২-৪, ১৬-১২
CUK-H0 1955-1-P36202

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

দ্বিতীয় সংখ্যা। [ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

P36202

আশ্রুৎকর্ণ, শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।

ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১—১০—৯।

হে শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমার প্রার্থনা সত্বর শ্রবণ করুন, আমার প্রার্থনা-বাক্য চিত্তে ধারণ করুন; আর আমার এই স্তুতিমন্ত্র যাহাতে আপনার অন্তরে মিত্রের ন্যায় স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহাই করুন। (ভাবার্থ)।

* * *

শ্রুতিতে দেখি, ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে বলা হয়,—"কচ্ছাত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম…।" শ্রোত্র যাঁহাকে শ্রবণে পায় না, পরন্তু শ্রোত্রের যাঁহা হইতে শ্রোত্রত্ব, তাঁহাকেই এখানে "আশ্রুৎকর্ণ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ মনে হবে। তিনি স্ফুট অস্ফুট সকল স্বরই শুনিতে পান। তিনি অন্তরের ও বাহিরের সবই বুঝিতে পারেন। গোপনের পরামর্শ ও প্রকাশ্যের সদ্ভাবমূলক বাক্য, কোন কিছুই অগোচর থাকে না। কেন-না, তিনি যে 'আশ্রুৎকর্ণ'।

* * *

মানুষ ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে, সাধারণতঃ তাহাদের সেই প্রার্থনার তিনটি স্তর দৃষ্ট হয়। শীর্ষোদ্ধৃত ঋক্ মানুষের সেই চরিত্র-চিত্রের প্রতিচ্ছবি ধারণ করিয়া আছেন। ঋকে লক্ষ্য করুন, ব্যাকুল ভক্ত প্রথমে কি প্রার্থনা করিতেছেন, আর পরেই বা কি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—'হে দেব! শুনুন—আমার প্রার্থনা শীঘ্র শুনুন।' পরক্ষণেই কহিলেন,—

'আমার এ প্রার্থনা একবার হৃদয়ে স্থান দেন।' শেষে জানাইলেন,—'যদি আ
আপনার হৃদয়ে স্থান পায়, সে প্রার্থনা যেন মিত্রভাবে আপনার হৃদয়ে স্থান
প্রার্থনা যেন আপনার প্রিয়তর সামগ্রী মধ্যে গণ্য হয়।'

* * *

মানুষে এই ভাব।

দুঃখপারাবারে নিমজ্জমান্ থাকিয়া, যন্ত্রণায় অস্থির বিচঞ্চল হ
প্রথমে ভগবানকে এক ভাবে ডাকে। প্রার্থনা শুনিয়া, ত্বরা
তিনি যেন দুঃখ দূর করেন,—প্রথমেই এ ভাব প্রকাশ পা
শুনিয়াও যখন সে প্রার্থনা ভগবান শুনিতে পান না, কর্ম্মফলরূপ যন্ত্রণার
ফলভোগের প্রতি তিনি যখন উদাসীন-ভাব প্রকাশ করেন, মানুষ তখন ভগ
এক ভাবে ডাকে; ডাকিয়া বলে,—'দয়াময়, আর যে সহিতে পারি না। আ
আপনার হৃদয়ে একবার স্থান দেন।' কিন্তু সে আহ্বানও যখন সুফলপ্রসূ
প্রার্থনা করে,—'হে ভগবন্, এই করুন, আমার বাক্য বা প্রার্থনা
প্রীতিপ্রদ হয়।' মানুষের প্রার্থনার এই তিন স্তর।

* * *

প্রার্থনায় জ্ঞান।

তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ', সমস্তই শুনিতে পাইতেছেন,—এ
আছে, তখন বুঝা যাইতেছে, প্রার্থনা শুনিতে পাইতেছেন
করিতেছেন না। এইরূপ ভাব মনে উদয় হওয়ার পর,
শুনিতেছেন না—তাহার কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে,
পারে, তাহার প্রার্থনা—তাঁহার শুনিবার উপযোগী প্রার্থনা হয় নাই। ত
চেষ্টা হয়—কি হইলে বা কি প্রার্থনা করিলে তাঁহার শ্রবণযোগ্য প্রার্থনা হয়
জ্ঞান আসে,—'তাঁহার প্রীতিজনক প্রার্থনা যাহা, তাহাই সঙ্গত ও তাঁহার শ্রবণ
প্রার্থনার ভাবকুসুম সাধকের হৃদয়ে কেমন স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুট হয়, কিক
ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করেন, অতঃপর একে-একে তাহাই লক্ষ্য করুন। আ

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পি

নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং ॥

হে অভীষ্টদ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন, হৃষ্ট
ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ প্র
করুন, এবং আমাকে বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করুন।

* * *

প্রার্থনার বিশেষত্ব।

ধন জন ঐশ্বর্য্য পুত্র-বিত্ত-শৌর্য্য-বীর্য্য সকলরূপ প্রার্থনার পর, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! হে অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্রদেব! আমায় সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ দান করুন,—আর আমাকে বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করিয়া তুলুন।' মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমি আয়ুঃ চাহি—ভোগের জন্য, আমি আয়ুঃ চাহি—বাঁচিবার সুখের জন্য নহে, আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন নব্য অভিনব সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় হয়, আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন আমায় ঋষিত্ব লইয়া যায়। যদি আমায় আয়ু দেও, যদি আমায় বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ কর, আমার জীবন যেন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকে, আমি যেন সর্ব্বপ্রকারে ঋষি হইতে পারি, আমি যেন বিজিতেন্দ্রিয় হই, আমি যেন অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি।' এই তো মানুষের মত প্রার্থনা—এই তো ঋষির মত সাধনা। কেমন ভাবে, কিরূপ প্রার্থনার মধ্য দিয়া, সাধনার এই স্তরে সাধক উপনীত হন, পর্য্যায়ক্রমে তাহা লক্ষ্য করুন,—অন্তরে অনুধাবন করিয়া দেখুন। তার পর,—

পবি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।

বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ॥

স্তুতিমন্ত্র-সেবনীয় হে ভগবন্! সর্ব্বপ্রকারে সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। অর্চ্চিত, নিত্যস্বরূপ আপনার সন্তোষ সাধনেই আমাদের সন্তোষ হউক, এবং আপনার সেবাই আমাদের প্রীতির হেতুভূত হউক।

* * *

প্রার্থনার পরিণতি।

এইবার চরম প্রার্থনা—প্রার্থনার পরম পরিণতি। সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়,—শ্রুতবাক্যের মর্ম্মার্থ কি? মর্ম্মার্থ কি এই নয় যে, আমি যেন এমন অপকর্ম্ম কিছু না করি, যাহার জন্য আমার স্তুতি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়, পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার নিকট পৌঁছিয়া যায়। 'তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশে উচ্চিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক'—এ ভাবের কি তুলনা আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি, গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ-ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে। স্তব-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক

হইতে পারিয়াছেন—এ সংসারের কয় জন? অনেক অনুসন্ধানে সন্ধান পাই, এ ভাব এক প্রফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকে নহেন—গোলোকের। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি হরিপরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরি? কে আর কহিবে এখন

'তোমারি সুখেতে আমারি সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয়-রাশি
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।'

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ,—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে—এ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন,—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হ পারে? এ সংসারে ইহাই চরম সাধনা নহে কি?

* * *

ভালবাসা।

[শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম-এ বি-এল লিখিত।]

(১)

দেহ লাগি দেহের ক্রন্দন,
রূপ লাগি আঁখির পিপাসা,
মধু লাগি ভ্রমর-গুঞ্জন,
নহে—নহে—নহে ভালবাসা।

(২)

গুণ লাগি গরব-সঞ্চার,
সুখে হাসি, দুখে দুখোদয়,
এক ভাব অন্তরে দোঁহার,
ভালবাসা সে ত কভু নয়।

(৩)

ক্ষণে ক্ষণে মান অভিমান,
পলে পলে বিরহ-মিলন,
বাঁধাবাঁধি পরাণে পরাণ,
ভালবাসা সে নহে কখন।

(৪)

সৌন্দর্য্যের রসে নিমগন,
চেতনা সে মাঝে জড়তার,
ভালবাসা মূক-আস্বাদন,
ভাষাতীত অনুভূতি-সার।

(৫)

ভালবাসা যারে ভালবাসে,
করে তারে সরবস্ব দান,
বাঁধা পড়ে আপনার ফাঁসে,
বাঁধিবারে না চাহে পরাণ।

(৬)

ভালবাসা আনন্দ না চায়,
আনন্দ আপনি করতল;
বিরহের মাঝখানে পায়,
পরিপূর্ণ মিলনের ফল।

(৭)

ভালবাসা—সে যে মহাভুল,
বাঞ্ছিতের সনে বিনিময়,
বাহ্য গোরা আঁখি ঢুলঢুল,
অভ্যন্তরে কৃষ্ণের উদয়।

'বেদ' ও তাহার অপব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

অপব্যাখ্যার জন্য আমাদের পরমপূজ্য 'বেদ' কিরূপ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত সংখ্যার (শ্রাবণ মাসের) "সাহিত্য-সংবাদে" তাহার একটী পরিচয় প্রদান করিয়াছি। অদ্য আর একটি ঋক্ ও তাহার ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। দেখিবেন—বুঝিবেন—কি সামগ্রী কি আকার প্রাপ্ত হইয়া আছে।

সুবর্ণ ময়লার স্তূপে আবৃত হইয়াছে। হীরকখণ্ড কয়লার খাদে ঢাকা পড়িয়াছে। রাহু আসিয়া শশধরকে গ্রাস করিয়াছে। আমরা বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া যে অন্যের দোষানুসন্ধানে প্রচেষ্ট রহিয়াছি, এ কথা ভ্রমেও যেন কাহারও মনে স্থান না পায়। মানুষ মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন। অতএব, আমাদেরও যে ভ্রম-প্রমাদ না ঘটিতে পারে, তাহার স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। তবে আমাদের যদি ভ্রান্তি ঘটে,—প্রদর্শন করুন, সঙ্গত হইলে, আমরা অবনত-মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব।

একটি নয়, দুইটি নয়; এক স্থানে নয়, দুই স্থানে নয়, শত শত সহস্র সহস্র মন্ত্র, কুব্যাখ্যার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত; দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সুতরাং যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই আমাদের উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাইবেন। পরন্তু আমরা কি দৃষ্টিতে দেখিয়া কি ভাবে বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে দৃষ্টিতে তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

বাগাড়ম্বর বৃথা। দেখুন—একটি ঋক্! বুঝুন—তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা। অনুধাবন করুন—আমাদের সঙ্কলিত অর্থ। পরিশেষে, জিজ্ঞাসা করুন—আপনার হৃদয়কে। আপনার হৃদয়ই উত্তর দিতে পারিবে—কোন্ অর্থ সঙ্গত ও কোন্ অর্থ অসঙ্গত। ঋক্ ও তাহার আলোচনা মৎসম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত বেদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা,—

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।

উর্বীরাপো ন কাকুদঃ॥

মহাভারতে যেমন ব্যাসকূট আছে, এই ঋক্‌টির অর্থ-নিষ্কাশনেও সেইরূপ ব্যাসকূট-উদ্ধার সমস্যায় পড়িতে হয়।

'ইন্দ্রদেব এতই সোমপান করেন যে, তাঁহার উদর সমুদ্রবৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাঁহার মুখের জল আর শুকায় না।' সাধারণতঃ ঋকের এই রকম একটা অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ইতর লোকের ভাষায়, 'পাঁড'-মাতালকে লক্ষ্য করিয়া, লোকে যেমন বলে—"বেটা যেন মদের জালা। মদে আর মুখে এক হয়ে আছে।"—এও কতকটা যেন সেই ধরণের উক্তি। 'ইন্দ্রদেব ঘোর সোমরসপানশীল অর্থাৎ মদ্যপ, অবিশ্রান্ত সোমরসপানে তাঁহার উদর যেন সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছে, তাঁহার মুখের জল শুকায় না, অর্থাৎ অনবরতই তিনি সোমরস মাদক-দ্রব্য পান করিতেছেন, মাদক-দ্রব্যের নাম মাত্রে তাঁহার জিহ্বা যেন সরস হয়।' এই ঋকের অনুশীলনে এইরূপ কদর্থ স্বতঃই সাধারণে গ্রহণ করেন। 'কুক্ষিঃ' আছে, 'সোমপাতমঃ' আছে, 'কাকুদঃ' আছে, আর রক্ষা আছে কি?

অথচ, ঋকটি কি গভীর ভাবদ্যোতক, একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আশ্বিন সূক্তের চতুর্থ ঋকের (তৃতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক) আলোচনায়, "সুসংস্কৃত পবিত্র সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে" এই ভাব মূলক বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সেই অর্থ সঙ্গত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে মনে করি।

ইন্দ্রদেবের উদর (কুক্ষিপ্রদেশ) সমুদ্রবৎ বৃদ্ধি পায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপের বিষয় স্মরণ করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার উদরের ও মুখের সম্বন্ধ-নির্ণয় পক্ষে একটা ধারণা আসিতে পারে। ইন্দ্রদেব এখানে মেঘাধিপতি, বৃষ্টির দেবতা। সুতরাং তাঁহার দেহ (উদর ও মুখ) ঐ 'অনন্ত আকাশ' বলিয়া মনে করিতে পারি। তার পর, 'কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ' বলিতেই বা কি বুঝি? প্রতীত হয় না কি—উহাতে মেঘপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত অন্তরিক্ষকেই বুঝাইতেছে? "সমুদ্র ইব পিন্বতে"—এ ক্ষেত্রে অতি সুসঙ্গত উপমা বলিয়াই মনে হয়। মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদ-নদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র যেমন তাহাতে স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, যতই মেঘ সঞ্চিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাঁহার সেই অনন্ত বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না। এখানে 'পিন্বতে' শব্দে 'বর্দ্ধতে' অর্থ উৎপ্রেক্ষায় আসিয়াছে। অলঙ্কারে, তাহা দ্বারা বিশালত্ব-ভাব সূচনা করিতেছে। উহার মর্ম্ম এই যে, সমুদ্র যেমন বিশাল ও বিস্তৃত, তাঁহার উদরও সেইরূপ বিশাল ও বিস্তৃত।

এইবার আর একবার 'সোম কি' বুঝিয়া দেখা যাউক। সংসারের ক্লেদরাশি বিশু[illegible] বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সাধারণভাবে [illegible] শব্দে সেই বিশুদ্ধ বাষ্পকে বুঝাইতেছে। অপিচ, এতদ্দ্বারা যজ্ঞধূমের বিষয়ও [illegible] পারে। আহুতিপ্রদত্ত সামগ্রীর বীজাণু, যজ্ঞধূম-সহ আকাশে সংবাহিত হ[illegible] ভূপতিত হইলে, সেই বীজাণু আশাতীত সুফল প্রদান করে। যজ্ঞকর্ম্মের বি[illegible] মধ্যে ইহাও একপ্রকার লক্ষ্যমূলক বলিতে পারি। সে হিসাবে, এখানে অর্থ [illegible] পারে, দেবোদ্দেশে আহুতি দান যতই অধিক হউক, তাহা গ্রহণ করিবার উপযোগী উদর (স্থান) দেবতার আছে। সুতরাং 'উদরে স্থান হইবে না' বলিয়া দেবোদ্দেশে দানে বিরত হইও না। যাহা হউক, সে 'জড়বাদের' দিক দিয়া এখন নাই দেখিলাম। বিজ্ঞান-বাদের দিক দিয়াও বুঝা যায়, বাষ্প দ্বারা মেঘসঞ্চারের বিষয়ই এখানে রূপকে

বিবৃত হইয়াছে। বাষ্প-গ্রহণ (পান) তাঁহার মুখ-সম্বন্ধ-সূচক, বাষ্পধারণ তাঁহার উদরের বিশালত্ব-জ্ঞাপক।

"আপো ন কাকুদঃ"—এই বাক্যের অর্থ, সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝি, 'মুখ-সম্বন্ধ-যুক্ত জল কদাচ বিশুষ্ক হয় না', অথবা 'তাঁহার উদর রসনার জলের ন্যায় সদা সিক্ত।' কিন্তু ইহার ভাবার্থ কি? প্রকৃতি-পক্ষে, মেঘাধিপতির মুখ-সম্বন্ধে বা উদর সম্পর্কে, ইহার ভাব-গ্রহণ অবশ্যই সহজবোধ্য। আকাশে বা মেঘে জলকণা সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে; সে জলকণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না, এখানে উপমায় সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, আকাশ-রূপ উদরে মেঘ সঞ্চার-রূপ সোমরস সমুদ্রবৎ বিস্তৃতভাবে সঞ্চিত হয়, তাহা কখনও একেবারে বিশুষ্ক হয় না, পরন্তু রসনার সরসতার ন্যায় তাহা নিত্যই সরস থাকে। সাধারণভাবে ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে।

এখন, এ ঋকে আধ্যাত্মিক পক্ষে কিরূপ অর্থ সঙ্গতি হয়, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ঋকটি দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশে উদরের বিশালত্ব, অন্য অংশে তাঁহার মুখের বা উদরের সদা আর্দ্র-ভাব। এক অংশে সোমপানে—ভক্তের পূজা-গ্রহণে—কখনও তাঁহার বিরতি নাই, অন্য অংশে তিনি সদাই স্নেহ-বিগলিত আর্দ্র হইয়া আছেন। অজ্ঞ জন-সাধারণ মনে করিতে পারে,—'এক ভগবান, তিনি কত জনের পূজা গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ, ধনবান জন, কত জাঁক-জমক করিয়া, কত চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় সামগ্রী দিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সে পূজা পরিত্যাগ করিয়া, সে অমৃতোপম ভোগে উপেক্ষা প্রদর্শনে, আমাদের এ সামান্য পূজার প্রতি তিনি কি দৃষ্টিপাত করিবেন?' এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া, এ ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি। তাঁহার অনন্ত-বিস্তৃত বিশাল উদর—অনন্ত কোটি সাধকের পূজা গ্রহণ জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে। যাহার যাহা সামর্থ্য হয়, তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন কর, তিনি আদর করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। বড়লোকের বড়-ঘটার পূজাও তিনি যেভাবে গ্রহণ করেন, গরীবের সামান্য পূজোপচারও তিনি সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতর-বিশেষ ভাব তাঁহাতে আদৌ সম্ভবপর নহে। রাজচক্রবর্ত্তী বলির প্রদত্ত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার নিকট যেরূপ আদৃত, বিদুরের প্রদত্ত তুচ্ছ তণ্ডুলকণাও তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রীতিপ্রদ।

ঋকে আছে—'আপো ন কাকুদঃ'। তাঁহার করুণার মন্দাকিনী যে কদাচ বিশুষ্ক হয় না, রসনার জলের ন্যায় তিনি যে সদাই আর্দ্র, এবম্বিধ উক্তিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবান 'অপ্রতিষ্কুত', তাঁহার দয়ার নির্ঝর সদা উন্মুক্ত, তিনি প্রার্থীকে কখনও 'না' বলিতে জানেন না, এ ঋকের 'আপো ন কাকুদঃ' সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

এতদনুসারে, এ ঋকের অন্বয়ানুসারী যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহাও এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে, যথা,—

'যঃ' 'কুক্ষিঃ' (ভগবত উদরপ্রদেশঃ, আকাশঃ, ভগবান ইতি ভাবঃ) 'সোম-প্রাতমঃ' (সোমপানশীলঃ, পরিশ্রুতবাষ্পগ্রহণশীলঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণকারী) 'সমুদ্র ইব'

(অর্ণব ইব, অনন্ত ইব) 'পিন্বতে' (বর্দ্ধতে, বিস্তৃতো ভবতীতি শেষঃ), 'কাকুদঃ' (মুখসম্বন্ধিন্যঃ) 'উর্ব্বীঃ' (মহত্যঃ, বিস্তীর্ণাঃ) 'আপঃ' (জলানি) 'ন' (কদাচিদপি ন শুষ্যন্তি)। বহুভাবদ্যোতকং এতৎ স্তোত্রং। কোঽপি অত্র সোমরসরূপমাদকদ্রব্যস্য সম্বন্ধং সূচয়তি। তন্নযুক্তং। ঋগভ্যন্তরে ব্যোম্নঃ বাষ্পগ্রহণস্য উপমা বিদ্যতে। অর্ণব ইব বিস্তৃতঃ অনন্তঃ আকাশঃ যথা বাষ্পগ্রহণশীলঃ, তথৈব ভগবান শুদ্ধসত্ত্বভাব-গ্রহণকারী। অশেষা তস্য করুণা। মুখসম্বন্ধিন্যঃ আপঃ যথা কদাচিদপি ন শুষ্যন্তি, ভগবতঃ করুণাধারা তাদৃশী নিত্যপ্রবহমাণা। ইতি ভাবার্থঃ।

বুঝিয়া দেখুন—কি ঋকের কি অর্থ চলিয়া আসিতেছে। দেশে এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজ আছে, হিন্দু সমাজ আছে, চূড়ামণিগণ আছেন, শিরোমণিগণ আছেন, সমাজপতিত্বের দাবী করেন—এমন-সকল লোকও আছেন। অথচ, তাঁহাদের পরমপূজ্য 'বেদ' যে এই অবস্থায় উপনীত, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না—ইহাই আশ্চর্য্য। হিন্দু! তাই বলি,—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'

মিলন-গীতি।

[শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ মোজাম্মল হক বি-এ বিরচিত।]

(১)

আর করিনে ভয়,
আজ বিভুর বরে মিলন-গীতি
হচ্ছে ভারতময়।
ও ভাই, হচ্ছে ভারতময়!
আজ সে গানের মোহনতানে
কতই প্রীতি আনে প্রাণে
আজকে মহা মিলন-যজ্ঞে
ভাবের বিনিময়।
মোদের ভাবের বিনিময়।

(২)

ভয় নাই ভয় নাই।
ভারতবর্ষে হিন্দু-মোস্‌লেম
আমরা দু'টী ভাই।
ওরে আমরা দু'টী ভাই!
একই মায়ের স্তন্য পিয়ে,
আমরা দোঁহে আছি 'জিয়ে'
নিদ্রা এলে-মায়ের কোলটী
ভিন্ন গতি নাই।
মোদের ভিন্ন গতি নাই।

(৩)

কুক্ষণে কে জানে
ভায়ের উপর ভায়ের ঈর্ষা
উদয় হ'ল প্রাণে।
ওরে উদয় হ'ল প্রাণে!
সেই হ'তে ত নিত্য শত,
ঝগড়া ঝাটি হ'ত কত,
স্নেহশীলা মায়ের পরাণ
কাঁদ্‌ত অভিমানে।
ওরে কাঁদ্‌ত অভিমানে।

(৪)

আর করিনে ডর।
আজ বিভুর বরে ভাইকে মোরা
চিন্‌ছি পরস্পর!
ওরে চিন্‌ছি পরস্পর।
ভাই 'মসজিদে' আজ ভায়ের মিলন,
'মন্দিরে'ও প্রেমালিঙ্গন,
আজ বুঝেছি 'বিবাদ' করে
নিজের ঘরে পর!
মোরা নিজের ঘরে পর।

(৫)

তোমার রাম, সীতা
ভীম, যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য্য
'মহাভারত', 'গীতা'
তোমায় শুধু জান্‌ব বলে,
পড়্‌ছি আমি কুতূহলে,
বল্‌তে পারি কে কার স্বামী—
কে কাহার বা পিতা।

(৬)

তোমরা সবাই আজ
এস এস আমার গৃহে
নাইকো কোন লাজ।
ও ভাই নাইকো কোন লাজ।
আমার গৃহের রত্নরাজি,
'আগুল' ভরে দিব আজি,
ভাইকে বড় করাই আমার
হবে গর্ব্বের কাজ।
ও ভাই হবে গর্ব্বের কাজ!

(৭)

নইত আমি দীন।
ঐ দেখ ভাই কাঠ কপাটে
আছে রত্নের চিন্।
ও ভাই, আছে গর্ব্বের চিন্।
জগজ্জয়ী খালেদ, আলিদ,
আয়শা, জোহ্‌রা হারুণ রশিদ,
এদের ঘরে জন্ম আমার
নইত আমি হীন,
ভাইরে নইত আমি হীন।

(৮)

দুই ভাই মোরা যবে,
অতুল প্রেমে স্নিগ্ধ হয়ে
দাঁড়াইব ভবে,
ও ভাই দাঁড়াইব ভবে।
আকাশ-হ'তে আশীষ-রাশি,
আস্‌বে মোদের শিরে ভাসি,
মোদের সুযশঃ গর্ব্বে ধরা
পূর্ণ তখন হবে,
ও ভাই পূর্ণ তখন হবে।

দেবতা।

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম-এ বিরচিত।]

বাজে আরতির শঙ্খ কাঁসের নিক্কণ,
মন্দির ভরিয়া যায় যত ভক্তদলে।
ফল ফুল-নৈবেদ্যের মহা আয়োজন,
গৃহগাত্র সিক্ত হয় পাদ্য অর্ঘ্য জলে॥
কেহ পুত্র, কেহ ধন করিয়া যাচনা,
কেহ ফেলি দরদের দরিত নিঃশ্বাস।
কেহ সাধু খ্যাতি তরে করি নীরাঞ্জনা,
নির্ম্মাল্য লইয়া শিরে গেল নিজ বাস॥
স্তব্ধ নিরজন গেহে একক দেবতা,
সম্মুখে স্থাপিত নগ্ন জড় জল-ঘট।
ফুল-দূর্ব্বা-বিল্বদল ভূমি আচ্ছাদিতা,
মানবের ছলনায় পুণ্য দৃশ্যপট॥
ডাকিয়া দেবতা কয় পূজারীর কাছে,
নাহি চাহি অর্ঘ্য জল নৈবেদ্যের থালা।
বৃথা এ মঙ্গল ঘট পল্লবিত রাজে,
নিষ্ফল চন্দন চুয়া ধূপ দীপ জ্বালা॥
আমি চাই পরাণের আকুল পিয়াসা,
অবিশ্রান্ত প্রীতি-প্রেম-ভক্তি বরিষণ।
নাহি চাই অর্ঘ্য সাজি শুধু আওয়া আসা,
আমি চাই প্রাণে প্রাণে অক্ষয় মিলন॥

রাঢ়ে সেন-রাজধানী।

[মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের লিখিত।]

[তাম্রশাসনে রাঢ়ভূমি ও সেনরাজপুত্রগণ।]

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিবিষ্টে
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈঃ ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়দিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্তুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥
তেষাম্বংশে মহোজা প্রতিভট পৃতনাম্ভোধি কল্লান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসা মৃগঙ্কঃ
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপাধি করুণোধাম সামন্তসেনঃ॥"

(বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, তৃতীয় চতুর্থ শ্লোক।)

"সেই (চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধবংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা বিশ্ববাসিগণকে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া বদান্য পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, এবং শুভ্র কীর্ত্তি-তরঙ্গে আকাশ-তলকে স্নাত করাইয়াছিলেন; যাঁহারা সদাচার-চর্য্যার খ্যাতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়-দেশকে অপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশে প্রবল প্রতাপ, শত্রুসেনা-সাগরের প্রলয় তপন, কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন, প্রিয়জনগণরূপ কুমুদ-বনের উল্লাস-লীলা সম্পাদক মৃগাঙ্কস্বরূপ, আজন্ম প্রণয়ানুরাগিগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার হিমাচল-সদৃশ, সত্যশীল অকপট করুণাধার সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।"

বর্দ্ধমান-জেলার সীতাহাটি-গ্রামে (কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী) প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে এই বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপুত্রগণ যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সদাচার-চর্য্যার খ্যাতি-গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়মণ্ডলকে অতুল প্রভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সে পবিত্র ভূমির অবস্থিতি-স্থান নিরূপিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, ঐতিহাসিকবৃন্দ এই আলোচনার মূল্য নির্দ্ধারণে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

রাঢ়ে সেন-রাজধানী 'বীরনগর।'

বীরভূম-জেলার লুপ লাইনের ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের মুরারই-ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে এবং রাজগাঁ ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে "বীরনগর" নামে একটী স্থানে পূর্ব্বতন পরিখা-প্রাকারের ও বিপুল মৃত্তিকা-নিকেতন-নিচয়ের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। বীরনগরের পশ্চিমোত্তর কোণে "রাজবাড়ী" নামে অপর একটী প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান আছে। উভয় স্থানেই দুইটী

ক্ষুদ্র পল্লীতে এখন কয়েক ঘর সাঁওতাল ও বাগ্দি প্রভৃতি বাস করিতেছে। বীরনগর ও রাজবাড়ীতে ছোট বড় প্রাচীন পুষ্করিণীর সংখ্যা ন্যূনাধিক প্রায় তিন শত হইবে। রাজবাড়ীর উত্তরে এক উচ্চ দীর্ঘ বিশাল প্রাচীরের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমস্থিত জঙ্গলময় ভূভাগের নাতিদূরেই সাঁওতাল-পরগণার পাহাড় শ্রেণী। বীরনগর ও রাজবাড়ীর দক্ষিণে দূরবিস্তৃত নিম্নভূমি। দক্ষিণের কিয়দংশে ও পূর্ব্বে সীতাপাহাড়ি, চন্দ্রপাহাড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, স্বচ্ছন্দ-বনজাত তরুলতায় পরিপূর্ণ। সীতাপাহাড়িতে 'যোগিগুফা' নামে একটী পুষ্করিণী ও দুইটী গুহা আছে। মাটির নীচে গুহা, সুন্দর পাথরের খিলানে উপরিভাগ আচ্ছাদিত ছিল। দুইটী গুহার মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। নাম শুনিয়া মনে হয়, গুহা দুইটী কোন যোগীর সাধনার আশ্রয়ভূমি ছিল। প্রবাদ আছে, বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানটীর প্রাচীনত্ব খ্যাপনের জন্য হয় তো এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। রাজগাঁয়ের দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রাজারামপুর, তাহার নিকটেই চিতারা ও তিলুরাণী গ্রাম। এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রাজনপুর। রাজগাঁয়ের দুই মাইল দক্ষিণে ভদ্রকালী ও ভাঁটরা গ্রাম। এই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রবাদ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে বহুজন-মুখে শ্রুত হইয়াছি। বীরনগর সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। তথায় 'বীরসেন' নামে এক রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান রাজবাড়ী গ্রামে তাঁহার আবাস-বাটী ছিল। অপরাপর স্থান-সম্বন্ধে প্রবাদ, যথা,—চন্দ্রপাহাড়ির নিকটে চন্দ্রপাড়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় চন্দ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন এবং ভাঁটরা ও ভদ্রকালীতে ভদ্রসেন রাজার বাস ছিল। রাজারামপুর ও তিলুরাণীতে কোন রাজা রাণী বাস করিতেন, ইত্যাদি। ভদ্রকালীতে একটি অষ্টভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের অদূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকটেই একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। মূর্ত্তিটী প্রায় তিন হস্ত উচ্চ ও দুই হস্ত বিস্তৃত একখানি কৃষ্ণ পাষাণখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া নির্ম্মিত। মূর্ত্তির অনেকাংশ অত্যাচারীর অত্যাচারে খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তর এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণে কতকাংশের নাম 'ধনগাড়া'। ধনাগারের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। কৃষকগণের মুখে শুনিয়াছি—"অনেকেই তথা হইতে অর্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, হল-চালনার সময় তথায় মাটির নীচে বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে জানিতে পারা যায়।" মন্দিরের নিকটে কয়েকটা পুরাতন পাথরের চৌকাট প্রভৃতি পড়িয়া আছে। বীরনগর প্রভৃতি স্থানের অবস্থানাদির বিষয় এবং এই সমস্ত প্রবাদ-প্রসঙ্গাদি আলোচনা করিয়া মনে হয়, বীরনগরেই রাঢ়ে সেন বংশীয়গণের রাজধানী অবস্থিত ছিল, এবং রাজগাঁ, রাজনপুর, চন্দ্রপাড়া, ভাঁটরা প্রভৃতি স্থান রাজধানীর উপকণ্ঠ-

বীরনগরের বর্ত্তমান পরিচয়।

যোগিগুফা।

বীরনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ।

মহিষমর্দ্দিনী দেবী।

বীরনগরই রাঢ়ে সেন-রাজধানী।

রূপে পরিগণিত হইত। বীরনগরের নিকটবর্ত্তী মথুরাপুর বা মন্থরাপুরে একটী হরগৌরীর যুগল-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। মুড়ারই ষ্টেসনের পূর্ব্বে নিকটেই ভাদীশ্বর গ্রাম। সাধুভাষায় ভদ্রেশ্বর বলে। এই গ্রামে এক পরিখা-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ দেখাইয়া লোকে তাহাকে ভদ্রসেন রাজার দেবালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটী সুন্দর হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি ও একটী মনসার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরগৌরীর মূর্ত্তি প্রায় দুই হস্ত উচ্চ। মনসা মূর্ত্তিটী অপেক্ষাকৃত ছোট। সর্প-সপ্তকের ফণাছত্রতলে বসিয়া বামহস্তে একটী সর্পকে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত জানু-পৃষ্ঠ মুদ্রায় দক্ষিণ জানুর উপর উত্তানভাবে ন্যস্ত রাখিয়া দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। ভাদীশ্বরের পূর্ব্বে পাইকর গ্রাম। পূর্ব্বে নাম ছিল "প্রাচী-কোট্"। প্রবাদ আছে, প্রাচী-কোটের প্রায় চারি মাইল পূর্ব্বস্থিত মিত্রপুর-গ্রাম মিত্রবর্ম্মা রাজার রাজ্যসীমা ছিল। মিত্রবর্ম্মার আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বীরনগরের পূর্ব্ব-দুর্গ ছিল—ঐ প্রাচী-কোট। কেহ কেহ বলেন, অপর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত বীরনগরাধিপের যে স্থানে উভয় রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে মিত্রপুর ও প্রাচীকোটের মধ্যস্থানে "ভাগাইল" নামে অভিহিত হইতেছে। এই মিত্রতা-বন্ধন জন্য অপর রাজার সীমান্ত দুর্গ মিত্রপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় সীমা-নির্দ্দেশক বাঁধকে আইল বা 'আল' বলে। এই অর্থেই 'ভাগাইল' নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিত্রপুরের পার্শ্বেই 'ননগড়' গ্রাম। এই গ্রামে 'রাজা মহীপালের দীঘি' নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি বর্ত্তমান আছে। পিতৃরাজ্য হারাইয়া, রাজা প্রথম মহীপাল, রাঢে আসিয়া যেখানে রাজধানী স্থাপন করেন, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়গিরি লিপির 'উত্তির লাঢম পতি', মহীপালের সেই প্রথম অভ্যুদয়-ভূমি, নলহাটী আজিমগঞ্জ রেলওয়ের বাড়ালা-ষ্টেসন হইতে ভাগীরথী তীরস্থ গায়সাম্বাদ (মুর্শিদাবাদ জেলা) পর্য্যন্ত প্রায় আট মাইল ব্যাপী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ তন্মধ্যবর্ত্তী মহীপাল নামক স্থান, ননগড হইতে বেশী দূরে নহে। আমরা ননগড় মিত্রপুরকে পাল-রাজগণের সীমান্ত-দুর্গ বলিয়া মনে করি।

হরগৌরী মূর্ত্তি।

ভদ্রেশ্বর রাজা ও ভদ্রেশ্বরের দেবমূর্ত্তি।

প্রাচীকোট বর্ত্তমান পাইকর-গ্রাম সম্বন্ধে প্রবাদ।

বীরভূমে মহীপাল-দীঘি।

১ম মহীপালের রাজ্যসীমা।

পাইকর গ্রামে প্রাচীন বহু দেবমূর্ত্তি ও কয়েকটী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি নরসিংহ মূর্ত্তি, একটি অষ্টাদশভুজা দেবী মূর্ত্তি, কয়েকটি বাসুদেব-মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটি দেবীমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। আমাদের উদ্দিষ্ট প্রথম শিলালিপিখানি একটি ভগ্নমূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত রহিয়াছে। 'রাজ্যে শ্রীবিজয় সেন' ভিন্ন লিপির অপরাংশ, পাদপীঠের ভগ্নাংশের সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। নারায়ণ-চত্বর নামক পুষ্করিণী-তীরে এই লিপিযুক্ত ভগ্ন পাদপীঠখানি পড়িয়া আছে। পাইকরে বুড়া-শিবের মন্দিরে একটি প্রস্তর স্তম্ভে অপর শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপির প্রথম শ্রেণীতে মাত্র 'মাঘস্য' এই শব্দটি পড়িতে পারা যায়। তারিখের অংশটি

পাইকরের দেবমূর্ত্তি।

পাইকরে বিজয় সেনের শিলালিপি।

কে বা কাহারা কাটিয়া উঠাইয়া দিয়াছে। ২য় শ্রেণীতে আছে,—"মণ্ডলপাত্র শ্রীপাহি-দণ্ডেন", অপরাংশের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ সি-আই-ই মহোদয় এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বলেন যে, এই উভয় শিলালিপি অক্ষর সমসাময়িক বলিয়া অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আমরা এই পাহি-দণ্ডকে বিজয় সেনের মন্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। পাইকরে প্রচলিত প্রবাদ পরম্পরা আমাদের অনুমানের সমর্থন করিতেছে। পাইকরের পশ্চিমস্থিত পাগলা নদীর তীরে একটী আম্রকানন আছে। সে কালের প্রাচীন বৃক্ষাদি নাই, কিন্তু নাম এখনও আছে। স্থানীয় লোকে বলে—'মহাবুল্লার বাগান'। প্রবাদ আছে, বীরনগরের কোনও সেন-রাজা কি কারণে তাঁহার মন্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। পরে সেন-রাজ উড়িষ্যা-বিজয়ে গমন করিলে, মন্ত্রী, সামান্য সৈনিকের ছদ্মবেশে যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, বিজয়লক্ষ্মীর সহিত রাজার প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ভাগীরথীর আসিয়া আম্রসংযুক্ত কোনও প্রিয় আহার্য্যের আয়োজন দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, এক সৈনিক অগ্রে এখানে আসিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছে। পরিচয়ে বুঝিতে পারেন, এ সেই উড়িষ্যা বিজয়ের কৃতী সৈনিক। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে প্রাচী-কোটে কর্ত্তৃত্ব-প্রদানে পুরস্কৃত করেন। বলা বাহুল্য, যে বাগান হইতে রাজার প্রিয় আহার্য্যে আম্র সংগৃহীত হইয়াছিল, সৈনিক তাহাও দান প্রাপ্ত হন। সৈনিক প্রাচী-কোটে গিয়া পুরাতন দুর্গের সন্নিকটে একটী কোট্ স্থাপন করেন। রাজা তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় অবগত হইয়া সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া পুনরায় তাঁহাকে সাদরে মন্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। লোকে বলে, সৈনিক অর্থাৎ 'পাইকের কোট' অপভ্রংশে 'পাইকর' হইয়াছে। আমরা কিন্তু অন্যরূপ মনে করি। আমাদের মনে হয়, 'মহাবলের বাগান' কালক্রমে বিকৃত হইয়া 'মহাবুল্লার বাগানে' পরিণত হইয়াছে। 'মহাবল' সৈনিককে বুঝাইত। সেনাপতির উপাধি ছিল—'মহাবলাধ্যক্ষ'। প্রবাদ বলিতেছে মন্ত্রীই ছদ্মবেশে সৈনিক হইয়াছিল। অনুমান হয়, 'মণ্ডল পাত্র পাহি দণ্ডই' এই সৈনিক 'পাহির কোট' কালক্রমে 'পাহিকোট' হইতে 'পাইকর' রূপ ধারণ করিয়াছে।

অপর একখানি শিলালিপি।

বিজয় সেন ও তাঁহার মন্ত্রী।

বিজয় সেন সম্বন্ধে প্রবাদ।

উড়িষ্যা-বিজয়ী রাজাকে আমরা 'চোড়গঙ্গ-সখা বিজয় সেন' বলিয়া মনে করি। এই প্রবাদ বোধ হয় কলিঙ্গ যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। দান সাগরে কথিত—"তদনুবিজয়-সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে" শ্লোকটির 'বরেন্দ্র' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ত্বরেন্দ্র' পাঠই আমাদের মতে সমীচীন। সুতরাং আধুনিক বহু ঐতিহাসিকের মতানুসারে "রাঢে বিজয়সেনের প্রথমাভ্যুদয়" আমাদের এ প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। 'মণ্ডল' শব্দের অর্থ 'বিশ্বপ্রকাশে' কথিত হইয়াছে—"স্থানমণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ"। বিজয় সেন হয় তো প্রথমাভ্যুদয় কালে মণ্ডল উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা স্বাভাবিক বলিয়া

পাইকর নামের ব্যুৎপত্তি।

প্রবাদ ও ঐতিহাসিক মত।

মনে হয়। কারণ, তখনও পালবংশের প্রভাব তখনও খর্ব্ব হয় নাই। পালবংশের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের "নৌবাট হী-হী রব" দিক্‌করীগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। এই জন্যই অনুমান হয়, মণ্ডল পাত্র পাহি দণ্ড বিজয় সেনেরই মন্ত্রী ছিলেন। বিজয় সেনের রাজ্ঞীর নাম ছিল—বিলাস দেবী। পাইকরের দুই মাইল দক্ষিণে বিলাসপুর গ্রাম ও গ্রামের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সরসীর 'রাণী দীঘি' নাম এ সম্বন্ধে নানা সংশয় মুখরিত করিয়া তোলে। রাণী দীঘির' দক্ষিণে অনতি-বৃহৎ প্রান্তরে পরিখার ক্ষীণ রেখা পরিবেষ্টিত এক নাত্যুচ্চ ধ্বংসস্তূপকে লোকে রাজবাড়ীর লুপ্তাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

রাজ্ঞী বিলাস দেবী।

—*—

দেশের শিল্প-বাণিজ্য।

[শ্রীযুক্ত জয়কুমার বর্দ্ধন রায় মহাশয়ের লিখিত *]

কার্পাস-বস্ত্রের ন্যায় পশমী বস্ত্রের ব্যবসাও বিদেশীয়দের একচেটিয়া। পশম দ্বারা শাল, র‍্যাপার, বনাত, ফ্ল্যানেল, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কেবল তিব্বত-দেশীয় ছাগলের লোমে উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ১ এক কোটী ২০ বিশ লক্ষ টাকার মেষের লোম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই কাবুল হইতে এদেশে আনীত হইয়াছিল।

পশমের ব্যবসা এ দেশে দিন দিন অবনতির দিকে নামিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে প্রতি পল্লীতেই ধোবারা মেষ পালন করিত। ময়লা-বস্ত্র মেষের মল দ্বারা তখন পরিষ্কার করা হইত। এক্ষণে সোডার প্রাচুর্য্যবশতঃ মেষের মলের আবশ্যকতা তিরোহিত হইয়াছে। ধোবারা আর মেষ পালন করে না।

ইংলণ্ডে প্রায় তিন কোটি মেষ আছে। সেখানে প্রতি বৎসর ৭ সাত কোটি টাকার মেষ-লোম বিক্রয় হয়।

সর্ব্বাদৌ পশ্চিম এসিয়া-বাসী এবং ইউরোপের দক্ষিণ দেশ-বাসীরা মেষ-লোম দ্বারা বস্ত্র বয়ন কার্য্য জানিত। তৎকালে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের অধিবাসিগণকে পশুচর্ম্ম গায় দিয়া শীত নিবারণ করিতে হইত। ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ফ্লেমিয় জাতি ইংলণ্ডে পশম-বুনানী কার্য্য প্রবর্ত্তন করে। এখন ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া পশম-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে সর্ব্বপ্রথম ৩টী মাত্র মেষ প্রেরিত হয়। ৮২ বৎসরে সে দেশে ৬ কোটি আট লক্ষ মেষ হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী

* শেষাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মহারাজ-কুমার বাহাদুরের এই প্রবন্ধ হাওড়ায় বঙ্গীয় হিতৈষী-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত হয়।

কালে মেষের সংখ্যা কতই বৃদ্ধি হইয়াছে! অষ্ট্রেলিয়াতে যে পশম উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য অন্যূন ২০ বিশ কোটি টাকা।

বার্ম্মিংহাম নগর ইংলণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব-সময় পর্য্যন্ত বার্ম্মিংহাম নগর লৌহ ও লৌহ-নির্ম্মিত জিনিসাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে লৌহের প্রাধান্য-পিতল অধিকার করিয়াছে। পিতলের বোতাম প্রস্তুত দ্বারা শিল্পিগণ বহু টাকা উপার্জ্জন করিত। এক্ষণে পিতলের বোতাম ব্যবহার পূর্ব্বের মত হয় নাই। কাজেই বোতামের ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে পিতলের নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া আফ্রিকায় প্রচুররূপে রপ্তানি হইতেছে। কাফ্রি রমণীগণ অতি আহ্লাদ-সহকারে ঐ সকল অলঙ্কার পরিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ও ব্রহ্ম-দেশের পার্ব্বত্য-প্রদেশেও ঐ সকল অলঙ্কার সমাদরে গৃহীত হইতেছে। এক বার্ম্মিংহাম নগরে ৬ লক্ষ মণ তামা এবং ঐ পরিমাণ পিতল এবং অন্যান্য ধাতু এই কার্য্যে লাগিতেছে। এখানে লৌহের নিভ প্রচুররূপে প্রস্তুত হয়। কলে নিভ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিতলের জিনিস প্রস্তুতের কারখানা তিন শতের উপর হইবে। ক্রমেই সংখ্যা বাড়িতেছে। দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে এখানে বন্দুক, কামান, তরবারি, সঙ্গীন প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে।

বাণিজ্য হিসাবে বার্ম্মিংহাম নগরের পরেই সেফিল্ড নগর। কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত বৎসর হইতে এখানে ছুরি, কাঁচি, তরবারি, দা, ক্ষুর, কাস্তে প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রয় হইতেছে।

লিভারপুল নগর বাণিজ্য-হিসাবে প্রায় লণ্ডনের তুল্য। এখানকার ধনকুবেরা পৃথিবীর নানা দেশ-জাত জিনিস-পত্র খরিদ করিয়া গুদামে সঞ্চিত রাখেন। পরে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হন। স্বদেশ-জাত জিনিস তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুণ লিভারপুলের আশ্চর্য্যরকম শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল সহরে মাত্র ৫৯০ মাত্র অধিবাসী ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধি হইয়া অধিবাসী সংখ্যা হয়—২৫৭৮০ জন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অধিবাসীর সংখ্যা হইয়াছে—৫১৮০০০ জন। তৎপরবর্ত্তী কালে যে অধিবাসী সংখ্যা যে আরও বড়িয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ডাণ্ডিনগর স্কটলণ্ডের অন্তর্গত। এখানে মোটা লিলেন পাটের চট, জাহাজের দড়ি এবং গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর ৮১ লক্ষ মণের উপর পাট ক্রীত হইয়া ডাণ্ডিনগরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইউরোপে শিল্প বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, একমাত্র তাহা বুঝাইবার জন্য কয়টী মাত্র বাণিজ্য-প্রধান স্থানের নামোল্লেখ করিলাম। যে দেশে শিল্পের এতদূর উন্নতি, সে দেশের অর্থ-সম্পদ যে দিনদিন বৃদ্ধি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা যতই কেন বক্তৃতা করি না, যতই কল্পনার বলে সুখের চিত্র প্রসারিত করি না, দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ততর হইবার উপায় বিহিত না হইলে, সকল উন্মত্তের প্রলাপবৎ অসারত্বে পরিণত হইবে। করুণ ভাষায় মন গলে, মধুর বাক্যে কর্ণ তৃপ্ত হয়,

কিন্তু জঠর জ্বালা দূর হয় না। দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে যে ব্যক্তি ক্লিষ্ট, তাহার কাণের কাছে বীণার ঝঙ্কার তুলিতে যাও, দেখিবে, সে মারিতে তাড়া করিবে।

সর্ব্বাগ্রে অন্নের সংস্থান করা যে আবশ্যক, এ কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। শস্যসম্পদ্ সকল সম্পদ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে। কিন্তু শস্যোৎপাদনে বহু বিঘ্ন। প্রাকৃতিক ঘটনাবশে অনেক সময় খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। কাজেই আমার নিজের জমী থাকা সত্ত্বেও অপরের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। খাদ্যশস্য খরিদ করিতে গেলেই অর্থের দরকার। জগতের কোন্ কাজই বা অর্থ ব্যতীত সম্পন্ন হয়? আমরা অর্থের খাতিরে দেহপাত করিয়া রাজভাষা শিক্ষা করিতেছি। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জ্জন অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া জীবিকার উপায় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ওকালতির ও কেরাণীগিরীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। ওকালতির পসারও মাটি হইতে চলিয়াছে। প্রতি বৎসর উকীলের সংখ্যা এতই বাড়িয়া যাইতেছে যে, দেশের লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবলই মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেও উকীলদের গ্রাসাচ্ছাদন কুলাইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। উকীলের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এমনই আশঙ্কা জন্মে বটে। তার পর কেরাণীগিরি দ্বারা এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে সচ্ছলতার সহিত পরিবার ভরণপোষণ করা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

হ্যাট-কোটের প্রলোভনে পড়িয়া তাঁতি ও কুমারের ছেলে জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কেরাণী হইবার দুরাশায় ঘুরিতেছে এবং আপনাদের সমগ্র শক্তি ক্ষমতা যত্ন চেষ্টা অযথা-পথে ক্ষয় করিতেছে।

দেশের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত। জেলেরা শণ-সূতার পরিবর্ত্তে বিদেশজাত টুন সূতা দ্বারা জাল প্রস্তুত করিতেছে। বাজারে বন্দরে টুন বা বেল সূতার বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। বাজার-প্রত্যাগত কয়েকজন জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল,—কলের সূতার জাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কারণ, এই সূতার ভিতর সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ ইহাতে অনেকটা শ্রম-লাঘব হয়।—ইহা যে আমাদের হীনতার পরিচায়ক, তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? কিন্তু আমাদের এইরূপ হীনতার নিদর্শন ও বিদেশী শিল্পের অর্থ শোষণ-পন্থা-দূরীকরণে চেষ্টা, আমাদের মধ্যে অনেকে আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। জগতে আমাদের স্থান কত নিম্নে, চিন্তা করিয়া দেখিলে হয় না কি? অতীত গৌরব-বিভবের ক্ষীণ-স্মৃতি বুকে করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া তাহাতে বরং অতীত গৌরব পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়াই সমীচীন। কোন্কালে কি দিয়া ভাত খাইয়াছ, সে গন্ধ কি আজিও আছে? সে অতীত কালের স্মৃতান্ন মনে করিলে, জঠরজ্বালার নিবৃত্তি হইবে না।

কুটির-শিল্প গুলি সংরক্ষণ করিবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, পল্লী-সঙ্ঘ করিয়া কেন্দ্রস্থলে এক একটি ক্ষুদ্র শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ঐরূপ শিল্পাগারে এক এক জন শিক্ষিত শিল্পী নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা দান করিবে। ঐরূপ শিল্পাগার যতদিন পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণের

চাঁদার উপর উহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতি সঙ্ঘে এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে পর যখন দেশের লোক বুঝিতে পারিবে যে, শিল্প দ্বারা জীবিকার পথ বেশ প্রশস্ত হইয়াছে, তখন দেশের সর্ব্বত্র শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার-প্রতিপত্তি স্বাভাবিক গতিতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে।

ইহা স্বীকার্য্য যে, নবপ্রণালীতে শিল্পশিক্ষাদান-ব্যবস্থা তত সহজ হইবে না। কিন্তু দেশের লোকের অনুরাগ থাকিলে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অচির কাল মধ্যেই দূরীভূত হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে ইউরোপ হইতে দুই চারি জন এদেশবাসী উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। দেশের ঔদাসীন্য-বশতঃ শিক্ষানুরূপ ক্ষেত্রাভাবে অপর ব্যবসা দ্বারা তাঁহারা কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, যখন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া দাঁড়াইবে, তখন অপর পাঁচ জনও তাঁহাদের পদাঙ্ক-রেখানুসারণে উদ্বুদ্ধ হইবে। মানুষের যদি প্রবৃত্তি ও একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে প্রায় কোনও অভাবই অপূর্ণ থাকে না। কর্ত্তব্য-পালনে একনিষ্ঠ হওয়া চাই। অল্প দিন হইল, বিলাতের কমন্স সভায় উদারনৈতিক সভ্য মিঃ রাঙ্কিম্যান বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'শিশুশিল্প ও কারখানাগুলিকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা কর্ত্তব্য হইবে, যে পর্য্যন্ত সেগুলি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত সকল প্রকার সাহায্য-প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কিং-প্রথা অধিকতর সুপ্রশস্ত করিতে হইবে।'

আমরা ভরসা করিতে পারি, এ দেশের লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় সদাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট শ্রেষ্ঠ পোষক-রূপে অগ্রসর হইবেন। আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যে যেটুকু করিতে পারি, তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা কেন? তাহাতে যে আমাদের কলঙ্কিত মুখ অধিকতর মসীমণ্ডিত হইবে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের ধনসম্পদ্ আছে, তাঁহাদের শিক্ষা ও প্রবৃত্তি নাই, পক্ষান্তরে যাঁহাদের শিক্ষা ও প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদের ধনসম্পদ্ নাই। শিক্ষা প্রবৃত্তি ও অর্থ একত্র সমাবেশ করিতে না পারিলে, লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে না—নিশ্চয়।

টাকার উপর শয্যা পাতিয়া যাহারা শয়ন করে, তাহাদের স্বপ্ন ভিন্ন রকমের। তাহারা দেশের ও দশের কথা ভাবিবার অবসর খুব অল্পই পায়। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-গুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। তথাপি কাহারও চক্ষু ফুটিতেছে না। অগ্নিস্পৃষ্ট গৃহের অদূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া 'হায় হায়' করিলে কোনই ফল নাই। বালতি দ্বারা কি কলসী দ্বারা জল আনিয়া সেচন করিতে হইবে। ফলতঃ বাক-বিচারে সময়পাত করিলে গৃহ রক্ষা হইবে না। ততক্ষণে অগ্নিদেব রাক্ষসী ক্ষুধা লইয়া অবশ্য নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে না। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্তরূপে যত্ন-চেষ্টা করা চাই।

আদৌ আমাদিগকে আমাদিগের কুটীর-শিল্পগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে একনিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ দেখিলে, উদারহৃদয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহায়তা-কল্পে অবশ্য অগ্রসর হইবেন। শিশু যখন চলিতে আরম্ভ করিয়া এক-পা দুই-পা অগ্রসর হইয়াই পতনোন্মুখ হয়, তখন নিকটে যে কেহ বয়স্ক ব্যক্তি থাকে, সেই শিশুর

হাত ধরিয়া ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া দেয়। ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। হাত-পা-বিহীন পঙ্গুকে কেহই পথ চালাইবার প্রয়াস পায় না। তদ্রূপ চেষ্টাকারী নিশ্চয় উপহাসাস্পদ হয়। পুরুষকার-সাহায্যে মানুষ সকল বাধা-বিঘ্ন দূরে অপসারিত করিতে পারে। বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির করিয়া অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সাফল্য-লাভের চেষ্টা করিতে পারিলে, পরিণাম-পুরস্কার কদাচ অলীকত্বে পরিণত হয় না।

ভাষা-জননী।

(শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ মহাশয়ের বিরচিত।)

জননী আমার। জননী আমার। আজি কি স্নিগ্ধ হর্ষ সমীর,
করিছে মত্ত সুপ্ত চিত্ত, যতেক বঙ্গ নিবাসীর;
ভাষায় পূজায়, তোমার অর্ঘ্য, দেব আশুতোষ করিল স্থির;
পাইলে তোমার যোগ্য স্থান, অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর।
জ্ঞানের মন্দিরে, তোমার আসন হেরিয়া, সবার উচ্চ শির;
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা। অর্দ্ধ শতাব্দীর।

জননী আমার। জননী আমার। নূতন তীর্থে গোমুখীর,
করিল সাধনা সে "রাম মোহন" "গুপ্ত কবীশ"—যুগ্মবীর,
'মধুর' কাব্য, 'দীনের' হাস্য লহরী 'বঙ্কিম' লেখনীর,
হইয়া মিলিত একটি আধারে সৃজিল তোমায় প্রয়াগতীর।
জ্ঞানের মন্দিরে, তোমার আসন হেরিয়া, সবার উচ্চ শির,
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধশতাব্দীর।

জননী আমার। জননী আমার। বাণীর সিদ্ধ সাহিত্য-বীর,
মিলিত কণ্ঠে করিছে গান, গরিমা তোমার ত্রিদিব-শ্রীর,
'রবির' কিরণে, জ্যোতি তোমার খেলিছে, অঙ্গে পৃথিবীর,
বিজ্ঞান আলোক, নবীন মুকুটে, শোভিছে তোমার পূজ্য শির।
জ্ঞানের মন্দিরে, তোমার আসন হেরিয়া, সবার উচ্চ শির;
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধ শতাব্দীর।

জননী আমার। জননী আমার! মিলন-ক্ষেত্রে ভারতীর,
তোমার চরণ রহিবে শীর্ষে, সকল বঙ্গ পুরুষ স্ত্রীর;
সাজাতে তোমায়, করিব গ্রহণ ভূষণ যথায় ধরিত্রীর,
হইবে জননী পূর্ণচন্দ্র, মানব-ভাষা-মণ্ডলীর।
জ্ঞানের মন্দিরে, তোমার আসন, হেরিয়া সবার উচ্চ শির;
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা। অর্দ্ধ শতাব্দীর।

---

* হাওড়া সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত।

বৈজ্ঞানিকের প্রাণ।

[প্রফেসার শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের লিখিত]

(১)

আজ প্রাণের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। কোথায় সে অতুল প্রাণের দর্শন পাইব,—যাহার অক্লান্ত সাধনার অঙ্গুলি-স্পর্শে প্রকৃতি দেবীর লৌহ-অর্গলিত অনন্ত-মহল রহস্য-নিকেতনের সমস্ত গুপ্ত কক্ষের দ্বার নিমেষে খুলিয়া যায়,—যাহার মোহন হাসিতে বিশ্বসৃষ্টির আলো-আঁধার একাকার হইয়া হাসিয়া উঠে,—যাহার সর্ব্বভেদী দৃষ্টির সম্মুখে রূপ ও অরূপে কোলাকুলি করে, জড় ও চৈতন্যে গলাগলি করিয়া নৃত্য করিতে থাকে? সেই কঠোর-মধুরের সন্ধানে চলিয়াছি,—মিলিবে কি?

প্রকৃতি দেবী নিরন্তর আমাদের সম্মুখে গোপন ইঙ্গিত করিতেছেন। আমাদের উন্মুখ একাগ্র চেষ্টা তাঁহার ইঙ্গিত ধরিতে যত্ন করিতেছে। তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলেই তিনি আরও একটু কাছে আসিয়া দাঁড়ান, তখন আমরা তাঁহার হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে পাই; এবার আরও—আরও নিকটে আসিয়া তিনি আমাদের কানে কানে ধীরে ধীরে কথা কহিয়া যান। এইরূপে আমাদের হস্ত, হৃদয় ও মস্তকের নিকটে অনবরত তাঁহার আহ্বান আসা-যাওয়া করিতেছে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানপূত হইলেই তাঁহার মন্দিরে আমাদের প্রবেশাধিকার মিলিবে।

বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে চাহেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির বিবিধ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি শৃঙ্খলা দেখিতে তৎপর হইয়া থাকেন। এই বিচিত্র ও অনবদ্য ঘটনা-সমূহকে এমন একটি সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, যাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা যোগ-সৃষ্টি হইতে পারিবে, নিখিল বিশ্বের স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু হইতে বিরাট্ চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদির একই জীবনেতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বৈজ্ঞানিকের পথ সরল ও কুসুমাস্তীর্ণ নহে; কি পাথেয় লইয়া তিনি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তীব্র আনন্দে অগ্রসর হন, এখন তাহাই দেখিব।

ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য,—সত্যপ্রিয়তা।

আমাদের প্রথম জ্ঞানের সঙ্গেই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, প্রকৃতির সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সমান দুইটি পদার্থ বা ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পদার্থের মধ্যে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য লইয়াই প্রকৃতি রাজ্য। সাধকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি লইয়া যদি আমরা না দেখি, তাহা হইলে উপরের আবরণের মধ্যেই আমাদের সমস্ত অন্বেষণ মাথা খুঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া মরিবে,—প্রকৃত সত্যের সুধারসে সকল সন্ধান রস-সিক্ত হইয়া সার্থক হইতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিকের প্রথম কর্ত্তব্য,—প্রকৃতির প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য দেখা,

এবং যত অস্ফুটই হউক না কেন, প্রকৃতির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট বাণী শুনিবার চেষ্টা। এই চেষ্টার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্বানুভূতি হইতে মুক্ত হইয়া সেই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। যে সত্যের অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক সাধক লিপ্ত হইবেন, তাঁহাকেও সেই সত্যের সহিত একই সুরে বাঁধা হইতে হইবে। একবার এই যোগ সাধিত হইলে সাধনার মধ্যপথ হইতে আর ফিরিবার উপায় নাই। তখন সাধারণ ঘটনার উপর আর দৃষ্টি স্থির থাকিতে চাহিবে না, প্রত্যেক পদার্থের মূল-উৎসের দিকে বৈজ্ঞানিকের সাধনা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক মানব সকল পদার্থের মধ্যেই 'প্রায়' ও 'যেন' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সেখানে দাঁড়াইলে চলিবে না; তাঁহাকে 'যথার্থ' ও 'প্রকৃত'-কে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। এক কথায় সত্যের প্রতি বৈজ্ঞানিকের একান্ত অনুরাগ থাকিবে; প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ না হইলে প্রকৃতির সিংহদ্বারে প্রবেশাধিকার মিলিবে বটে, কিন্তু যেখানে অনন্ত প্রাণের সত্য-রস উৎসারিত হইতেছে, তাহার বাহিরে তৃষার্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

সুতরাং বিজ্ঞান মানুষকে একান্ত নির্ভরতা শিক্ষা দিতেছে। প্রত্যেক ঘটনার সম্মুখে শিশুর মত বসিতে যত্ন কর, আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত সমস্ত ধারণা পরিত্যাগ কর, এবং যে গভীর গোলক-ধাঁধার মধ্যে প্রকৃতি তোমায় লইয়া যান, সরল প্রাণে ও বিনয়-সহকারে সেইদিকে অগ্রসর হও, তবে প্রকৃত সত্যের মিলন ঘটিবে। ইহাই দার্শনিক হাক্সলির মত। জগৎ-জোড়া এই বিচিত্রতা এমনিভাবে চিরদিন রহিয়াছে। যাহা আছে, তাহা লইয়াই মানবের কাজ। বৈজ্ঞানিক সত্য পদার্থগত,—ব্যক্তিগত নহে। সুতরাং পদার্থ বা ঘটনাকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, তাহাদেরই দিয়া তাহাদের জানিতে ও বুঝিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সাধকের নিজের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা ত্যাগ না করিলে সত্যঘটনা ব্যক্তিগত কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই জন্যই ব্যক্তিত্বকে বর্জ্জন করিয়া ঘটনার সম্মুখে পূজানিরত হইতে হইবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন,—

"Devotion to science is a tacit worship—a tacit recognition of worth in the things studied; and by implication in their cause. It is not a mere lip-homage, but a homage expressed in actions—not a mere professed respeet, but a respect proved by the sacrifice of time, thought, and labour."

সুতরাং বৈজ্ঞানিককে কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। এই বিশাল প্রকৃতি-রাজ্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র এবং ঘটনাবলী তাঁহার পূজার উপকরণস্বরূপ। বেকন, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, আগাসী, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ ঋষিরা সকলেই এই একই মন্ত্রের উপাসক। শিশুকাল হইতেই প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া ম্যাক্সওয়েল সাধারণভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। প্রত্যেক ঘটনা ও পদার্থের মধ্যেই তিনি একটি বিশেষ ভাব জানিতে চাহিতেন। সকল

সময়েই তাঁহার কথা ছিল—"But what's the particular go of it ?" মহামতি ফ্যারাডে নিজের ধারণার উপর অণুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। যতক্ষণ না প্রত্যেক ঘটনা তিনি একান্ত মনোযোগ সহকারে দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেন, ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আমি নিরন্তর প্রকৃতির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত আছি, এবং কি উপায়ে তিনি এই বিশ্বজগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা রচনা করিতেছেন, তাহাই দেখা আমার একমাত্র কাজ হইয়াছে। ঘটনাবলী আমার নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহারা আমায় রক্ষা করিয়াছে। আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতাম।" এইরূপ নির্ভরতা লইয়াই প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ আগাসী তাঁহার ছাত্রদিগকে পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া দিনের পর দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি দেখিতেছ, আরও কি দেখিতেছ ?" তিনি তাঁহার পরীক্ষা-গৃহকে দেবনিকেতন বলিয়া মনে করিতেন। তাই বলিয়াছেন,—

"The study of Nature is an intercourse with the highest mind. You should never trifle with Nature. At the lowest her works are the works of the highest powers, the highest something in whatever way we may look at it. A laboratory of Natural History is a sanctuary where nothing profane should be tolerated. I feel less agony at improprities in churches than in a scientific laboratory"

আর জগদীশচন্দ্রের মনীষা উদ্ভিদের ভিতরে প্রাণের স্পন্দন শুনিবার আগে বলিয়াছেন,—

"প্রকৃত-তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।"

সুতরাং বৈজ্ঞানিকের প্রথম বিশেষত্ব—ঐকান্তিক একাগ্রতা। নিরাসক্ত এ[illegible] নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। সত্যের [illegible] সমস্ত দুঃখ একাগ্র ধৈর্য্যের সহিত বহন করিতে পারিলেই সম[illegible]

মত-প্রচারে সতর্ক[illegible]

আগেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকের পথ [illegible]

সাধক [illegible]

অর্থ জ্ঞাপন করা—ইহাই বিজ্ঞানের কাজ, এবং ব্যক্তিগত সমস্ত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া এই ঘটনাবলীর উপরেই মত গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস করাই বৈজ্ঞানিকের বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিকের ভাবনা,—পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। যতক্ষণ না দুই দিক হইতে মিলন হয়, ততক্ষণ তিনি কোনও একদিক গ্রহণ করিতে পারেন না।

সাধারণতঃ মানুষ নিজের অনুভূতি দিয়া বিচার করিয়া থাকে। কোনও একটি সুন্দর ভাব বা সরল যুক্তি পাইলে সে সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের এই দুর্ব্বলতা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সমূহ বিপদ আনয়ন করে। যতক্ষণ না ঘটনাবলীর প্রামাণ্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন, ততক্ষণ তিনি কোনও মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এই সর্ব্ববিষয়ে অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের ভাব একটি জার্ম্মান বাক্যে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, —"যিনি সর্ব্বদা ভিন্নমত পোষণ করেন, তিনিই অধ্যাপক।" আর আমাদের সংস্কৃতেও মুনির সংজ্ঞায় ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" বৈজ্ঞানিক যেমন নিজের মতের সাক্ষী, সেইরূপ আপনার প্রত্যেক পরীক্ষার তিনিই কঠোর বিচারক। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া যদি তিনি কোনও মত প্রচার করেন, তবে সে মতের মধ্যে কিছু অসত্য থাকিয়া গেলে তজ্জন্য তিনি মানব সমাজের নিকট দোষী হইয়া থাকেন। কি কঠোরভাবেই হাক্সলি বলিয়াছেন,—"যে মতবাদ প্রামাণের বাহিরে যায়, উহা যে কেবলমাত্র ভ্রম, তাহা নহে, উহা পাপ।" সুতরাং মত-প্রচার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি কেবলমাত্র সত্যের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকিবে। তাঁহার ভিতরের ও বাহিরের মিলন হইলেই তিনি জগতের নিকট সে মিলনের বার্ত্তা বহন করিবার উপযুক্ত হইবেন।

প্রকৃতিদুলাল ফ্যারাডে বলিয়াছেন,—"বৈজ্ঞানিক সাধকের মনের দ্বারে কত অসংখ্য চিন্তা ও মতবাদ আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পরীক্ষা ও কঠোর বিচারের দ্বারা যে নীরবে ও [illegible]ইয়াছে, জগৎ তাহার অল্পই সংবাদ রাখে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সফলতা [illegible] নিকটেও তাঁহার সমস্ত প্রস্তাব, আশা ও কামনার দশমাংশও [illegible]ন্দেহ।" সুতরাং প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে [illegible]থা শুনিতে যদিও প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু শেষ [illegible]। তিনি কোনও মানুষের সম্মান করিবেন [illegible]কেবলমাত্র এই ঘটনাদির উপরে বিশ্বাস

অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় ও যুক্তি নূতন ভাব গ্রহণ করিতে সতত উন্মুক্ত থাকিবে। বদ্ধ জলাশয়ের মত কোনও ভাব বা সত্যকে সীমাবদ্ধ করা পাপ। মানব-মন নিয়ত-প্রবহমান নদীর মত পরিপূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। নদী যেমন তাহার নিজের ভার লইয়া একটা বিশেষ গতির দিক স্থির করিয়া চলিলেও দুই কূলের বাঁধনের নিকট দিক-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তেমনি বৈজ্ঞানিকও আপনার বিশিষ্ট মতবাদ ধরিয়া চলিলেও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন যুক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কোনও সত্যই সীমাবদ্ধ নহে; সীমার মধ্য হইতে পরিপূর্ণ সীমাহীন হইবার দিকেই তাহার গতি। ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রাণের বিশেষ কথা। এই জন্যই ফ্যারাডে বলিয়াছেন,—"জীবন পরিপূর্ণতার দিকে গড়িয়া উঠিতেছে। জ্ঞানের রাজ্যে যে মানুষ মতান্তর গ্রহণের ও পরিবর্ত্তন-শীলতার অবস্থায় না থাকে, সে ঘৃণ্য, অপদার্থ।" ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের প্রাণের কথা।

* * *

বৈদিক কল্পবাদ।

P 36,202

[শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি-টি মহাশয়ের লিখিত।]

সাংসারিক অনেক বিষয়েই কার্য্য-কারণের বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার এরূপ অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে যে, কিছুতেই সে বৈষম্যের মীমাংসা করা যায় না। ঈশ্বর ইহার কারণ হইতে পারেন না; কেবল অবিদ্যাও উহার কারণ নহে। এইরূপ নানাদিক বিবেচনা করিয়া বেদান্ত বলিলেন,—এ-জন্মের সুখ-দুঃখাদি পূর্ব্ব-জন্মকৃত কার্য্যের ফল, এবং বর্ত্তমান জন্মের চিন্তা ও কার্য্যাবলী দ্বারাই পরজন্ম নিয়মিত হইবে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, সর্ব্বপ্রথম জন্মের সুখ-দুঃখ কিসের ফল? কাজেই স্থির হইল,—সংসার অনাদি। কিন্তু প্রাচীন উপনিষৎসমূহে সৃষ্টি-সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ঐতরেয় (১।১।২) বলিয়াছেন—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকান-সৃজত।' তৈত্তিরীয় (২।৭) বলিয়াছেন—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।' বৃহদারণ্যক (৫।৫।১) বলিয়াছেন—'আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিম্' ইত্যাদি। ছান্দোগ্য (৬।২।১) বলিয়াছেন—'অগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।' এই সকল মন্ত্রবর্ণে 'অগ্র' কথাটার পুনঃপুনঃ উল্লেখ এবং সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির আদি আছে। সুতরাং 'সংসার অনাদি' এই বাক্যের সহিত প্রাগুক্ত উপনিষৎগুলির বিরোধ উপস্থিত হয়। দুই দিক রক্ষা করিতে যাইয়া বৈদান্তিকেরা স্থির করিলেন যে, সৃষ্টিকার্য্য অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তবে সৃষ্ট-জগৎ একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এক কল্প পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে এবং পরে প্রলয় হয়। যথা,—গীতা (৯।৭),—

কল্পবাদের উৎপত্তি।

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥"

অর্থাৎ,—হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমারই প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কল্পের আদিতে আমি পুনরায় তাহাদের সৃষ্টি করি।

তৎপরে কল্পবাদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে কল্পকথা নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। কল্প কয়টী, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে কত কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যানের মূলে ঋগ্বেদের একটী মাত্র ঋক্। শাঙ্কর-ভাষ্যেও বিভিন্ন কল্পসম্ভব সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও বৈদিক প্রমাণের উল্লেখ নাই। এই ঋক্‌টী ব্রাহ্মণদিগের নিকটে সুপরিচিত। কেন-না, তাঁহারা ইহা ত্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া থাকেন। যথা,—(ম১০।১৯০)

কল্পবাদের বৈদিক প্রমাণ।

'ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥'

অর্থাৎ,—ঋত ও সত্য তপস্ হইতে উদ্ভূত; তাহা হইতে রাত্রি ও তরল সমুদ্র; সমুদ্র হইতে বৎসর উৎপন্ন; এবং বিশ্বের (দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন) সমস্ত পদার্থের বশী বা প্রভু দিন রাত্রির সৃষ্টি করিলেন। ধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, শূন্য (বাতাস) এবং পরে স্বর্গের কল্পনা বা সৃষ্টি করিলেন।

এস্থানে 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' এই অংশটুকুর অর্থের উপরেই সমগ্র কল্পবাদ নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঋগ্বেদের অন্য কোথাও কল্পান্তরের উল্লেখ নাই। বাদরায়ণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি 'পূর্ব্বে' অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আরও একটী অর্থ হইতে পারে এবং সেইটিই বোধ হয় সহজ অর্থ;—যেমন 'যথাক্রমে, অর্থাৎ একটীর পর আর একটী সৃষ্টি করিয়াছেন'। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত অর্থটী গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে, কোনরূপে বাহ্যিক বৈষম্যের একটী মীমাংসা করা যায়। আর ব্যক্তির জন্মান্তর থাকিলে সমগ্র জগতেরও জন্মান্তর থাকা অসম্ভব নহে, এবং সংসার যখন অনাদি, তখন কল্পান্তরবাদ স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে, জন্মান্তর সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। আর ব্যষ্টি-সম্বন্ধে উহা স্বীকার করিলেও, সমষ্টিতেও যে তাহাই প্রযোজ্য হইবে, ইহা কেবল সাদৃশ্যমূলক অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তার পর সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থই যে এক সময়েই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে, এ ধারণার মূলে কি প্রমাণ আছে, বুঝিতে পারা যায় না। তদুপরি, 'সংসার অনাদি' এ কথা মানিয়া লইলে, বাহ্যিক ইতর-বিশেষের কারণ নির্দ্দেশের জন্য, বিভিন্ন কল্পের অস্তিত্ব স্বীকার করা যে নিতান্তই প্রয়োজন, তাহাও মনে হয় না।

এই প্রমাণ দ্ব্যর্থ-বোধক।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—'যথাপূর্ব্বম্' কথাটীর 'যথাক্রমে' এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, এবং করিলে, বেদ উহার সমর্থন করেন কি না—নতুবা এরূপ অর্থ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে। উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঋগ্বেদের আর দুইটী ঋক্ এই শেষোক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে। নতুবা শ্রুতির মধ্যেই অসামঞ্জস্য হইয়া দাঁড়ায়। তন্মধ্যে একটী—(ম ৬ ৪৮।২২ ঋক্) যথা,—'সকৃদ্ব দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত। পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদহ্নো নানুজায়তে।' সায়ণাচার্য্য ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—'সকৃৎ সকৃদেব দ্যৌরজায়ত উৎপন্নত সকৃদুৎপন্নৈব স্থিতা ভবতি, ন পুনস্তস্যানষ্টায়া অন্যা তৎসদৃশী দ্যৌর্পায়তে ভূমিশ্চ সকৃদেবাজায়ত পৃশ্ন্যাঃ মরুতাং মাতুর্গোঃ পয়শ্চ সকৃদেকবারমেব দুগ্ধং যস্মাৎ পয়সো মরুতো জজ্ঞিরে। যথা দ্যাবা পৃথিব্যৌ সকৃদেবোৎপন্নেতে এবং পৃশ্নিরপি সকৃৎ দুগ্ধেনৈব পয়সো মরুতো জীজনৎ ততঃ পরং অন্যঃ পদার্থোনানুজায়তে তৎসদৃশোনোৎপদ্যতে।' এই ঋকে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বলা হইতেছে যে, আকাশ ভূমি পৃশ্নির দুগ্ধ একবার মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় ঋক্টী এই (১০।৭৪।৪)—'আ তত্র ইন্দ্রায়বঃ পনংতাভি য ঊর্দ্ধং গোমন্তং তিতৃৎসান্। সকৃৎস্বাং যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষণ্॥' এখানেও সুস্পষ্ট ভাবেই লিখিত রহিয়াছে,—যিনি সকৃৎজন্মা অর্থাৎ একবার মাত্র উৎপন্না পুরুপুত্রা অর্থাৎ বহুপুত্রা বৃহতী মহীকে সহস্র ধারায় দোহন করিতে চান।

ভিন্ন অর্থের বৈদিক প্রমাণ।

শুধু ইহাই নহে; প্রাচীন উপনিষৎ-সমূহেরও যে মন্ত্রগুলি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ 'অগ্র' শব্দ দুইটী অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা, বিভিন্ন কল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে অথবা সৃষ্টির আদিতে, অর্থাৎ একবার মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারই প্রারম্ভে। বৃহদারণ্যকের অপর একস্থলে ইহার আরও একটু স্পষ্টতর উল্লেখ আছে। যথা (১।২।১)—'সোঽর্চ্চন্নচরত্তস্যার্চ্চত আপোজায়ন্তার্চ্চতে বৈমেকমভূদিতি তদেব অর্কস্য অর্কত্বম্।' অর্থাৎ, অর্ক একবার সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অর্কত্ব।

উপনিষদের প্রমাণ।

এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতায় একস্থানে লিখিলেন—'অকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়া স্থিত রহিয়াছে; তাহাদের নাশ হইয়া, তৎসদৃশ অন্য কিছুর সৃষ্টি হইবে না।' অপর ঋকের অর্থে লিখিলেন—'একবার মাত্র প্রজাতা মহী'। তিনিই আবার 'যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ' এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষং চ ইমং ত্রিভুবনম্ স্বঃ—তদেতৎ সর্ব্বং ধাতা বিধাতা যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ কালে অকল্পয়ৎ সৃষ্টবান্—তথৈব আগামিনি অপি কল্পে কল্পয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ।' ভগবান্ মনু শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু শ্রুতির মধ্যে অসামঞ্জস্য হইলে কি করিতে হইবে, কিছুই বলেন নাই। সুতরাং 'যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ' কথাটীর কোন্ অর্থ গ্রহণীয়, ভাবিবার বিষয়।

সায়ণাচার্য্যের অসামঞ্জস্য।

উপসংহারে ইহাও স্বীকার্য্য যে, ঋগ্বেদে যখন এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে,

'ভূমি, স্বর্গ প্রভৃতি একবার—একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে', তখন ইহাদের একবিধ বার সৃষ্টি সম্বন্ধেও একটী মত তৎকালে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। এবং সেই মতই বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে (এমন কি শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদেও) অধিকাংশ স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

মীমাংসা।

অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

[শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত।]

আসাম এবং বঙ্গদেশের একই সীমা; এই দুই প্রদেশের জলবায়ু, অধিবাসী বা আচার-নীতি বিষয়েও বিশেষ প্রভেদ নাই। তজ্জন্য ইহাই স্বাভাবিক যে, এই দুই প্রদেশের ভাষার মধ্যেও অনেক সামঞ্জস্য থাকিবে। কয়েক বৎসর হইল, কতিপয় বঙ্গীয় লেখক অসমীয়া ভাষাকে বঙ্গভাষার অপভ্রংশ আখ্যা দিয়াছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে কয়েক জন অসমীয়া সাহিত্যিক বঙ্গভাষাকে প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়াছিলেন। এই সকল বাদানুবাদের ভিতর প্রবেশ করিবার আমার ইচ্ছা, সামর্থ্য বা অধিকার নাই। আমি ইহাই বলিতে চাই, অসমীয়া ভাষা অতি প্রাচীন এবং পুরাকালে যাহা কামরূপ এবং কামরূপীয় ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল, এক্ষণে তাহাই আসাম ও অসমীয়া ভাষার আখ্যান পাইয়াছে।

অসমীয়া সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে ছড়া গীত প্রভৃতি মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যের কথা বলিবার অবকাশ হইবে না। তাই, লিখিত যে সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে, তাহারই প্রাচীনতম কবির কথা হইতে আমার এই বিবরণ আরম্ভ করিব। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হস্তলিখিত অনেক পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন গৃহস্থেরা এই সকল পুঁথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, এবং লোকচক্ষুর গোচর হইতে দেন না।

আপাততঃ যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম "প্রহ্লাদ-চরিত্র।" ইহার কবি 'হেম সরস্বতী'। প্রাচীন কামরূপের রাজধানী কমতাপুর ইঁহার জন্মস্থান। কমতেশ্বর দুর্লভ নারায়ণের রাজত্বের সময় এই গ্রন্থ লিখিত হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর আদিভাগে কবি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ভাষা পরবর্ত্তী কবি সকলের ভাষা হইতে বিশেষ পৃথক নহে; এমন কি, আজকালও সকলে সহজে ইহার ভাষা বুঝিতে পারে। এই জন্য ইহাই সম্ভব যে, হেম সরস্বতীর পূর্ব্বেও অনেক কবি কামরূপীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কারণ, কোনও ভাষার প্রথম গ্রন্থের ভাষা এরূপ মার্জ্জিত সংযত ও শুদ্ধ হইতে পারে না। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

"মাধবক প্রহ্লাদে নমিলা সেহি ঠাবে।
অকপটে পৰিলা হৰিৰ দুই পাবে॥
জগতকাৰণ প্রভু তুমি নাৰায়ণ।
নাহি আদি অন্ত প্রভু তুমি নিৰঞ্জন॥
অনাদি অনন্ত প্রভু নাহি অন্ত ভেদ।
তুমি চৌদ্দ শাস্ত্র প্রভু তুমি চাৰি বেদ॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাহৰি শৰণ দিওক।
তোমাৰ নামক মোৰ মুখে নছাৰোক॥"

হেম সরস্বতীর পরে প্রায় আড়াই শত বৎসরের মধ্যে লিখিত এমন কোনও প্রসিদ্ধ কাব্য পাওয়া যায় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ মাধব-কন্দলীর অভ্যুদয় হয়। ইঁহার পূর্ব্বে যদিও অনেকেই অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি মাধব কন্দলীকেই প্রথম জাতীয় কবি বলা উচিত। ইঁহার প্রণীত রামায়ণ সকলের পরিচিত। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কন্দলী তাহার বংশগত উপাধি ছিল, এবং পরবর্ত্তী অনন্ত কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী, মহেন্দ্র কন্দলী প্রভৃতি কবিগণের ইঁহার বংশেই জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুমানের কোনও ভিত্তি দেখা যায় না; কেন-না, বিভিন্ন বংশে কন্দলী উপাধি ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এবং আজকাল আসামের কুত্রাপি কন্দলী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ দেখা যায় না। আমাদের মনে হয়, তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোককে কামরূপের প্রাচীন রাজারা এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন;—কন্দল অর্থ বাদ বা তর্ক। কবিবর মাধব-কন্দলী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আজকাল যে অসমীয়া রামায়ণ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আদিকাণ্ড মাধব দেবের লিখিত এবং উত্তরাকাণ্ড শঙ্করদেবের লিখিত। খ্যাতি আছে যে, শঙ্কর দেব মাধব-কন্দলীর লিখিত সমস্ত রামায়ণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিজেই উত্তরাকাণ্ড প্রণয়ন করেন; এবং আপন শিষ্য মাধব দেবের দ্বারা আদিকাণ্ড লিখাইয়া লন। এক্ষণে মাধব-কন্দলী প্রণীত সমস্ত রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাধব-কন্দলীর ভাষা প্রাঞ্জল, সংস্কৃত-বহুল এবং মার্জ্জিত। কিন্তু ইহাতে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়—যাহার অর্থ করা দুষ্কর। তাঁহার রচনার উদাহরণ-স্বরূপ সীতাদেবীর রূপবর্ণনার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা,—

"মুখচন্দ্র অৰি অমৃতক অভিলাষে।
[illegible]াসিবাক লাগি ৰাহু আসি ভৈলা পাশে॥
[illegible]ধনুত কটাক্ষ যেন শৰ।
[illegible]গন উপৰ॥
[illegible]ল।
[illegible]ত সকল॥
[illegible]।
মনোহৰ অধৰ অধিক বিম্বফল।
তিনি ৰেখা সমে জ্বলে সু-শোভিত গল॥
বাহু দুই খান তোৰ মৃণালৰ নৰি।
উদৰত ত্রিবলিকা মাৰ খাট খৰি॥
ডম্বৰুৰ মধ্যদেশ সদৃশ কঙ্কাল।
কাঞ্চিয়ে ৰঞ্জিত অতি নিতম্ব বিশাল॥
সুকুমাৰ উৰু বাম কদলীৰ সম।
জঙ্ঘ দুইৰ কান্তি অতি দেখি মনোৰম॥

[illegible]য। প্রবন্ধে এই রকমের কথা থাকিতে পারে।
[illegible]জী-w-র মত। 'ম' র মত পড়িলেও হইতে পারে।

সুগঠিত গ্রন্থি অতি বাঙ্গা দুই পাব্। পহুঁৰ গমনে কুঞ্জৰৰ তেজ হৰে।
নব কিশলয়দল সদৃশ স্বভাব্॥ সুপুৰুৰ শবদে সাবস অনুসৰে॥"

মাধব-কন্দলীর পরেই অসমীয়া সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কবি শঙ্কর-দেবের অভ্যুদয়-কাল। শঙ্কর দেবের যুগ অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। শঙ্কর-দেব কায়স্থ-জাতীয় ভূঞা-সমূহের শিরোমণি বা সর্ব্বপ্রধান ভূঞা ছিলেন। ভূঞারা তখন এক্ষণকার নগাঁও, দরং এবং কামরূপ অঞ্চলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের একত্রিত হইবার আবশ্যকতা ছিল। শিরোমণি ভূঞার নেতৃত্বে তাঁহারা অন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতেন, এবং শান্তির সময় নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজের নিজের রাজ্য শাসন করিতেন। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে নগাঁও জেলার অন্তর্গত বরদোবা (বটদ্রবা) গ্রামে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কুসুম্বর এবং মাতার নাম সত্যসন্ধা ছিল।

শঙ্করদেব অসমীয়া জাতির কেবল সাহিত্য-গুরু নহেন, পরন্তু ধর্ম্ম-গুরুও ছিলেন। ইঁহার প্রচলিত ধর্ম্মকে মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম কহে, এবং এই মতাবলম্বী লোক সমস্ত আসামে ও উত্তর-বঙ্গের অনেক জেলায় রহিয়াছে। ইনি মহাপুরুষ শঙ্করদেব বলিয়াই খ্যাত এবং ইঁহার মতাবলম্বী লোকেরা ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইঁহার জন্ম বৎসর হইতে শঙ্করাব্দ বলিয়া একটি বৎসর গণনা করা হয়।

মহাপুরুষ শঙ্কর-দেবের যৌবনকালেই প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়। তাহার পরে তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেন। ইনি সংস্কৃত-শাস্ত্রে অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং সর্ব্বত্র নিজের পাণ্ডিত্যগুণে প্রভূত সম্মান ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে ইনি নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং বৃদ্ধ পিতামহের অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। এই সময় হইতে ইনি মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন।

শঙ্কর দেবের প্রথম গ্রন্থ "কীর্ত্তন"। কীর্ত্তন প্রত্যেক অসমীয়ার গৃহে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত পঠিত হয়। প্রত্যেক সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের প্রারম্ভে গীতা-ভাগবতের ন্যায় কী[illegible] পাঠ হয়; এবং তাহার সুমধুর পদাবলী নাম-কীর্ত্তনের সময়, তাল ও করতা[illegible] গীত হয়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে[illegible] সমূহের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন এই গ্রন্থে সুললিত ভাষায় নিবিষ্ট র[illegible] দশাবিতার বন্দনা, ইহা অতিশয় ললিত ও মধুর এবং [illegible] ন্যায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এমন অসমীয়া লোক নাই, [illegible] যাঁহার মুখস্থ নাই। ইঁহার ভাষা বড়ই সুললিত এ[illegible]

কীর্ত্তনের পরেই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভা[illegible] কীর্ত্তনের ন্যায় ইহাও অসমীয়া লোকের পরম আ[illegible] সংস্কৃতের অনুবাদ, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অস[illegible] ইহার পদাবলী এতই সুললিত ও মধুর এবং [illegible]

এতই সুস্পষ্ট যে, শঙ্কর দেবের অনুবাদ, মূল শ্লোক হইতেও উপাদেয়। এই স্থলে দুইটি মাত্র শ্লোক ও তাহার অনুবাদের নমুনা দেওয়া গেল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, শঙ্কর দেবের প্রতিভা কি সুন্দররূপে সংস্কৃত ভাগবতের সারার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে নিজের অপূর্ব্ব সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে।

মূল সংস্কৃত; যথা,—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো, মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে,
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং, তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥"

ইহার অসমীয়া এইরূপঃ—

তুমি জগজীব, তোমাক পূজিলে, মিলে আপোনাতে জাই।
যেন মুখশ্রীক, প্রতিবিম্ব মুখে, দেখিয়া দর্পণ চাই॥

অন্য একটি শ্লোক ঃ—

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিংকল্পসে মাতুরধোক্ষ জাগসে,
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥"

ইহার অনুবাদ এইরূপে ঃ—

"গর্ভত থাকন্তে উদরত ঘালে পাৰে। তাৰ অপৰাধক নধৰে যেন মাৰে॥
তোমাৰ কুক্ষিত আমি আছোঁ চৰাচৰ। হেন জানি ক্ষমিওক দোষ দামোদৰ॥"

এই স্থানে দামোদর শব্দের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যদিও মূল সংস্কৃতে এই শব্দ নাই।

এই দুই গ্রন্থের পর, শঙ্করদেবের রুক্মিণী-হরণ, কলি-ছলন, অনাদিপাতন, অমৃতমন্থন, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ প্রভৃতির অনুবাদ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভাষার মাধুর্য্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে তাহাদের প্রত্যেকটি অসমীয়া সাহিত্যের এক এক অমূল্যরত্ন।

শঙ্করদেব অনেক গীত, স্তোত্র এবং নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশের বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় কতকগুলি গীত ইনি ব্রজবুলী ভাষাতেও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত একটি গীতের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

"বালক গোপাল করত বে কেলি। শিরে শিখণ্ডক দোলে গলে গজমুতী,
উচ্ছায়া পাঞ্চনি নাচে, হাসে গোপমেলি॥ কোটী মদন মন মোহন মূরতি।
নীল তনু পীত পট ধরি লতি লোৰ, চরণে মঞ্জির বুরে উর হেমহার,
নব ঘন ঘন যৈসে বিজুলি উজোৰ। শঙ্কর কহে অহি হরিকা বিহার॥"

শঙ্করদেবের নাটকের পূর্ব্বে, অসমীয়া-সাহিত্যে কোনও দৃশ্য-কাব্য কিংবা অসমীয়া-সমাজে কোনও অভিনয় প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ইনি এই দেশে সর্ব্বপ্রথম এই দুয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রণীত নাটক সকল সর্ব্বত্র এখনও অভিনীত হয়।

প্রক্ষিপ্ত রামায়ণ।

[কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয়ের রচিত।]

১। রামায়ণের আদর্শত্ব।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির 'রামায়ণ' চিত্র, এ দেশের—শুধু এদেশের কেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বপদপ্রয়াসী প্রদেশমাত্রেরই, যথার্থ আদর্শস্থল। এতদ্দেশের বালিকাগণও অতি শৈশব কাল হইতেই, সুচরিত্র সংঘটনের জন্য বারব্রত আরম্ভ করিয়া, সেই ব্রতের ফলে প্রার্থনা করে যে, 'সে নিজে সীতার ন্যায় সতী হউক এবং তাহার রামের ন্যায় স্বামী, দশরথের ন্যায় শ্বশুর, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ন্যায় গুণের দেবর লাভ হউক।'

রামায়ণ যে সমস্ত জগতেরই আদর্শ চিত্র, ইহা উপকথার বিষয় নহে। বাল্মীকি যথার্থই নিজতন্ত্রীতে গুণ-সমারোপ করিয়া অতি সুমধুর স্বরে মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন ;—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥'

এই পৃথিবীতে যতদিন পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই রামায়ণের চরিত্র-সমূহ জনগণের নিকটে আদর্শরূপে সমাদৃত হইবে।

বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণ ব্যতীতও মহাভারত এবং অগ্নি, বিষ্ণু ও পদ্ম প্রভৃতি পুরাণেও রামের আদর্শ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

২। রামায়ণের টীকা।

রামায়ণের টীকাও অনেকগুলি, যথা ;—

১। কতক, ২। চতুরার্থদীপিকা (চতুরার্থী), ৩। তর্নি শ্লোকী ? ৪। তিলক [রামাভিরাম বা রামশর্ম্মা—(রামানুজ)], ৫। রামায়ণ-বিরোধ-পরিহার, ৬। রামায়ণতাৎপর্য্য-বিরোধভঞ্জিনী, ৭। বাল্মীকিহৃদয় (অহোবলাচার্য্য), ৮। বিদ্বন্মনোরমা, ৯। শৃঙ্গারসুধাকর, ১০। সুবোধিনী, ১১। সেতু, ১২। ঈশ্বরদীক্ষিত কৃত, ১৩। শৃঙ্গবতিলক (গোবিন্দরাজ কৃত), ১৪। ধর্ম্মকূট (ত্র্যম্বকযজ্বা), ১৫। দেবরামভট্ট কৃত, ১৬। নাগেশ কৃত, ১৭। নৃসিংহ কৃত, ১৮। তত্ত্বদীপিকা (মহেশ্বরতীর্থ কৃত), ১৯। রামায়ণকূটটীকা (রামানন্দতীর্থ), ২০। রামাশ্রমাচার্য্য কৃত, ২১। মনোহর (লোকনাথ কৃত), ২২। বিবেকতিলক (বরদারাজ) ২৩। বিদ্যানাথ, ২৪। বাল্মীকিতাৎপর্য্যতরণী, ২৫। শিবরামসন্ন্যাসিকৃত, ২৬। রামায়ণসপ্তবিষ্ব (হয়গ্রীব), ২৭। হরিপণ্ডিত কৃত, ২৮। বিদ্বন্মনোরঞ্জনী, ২৯। বিরোধভঞ্জিনী (ব্রহ্ম-

বিদ্যাদীক্ষিত), (৩০। রামচন্দ্র সরস্বতী, ৩১। রামচন্দ্রানন্দ সরস্বতী ?), ৩২। বিমলবোধ, ৩৩। সর্ব্বজ্ঞ (লোকনাথ কর্ত্তৃক স্বকীয় টীকাগ্রন্থে ধৃত)।

উল্লিখিত তেত্রিশখানা টীকার সমুল্লেখ য়্যাফ্রেটসাহেব কৃত 'কাটোলাগাস্ ক্যাটেলিজিয়াম' গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১। রামানুজ কৃত 'তিলক', ২। মহেশ্বরতীর্থকৃত 'তত্ত্বদীপনী', ৩। লোকনাথচক্রবর্ত্তিকৃত 'মনোহরা', ৪। লক্ষ্মীকান্তশর্ম্মকৃত 'রামায়ণার্থ সন্দর্ভবোধিনী', ৫। গোবিন্দরাজকৃত 'ভূষণটীকা' এবং ৬। ভট্টদেবরাজকৃত 'বিষমপদব্যাখ্যান' এই ছয় খানি টীকার চাক্ষুষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কথঞ্চিৎ পরিচয়ও এই প্রবন্ধ মধ্যে আবশ্যক অনুসারে প্রদত্ত হইবে।

৩। আদর্শভেদে পাঠের বিভিন্নতা।

প্রাচীন গ্রন্থ-মাত্রেরই 'পাঠ' লইয়া চিরদিন তর্ক ও বিতর্ক, পরিগ্রহ ও পরীহার অবাধে চলিয়া আসিতেছে। টীকাকারগণের মধ্যে কেহ হয় ত একটা মূল গ্রন্থের পাঠ বলিয়া মানিয়া লইলেন, পক্ষান্তরে আবার অনেকে অবাধে তাহা 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। আধুনিক অনুসন্ধান-প্রয়াসী এই বিষয়ে যেন টীকাকারগণেরও উপরে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন! টীকাকার অবশ্য সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াই 'অস্তি' বা 'নাস্তি',—'স্বীকৃত' বা 'প্রক্ষিপ্ত',—ইহা স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালের সমালোচকগণ ততদূর কষ্ট স্বীকার না করিয়া, প্রায়শঃ স্বেচ্ছাবশেই টীকাকারগণেরও উপরে মতামত প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না।

বাল্মীকি-কৃত প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণের সহিত হস্তলিখিত মূল গ্রন্থের এত পাঠবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে একেবারেই অবাক্ হইয়া পড়িতে হয়। রামায়ণের যতগুলি মুদ্রাঙ্কণ এতদ্দেশে হইয়াছে, পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কৃত সংস্করণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরিশুদ্ধ, ইহা স্বতঃই ধারণায় আসিয়া থাকে। অর্ব্বাচীন প্রকাশিত রামায়ণসমূহও প্রধানতঃ হেমচন্দ্রের পদচ্ছায়ার অনুসরণেই মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, ইহাতে কোন সংশয়ই বর্ত্তমান নাই। কারণ, তুলনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টই তাহা প্রতীয়মান হইবে যে, অপরেও হেমচন্দ্রের পাঠাদিরই অনুকরণ করিয়াছেন।

৪। অমুদ্রিত আদর্শগ্রন্থের কথা।

হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রতি কাণ্ডেরই প্রতি সর্গের অন্তে তাহার এক একটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুপণ্ডিত হেমচন্দ্র এই রীতি প্রায়ই গ্রহণ করেন নাই। তদীয় সম্পাদিত গ্রন্থে সর্গের নাম পরিগ্রহ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

আদর্শে প্রতি সর্গের অন্তে তাহার যেরূপে নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহা দেখাইবার জন্য দিঙ্মাত্র উল্লেখ করা গেল। যে কোনও মুদ্রিত রামায়ণের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলেই ইহা সহজে সম্যক প্রমাণিত হইবে। যথা,—

১। নারদ-বাক্যং নাম সর্গঃ। ২। ব্রহ্মাগমনং নাম। ৩। অনুক্রমণিকা। ৪।

কাব্যোপসংক্ষেপঃ। ৫। অযোধ্যাবর্ণনং। ৬। রাজবর্ণনা। ৭। অমাত্যবর্ণনা। ৮। ৯। ১০। ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে মন্ত্রিবাক্যং। ১১। অশ্বমেধযজ্ঞঃ। ১২। যজ্ঞারম্ভঃ। ১৩। যজ্ঞকর্ম্ম। ১৪। রাবণবধোপায়ঃ। ইত্যাদি।

সর্গের নাম বিনির্দ্দেশ যেরূপ, সেইরূপ কাণ্ড, সর্গের শ্লোকসংখ্যা এবং সর্গ-সংখ্যাতেও এই আদর্শের সহিত অপরাপর গ্রন্থের অত্যন্ত বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামানুজ বাল ও যুদ্ধ কাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'ইত্যার্ষে রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যামাদিকাণ্ডে পৌরপ্রমোদঃ॥ ৮১॥ আদিকাণ্ডঃ (সমাপ্তঃ)॥

পণ্ডিত হেমচন্দ্র সম্পাদিত রামায়ণের বালকাণ্ডের উপসংহারের পাঠ এইরূপ,—

'ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকিয়ে বালকাণ্ডে ভরতমাতুলালয়গমনং নাম সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭'

আদর্শের স্থানান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'ইত্যাদিকাণ্ডে বালচরিতে হরেরয়োধ্যাপ্রবেশঃ॥ ৭৮॥

'আদিকাণ্ডে বালচরিতে'—ইহার লিপিপ্রমাদে ত ক্রমে 'বালকাণ্ডে' এইরূপ পাঠ সংঘটিত হইয়া পড়ে নাই?

আদি বা বাল কাণ্ডের মোট সর্গ-সংখ্যা, উভয় আদর্শের একটিতে ৮১ ও অপরটিতে ৭৯ দেখা যাইতেছে। শ্লোক-সংখ্যাতেও এইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং টীকাকারগণের পরস্পরের উক্তিতেও একতা দেখা যায় না।

এই আদর্শের প্রারম্ভ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। প্রচলিত যে কোন মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত মিল করিলেই পরস্পরের মধ্যে পাঠ অনৈক্য স্পষ্টই অনুভূত হইবে। যথা,—

'তপঃস্বাধ্যায়নিরতস্তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিসত্তমঃ॥ ১॥
কোন্বস্মিন্ প্রথিতো লোকে সদ্‌গুণৈর্গুণবত্তমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২॥
উদারাচারসম্পন্নঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বীর্য্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩॥
জিতক্রোধো মহান্যুক্তশ্চ ধৃতিমান্ কোঽনুসূয়কঃ।
সংজাতরোষাৎ কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি॥ ৪॥
কঃ উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নির্ধিগুণসম্পদাম্॥ ৫॥
সমগ্রাঙ্গপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।
অনিলানলসূর্য্যাণাং শক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ॥ ৬॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো নারদ তত্ত্বতঃ।
দেবর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৭॥

উপস্থা ও নিত্য বেদ-পাঠে রত তপস্বী বাক্যবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনিবর বাল্মীকি, নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সংসারে বিখ্যাত, সদ্‌গুণযুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্য, দৃঢ়ব্রত, উদার-আচার-পরায়ণ, সকল জীবে সমান হিতৈষী, বীর্য্যবান, বদান্য, প্রিয়দর্শন, জিতক্রোধ, ধৃতিমান ও অনসূয়ক,—এমন মহান ব্যক্তি কে আছেন?—যাঁহার ক্রোধে দেবতাগণও ভীত হইয়া থাকেন? কে উদার-চরিত্র? তিন লোকের রক্ষাবিধানে একমাত্র কে সমর্থ? প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিধানে কে নিয়ত অনুরত? সমগ্রগুণ সম্পদের একমাত্র নিধি কে? লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া একমাত্র কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন? বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য একমাত্র কে বর্ত্তমান আছেন? হে নারদ! এই সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কে, তাহা আমি আপনার নিকটে জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ, দেবর্ষি আপনিই কেবল এই সকল লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

নিম্নলিখিত শ্লোকটির আদর্শের পাঠ এইরূপ;—

'তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
দৃষ্ট্বা ক্রৌঞ্চী করোদার্ত্তা করুণং খ-পরিক্রমা॥'

ব্যাধশরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেখিয়া, ক্রৌঞ্চী ভয়ে আকাশে উড়িতে উড়িতে করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

এই শ্লোকটির মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ এইরূপ;—

'ভার্য্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুবাব করুণাং গিরম্॥'

প্রথম অংশে উভয়ত্র তুল্য পাঠ, কিন্তু এই শ্লোকটির শেষার্দ্ধের পাঠ কি মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ হইতে এই আদর্শের পাঠই অধিক সমীচীন নহে? 'ভীতা' ক্রৌঞ্চীর আকাশে উড্ডয়নই কি কবির স্বাভাবিক বর্ণনা নহে।

অপর একটি শ্লোকে এই আদর্শের পাঠ;—

'পাদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তমিদং কাব্যং সমাক্ষরম্।
শোচতোক্তং ময়া যস্মাত্তস্মাচ্ছ্লোকো ভবত্বিতি॥'

বাল্মীকি, শিষ্য ভরদ্বাজকে বলিলেন, চতুষ্পাদযুক্ত সমাক্ষর এই বাক্যটি অতিশয় শোকের সময়ে আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব ইহা "শ্লোক" নামে বিখ্যাত হউক।

প্রচলিত গ্রন্থে এই শ্লোকের পাঠ এইরূপ,—

'পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥'

এই শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটি কি দ্বিতীয়টি হইতে বর্ণনায় হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়?

উপরে পাঠান্তরের দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া উপেক্ষিত শ্লোকও কিছু কিছু দেখান যাইতেছে।

যাঁহারা মহাকবি ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ উত্তররামচরিত নাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন, নিম্নের শ্লোক দুইটী অবশ্যই তাঁহাদের স্মৃতিপথে চিরজাগরূক হইয়া রহিয়াছে,—

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ সহ তয়া গুণৈরভিবিবর্দ্ধিতঃ ॥ ১৪ ॥
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্ ॥ ১৫ ॥
(৭৮ সর্গঃ। আদিকাণ্ডে।)

অবশ্য এ কথা এস্থলে অবশ্যই স্বীকার্য্য বটে, উত্তরচরিতে এই প্রথম শ্লোকটির পাঠ কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—

'প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ। প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ ॥'

উপরোক্ত শ্লোক দুইটির মর্ম্ম এই,—দেবী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাবতঃই অতিশয় প্রিয়তমা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সীতার সদ্‌গুণপরম্পরাই তাঁহার প্রতি রামের এই স্বাভাবিক প্রীতির পরিবর্দ্ধনে ক্রমশঃ অধিকতররূপে সমর্থ হইয়াছিল। রাম যে সীতার নিজ প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কথা অধিক করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। রাম ও সীতার পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসার সুগভীরতা কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ হৃদয়ই সুস্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

উত্তরচরিতে বর্ণিত হইয়াছে, বাল্মীকির শিষ্য লব ও লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুর মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় সমুদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর চন্দ্রকেতুর সহিত কুশ ও লব শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে, রাম, বাল্মীকির শিষ্য বলিয়া দুই ভ্রাতার পরিচয় বিজ্ঞাত হইলেন, কিন্তু সীতারও নিজ আকৃতির সৌসাদৃশ্যে কুশ ও লব নিশ্চয়ই সীতার পুত্র, এইরূপ সন্দিগ্ধমনাও তিনি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুশ ও লব, স্বগুরুর নিকট হইতে তদ্‌বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালে রামের অভিপ্রায় অনুসারে রামায়ণের এই শ্লোক-সমূহ আবৃত্তি করিয়া রামচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। কুশ ও লবের মুখে নিজ অনুভূত জীবনের পূর্ব্ব-চরিত্রের সমালোচনা এইরূপে শ্রুত হইয়া, সীতার অভাবে একান্ত ম্রিয়মাণ রামচন্দ্র ব্যথিত-মনে তখন বলিয়াছিলেন,—'কষ্টমতিদারুণো হৃদয়মর্ম্মোপঘাতঃ! হা দেবী, এবং কিল তদাসীৎ!'

কি কষ্ট, অতি নিদারুণ এই কথাগুলি, এক্ষণে আমার হৃদয়ের মর্ম্মসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। হায়, দেবি সীতে, এইরূপ সুখের দিনই তখন আমাদের ছিল। এখন সে সকলই স্মরণপথের অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

রামায়ণের এই আদর্শে এই শ্লোকটি আদিকাণ্ডের ৭৮ সর্গে বিবাহের পরে যখন রামচন্দ্র প্রভৃতি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনার অবসরে সমুল্লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্র প্রভৃতির সম্পাদিত কোন গ্রন্থেই এই শ্লোক দুইটীর সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, রামানুজ বা মহেশ্বর প্রভৃতিও স্ব স্ব টীকাগ্রন্থে ইহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; করিলে, অবশ্যই ইদানীন্তন মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোক দুইটীও বর্ত্তমান থাকিত। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এইগুলি ভবভূতির নিজেরই শ্লোক, রামায়ণের নহে! কিন্তু ভবভূতি নিজের শ্লোক ভিন্ন যে রামায়ণের কোনও শ্লোক আপনার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই, তাহাই বা কিরূপে নিশ্চয় প্রমাণিত হইতে পারে?

হাওড়ার কথা।

[শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া দেশ-গ্রাম ভুলিতে পারি নাই। আমাদের হাওড়া ও তদ্দেশের সহিত কত প্রাচীন ইতিহাস কত প্রাচীন গল্প সংশ্লিষ্ট, তাহা এক একবার ভাবি। প্রাচীন তত্ত্বের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রাত্নিকদের প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। কিন্তু তাহার সম্ভাব এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। ভরসা করি, হাওড়া সম্বন্ধে এইবার সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে প্রবন্ধাদি শুনিতে পাইব ও আনন্দ উপভোগ করিব।

"হাওড়া" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ "হেরম্ব-হট্টের" সহিত হাওড়ার সম্বন্ধ কতদূর, তাহা জানিতে পারিব। আমার মনে পড়ে, বালক কালে হাওড়ার হাটে হেরম্ব দেবের পূজা হইত, এখন আর তাহা হয় কিনা, জানি না। বাংলার দক্ষিণ-প্রদেশ হেরম্ব-হট্ট ছিল। অদ্যাবধি হাওড়ার কাপড়ের হাট ভারত-প্রসিদ্ধ। হোড, হৌড, হর্ড প্রভৃতি সযন্ত্র সথনক পোতের সহিত 'হাওড়া'র সম্বন্ধ আছে কিনা? মহাভারতে বাংলার শৌভদিগের সহিত দ্বারাবতীদিগের যুদ্ধে তৎ বহিত্র ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও মনে হয়, হৌড নামা বৃহৎ সযন্ত্র ও সথনক বহিত্রের নির্ম্মাণ ও পত্তন-স্থান বলিয়া "হাওড়া" নামের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য-মতে হাওড়ার নিকট যে সকল পোত নির্ম্মিত হইত, তাহা বাংলার সর্ব্বপ্রকার সাগর-যায়ী পোতের মধ্যে উৎকৃষ্ট। হয় ত তাহা আমার বাংলার অতি-প্রাচীনতা-জ্ঞান-বিমূঢ় সংস্কার; তাহার নিরাকরণ হইলে উপকৃত হইব। হাওড়ার "হোড" নামক তক্ষণিকদিগকে এখনও দেখা যায়; তাহাদের বংশ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অনেকে এখনও হাওড়ার বকথক (Dock) জাহাজের কর্ম্মাদি করে। সভাপর্ব্বের (৩১অঃ) হেরম্বক-প্রদেশ জয়ের কথা আছে। তাহা বাংলার প্রদেশ-বিশেষ বলিয়া বুঝায়।

তার পরে "বেতড়"। ইহার সহিত মহাভারতে উল্লেখিত "বেতসিকা"র কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা? বেতসিকা হইতে সমুদ্র-যাত্রা ঘটিত। বেতড় হইতেও বহুকাল ধরিয়া সমুদ্র-যাত্রা আরম্ভ হইত। "বেতাই চণ্ডী" সম্ভবত বেতসী চণ্ডী। "বেত্রকীয়" বন, "বকাসুর" প্রভৃতির সহিত "বেঁটরা-বাকসাডার" সম্বন্ধও দেখা যায়। তথা হইতে প্রাচীন কালে "একচক্রা", একচক্রা হইতে "পাঞ্চাল" যাইবার পথ ছিল। একচক্রা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শম্ভলপুর (শম্ভপুরী), পাঞ্চালও মধ্যভারতে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কালে হাওড়া হইতে ঐ পথ আরম্ভ এবং অহল্যাবাইএর রাস্তা নামে খ্যাত। হাওড়ার বেতড়ের নিকট হইতে আর একটি পথ আছে; উহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার বর্ত্তমান হিন্দুনাম বিলুপ্ত; ইংরাজী নাম Grand Trunk Road. প্রাচীন হিন্দুনাম "উর্দ্ধপথ", "অন্তরিক্ষ পথ," "আকাশ-পথ" প্রভৃতি ছিল। সম্ভবতঃ "দক্ষিণাপথ"ও এই স্থান হইতে

আরম্ভ হইয়াছিল। সন্তারকদের সাঁত্রাগাছি, শানা অর্থাৎ যন্ত্রনির্ম্মাতৃদের শানাপাড়া, ভড় বা বৃহৎ পোতের ঘাট ভড়পাড়ার ঘাট—প্রাচীন সাংযাত্রার নিদর্শন। বিখ্যাত মীরমদন "মগফিরিঙ্গি মদনরায়" নামে অখ্যাত হন। ইনি মীর-উল-বহর বা সামুদ্রিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন—আলিবর্দ্দির আমলে। ইঁহার জায়গীর "ধাড়সা" পরগণা নামে আখ্যাত হয়; এবং ধাড়সা-নিষ্কৃতি বা ধর্ম্ম-নিষ্কৃতি অর্থাৎ পতিতোদ্ধার ব্যাপারে তিনি জাতে উঠেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত সদ্‌ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্পাদন ও লক্ষাধিক আয়ের জায়গীর ধাড়সা-পরগণা যৌতুক দিয়া। তখনও বেতড় বা বেতসী বন্দর ছিল। তৎকালে দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মে নৌসম্বন্ধীয় বাণিজ্য ও কর্ম্মে সকলে ধনশালী ছিলেন। তাহার নিদর্শন সরস্বতী-তীরস্থ গ্রাম ও নগরাদির প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে বর্ত্তমান। আমরা বালক-কালে বেতড় বাকসাড়া প্রভৃতি গ্রামের যে ঋদ্ধি দেখিয়াছি, এখন তাহা নাই। সম্ভবতঃ বেতসী হইতে "বৈতসী বৃত্তি" পদের উৎপত্তি। বৈতসী অর্থাৎ বেতাস উৎপন্না বৃত্তি বা আজীব অর্থাৎ পেশা। ইহার সহিত "বেতসধর্ম্ম" বা "নম্রতাপরিগ্রহ" পদের ঐক্য করা সমীচীন নহে।

কালিদাসের কূট শ্লোকে দেখা যায় যে,—

'অনগ্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥' (রঘু ৪ ৩৫)

রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহাসাগরোপকণ্ঠে তালীবন-শ্যাম-এ উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জনপদ জয় করিয়া "সিন্ধুরয়" (বর্ত্তমান ভাষায় সিন্ধুরায়) উপাধি গ্রহণ করেন, এবং তিনি তথা হইতে "অনম্র" আনাম বা কাম্বোজদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাহাতে নৌসৈন্যের প্রয়োজন। সুহ্ম দেশের বেতসী তৎকালে সাংযাত্রিকের অগ্রণী ছিলেন। সুহ্মের ক্ষত্রিয়গণ বৈতসীবৃত্তি অর্থাৎ নৌসৈন্য-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া এবং রঘুর অনম্র বিজয়ের সাহায্য করিয়া রঘুর দিগ্বিজয়-ব্যাপার-ঘটিত কষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। "সিন্ধুরয়" হয় ত অপর কোন ব্যক্তি বা প্রচ্ছন্নভাবে কালিদাস সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। বেতস-এর অর্থ—রথ, বিদুল। বিদুলী=দুলে জাতি। একচক্রার সহিত চক্রবেড়ে পল্লীর সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অথবা "চক্রবাড়"এর কেন্দ্রস্থল বলিয়া তন্নামের উৎপত্তি। তথায় প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতিষীদের বাসস্থান—এখনও "যানের বাড়ী" নামে খ্যাত। তথায় হয় ত চক্রবাল খাল ছিল। তাহা প্রায় বিলুপ্ত। যৎসামান্য নিদর্শন তথা হইতে বেতড় পর্য্যন্ত "বেলেখাল"-এ বর্ত্তমান আছে। চক্রবেড়ের বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল; তথায় এখনও বহু তন্তুবায় আছে। ধনী "চন্দ্র"দিগের বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিলে মনে হয়, ইহারা এককালে হেরম্ব-হট্টের "চন্দ্র" বা হট্টপাল ছিলেন। চন্দ্রী=চাঁদনী=হট্ট।

সন্তরণ-এর সহিত "নাগ" বা "নৌগ" দেবের বিশিষ্ট সম্বন্ধ। মদন রায়ের সময়েও নাগ-দেবের পূজা বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বালক কালে সাঁত্রাগাছীতে নাগ-বেদী দেখিয়াছি। মনসা-গাছ বেদীর উত্তরে স্থাপিত ছিল এবং গ্রামের সমবেত জলকর হইতে নাগোৎসব সম্পাদন তথা বড় বড় মোদক (মোয়া) বিতরণ দেখিয়াছি। তখন বৃহৎ চর্ম্মকার-পল্লীর

মুচীদের ১০০।১৫০ ঢাকের আওয়াজ গ্রামান্তরে শ্রুত হইত। সাগর চৌধুরী প্রসিদ্ধ সর্প-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য এখনও বর্ত্তমান। নাগোৎসব এখন বেদীর সহিত বিলুপ্ত।

উৎকল-পথের অধ্যক্ষ মদন রায় ছিলেন। হিজলীতে তাঁহার ঘাটি ও জায়গীর ছিল। দস্যুতা-নিবারণে মদন রায় আলিবর্দ্দীর প্রধান সহায় ছিলেন। শুনা যায়, উৎকল-পথে তাঁহার শাসনে একাকী শকটবাহী রাত্রিতেও অর্থ বহন করিত।

শালকিয়া গ্রামও অনেক প্রাচীন বস্তুর সাক্ষ্য-স্বরূপ। তথায় "ছালিকা" সঙ্গীতের প্রধান স্থান ছিল। তাহার শেষ নিদর্শন—বদন অধিকারীর যাত্রা। বর্ত্তমানে যাত্রা প্রায় নাটকে পর্য্যবসিত। সংযাত্রায় ব্যবহৃত বলিয়া "যাত্রা" সংজ্ঞার উৎপত্তি। সেদিন পর্য্যন্ত শালকিয়াতে যাত্রা-ওয়ালাদের তথা তুর্য্য (তর্জ্জা) কারীদের, পাঁচালী-ওয়ালাদের নিবাস ও আড্ডা ছিল। হরিবংশে প্রাচীন "ছালিক্য" ক্রীড়াপোতে ব্যবহৃত হইত। তৎসঙ্গীত দ্বারাবতীতে কৃষ্ণ স্থানান্তর (ত্রিদিব) হইতে আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত। সম্ভবতঃ বাংলা হইতে, সংযাত্রা হইতে সং (ভাণ প্রহসন) ও যাত্রা (নাটকাদির) উৎপত্তি। তাহা সাংযাত্রিকদের সংযাত্রা বা সাগর-গমনে ব্যবহৃত হইত।

এই সমস্ত জল্পনা-কল্পনা হইতে বহুবিধ ইতিহাস আচার-ব্যবহার আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহার জন্য কেহ কেহ নিশ্চয় চেষ্টান্বিত আছেন এবং তাঁহাদের আবিষ্কারে হয় তো আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব।

—*—

অধ্যয়্য।

[শ্রীমতী লীলা দেবী লিখিত।]

ধরা দিতে দিতে তুমি দাওনা যে ধরা
কোথায় মিলায়ে যাও আমি দিশাহারা
ধাই পাগলিনী প্রায় মধু নিধু বনে
বিলাস বিপিনে নব-ব্রততী বিতানে
যমুনা-পুলিনে কেলী কদম্বেরি মূলে
হে নির্দ্দয়! তবুও যে দেখা নাহি মেলে!

তোমার আহ্বান আসে উন্মাদ সমীরে
বাঁশরী বাজিয়া উঠে কি আকুল সুরে
নিকুঞ্জ-কুটীরে শুনি নূপুরের ধ্বনি
চকিতে দেখিতে পাই সেই মুখখানি
অমনি ধরিতে যাই—নাহি পাই আর
হে দয়িত! এ বেদনা সহে না আমার!

ফসল ও তাহার সার।

[শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটী মহাশয়ের লিখিত।]

জমির প্রকৃতি।—বালি ও এঁটেল মাটী সমান ভাবে থাকিলে তাহাকে দোঁয়াস জমি বলে। চাষের পক্ষে সাধারণতঃ এইরূপ জমিই ভাল। কেবল এঁটেল মাটী অতিশয় কঠিন। তাহাতে রোদ, জল ও বায়ু ভাল প্রবেশ করিতে না পারায় ফসল ভাল হয় না। বালি মাটী সহজে তাতিয়া উঠে। এই তাপে গাছের হানি হয়, ফসলও ভাল হয় না। জমিতে বালি আছে কিনা বা কিরূপ পরিমাণ আছে, জানিতে হইলে, এক ডেলা মাটী জলে গুলিতে হয়। মাটী জলের সহিত মিশিয়া যায়, বালি নীচে থিতাইয়া পড়ে। আওতা-জমিও চাষের পক্ষে সুবিধা নহে। উদ্ভিদ্ মাত্রই আলোক না পাইলে ভাল জন্মায় না; জন্মিলেও উহাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না। পান, আনারস প্রভৃতি দুই একটী গাছের পক্ষে ইহার ব্যতিক্রম আছে।

সারের প্রয়োজনীয়তা।—চাষের জন্য দোঁয়াস মাটী ব্যবহার করিতে হইবে। মাটি এঁটেল হইলে তাহাতে বালি ও সার মিশাইয়া এবং বালি হইলে তাহাতে এঁটেল মাটী ও সার মিশাইয়া ক্রমে ক্রমে চাসের যোগ্য করিতে হইবে। কিন্তু কেবল এই উদ্দেশ্যেই সার ব্যবহৃত হয় না। আমরা যাহা আহার করি, তাহা হইতে দেহ বর্দ্ধিত হয়, আহার না পাইলে দেহ রক্ষা হয় না; সেইরূপ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যও আহার প্রয়োজন। সার সেই আহার্য্য। একবার ফসল হইলেই জমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায়। বন্যাদি প্রাকৃতিক উপায়ে সারের সংস্থান না হইলে, পুনরায় তাহাতে আবাদ করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায় না। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেই উর্ব্বরতা-শক্তি রক্ষা করিতে হয়। অবশ্য সার না দিলে যে ফসল একেবারেই হয় না, তাহা নহে। কারণ, প্রকৃতি হইতে জমি সার সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু বৎসরে ২।৩টি ফসল লইতে হইলে বা বারমাসই ফুল ফল পাইতে হইলে, তাহাতে সার দিতে হয়, দিলে, জমির কার্য্যকরী শক্তি বাড়ে। ভাল কৃষকেরা দুইবার ফসল লইয়া একবার জমি পচান দেয় অর্থাৎ অনাবাদে ফেলিয়া রাখে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্রাম পাইয়া জমি আবার আপনার আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লয় ও পূর্ব্বের মত ফসল দেয়। আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখা একটু ভাবিবার বিষয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নানা বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জমির টীকা দেওয়া (inocculation) প্রভৃতি যে সকল পদ্ধতি সেখানে প্রচলিত হইয়াছে, আমাদের দেশে যে শীঘ্র তাহার প্রবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এখনও আমাদের দেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত ও নূতনের বিরোধী। শিক্ষিত সম্প্রদায় চাষে মন দিলে সেই সকল উন্নত উপায় প্রচলিত হইতে পারে। সুতরাং অল্প খরচে ও অনায়াসে যে সকল উপায়ে জমির ফসল অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বলিব। দেশী ও বিলাতী উভয় সারের কথাই বলিয়াছি ও উহাদের কার্য্যকারিতা নিজের বা অপরের জমিতে পরীক্ষা করিয়াছি।

কোন্ জমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না?—বাইওকেমিক চিকিৎসার মতে আমাদের শরীরে ধাতুবিশেষের অভাব হইলে কোনও বিশেষ পীড়া হয়। ঔষধরূপে সেই ধাতু উদরস্থ হইলেই সেই পীড়া সারিয়া যায়। জমীর অনুর্ব্বরতা ও সার দেওয়াও ঠিক তাহাই। কিন্তু একটা কথা আছে—যদি আমরা প্রতিদিন বা বিশেষ বিশেষ সময়ে এমন খাদ্য গ্রহণ করি, যাহাতে দেহে সকল ধাতুর সমতা রক্ষিত হয়, তাহা হইলে পীড়াও কাছে আসিতে পারে না। সেইরূপ বৎসরের মধ্যে জমির যাহা অভাব পড়ে, যদি কোনরূপে জমি তাহা নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঔষধ দিতে হয় না।

(১) যে জমিতে প্রতি বৎসর নদীর বন্যা আসিয়া পলি পড়ে, তাহাতে আর কৃত্রিম সার দিতে হয় না। পলি অতি উৎকৃষ্ট সার। ইহাতে ঔদ্ভিজ্য, ধাতব ও জান্তব সার—সকল সারই বিদ্যমান থাকে।

(২) যে জমি নূতন ভাঙ্গা হইয়াছে বা বাগান কাটিয়া যে জমি করা হইয়াছে, তাহার জোর ২।৩ বৎসর সমানভাবে থাকে। সে জমিতে ঐ সময়ের মধ্যে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। সার দেওয়া উচিত, কিন্তু অনর্থক বা অপরিমিত সার দিলে অপকার হয়। গাছ খুব বড় ও তেজাল হয়, ফসল বা ফল ভাল হয় না। এরূপ অতিরিক্ত সারের জমিতে ধান গম প্রভৃতির গাছ পড়িয়া যায়, শীষ ভাল হয় না; যাহা হয় তাহাও প্রায় ভাল নয়। ফলের গাছের বাড় হইলে, শাখা-প্রশাখাতেই জমির রস খাইয়া ফেলে, ফল তেমন হয় না।

সারের প্রকার-ভেদ।—উদ্ভিজ্জ, ধাতব ও জান্তব ভেদে সার তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কঠিন ও তরল ভেদেও সার দুই প্রকার।

উদ্ভিজ্জসার।—(১) moss বা শেওলা। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার শেওলা পাওয়া যায়। গামলা বা টবে যে সকল গাছ লাগান হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। সাধারণের মধ্যে ইহার সেরূপ ব্যবহার নাই।

(২) পাতাসার।—গাছের পাতা পচিলে অতি উত্তম সার হয়। বেল ও আনারসের গাছ পুতিবার সময় পাতাসার দিলে বিশেষ উপকার হয়। আলু জমিতেও পাতাসার ভাল কাজ করে। পাতা সহজে পচিতে অনেক সময় লাগে। কৃত্রিম উপায়ে ইহাকে শীঘ্র পচাইতে পারা যায়। পাতাকে বেশ করিয়া শুকাইয়া tea-dust এর মত গুঁড়া করিতে হয়। পরে একটী পাতনা বা পিপাতে রাখিয়া জল দিয়া আর একটী পাতনা ঢাকা দিতে হয়। এইরূপ ৮।১০ দিন থাকিলেই উহা পচিয়া যায় ও ব্যবহারের যোগ্য হয়।

(৩) নারিকেলের ছোব্‌ড়া ও আঁশ।—পচিলে খুব ভাল সার হয়। ইহা সাধারণতঃ পচিতে বেশী সময় লাগে। কিছু চূণ ও ছাই মিশাইয়া মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিলে সহজে পচিয়া যায়। পরদেহপুষ্ট উদ্ভিদের পক্ষে ইহা ভাল সার। ইহার সহিত ১ম দফার শেওলা মিশাইলে যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা বিগোনিয়া প্রভৃতি গাছের কলমের পক্ষে বিশেষ উপকারী। জমি দোয়াস করিবার ইহা একটী ভাল উপকরণ।

(৪) রাবিশ।—সকল প্রকার রাবিশই পচিলে ভাল সার হয়। যে জমিতে গ্রামের গড়ান (ময়লা) যায়, তাহা খুব জোরাল হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর আবর্জ্জনা ফেলিয়া যে সকল স্থান ভরাট করা হয়, তাহার মাটীও খুব জোরাল হয়। সেই সকল জায়গায় কপি, পালং, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত হয়। কৃষকদিগের আঁকুড়ের সারেও এই রাবিশ থাকে। তবে তাহাতে গোবর প্রভৃতি জান্তব সারও থাকে। তাহার কথা পরে বলিব। কাঁচা ঘরের কাঁথড়া ভাঙ্গা মাটী, লাউ গাছের পক্ষে ভাল সার। পুকুরের পচা পাঁক খুব জোরাল সার। ধানী জমিতে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়াছি। পুরাতন পাকা ইমারত ভাঙ্গা রাবিশের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে। এই রাবিশে মাটীর সহিত চুণ, শুরকী প্রভৃতিও থাকে। ইহা বট, পাকুড় প্রভৃতি গাছ জন্মিবার বিশেষ সহায়। জীবন্তী ও ডুমুর গাছও ইহাতে বাড়িতে দেখিয়াছি। নেবু গাছের গোড়ায় রাবিশ গুঁড়া করিয়া দিলে গাছের উপকার হয়। একবার একটা ভাঙ্গা ইমারতের ভিটায় বেগুনের আবাদ করিয়া মন্দ ফসল হয় নাই।

(৫) ছাই।—কাঠ ও কয়লা উভয়েরই ছাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। চুণের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ইহা সহজে উদ্ভিদের শিকড় পচাইতে পারে। এঁটেল মাটীর সহিত মিশাইলে আঁশ ভাঙ্গিয়া মাটি হাল্‌কা হয়। মানকচু, প্রভৃতির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সার। রেগুন গাছের গোড়ায় ঘুঁটের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া দিলে গাছ সতেজ হয়। পাতায় পোকা ধরিলে বেগুন ও শসা গাছে ইহা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আজ কাল অনেক স্থলে হাড়ের ছাই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার সারে বুট ও গম ভাল ফলে।

(৬) খইল।—উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান। সাধারণ সার হিসাবেও ইহার মূল্য কম নহে। সারে নাইট্রোজেন ফস্‌ফেট্ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য থাকা প্রয়োজন, খইলে তাহার সকলগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা সরিষার খইলই বেশী ব্যবহার করে। ইহা চূর্ণ ও তরল দুই ভাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সরিষার অপেক্ষা কার্পাসের খইল-এ নাইট্রোজেন বেশী থাকে। ইহা গবাদির খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। পশুকে উত্তম খাদ্য যথেষ্টরূপে খাইতে দিলে, কেবল তাহাদের দেহপুষ্টি ও বলাধান হয় না, তাহাদের পুরীষাদিরও সার হিসাবে ঔৎকর্ষ সাধিত হয়। খাদ্যের উপাদানের সামান্য অংশ পশুদিগের শরীর-পোষণকার্য্যে ব্যয়িত হয়, অধিকাংশই তাহাদের মল-মূত্রাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়া উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে।

সাধারণ খড়ে ০·৪ হইতে ১·০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সুতরাং গবাদির খাদ্যে খইলের পরিমাণ অধিক না হইলে তাহাদের নিকট হইতে সমধিক উপকারের আশা করা যায় না।

সংপ্রতি রেড়ী ও বাদামের খইলের বেশ প্রচলন হইয়াছে। সরিষার খইল অপেক্ষা ইহাদের কার্য্যকারিতা অধিক অথচ খরচ অল্প। বিলাতি মটরের চাষে রেড়ীর খইল প্রশস্ত। আমাদের কৃষকেরা আলুর জমিতে চূর্ণ করিয়া সরিষার খইল ব্যবহার করে। কিন্তু রেড়ীর খইল ব্যবহার করিলে খরচ প্রায় অর্দ্ধেক পড়ে, অথচ ফসল ভাল হয়। আলু, কচু, আক, মূলা, কপি, ভুট্টা, লঙ্কা প্রভৃতির পক্ষে খইলের সার সবিশেষ উপযোগী।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' (Encyclopædia Britanica) হইতে নিম্নে কয়েকটি খইলের প্রতি টনে খাদ্য ও সাররূপে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের একটি তালিকা দেওয়া হইল। (টন—প্রায় ২৭॥০ মণ, পাউণ্ড—প্রায় আধ সের।)

	খাদ্য।			সার।		
	নাইট্রোজেন।	ফসফেট্।	পটাস।	নাইট্রোজেন।	ফসফেট্।	পটাস।
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
নারিকেল খইল —	৭৬ ৭৬	৩১ ৩৬	৪৪·৮০	৭২ ৬০	২৮ ৯৫	৪৪ ৪৯
মসিনা খইল —	১০৬ ৪০	৪৪ ৮০	৩১·৩৬	১০১·৬৬	৪১ ৫৯	৩০·৯৫
সরিষা খইল —	১০৯ ৭৬	৫৬ ০০	৩৩·৬০	১০৬ ৬২	৫৪ ০৭	৩৩·৩৫
কার্পাস খইল —	১৪৭ ৮৪	৬৯ ৪৪	৪৪ ৮০	১৪৩ ৪৬	৬৬ ৪৮	৪৪ ৪৩

(৭) সবুজ সার।—ইংরাজীতে যাহাকে Green manuring বলে। ধঞ্চে ও শণ ইহাদের মধ্যে প্রধান। সারের হিসাবে আমাদের দেশে ইহাদের আবাদ নাই বলিলেই হয়। দড়ির জন্য স্থানে স্থানে শণের চাষ হয়, ধঞ্চের আবাদ আরও কম। কাঁদি মহকুমার জনৈক ভদ্রলোককে সারের জন্য ধানের জমিতে মাসকলাই বুনিতে দেখিয়াছি। ধঞ্চে ও শণের মধ্যে ধঞ্চেই প্রথম। রোপা ধানের জমিতে ইহার সার দিয়া অনেক স্থলে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সরকারী কৃষিবিভাগ ইহার সার বিশেষভাবে অনুমোদন করেন। বৈশাখ মাসে জমিতে দুইটী চাষ দিয়া ইহার বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। বিঘায় /২॥ সের বীজ লাগে। দর সচরাচর ৫৲ মণ। আষাঢ় মাসের প্রথমেই গাছ ২।৩ হাত বাড়িয়া উঠে। কাড়ানের সময় বৃষ্টি হইলে ঐ গাছ একেবারে চষিয়া দিতে হয়। ২।১ দিনের মধ্যেই ইহা পচিয়া যায়। তখন ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। কিছু চূণ ছিটাইয়া দিলে পচনের সাহায্য হয়। ধইঞ্চা নিজে ভাল সার এবং ইহার মূলদেশেও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বহু খাদ্য লক্ষিত থাকে। কাড়ান না হইলে ধইঞ্চার আবাদ অন্য প্রকারেও লোকসানের নহে। উহা কাটিয়া পাটের ন্যায় কাচিয়া লইতে হয়। ইহার দড়ি খুব শক্ত। আমাদের কৃষকদিগের মধ্যে ধইঞ্চার সার প্রচলন হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। ইহাতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ হিসাবে বর্দ্ধিত হয়। সার ভিন্ন অন্য ভাবেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। অথচ, ধইঞ্চার চাষে খরচ সেরূপ অধিক নহে।

ধাতব সার।

(১) নাইট্রোজেন।—ইহা জমির পক্ষে কত দরকারী, পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। ইহা নিজে বায়বীয় পদার্থ, অন্য বস্তুর সহযোগে পাওয়া যায়। সোরা, Nitrate of potash নাইট্রোজেন ঘটিত প্রধান সার। Nitrate of soda আর একটি। পশুর বিষ্ঠা, মূত্র, মাংস, রক্ত এবং সোরা ও খইল প্রভৃতিতে নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। ইহা উদ্ভিদকে সতেজ করে। পাতা, ফুল ও শিম্বীর জন্য যে সকল উদ্ভিদের আবাদ হয়, ইহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ফলের চাষে ইহা তত কাজ করিতে

পারে না। মূলা, শাক-সবজী, আলু, মটর, ভুট্টা, সিম, আক্ প্রভৃতির পক্ষে সোরা ও Nitrate of Soda খুব ভাল সার।

(২) পটাশ।—ইহা নানা আকারে পাওয়া যায়। ইহাও উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী। ফলগাছের পক্ষে ইহা অতিশয় প্রয়োজন। যে গাছে ফল হয় না, ফলিবার পূর্ব্বে তাহাতে অল্প নাইট্রোজেনের সহিত মিশাইয়া পটাশের সার ব্যবহার করিলে গাছ ফলিতে পারে। পটাশই ফলের শ্বেতসার ভাগকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করে।

(৩) ফস্‌ফোরাস্—নানা রাসায়নিক অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। জীবের অস্থিতে সমধিক ফস্‌ফোরাস্ আছে। এই জন্যই অস্থিসারের প্রয়োজন। Super-Phosphate একটী ফস্‌ফেট্ প্রধান সার। বীজের উপর ফস্‌ফেট্ বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। গমের পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

ইহা ছাড়া কেইনিট্, বেসিক, স্ল্যাগ, ম্যাগনিসিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটী ধাতব সার আছে। ঐগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া বেশী কথা লিখিলাম না।

(৪) চূণ।—মানবদেহের ন্যায় উদ্ভিদের পক্ষেও ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল সাররূপে চূণ খুব কমই ব্যবহৃত হয়। কেন-না, মাটীতে কোন না-কোনও আকারে চূণ স্বভাবতঃই থাকে। ইহা জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। চূণ ভূমির অম্ল নাশ করে, এঁটেল মাটীকে হাল্‌কা করে, জীব ও উদ্ভিদের দেহ পচাইয়া সারে পরিণত করে এবং অনেক দুষ্ট জীবাণু নষ্ট করে। পতিত জমি ভাঙ্গিয়া আবাদের পূর্ব্বে তাহাতে চূণ ও ছাই ছিটাইয়া দিলে গাছের শিকড় প্রভৃতি সহজে পচিয়া যায়।

(৫) লবণ।—সকল উদ্ভিদেই ইহা কিছু না কিছু আছে। নারিকেলের পক্ষে ইহা খুব উপকারী। রোপা ধানের গোড়ায় সর পড়িয়া জমি কঠিন হইলে, উহা প্রায় ফাটা হইয়া যায়। তখন জমিতে লবণ দিলে উহা সরিয়া যায়। কারণ, লবণ এঁটেল মাটীর আঁশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় গাছ যথেষ্ট রস আকর্ষণ করিতে পারে। প্রায়ই ভাদ্র মাসে লবণ দেওয়া হয়।

প্রাণিজ বা জান্তব সার।

(১) অস্থি।—আমাদের দেশে অস্থিসার আজও তত প্রচলিত হয় নাই। ফলগাছের ও অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে ইহার বিশেষ উপকারিতা দেখা যায়। ইহার গুঁড়া সার ব্যবহার করাই সুবিধা। ইহাতে ফস্‌ফোরাস্ অধিক পরিমাণে আছে। আমের চারা পুঁতিবার সময় হাড়ের গুঁড়া দিলে ভাল হয়। হাড়ের ছাইএর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(২) বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, মাংস প্রভৃতিও সার-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিষ্ঠাসারে কপি, পালং প্রভৃতি সবজী বিশেষ পুষ্ট হয়। কিন্তু সারের ভাগ অধিক হইলে উদ্ভিদে জলীয় অংশ বেশী সঞ্চিত হওয়ায় উহা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হয় না। লাউ গাছের গোড়ায় ও পালং শাকে গোবর গোলা জল দিলে উপকার হয়। পচামাছ, নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি পচিলে গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়।

(৩) গোবর।—গোময় ও গোমূত্রের সারই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহার করা হয়। সার বলিলে অনেক ইহাই বুঝে। প্রায় প্রত্যেক কৃষকেরই বাটীর নিকটে একটি সারকুণ্ড বা সার-

ডোবা থাকে। উহাতে বাটির আবর্জ্জনা ও গোশালা হইতে খড়, গোবর, মূত্র, খিঁচ ইত্যাদি ফেলা হইয়া থাকে। সংবৎসর জমা হইয়া উহা পচে ও সাররূপে ক্ষেত্রে নীত হয়। সার হিসাবে ইহা বেশ ভাল। সাধারণতঃ ধানী জমিতে এই সারই ব্যবহৃত হয়। সারের ডোবাটি পাকা ও আবৃত স্থানে হইলে ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে সারের রস মাটিতে শোষণ করিয়া লয় না বা রোদ-বাতাসেও উহার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না।

মিশ্রসার।

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট্ ও পটাশ এই তিনটিই সারের বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। তিনটিরই স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে; কিন্তু যে সারে এই তিনটি দ্রব্যই আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গোমূত্রে পচান খইল এই মিশ্রসারের একটি সরল অথচ উত্তম প্রকার। ইহা খুব জোড়াল, ইহা আলু ও আকের জমিতে আশাতীত ফল দেয়। পচা পাঁকে হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া ধানের জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ২ ভাগ সোরা ও ৩ ভাগ হাড়ের গুঁড়ার সার দিলে ফল মিষ্ট হয়। ১ ভাগ সোরা, ৩ ভাগ অস্থিচূর্ণ ও ৪ ভাগ সাজিমাটি ফলগাছের উৎকৃষ্ট সার। সমপরিমাণ অস্থিচূর্ণ ও সাজিমাটি গোমূত্রের সহিত ব্যবহার করিলে ফল মিষ্ট ও সদ্‌গন্ধ হয়।

অন্যান্য সার।

এ পর্য্যন্ত প্রায় সাধারণভাবেই সারের আলোচনা করিলাম। বিশেষ বিশেষ গাছের পক্ষে বিশেষ বিশেষ সারের কার্য্যকরী ক্ষমতা অধিক। এ সম্বন্ধে অনেক "খনার বচন" আছে। এই বচনগুলি অবহেলার জিনিষ নহে। কারণ উহা বহু অভিজ্ঞতার ফল। রাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত Agricultural Sayings in Lower Bengal নামক পুস্তক হইতে উহাদের কয়েকটি মাত্র তুলিব।

(১) বাঁশবনের ধারে বুন্‌লে আলু। আলু হয় গাছ বেড়ালু। (সতেজ)।

(২) ওলে কুটি মানে ছাই। (কুটি—পচা খড়।)

(৩) ধেনো মাটিতে বাড়ে ঝাল। (লঙ্কা)।

(৪) চিটা দিবে নারিকেলের মূলে। (চিটা ধানের আগড়া বা পাতান।)

(৫) গোয়ে গোবর বাঁশে মাটি। অফলন্ত নারিকেলের শিকড় কাটি। (গোয়ে—গুবাকে, সুপারিতে।)

(৬) সুপারি বনে মান্দার রো।

(৭) ফাগুনে আগুন চৈতে মাটী। বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি। (বাঁশের পিতামহ=তিন বৎসরের পুরাতন বাঁশ)।

(৮) বাঁশে দিও ধানের চিটা।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় খনার বচনে লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক কৃষকের ও কৃষিবিদ্যায় আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তির সে গুলির সহিত পরিচিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার।

জমির পক্ষে সার কত এবং কেন প্রয়োজনীয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শস্য জন্মিবার সহিত জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায়। ঐ শক্তিই ফুল, ফল বা শস্যরূপে আমাদের হাতে আসে। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, পটাশ ইত্যাদি পদার্থে ঐ শক্তি সঞ্চিত থাকে। ক্রমশঃ, আবাদের সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন প্রভৃতির হ্রাস হইয়া আসে ও তাহাতেই জমি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ অর্থাৎ অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। সারের আকারে ঐ সকল জিনিস জমিতে পড়িলেই উহা আবার উর্ব্বর হয়। প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করে। প্রকৃতি সাহায্য না করিলে জমি হইতে একবারের অধিক ফসলই পাওয়া যাইত না। পাতা, শিকড় প্রভৃতি পচিয়া নাইট্রোজেন হইতেছে। প্রকৃতি সকল সময়ে জমির সম্পূর্ণ অভাব দূর করিতে পারে না। তখনই আমরা প্রকৃতির সাহায্যের জন্য সার দিই। দুই একটা এমন জিনিষ আছে, যাহা ফসল জমি হইতে একবার লইলে আর পায় না। সেইগুলি সারের সহিত আমরা দিয়া থাকি।

তৎপরে সারের প্রকার-ভেদ ও সেই সকলের উপযোগিতা আলোচনা করিয়াছি। কেবল ধাতব সার দিলে যে ফসল পাওয়া যায়, নাইট্রোজেনের সারে উৎপন্নের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী হয়। ধাতব ও নাইট্রোজেন সার উভয়ে বিহিত পরিমাণে মিশাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। ধাতব সারের মধ্যে সোডা পটাশ বা ম্যাগনেসিয়ার লবণ হইতে ফস্‌ফেট বেশী উপকারী। শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের মূলের গ্রন্থিদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু জন্মে, তাহারা উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। শূকধান্যের (Cereals) জমিতে শিম্বী-জাতীয় ফসল উৎপাদন করা আর সার দেওয়া একই কথা। উহাদের পাতা পড়িয়া পচিয়া ড্রেসিংএর কার্য্য করে। বায়ু হইতেও তাহারা যথেষ্ট নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। বারম্বার শূকধান্যের আবাদে যে সকল জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াছে। উত্তর আমেরিকায় সেই সকল জমিতে শিম্বী ফসল জন্মাইয়া উহা চষিয়া দেওয়া হয়। এই হিসাবেই ধইঞ্চের সারের উপকারিতা দৃষ্ট হয়। একই জমিতে ক্রমান্বয়ে কন্দ ও শিম্বী জাতীয় ফসল আবাদ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে rotation of crops বলে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বহু অতীত যুগ হইতে ইহা কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে। "খনার বচন" আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিদিগের অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ। সহস্র ক্ষেত্রে উহাদের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করা হইয়াছে। সেগুলি ফেলিবার জিনিস নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার যে সকল নূতন তথ্য প্রচারিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহারও সাবশেষ আলোচনা করা উচিত। আমাদের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে সেই সকল উপায় অনুষ্ঠিত হইলে, আশাতীত ফল লাভ করা যাইবে। গভর্ণমেণ্ট নানা ভাবে কৃষিবিদ্যায় উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যালয় ও পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন; সার ও বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; প্রতি জেলার কৃষকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা পাঠ্যবিষয় মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যকে অবহেলা বা ঘৃণা করিবার কোনও হেতু বা সময় আর নাই। কুটীরবাসী কৃষকই সমাজসৌধের ভিত্তি। কৃষকের অর্থেই

সমাজ পরিপুষ্ট। এ বিষয়ে সংপ্রতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে; আরও কামনা করি। কৃষিকার্য্য কেবল লাভের ব্যবসা নহে, ইহা স্বাস্থ্য ও শান্তির সহায়তা করে। ইহা কেবল নিঃস্ব কৃষকের কার্য্য নহে। লক্ষপতি ধনীও ইহাতে টাকা খাটাইবার সুগম পথ পাইবেন। আমাদের দেশে এখনও মাটীর অভাব নাই। সামান্য বেতনের চাকরীতে উৎসাহ নিঃশেষ না করিয়া, বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, অনেক ঘরের দুর্ভিক্ষ ঘুচিয়া আবার সুখের সুদিন ফিরিয়া আসিবে।

পুস্তক-পুস্তিকা।

যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা সাহিত্য-সংবাদে' সমালোচনার জন্য প্রাপ্তি হইয়াছি, তাহার মধ্যের আরও কতকগুলির বিষয় এতৎ প্রসঙ্গে লিখিত হইল। অন্যান্য প্রাপ্ত গ্রন্থের বিষয়ও ক্রমশঃ আলোচিত হইবে। কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই।

* * *

শোণিতাঞ্জলি।—রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। রাজা বাহাদুর আজীবন সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্রতী আছেন। সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার আনন্দ বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সমাজের বা ধর্ম্মের বা জাতির শুভসূচক বলিয়া যে প্রস্তাব যখনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়, তিনি তখনই সে প্রস্তবের পৃষ্ঠপোষণ করেন। সামরিক ব্যাপারে শোণিতাঞ্জলিদানে ব্রাহ্মণের ইতিকর্ত্তব্যতা এই গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের রচনা নৈপুণ্য গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া আছে।

* * *

দাস আমি।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শিবপুর 'প্রভাকর লাইব্রেরী' হইতে প্রকাশিত। প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ,—"এই 'দাস আমী'র প্রকাশে যদি পাঠক মহোদয়গণকে 'তাঁহার' (ঈশ্বরের) সহিত 'আমার' (মানবের) কি সম্বন্ধ তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" আদ্যলীলা, মধ্যলীলা ও অন্তলীলা—তিন অংশে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিন্যস্ত। গ্রন্থকার যে ভাবুক ও ভক্ত, তাহা গ্রন্থের সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত। এই গ্রন্থের লভ্যাংশ হরিসভার সেবায় অর্পিত হইবে। সঙ্কল্প ও সাধনা—উভয়ই সাধু।

* * *

গুরু-গোবিন্দ সিং।—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গ-ভাষার একখানি সম্পৎ মধ্যে গণ্য করিতে পারি। তিনকড়ি বাবুর ভূয়োদর্শন এবং পরিপক্ক হস্তের নিদর্শন 'গুরুগোবিন্দ সিং' গ্রন্থের প্রতি অংশে প্রকাশমান। শিখ-শৌর্য্যের ক্রমশঃ বিকাশ, উত্থান ও পতন—এই তিন অবস্থারই আভাষ, সরল সুন্দর ভাষায় এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শিখগণের

মতানুযায়ী এই গ্রন্থ লিখিত' বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। সুতরাং শিখ গুরুর প্রকৃত তথ্য এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আশা করা যায়। গ্রন্থখানি চিত্র-সংবলিত।

* * *

পাণিপথ।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী বি-এ প্রণীত। 'পাণিপথ ঐতিহাসিক কাব্য।' চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন চট্টল-ভূমি কবিত্বের উৎস স্থানীয়। কবিবর নবীনচন্দ্রের বীণা এই চট্টলেই বাজিয়াছিল। তার পর দাস গুণাকর, শশাঙ্কমোহন প্রভৃতি চট্টলের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছেন। ছোট-বড় অনেক কবিই এখন চট্টলে প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। 'পাণিপথ'-রচয়িতা এই সুরেশচন্দ্রও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন। এই কাব্য তাঁহার প্রথম রচনা। এখন বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অসদ্ভাব নাই। নচেৎ, এই গ্রন্থই সুরেশচন্দ্রকে 'কবি' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শত ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইলেও, আমরা 'পাণিপথ'-প্রণেতার প্রতিষ্ঠা-কামনা করি।

* * *

শিলং পাহাড়।—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রামময় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত। মুখপাতেই ৺বৈদ্যনাথ ধামের প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীশ্রীনারদ বাবা মহারাজ সরস্বতীর প্রতিকৃতি এবং তাঁহার নামের উৎসর্গ-পত্র। তার পর, উত্তর-বঙ্গের তীর্থ-ক্ষেত্র (কামাখ্যা) প্রভৃতির বর্ণনা ও শিলং পাহাড়ের বৃত্তান্ত।

'শিলং পাহাড়ে' বিবিধ উদ্দেশ্য উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। "শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের করকমলে ভক্তি-উপহার প্রদত্ত" হইয়াছে এবং 'সাহিত্য-সংবাদে' সমালোচনার জন্যও নির্ব্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং দুই ভাবেই গ্রন্থখানির প্রাপ্তিস্বীকার করা হইল। 'শিলং পাহাড়' পাইয়া পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় গ্রন্থকারকে যে পত্র লেখিয়াছেন, বলা বাহুল্য, গ্রন্থ-সম্বন্ধে সেই মতই আমরা পোষণ করি। সুতরাং সেই পত্রই এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"আপনার প্রীতির উপহার 'শিলং পাহাড়' প্রাপ্ত হইয়া বড় আনন্দিত হইলাম।

"বেদ-ব্যাখ্যা-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান থাকিয়া, বিষয়ান্তরে চিত্ত আদৌ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কি আপনার রচনার মোহিনী শক্তি, পুস্তকখানি হস্তগত হইবা মাত্র, আমাকে উহার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। ধর্ম্মপ্রাণতায় যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহা যে চুম্বকের ন্যায়, লৌহময় হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আশীর্ব্বাদ করি, সাহিত্য-সংসারে আপনার যশঃ শোভন-দ্যুতি বিস্তার করুক।"

* * *

প্রজাপতি।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি-এ প্রণীত। ২৩ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে প্রকাশিত। নূতন উপন্যাস। এক এক সময়ে উপন্যাসের সমুদ্রে এক একটা তরঙ্গ আসে। দিন কতক ডিটেক্‌টিভের ঢেউ চলিয়াছিল। এখন অশ্লীলতা অন্তঃসলিলবাহিনী। যে সকল উপন্যাস পুত্র-কন্যার হস্তে অবাধে প্রদান করা যায় না, এখন তাহাদেরই সমাদর

দেখি। উপন্যাসের কাট্‌তি দেখিয়া যদি ঔপন্যাসিকের আসন নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সত্যেন্দ্র বাবুর স্থান অনেক নিম্নে পড়িয়া থাকে। কিন্তু রচনার সরসতা, ভাবের প্রগাঢ়তা, রুচির পরিমার্জ্জনীয়তা প্রভৃতির প্রতি যদি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে সত্যেন্দ্র বাবুর আসন অনেক উচ্চে নির্দ্দেশ করা যায়। সত্যেন্দ্র বাবুর এই 'প্রজাপতি' উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের একটী নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আছে। উপন্যাসখানি পড়িতে চিত্তাকর্ষক, অথচ, সমাজ-বিশেষের চারুচিত্র। সত্যেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বৈষ্ণবী" উপন্যাস লেখেন। তার পর তাঁহার 'ভারতভ্রমণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'প্রজাপতি' তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহাতে হাত যেন আরও খুলিয়াছে; চরিত্র-চিত্র অধিকতর প্রস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার অসিতকুমার শিক্ষিত ধনিসন্তানের উচ্চ আলেখ্য। বাঁধাই ছাপাই প্রভৃতির তুলনায়, মূল্য সুলভ। সত্যেন্দ্র বাবুর "প্রজাপতি" সর্ব্বত্র সমাদৃত হউক। তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হউন।

সাময়িক।

অনাথবন্ধু-সমিতি।

গত ২১ এ ভাদ্র হাওড়া-বাঁটরা অনাথবন্ধু-সমিতির চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য,—গৃহস্থের নিকট হইতে মুষ্টি মুষ্টি চাউল এবং সামর্থ্যবান্ সহৃদয় জনগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, পল্লীর নিরন্ন পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের বেতন ও পরীক্ষার ফিস্ প্রভৃতি সঙ্কুলান। শ্রীযুক্ত বামাচরণ কুণ্ডু মহাশয় এই সমিতির প্রাণ। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ রায়, শ্রীযুক্ত অন্নাদিনাথ মল্লিক প্রভৃতি কর্ম্মিগণ দেহ-স্থানীয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে, সমিতি আপনাদের স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল এবং শ্রীযুক্ত অসিপদ মল্লিক মহাশয়দ্বয় সহকারী সভাপতি আছেন। সমিতির গঠন যেরূপই হউক, কিন্তু উহার কার্য্য আদর্শ-স্থানীয়। যদি বঙ্গের প্রতি পল্লীতে এই অনাথবন্ধু-সমিতির আদর্শ গৃহীত হয়, দেশের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে। এ দুর্দ্দিনে অনাথবন্ধু-সমিতির উপযোগিতার [illegible] হয় কাহাকেও আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

ধর্ম্মতীর্থরক্ষা-সমিতি।

[illegible]মে অধর্ম্ম, আচারের নামে অনাচার—আজকাল প্রায় চারিদিকেই চলিয়াছে। [illegible] এখন যেন কেবল একটা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের [illegible] বিশৃঙ্খলভাব দেখিয়া, কয়েক জন সহৃদয়ের প্রাণ উদ্বেলিত হয়। তাহারই ফলে, কলিকাতার 'ব্রাহ্মণ-সভা' একটী প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটীর মর্ম্ম এই:—

"বৈধ উপায়ে বর্ণাশ্রম-সমাজে অসদাচার নিবারণ ও সদাচার সংস্থাপন জন্য একটী কমিটি গঠিত হউক। ... তাঁহারা সমাজ হইতে ক্রমে গুরুতর অসদাচার-সমূহের নিবারণ-

চেষ্টা করিবেন এবং ক্রমে যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র শাস্ত্রসম্মত আচার প্রবর্ত্তিত হয় এবং ধর্ম্মের নামে সমাজে অধর্ম্মাচরণের প্রশ্রয় না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন; এবং তীর্থ-সমূহে যে সকল অসদাচারের প্রচলন রহিয়াছে, তাহারও নিবারণ-ব্যবস্থা করিবেন।" এ সম্বন্ধে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; এবং "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত-ভাষার মাসিকপত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয় ঐ কমিটির সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে-সি-আই-ই এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভার প্রাণস্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী এম-বি মহাশয় প্রভৃতি 'হিতৈষী সভ্য'-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রাণভূত নবীন উৎসাহ, তর্করত্ন মহাশয়ের প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরক্তি এবং ডাক্তার নন্দী মহাশয়ের প্রাণপাত সহায়তা,—এই তিন শক্তির সমাবেশে, সম্পূর্ণ ভরসা, এ শুভসঙ্কল্প জয়যুক্ত হইবে।

পূজনীয় শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত।

একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

বহুই চিত্তাকর্ষক

সহস্রকণ্ঠে প্রসংশিত

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত
"সুবর্ণ-বলয়ের" ন্যায় শিক্ষাপ্রদ সুখপাঠ্য সামাজিক উপন্যাস
বাঙ্গালায় অতি অল্পই আছে।
সচিত্র, সিল্কের বাঁধাই, মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুলাদি—।৵০ আনা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত

ধর্ম্মের ও কর্ম্মের **সাধনা।** মনের ও প্রাণের

মনকে সাধনার পথে অগ্রসর করিতে, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে, প্রাণে ধর্ম্ম-ভাবের প্রবাহ ছুটাইতে—এমন গ্রন্থ আর নাই।
মূল্য, কাপড়ের বাইণ্ডিং দেড় টাকা, কাগজের মলাট পাঁচ সিকা। মাশুলাদি চারি আনা।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।] [আশ্বিন, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

—‡ • ‡—

দেব্যায়াহি জগন্মাতঃ! মন্ত্রা ইমে ত্বায়বঃ।

স্মৃতিভিস্তনা পূতাসঃ।

* * *

"দেবি জগন্মাতা। এস—মা একবার এস! তোমারই স্মৃতি-সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত নিত্যস্বরূপ মন্ত্র তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে।"

* * *

আবাহন।

বৈদিক-মন্ত্রের অনুধ্যানে মা-তোমায় ডাকিতেছি,—'দেবি জগজ্জননি! এস মা—একবার এস। তোমারই স্মৃতি-সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত নিত্য-স্বরূপ-মন্ত্র তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে।' মা।—আর তুমি না আসিয়া পারিবে কি? মা।—আর কি তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে? দেবি!—শুভমুহূর্ত্তে শুভদ-স্তোত্রে আমরা আবার তোমায় আবাহন করিতেছি,—'দেবি! প্রসন্ন হও।'

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥"

* * *

মা। তুমি না আসিবে কেন?

মা! তুমি না আসিয়া আর কতকাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে? আমাদের এ পাপ-কলুষিত চিত্ত তোমায় পাইবার স্পর্দ্ধা করিতে না পারে,—আমরা এখনও পর্য্যন্ত তোমায় পাইবার অধিকারী হইতে না পারি,—কিন্তু মা! যে মন্ত্রের সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; তোমার স্মৃতিসহযুত যে মন্ত্র নিত্য-পবিত্র, সেই মন্ত্র যখন আমরা প্রাপ্ত হইব, হৃদয় যখন আমাদের সেই মন্ত্রে মন্ত্রময় হইয়া আসিবে; তখন তো তুমি আর বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে না! আশাই মানবের প্রাণ। আশাই মানবের অস্তিত্ব। সেই আশা-রশ্মি অবলম্বন করিয়াই অকূলে কূল পাইবার ভরসা করিতেছি। মা!—তুমি না আসিবে কেন?

* * *

শুভক্ষণে শুভদ-প্রার্থনা।

শুভমুহূর্ত্ত সর্ব্বদা আসে না। শুভসংযোগ সর্ব্বদা ঘটে না। আশ্বিনে, অম্বিকার আগমনে, কি যেন একটা পুলক-সঞ্চারের হিল্লোল বহিয়া যায়। মা-আমাদের সর্ব্বত্র আছেন; মা-আমাদের সদাকাল বিরাজমানা, তবু যেন মনে হয়,—এই শরতে, এই আশ্বিনে, মা-আমাদের আবার নূতন করিয়া আসিতেছেন। তাই আনন্দের বিদ্যুৎপ্রবাহ হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া যায়। অনুভূতি হয়—শুভ মুহূর্ত্ত আবার আসিয়াছে। মনে হয়,—আবার যেন আমরা প্রার্থনা করি,—

'অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥'

প্রার্থনার বিষয়।

করুণাময়ীর করুণার ধারা সহস্রমুখী হইয়া ছুটিয়াছে। তুমি কি চাহিবে? তোমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় কি আছে? ঐ দুই পংক্তি স্তবে তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীই বিদ্যমান আছে। যাহা তোমার আকাঙ্ক্ষা হয়, পার্থিব বা অপার্থিব, সকল সামগ্রীই উহার মধ্যে প্রাপ্ত হইবে,—সকল ভাবই উহার মধ্যে ব্যক্ত আছে। প্রার্থনায় এমন অপূর্ব্ব শব্দ-সমাবেশ যে, কোনও প্রার্থীকেই হতাশ হইতে হইবে না। যাঁহার মনে যেরূপ প্রার্থনার ভাব আছে, উহাতে সমস্তই ব্যক্ত আছে। বুঝিতে চাও—কি প্রকার? বুঝিয়া দেখ—অধিকার-ভেদে প্রার্থনায় কি ভাব প্রস্ফুট হয়!

অধিকারি-ভেদে প্রার্থনার মর্ম্ম।

এক ভাব দেখ,—প্রার্থী রূপের কামনা করিতেছে, জয়ের (অর্থাদিলাভের) কামনা করিতেছে, শত্রু সংহারের কামনা করিতেছে। সাধারণ স্তরের অধিকারীর প্রার্থনা,—এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনার উন্নত স্তরে যাঁহারা আরূঢ় হইয়াছেন, ঐ একই শব্দে তাঁহাদের প্রার্থনায় ভিন্ন ভাব ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহারা যে রূপ চাহিতেছেন, সে রূপের অর্থ—"রূপং রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্তু।" অর্থাৎ, সাধক বলিতেছেন,—'মা জগজ্জননি! প্রসন্ন হও, যেন তোমার ক্রোড়ে স্থান পাই, যেন তোমায় আমি প্রাপ্ত হই।' তার পর তিনি চাহিতেছেন—'জয়'। 'জয়' কাহাকে কহে? "জয়ং—জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ঃ।" বুঝিয়া দেখুন—সাধকের কি প্রার্থনা। তিনি স্বারূপ্য কামনা করিতেছেন। তার পর—'যশঃ'। 'যশঃ' কাহাকে কহে? "সহ নো যশঃ' ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদনজন্যং যশস্তদ্দেহি।" সাধক অন্য যশের ভিখারী নহেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদন জন্য যে যশঃ, তিনি সেই যশের প্রার্থী। উপসংহারে—'দ্বিষো জহি।' আমরা যে ভাইয়ে-ভাইয়ে পরস্পর শত্রুতা করিয়া এক-ভাই অন্য-ভাইয়ের নাশের জন্য মার নিকট প্রার্থনা করি,—'মা, আমার শত্রুনাশ কর', এ প্রার্থনার লক্ষ্য তাহা নহে। পরস্পর শত্রুতা-সূত্রে আবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাই-ই যদি 'দ্বিষো জহি' প্রার্থনা করি, মা তখন কার প্রার্থনা শুনিবেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, ঐ প্রার্থনার লক্ষ্য—সে শত্রু নহে। ঐ প্রার্থনার লক্ষ্য,—সকলে সমভাবে যে-শত্রুর বিনাশ-কামনা করিতে পারি। প্রার্থনার সার্থকতা সেইখানেই। প্রার্থনার সেই

সন্তান তখন মাতৃচরণে প্রণতি জানাইয়া কহিবে,—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

পরিণতি। শত্রু-দমনের আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া, অপরকে নাশ করিবার প্রার্থনা জানাইতে গিয়া, শেষে এমন-ই হইয়া পড়িবে যে, জগতের সকলের জন্য প্রাণ কাঁদিবে,—নিজের মঙ্গলের সঙ্গে সকলের মঙ্গল বিজড়িত হইয়া পড়িবে। মা যে এই সংসার-রূপে চরাচর ব্যাপিয়া আছেন,—তাহা বুঝিতে পারিয়া, তখন সর্ব্ব-জীবে আত্মানুভূতি আসিবে। মাতৃপূজার আয়োজনে, মাতৃমূর্ত্তির অনুধ্যানে, মাতৃমন্ত্রের উচ্চারণে, শুভফল এইরূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলি,—[illegible] পাইয়াছ, একবার ডাক মাকে। ডাক,—"দেব্যায়াহি জগন্মাতঃ! পূজাং গৃহান্ মৎকৃতাং।"

আবাহন-গীতি।

[রায় সাহেব কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বিরচিত।]

অয়ি শুচিস্মিতে, মাতৃরূপে
সেজেছ কি বিভূতি-ভূষণে।
এ'ত স্বপনের কথা নয়,
এ যে দেখি সত্য-জাগরণে॥
তুমি নয়ন-নন্দিনী,
তুমি কোবিদ-বন্দিনী
তুমি কলা-কপালিনী,
তুমি সিদ্ধ কলস্বনে।
তব মুখ-শতদল
শত সৌর-করোজ্জ্বল,
কত কান্তি নিরমল
ঢাল কনক-কিরণে।
সাধে কি গো গুণ গাই,
হেন কোন্ ভাব নাই
তোমাতে মা নাহি পাই,
গর্ব্ব জাগে না স্মরণে।
কোথাকার কোন্ ভাষে
এত মধুরিমা হাসে,
কবি-ভৃঙ্গ মধুবাসে
নিত্য মত্ত গুঞ্জরণে—
আমাদের কথা নয়,
রাষ্ট্র যে জগৎময়
বিদেশী গুণজ্ঞ কয়,—
তুমি অতুল ভুবনে।
ভাষা মানে পরাভব
বর্ণিতে বিভব তব,—
সঞ্চিত যা নিত্য নব
ক্রম-সৃষ্টি পুষ্টি সনে।
তুলিয়ে গৌরব রব
কোটি কণ্ঠে এক হ'ব,
তোমার মহিমা কব
বড় সাধ ছিল মনে।
পূর্ণ সাধ বর্ষে বর্ষে
বাণীপুত্র পুণ্য-স্পর্শে
তোমার মঙ্গলে বর্ষে
হর্ষ-ধারা "সম্মিলনে"।
এ বিপুল বিশ্বমাঝে
স্নিগ্ধ মোহন দৃশ্য-সাজে
তোমার শ্রীরাগ রাজে
দেখে যাক্ বিশ্বজনে॥

সার্থকতা যেই বুঝিতে পারিব, অমনি আমাদের সকল দ্বন্দ্বের কারণ একেবারে বিলুপ্ত হইবে। সাধক যে ভাবে বিভোর হইয়া 'দ্বিষো জহি' প্রার্থনা উচ্চারণ করেন; আমরা যখন তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব;—আমরাও তখন বুঝিতে পারিব,—"দ্বিষো জহি কাম-ক্রোধাদীন্ শত্রূণ জহি নাশয়।" আমাদের প্রার্থনা তখন উল্টাইয়া দাঁড়াইবে; তখন আর আমরা ভাই হইয়া ভাইকে সংহার করিতে না যাইয়া মা জগদম্বাকে জানাইব,—'মাগো! কামক্রোধহিংসা-বশে আমরা আর পরস্পর যেন ভাই-ভাই শত্রুভাবে না থাকি।'—

মন্ত্রফল।

প্রার্থনার অর্থ দুই দিকে এই দুই ভাবে প্রকাশমান্। যে জন যে পথের পথিক, তাহার গতি-মতি সেই দিকেই প্রধাবিত হইবে। তবে যে বলিয়াছি,—মন্ত্রের সহিত জগন্মাতার সম্বন্ধ আছে; তাহার কারণ,—মন্ত্রোচ্চারণের একটা শুভফল কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। সে শুভফলে—পার্থিব বস্তুর কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ অপার্থিব বস্তুর প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'মা আমায় রূপ দেও, জয় দেও, যশঃ দেও, আমার শত্রুনাশ কর'—প্রভৃতি বলিতে বলিতে, শেষে বলিতেই হইবে,—'মা, আমায় স্বরূপজ্ঞান দেও, আমায় পরমাত্মবস্তু দেও, আমি যেন কাম-ক্রোধাদি জয় করিয়া জয়-রূপ তোমার সারূপ্য প্রাপ্ত হই, আর তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদন-জনিত যশই যেন আমার একমাত্র কাম্য হয়।' ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত স্তোত্রোচ্চারণের ইহাই শুভফল।

সেই প্রার্থনাই কর।

শুভদিন শুভক্ষণ যেন অবহেলায় না কাটে। জগজ্জননী আসিতেছেন; শরণাপন্ন হও। ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখং।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।" ভাল, সেই প্রার্থনাই কর,—"তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্।"

স্বরূপ-জ্ঞান।

প্রার্থনা করিতে করিতে, প্রার্থনার ফলে পুলক-রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হইতে হইতে, প্রার্থনার ফলে নয়নে গলদশ্রুধারা বহিতে বহিতে, মা আপনিই আসিয়া সম্মুখে আবির্ভূতা হইবেন; আপনিই আসিয়া সন্তানের নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া, স্বরূপে প্রকাশ পাইবেন। সন্তান তখনই বুঝিতে পারিবে,—মা কি?—মা কিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন? সন্তান তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে,—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।"

'দেবি! তুমিই জগতের একমাত্র আধারস্থানীয়া, তুমিই মহীস্বরূপে অবস্থিত, আবার তুমিই অপ্-রূপে সমগ্র বিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছ। তোমার শক্তি অলঙ্ঘনীয়।'

'বেদ' ও তাহার অপব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

অপব্যাখ্যার জন্য, জন-সাধারণের মনে 'বেদ'-বিষয়ে কি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে, পূর্ব্বের দুইটী প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। শত শত ঋকের অর্থ ঐরূপ কলুষিত হইয়া আছে। আজ আর একটী ঋকের ব্যাখ্যার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ব্যাখ্যার দোষে কি সামগ্রী কি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহা বোধগম্য হইবে।

ঋক্ ও তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা।

প্রথমে লক্ষ্য করুন,—ঋকটী কি? তারপর দেখুন—সায়ণভাষ্য। তার পর বুঝুন—লোকের কুব্যাখ্যা। পরিশেষে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন—ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম কি হইতে হইতে পারে? প্রথমে ঋক্‌টি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; যথা ঃ—

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্‌ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্বং।

তদিন্দ্রোঽর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥

সায়ণ-ভাষ্য।

ঋক্‌টীর সায়ণ-ভাষ্য যাহা অধুনা প্রাপ্ত হই, তাহা এইরূপ ;—"যদ্‌যদা সানোঃ সানুমারুহৎ। যজমানঃ সোমবল্লীসমিদাদ্যাহরণায়ৈকস্মাৎ পর্ব্বতভাগাদপরং পর্ব্বতভাগমারূঢ়বান্। তথা ভূরি প্রভূতং কর্ত্বং কর্ম্ম সোমযাগরূপমস্পষ্ট। স্পৃষ্টবানুপক্রান্তবানিত্যর্থঃ। তত্তদানীমিন্দ্রোঽর্থং যজমানস্য প্রয়োজনং চেততি। জানাতি। জ্ঞাত্বা চ বৃষ্টিঃ কামনাং বর্ষিতা সন্ যূথেন মরুদ্‌গণেন সহৈজতি। কম্পতে। স্বস্থানাৎ যজ্ঞভূমিমাগন্তুমুদ্‌যুক্ত ইত্যর্থঃ।"

অধুনা-প্রচলিত অর্থ।

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে, অধিকন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার উপর সম্পূর্ণরূপ রঙ্ ফলাইয়া, অধুনা ঋক্‌টির যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমরা প্রথমে তাহার আভাস দিতেছি। তার পর, কি সূত্রে কোন্ অর্থ আসিয়াছে, একটু পরিচয় দিয়া, আমরা যে অর্থ সঙ্গত মনে করি, নির্দ্দেশ করিব।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হয়,—'যে সময়ে যজমানেরা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সোমলতা ও সমিধ্ প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের শিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ (পরিভ্রমণ) করেন, তখন তাঁহারা যে সোমযাগরূপ কর্ম্ম করিবার জন্য

উদ্যোগী হইয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া, অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্রদেব, মরুদাদি সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ, তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন।' ফলতঃ, ইন্দ্রদেব সোমরস মাদক-দ্রব্যের এতই ভক্ত যে, সোমলতা-প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্যোগ দেখিয়াই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ হন ;—দলবল-সহ মদ্যপান করিতে আসেন।

ঋক্‌টির এই যে অর্থ অধুনা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ—ঋক্‌ের দুই তিনটি শব্দের উপর ব্যাখ্যাকারিগণের সংস্কারানুরূপ দৃষ্টির প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথম—'সানোঃ সানুং'; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ 'সানোঃ সানুং' দেখিয়া, তাঁহারা স্থির করিলেন,—'এই দুই শব্দে সোমলতা অন্বেষণার্থ পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ (আরোহণ) অর্থই আসিতেছে।' তার পর, 'কর্ত্বং' শব্দে যখন 'কর্ম্ম' বুঝায়, তখন উহা সোমরস-মাদক-দ্রব্য-প্রস্তুত-রূপ কর্ম্ম নিশ্চয়ই। এই হইতেই স্থির হইল,—'যজমানগণ যখন সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সোমলতা সংগ্রহ করিবার জন্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করেন,' ইত্যাদি।

আমাদের ব্যাখ্যা।

এখন, আমরা ঐ ঋকের কিরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে করি, আমাদের কৃত 'অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যা,' 'বঙ্গানুবাদ' এবং 'ঋকের মুখ্য লক্ষ্য' প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া তাহা উপলব্ধি করুন।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদবস্থায়াং সাধক ইতি শেষঃ) 'সানোঃ সানুং' (উচ্চাবচং, স্তরাৎ স্তরং) 'আরুহৎ' (আরূঢ়বান্, আরোহণং করোতি, ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতীতি ভাবঃ), তদেব 'ভূরি' (প্রভূতং) 'কর্ত্বং' (কর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং) 'অস্পষ্ট' (স্পৃষ্টবান্ কর্ত্তুমারভতে); 'তৎ' (তদা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অর্থং' (ভক্ত-প্রয়োজনং, সাধকস্য অভিপ্রেতং) 'চেততি' (জানাতি), অপিচ 'বৃষ্ণিঃ' (অভিলাষপূরকঃ) 'যূথেন' (স্বদলেন, যথাপ্রয়োজনেন ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'এজতি' (আগচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি, অভীষ্টসিদ্ধিং করোতীতি ভাবঃ); যদৈব সাধকঃ ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতি, তদা সৎকর্ম্মনিবহা অনুগচ্ছন্তি; ভগবানপি তৎপ্রয়োজনং জ্ঞাত্বা তস্যাভীষ্টং পূরয়তীতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যেমন ক্রমশঃ সাধন-মার্গে অগ্রসর হন (শনৈঃ শনৈঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন); তাঁহার (ইষ্টাপূর্ত্ত) কর্ম্মনিবহও সেইরূপ প্রভূতভাবে আরব্ধ হয় (ভগবানকে স্পর্শ করে—প্রাপ্ত হয়)। ভগবান তখন, সাধকের অভিপ্রায় (প্রয়োজন) বুঝিতে পারেন; এবং বুঝিতে পারিয়া, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ তিনি, সাধকের প্রয়োজনানুরূপ ঐশ্বর্য্যাদিসহ সাধকের সমীপে উপস্থিত হন।

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

কি লক্ষ্য লইয়া ঋক্‌টি প্রকটিত আছে—তাহা বুঝিবার জন্য, প্রথমে স্মরণ করুন,—একটা সংস্কারকে বা কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঋক্‌টির সহিত কত অবান্তর বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে! তার পর অনুধ্যান করিয়া দেখিবেন,—আমাদের ঐ ব্যাখ্যায়

ক সার্থকতা আছে! তবে ইহাও মনে রাখিবেন যে, সায়ণের ভাষ্যের অন্য এক তাৎপর্য্যও থাকিতে পারে। যাগাদিকর্ম্মবিহীন ঘোর কলিকালে, সাধারণ যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্তি উন্মেষের জন্যও, তিনি ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। পরন্তু যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্তি-উন্মেষের জন্য যখন কোনরূপ যজ্ঞকর্ম্মের সঙ্গে ইহার সংশ্রব রক্ষা করা হইয়াছিল, তখন যে একেবারেই তাহার সার্থকতা ছিল না, তাহা নহে। কেন-না, যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, যাজ্ঞিক আপনিই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। অপিচ, সায়ণ সোমকে মাদক-দ্রব্য বলেন নাই; সোমবল্লী ও সমিধ—যজ্ঞের উপকরণ মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অনধিকারিজন বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া একে আর করিয়া তুলিয়াছেন,—বিদ্রূপের ছলে উহার মধ্যে অন্য ভাবের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন।

ঋকের মুখ্য লক্ষ্য।

এইবার একবার ঋকের মুখ্য লক্ষ্য ও আমাদের ব্যাখ্যার উপযোগিতার বিষয় অনুধ্যান করুন; বিচার করিয়া দেখুন,—আমাদের অর্থের সঙ্গতি হয় কি না?

যখন ঊর্দ্ধে উচ্চস্তরে আরোহণের ভাবমূলক 'আরুহৎ' ক্রিয়াপদ রহিয়াছে, তখন 'সানোঃ সানুং' পদদ্বয়ে শিখরের উপর শিখরে চূড়ার উপর চূড়ায় পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে আরোহণের—ভগবৎ-সন্নিধানে অগ্রসর হওয়ার (উদ্গমনের) ভাবই উপলব্ধ হয়। যদি পর্ব্বতে পর্ব্বতে সোমলতা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে 'আরুহৎ' ক্রিয়াপদ না থাকিয়া নিম্নোচ্চ-শৃঙ্গে গতাগতিমূলক কোনরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সঙ্গত হইত। অপিচ, সোমলতা-সংগ্রহের জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট-স্থানে যজ্ঞক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনরায় নিম্নদেশে অবতরণও আবশ্যক হইয়া পড়িত। কিন্তু এখানে সে ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। সুতরাং সাধকের ঊর্দ্ধে আরোহণ—ভগবৎসন্নিধানে উদ্গমন—এইরূপ অর্থই সমীচীন ও সুসঙ্গত। বিশেষতঃ, যখন সোমলতার বা সোমযাগের উল্লেখ পর্য্যন্ত এখানে নাই, তখন কেন সে অর্থ টানিয়া আনিতে যাই? 'কর্ত্বং' (কর্ম্ম) বলিতেই বা সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম কোথায় পাই? যে কর্ম্ম সৎসংশ্রবযুক্ত, যে কর্ম্ম জনহিত-সাধক, আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি, সেই কর্ম্মই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মই ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করে, সেই কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। সুতরাং সোমরস-প্রস্তুতরূপ কর্ম্ম অর্থ টানিয়া না আনিয়া, সাধারণভাবে জনহিতসাধক ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মাদিই 'কর্ত্বং' শব্দে বুঝাইতেছে, ইহাই আমরা মনে করি। যথানুষ্ঠিত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। অথবা, সাধক যতই ভগবানের সমীপস্থ হইবেন, ইষ্টাপূর্ত্তাদি-সৎকর্ম্মে ততই তাঁহার প্রবৃত্তি আসিবে। সেই জন্যই ঋকে 'অস্পষ্ট' ক্রিয়াপদ দেখিতে পাই। 'যূথেন' শব্দেই বা মরুদ্গণকে বুঝাইতেছে কেন মনে করিব? এক বলিতে পারি, সর্ব্বদেবকে বুঝাইতেছে; আর বলিতে পারি, ভগবান-নামের সার্থকতা সূচক তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যকে বুঝাইতেছে। 'ভগ' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'বৎ' প্রত্যয়ে 'ভগবৎ' পদ সিদ্ধ। কিন্তু 'ভগ' কাহাকে কহে? 'ভগ' শব্দের তাৎপর্য্যে আমরা কি বুঝি?

'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥'

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী (সৌভাগ্য), জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই যে ষড়বিধা বিভূতির বিদ্যমানতা [illegible] তাঁহার নাম ভগবান; তাঁহার 'যূথ' বা শ্রেণী বলিতে ঐ সকলকেই বুঝায় না [illegible]? "আমি" বলিতে, আমরা কি বুঝি? বুঝি না কি—আমার এই অস্থিমাংসমেদমজ্জ-[illegible] দেহই ভ্রূরাদি সমস্ত লইয়াই 'আমি'। সেইরূপ ঐ ষড়ৈশ্বর্য্য-সমষ্টিই ভগবত্ত্ব।

[illegible] স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের বিভিন্নরূপ প্রার্থনা থাকে। তদনুসারে, 'বৃষ্ণিঃ' [illegible]পূরক তিনি, সকলের সকল প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় লইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার [illegible]ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সকল প্রার্থনার সকল সামগ্রীই বর্ত্তমান। ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

তিনি মহান্, আমি ক্ষুদ্র; তিনি অনন্ত জলধি, আমি বারিবিন্দু। আমি কি কখনও তাঁহার সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে পারি? তাঁহার অনুসরণ পণ্ডশ্রম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার আশা—দুরাশা মাত্র। এই মনে করিয়া, অনেক সময় মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এ ঋক্ মানুষের সেই হতাশে আশার সঞ্চার করিতেছে, বলিতেছে,—'কেন হতাশ হও? একটু একটু অগ্রসর হইতে আরম্ভ কর দেখি! তাঁহার করুণার ধারা সম্মুখেই স্বতঃ-প্রবাহিত দেখিতে পাইবে। সাধনমার্গে ক্রমশঃ যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, ততই তোমার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়িবে, ততই তিনি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, ততই তোমার সিদ্ধিলাভের উপযোগী ঐশ্বর্য্যাদি লইয়া তিনি তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সাধকের অভীষ্ট পূরণ জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত রহিয়াছেন। শঙ্কা করিও না, সন্দেহ করিও না, মনে সংশয় আনিও না। সাধনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে।'

বেদের ব্যাখ্যা—অধিকারী অনুরূপ।

বিহঙ্গম বৃক্ষশাখায় বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। সে স্বর শ্রবণে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বৈষ্ণব শুনিতেছেন—পাখী গাহিতেছে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।' শৈব শুনিতেছেন—পাখী 'শিব শিব' বলিতেছে। শাক্ত পাখীর স্বরে 'কালী তারা দুর্গা" নাম শুনিতেছেন। মৌলবীর কর্ণে "আল্লা আল্লা" ধ্বনি, নানকপন্থীর কর্ণে 'গুরু" নাম—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ পাখীর গানে বিভিন্ন স্বর শুনিতেছেন। আবার ধর্ম্মের ধার যাঁহারা ধারেন না, অথবা যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহাদের কর্ণে ঐ স্বরই আবার আর এক ভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

শব্দ-ব্রহ্ম-ময় বেদ-বাক্যের ভাবগ্রহণ-সম্বন্ধেও সংসারে সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথ দিয়া সেই ভাবেই বেদরূপ মহাসমুদ্রের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যা নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া, পরম-পবিত্র সামগ্রীতে কলুষ-কল্পনার আরোপ করিয়া, বৃথা তাহাকে কলুষিত করিবার চেষ্টা পাইবেন না। বেদের বেদত্ব তাহাতে লোপ পাইবে না বটে; কিন্তু অজ্ঞানীর অজ্ঞান-অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া তুলিবে—ইহাই আশঙ্কা।

—*—

বৈজ্ঞানিকের প্রাণ।

[প্রফেসার শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয়ের লিখিত।]

দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও কল্পনা।

পদার্থবিজ্ঞানের জন্মদাতা নিউটনের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

"Nature and Nature's laws lay hid in night,
God said, "Let Newton be!" and all was light."

নিউটনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কোনও আবরণ থাকিতে পারিত না। কি সর্ব্বদেশভেদী মনীষার দীপ্তি লইয়াই তিনি বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন! তিনি চক্ষু মেলিয়াই দেখিলেন—উত্তাপ ও আলোক, বর্ণ, শব্দ, চুম্বক ও তাড়িতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, তুষার, শিশির, অণু, পরমাণু, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা—স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হইয়া গিয়াছে। মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠিতেছে, স্বর্গ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছে। কোথাও ত তাহাদের জীবনের পার্থক্য নাই! যে গুণে বৃক্ষের শাখাচ্যুত হইয়া আপেল ফল ভূমিতে পড়ে, সেই গুণেই চন্দ্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি পরস্পরের দিকে ছুটিতে গিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছে। এই মাধ্যাকর্ষণ-বলেই বায়ু বহে, তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলা হয়, বৃক্ষের পত্রাবলী নাচিয়া থাকে। এই একই সূত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দুই দিকে আরও কিছু থাকে, তবে তাহাদেরও বুঝি বাঁধিয়া ফেলিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সর্ব্বভেদী, কল্পনা সর্ব্বগামী। জগতের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অকপটে তাহার জীবন-কথা বলিয়া যায়। রসায়নের ঘটনার সাহায্যে ডাল্টন পদার্থের গঠনের স্থির করিতে গিয়া পরমাণুবাদ সৃষ্টি করিলেন; তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িদনুবাদ গড়িয়া তুলিলেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক কোলরস (Kohlrausch) ফ্যারাডে সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"তিনি সত্যের আঘ্রাণ পাইতেন।" সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ফ্যারাডে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। প্রত্যেক তথ্যই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। সে সকলের শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। নিউটন ও পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন, জড় পদার্থের ধর্ম্মই স্থিতি-প্রবণতা বা জড়ত্ব (Inertia)। কিন্তু ফ্যারাডেই প্রথম দেখাইলেন, তাড়িত জড় না হইলেও, তাহার জড়ত্ব আছে। যেদিন এই তথ্য উদ্ভাবিত হইল, সে দিন বিজ্ঞানের এক মাহেন্দ্রক্ষণ।

এই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও কল্পনার বলেই বিজ্ঞান জড় হইতে চৈতন্যের দিকে চলিয়াছে। সত্য-দ্রষ্টা মনীষি ফ্যারাডেই এই মন্ত্রের প্রথম প্রচারক। তিনিই প্রথমে জড়পদার্থের পরমাণুর

(atom) পরিবর্ত্তে শক্তিকেন্দ্রের (Centre of force) কথা বলিয়াছেন। আর, তাঁহার সর্ব্বভেদী শক্তিরেখাগুলি (Lines of force) তাঁহার সমস্ত বিচারের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার তীব্র কল্পনা এই শক্তিরেখাগুলির আকুঞ্চন, কম্পন ও পরস্পরের মধ্যে অপসরণ-বৃত্তির সাহায্যে সমগ্র ঘটনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের কল্পনার লীলা দেখিতে হইলে একবার এই বিশাল জগতের দিকে দেখিতে হইবে। আমাদের সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর বার লক্ষ গুণ। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। যে কয়টি তাহার দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারা হইতে আলোক আসিতে সওয়া তিন বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। মনে কর, তারকাদির পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কত! আর, একবার জগতের নীহারিকা-বাদের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। হর্সেল—পিতাপুত্র যেদিন নীহারিকাগুলিকে তারকাপুঞ্জ বলিয়া স্থির করিলেন, সে দিনের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। নীহারিকাগুলি অনেক দূরে আছে বলিয়া কুজ্ঝটিকার মত দেখায়; তাহারা এক একটি জগৎ। আমরা একটি সৌরজগতের বিশালতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই আপনাদের শক্তিহীনতায় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ি; কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই অনন্ত সৃষ্টিকে দর্পণে প্রতিবিম্ব-দর্শনের মত সজীব সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার কল্পনা এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার পক্ষপুটের ভিতর অনায়াসে টানিয়া লইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক শুধু দৃষ্ট ও শ্রুত জগতের মধ্যেই আপনার শক্তিকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া দেউলিয়া হইয়া পড়েন না। দৃষ্টির আলোক যেখানে হারি মানে, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিয়া থাকেন; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মনের ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। নিউটন যেদিন সূর্য্যালোককে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে সাতটি প্রধান রঙ্গের কাহিনী বাহির করিলেন, তখন এই সাতটি রং তাঁহার চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—"তবে কি এই সসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?" ইহার উত্তরও মিলিয়াছে। এই বিষয়ে মহামতি জগদীশচন্দ্র, জার্ম্মানীর অধ্যাপক হার্টজ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন,—রক্ত, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি সাতটি রঙ্গের রাজ্যের দুই দিকে অসীম অদৃশ্য আলোক-রাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, আকাশে ছোট বড় নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, নিরন্তর এই তরঙ্গগুলি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষীণ ইন্দ্রিয় তাহাদের সকলগুলিকে ধরিতে পারিতেছে না। আকাশের প্রত্যেক অণু কাঁপিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন, সমভাবাপন্ন, সমাবয়ব, অতীন্দ্রিয় এই আকাশ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। অবিরত এই

আকাশের অণুগুলির কম্পনে আকাশের মধ্য দিয়া তরঙ্গ চলিয়াছে; সেই তরঙ্গ নিরন্তর আমাদের আঘাত করিতেছে। যখন এই কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে প্রায় চারি কোটি কোটি বার পৌঁছায়, তখন আমরা লাল রং দেখিতে পাই। সংখ্যা আরও বাড়াইলে ক্রমান্বয়ে পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি রং দেখা দেয়। যখন কম্পন-সংখ্যা আরও বাড়িয়া সেকেণ্ডে প্রায় আট কোটি কোটি বার হইয়া দাঁড়ায়, তখন বেগুনে রং দেখা দেয়। কম্পন-সংখ্যা আরো বাড়াইলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি পরাস্ত হইয়া পড়ে; আর আমরা দেখিতে পাই না। এই অনন্ত আকাশ-তরঙ্গের অতি অল্পই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"আকাশ-সঙ্গীতের অসংখ্য সুর-সপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তক মাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য রাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতিঃরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।"

জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ বাহির করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পনা আপনার শক্তিতে আপনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ফ্যারাডে প্রথমে দেখাইলেন,—তাড়িত-স্রোতের জড়ত্ব আছে। যখন তাড়িদণু বা ইলেক্ট্রন উদ্ভাবিত হইল, তখন এই তাড়িতের জড়ত্ব বিষয়ে এক নূতন পথ খুলিয়া গেল। একটী হাইড্রোজেনের পরমাণুর গুরুত্ব বা জড়ত্ব মাপিবার যন্ত্র আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই; এই পরমাণুই অণোরণীয়ান্ বলিয়া বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ও উদার কল্পনা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাইয়াছে, প্রায় আঠার শত পঞ্চাশটি তাড়িদণু একত্র করিলে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর মত হয়। সুতরাং তাড়িদণুকে তাড়িত-বিন্দু বলিলেও চলে। সাধারণতঃ তাড়িদণুর জড়ত্ব নাই; কিন্তু যখন এই বিন্দুটি ছুটিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার জড়ত্ব দেখা দেয়; আর যতই তাহার বেগ বাড়িয়া যায়, ততই তাহার জড়ত্বও বাড়িতে থাকে। তবে কি পদার্থের জড়ত্ব জড়ের স্বধর্ম্ম নহে,—তাড়িতের বেগের ধর্ম্ম? তাহা হইলে জড় বলিয়া কিছু রহিল না; রহিল শুধু—তাড়িত ও তাহার বেগ। কিন্তু আমাদের সাধারণ জড়-পদার্থের জড়ত্ব তো সকল সময়েই সমান আছে। যদি বেগযুক্ত তাড়িতই জড়ত্বের কারণ হয়, তবে ইহার উত্তর কি হইবে? বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন,—আমরা যাহাদের জড় বলি, তাহারা অন্য কিছুই নহে,—কতকগুলি তাড়িদণুর সমষ্টি। পদার্থ যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, তাহার মধ্যের তাড়িদণুগুলি তাহার ভিতর ছুটাছুটি করিতে পারে; এবং এই ভ্রমণের বেগ এত বেশী যে, আমরা তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। সুতরাং পদার্থের জড়ত্ব এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না। জগতের এই তাড়িদণুর লীলার মধ্যেই এত বিচিত্র পদার্থের বিবিধ রূপের সৃষ্টি হইতেছে। তাহার পর 'কুরী' দম্পতীর 'রেডিয়াম' আবিষ্কারের পর জড় হইতে শক্তির দিকে বিজ্ঞানকে আরো একটু

অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই রহস্যময় ধাতু হইতে তাড়িদণুর সহিত রন্‌জেন-রশ্মি ও অসংখ্য অদৃশ্য আলোক-রশ্মি চতুর্দ্দিকে নির্গত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও কঠিন পদার্থসমূহ এই ধাতুর ক্রমিক অবনতিতে নিরন্তর সৃষ্ট হইতেছে। একই প্রকারের রেডিয়াম পরমাণু ভাঙ্গিয়া অবিরত তজ্জাত তাড়িদণুর সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু সৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং জড় জগতের মূলে শক্তি বিদ্যমান। শক্তিই অবস্থাবিশেষে জড়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জড় বস্তু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। কি সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও সর্ব্বভেদী কল্পনা লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন! যখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অধিকক্ষণ কর্ম্মের পর আর তাঁহার কল সাড়া দিল না। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে যেমন তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে তিনি সেই চিহ্ন দেখিলেন। অল্প-বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইলে কল আবার সাড়া দিতে লাগিল। দার্শনিক জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা তখনই জড়ের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাইল। অমনি তাঁহার বাঁধনহারা কল্পনা জড়ের মধ্যে প্রাণের সন্ধানে বাহির হইল। তিনি বলিলেন,—

"গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। সেজন্য জানিতে চাই, তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল, ঘটনার ছাপ —তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত,—কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রীড়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?"

তাঁহার সাধনা, তাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টি জয়যুক্ত হইয়াছে। রূপের আড়ালে যে অরূপের লীলা চলিতেছে, তাহার উৎসব-প্রাঙ্গণে তাঁহার নিমন্ত্রণ মিলিয়াছে।

একের দিকে গতি।

এইরূপে বৈজ্ঞানিকের সমস্ত সাধনা ও আকুল অনুসন্ধান—জড়ের মধ্য হইতে শক্তির দিকে, প্রকাশ হইতে অপ্রকাশের দিকে, বিচিত্রতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে এক ও শাশ্বতের দিকে, অসীম আবেগে ধাবিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যতই পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের গভীরতার দিকে চলিয়াছেন, ততই তিনি অনন্ত সৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছেন; আর, এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই যে সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার সহিত তাঁহার মিলন ঘটিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কবি পথের কথা ভাবেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কবি আপনার আবেগের মধ্য হইতে প্রমাণ বাহির করিতে না পারিয়া, উপমার ভাষা ব্যবহার করেন। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিককে কঠোর নিশ্চিতের পথ দিয়া সেই অনন্ত রহস্যের দিকে ধাবিত হইতে হইতেছে। তিনি এমন রহস্যময় রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপনীত হইতেছেন, যেখানে অদৃশ্য

আলোকরাশির সম্মুখে স্থূল পদার্থের কঠিন বাধা স্বচ্ছ হইয়া পড়িতেছে, জড় ও শক্তি একাকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপে চক্ষুর আবরণ হঠাৎ অপসারিত হওয়ায় যখন এক অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয় রাজ্যের ছবি বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়া বলেন,—'যেন নহে,—এই সেই।' একের দর্শন পাইয়া তাঁহার অস্তিত্ব মধুময় হইয়া উঠে; তিনি করজোড়ে স্তব করেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

অসমীয়া প্রাচীন-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়।

[শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের বিরচিত।]

সাহিত্য-গুরু হিসাবেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের কথা বলিলে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্পূর্ণ সমাদর করা হয় না। বস্তুতঃ, শঙ্করদেব প্রধানতঃ ধর্ম্মগুরু ছিলেন, এবং ধর্ম্মপ্রচারের সৌকার্য্যার্থেই এই উপাদেয় গ্রন্থ-নিচয় অসমীয়া ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি একাধারে সুগভীর পণ্ডিত, সুরসিক সাহিত্যিক, বিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারক, এবং তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। বলিতে গেলে, অসমীয়া জাতির সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠানের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। মহাপুরুষ শঙ্করদেব এবং তাঁহার কীর্ত্তি-সমূহ বাদ দেওয়া গেলে, অসমীয়ার গৌরবের সামগ্রী আর কিছুই থাকে না। জাতীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধন, জাতীয় প্রতিভার মূলতত্ত্বসমূহের সুললিত ভাষায় প্রকাশ এবং সমগ্র জাতিকে চিরকাল পর্য্যন্ত সুরস আনন্দ প্রদান, এই গুলিই যদি মহাকবিদিগের কাব্যের মহিমা হয়, তাহা হইলে, তিনি যে সমস্ত পৃথিবীর কবিদিগের মধ্যে এক অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য, ইহা বলিলে একটুকুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইবে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে, মহাপুরুষ শঙ্করদেবের প্রিয় শিষ্য এবং প্রায় তাঁহারই সমকক্ষ ছিলেন—মহাপুরুষ মাধবদেব। মাধবদেব, শঙ্করদেবের মত উচ্চ ও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও, নিজের পাণ্ডিত্য এবং চরিত্র গুণে তাৎকালিক সমাজে শঙ্করদেবের পরেই আপনি আসন নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত নামঘোষা, ভক্তিরত্নাবলী, কতিপয় নাটক এবং অনেক গীত ও ভটিমা প্রচলিত আছে। ধর্ম্মগ্রন্থ-স্বরূপে নামঘোষাও কীর্ত্তনের মত সমাদৃত। শঙ্করদেবের মত তঁহারও ভাষা ললিত, ছন্দ মধুর এবং শব্দবিন্যাস বড়ই বিচিত্র। এই স্থানে তাঁহার ভাবপূর্ণ সরস ঘোষা-সমূহের আলোচনার স্থান হইবে না। আমরা নিম্নে একটি মাত্র ঘোষা উদ্ধৃত করিলাম;—

"হরিভক্তি সরোবরে, সন্তোষ অমৃত জলে,
কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রকাশয়।
রামনাম রাজহংস, ছানিয়া আবার করে,
শুনি অতি কৌতুক মিলয়॥"

তাঁহার গীত-সমূহও অতি প্রসিদ্ধ, এবং অদ্যাপি সর্ব্বত্র গীত হয়। গীত-রচনায় মাধবদেব শঙ্করদেব অপেক্ষাও সিদ্ধহস্ত। ইঁহার অনেকগুলি গীত আছে, যাহাতে তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় কথাগুলি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল গীত "দেহ-বিচার" গীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শঙ্করদেবের ও মাধবদেবের মিলিত প্রতিভা একদিকে আসামের ধর্ম্মাকাশ হইতে যেরূপে অনাচার-মেঘসমূহ দূর করিয়া দিয়াছিলেন; অন্যদিকে সেইরূপ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিবিধ সুমধুর ফল-পুষ্প উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিমল প্রতিভার জ্যোতিতে এক দিকে যে রকম বৈষ্ণবধর্ম্ম সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল, অন্যদিকে সেইরূপ সাহিত্য-বিষয়েও নব নব প্রতিভার উন্মেষ হইতে লাগিল। শঙ্করদেব সাহিত্যে যে উচ্ছ্বাস ও গতি প্রদান করিলেন, বলিতে গেলে, অদ্যাপি তাঁহার প্রভাব বহমান রহিয়াছে। শঙ্করদেবের সময়ে এবং তাঁহার পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের তৎকালে লভ্য যাবতীয় গ্রন্থ অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ অসমীয়া ভাষাই আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, লীলাবতী, জ্যোতিষ আদি শাস্ত্রেরও অসমীয়া অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে সাহিত্যের এরূপ অভ্যুত্থান ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোনও সভ্যদেশে হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগকে ইংরাজী-সাহিত্যের এলিজাবেথের যুগ ও রোমান সাহিত্যের অগস্তান্ যুগের সহিত তুলনা করা যায়।

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবের কথা বলিতে গিয়া মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার বংশসম্ভূত রাজা-সকলের নামোল্লেখ না করিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহারাজ নরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতি ছিলেন। তিনি শঙ্করদেবকে ও মাধবদেবকে বড়ই ভক্তি করিতেন। তাঁহারাও মহারাজকে আদর্শ নরপতি বলিয়া মান্য করিতেন। কোচবিহারে মহারাজ নরনারায়ণ পণ্ডিত-সকলের এক মহতী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সভা হইতে পণ্ডিতগণের দ্বারা অনেক অমূল্য গ্রন্থ কামরূপীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। মহাকবি রামসরস্বতী তাঁহার সভায় থাকিয়া মহাভারত অনুবাদ করেন। মহারাজ নরনারায়ণের প্রবর্ত্তিত এই রীতি তাঁহার পরবর্ত্তী পুরুষগণও অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। এমন কি, প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নরনারায়ণের বংশোদ্ভব আসাম দরঙ্গী রাজার আমলে সমগ্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনূদিত হইয়াছিল। এই পুঁথি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার প্রত্যেক পাতা দীর্ঘে আড়াই ফুট এবং প্রস্থে এক ফুট হইবে; এবং সমস্ত পুঁথি প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইবে। এই সঙ্গে অসমীয়া প্রাচীন পুঁথির একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। অনেক পুঁথিতে বিচিত্র-বর্ণের চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে; এবং তিন চারি শত বৎসরেও এই চিত্র-সমূহের বর্ণের কোনও মলিনতা ঘটে নাই। যাঁহারা চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা অভ্যাস করেন, তাঁহারা এই চিত্রসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে এতগুলি প্রসিদ্ধ নাম পাওয়া যায় এবং

তাঁহাদের লিখিত এতগুলি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাঁহাদের নাম করিতে গেলেও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তজ্জন্য আর দুই জন মাত্র মহাকবির উল্লেখ করিয়া এই সামান্য প্রবন্ধের উপসংহার করিব মনস্থ করিয়াছি।

তাহা বলিবার পূর্ব্বে অসমীয়া গীতি-সাহিত্যের একটি কথা বলিবার আছে। বেহুলা এবং লখিন্দরের আখ্যান সর্ব্বত্র সুপরিচিত। নীলাচলবাসী কবি মনকরই এই হৃদয়-বিদারক কাহিনীর প্রথম কবি। মনকরের পরে কামরূপে দুর্গাবর ও নারায়ণদেব এবং শ্রীহট্টে বংশীদাস প্রভৃতি কবিগণ এই আখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করেন। মনকর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহার কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পাঁচালী-গায়কদের মত কামরূপে ওঝা-নামধারী গায়কেরা বেহুলার এই চিরপবিত্র আখ্যান করতাল সংযোগে গাহিয়া থাকেন। নারায়ণদেবের কাব্যই প্রধানতঃ এইরূপে গীত হয়। নারায়ণদেবের উপাধি ছিল—সুকবি। সুকবি নারায়ণদেব হইতে তাঁহার গীতিকাব্য কামরূপ অঞ্চলে "সুক-নারায়ণী" বা সংক্ষেপে "সুকনান্দী" বলিয়া প্রখ্যাত। মনসা-পূজার সময় সহস্র সহস্র লোক এখনও তাললয়সংযুক্ত এই গীত-শ্রবণে একান্ত মোহিত হইয়া থাকে এবং লখিন্দার বেহুলার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

এইক্ষণে উপরিউক্ত মহাকবি দুইজনের সামান্য পরিচয় বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহারাজ নরনারায়ণের সময় মহাকবি রামসরস্বতী অসমীয়ায় মহাভারত অনুবাদ করেন। যতদূর জানা গিয়াছে, রামসরস্বতীকে এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহাভারত অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। মহাভারতের সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইনি কয়েক খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল কাব্যের মধ্যে কুলাচলবধ, বঘাসুর বধ, মণিচন্দ্র ঘোষ, এই তিন খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার উপরও তৎকালিক সামাজিক অবস্থা বর্ণন করিবার জন্য মহাভারতের নায়ক সকলের নাম সংযোজন পূর্ব্বক ইনি অনেক চুটকি চুটকি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহার কল্পনা-শক্তি অতীব প্রখর ছিল। এই স্থানে তাহার সম্যক পরিচয় দিবার অবকাশ নাই। কিন্তু তাঁহার ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও সবল যে, আসাম ও বঙ্গদেশের যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার কাব্য পড়িতে পারে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যেন আপনাদের কেহ তাঁহার প্রণীত ছোট বা বড় যে কোনও একখানি কাব্য পাঠ করেন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, মহাকবি রামসরস্বতী বাস্তবিকই কল্পনাময়ী বীণাপাণির বরপুত্র এবং তাঁহার কাব্যনিচয় দেশবাসীর প্রতি বীণাপাণি সরস্বতীর নির্ম্মাল্য-স্বরূপ। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের পরে অসমীয়া সাহিত্যে কবিবর রামসরস্বতীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

আমি আর এক মহাজনের উল্লেখ করিতে যাইতেছি, যিনি সর্ব্বত্র ভট্টদেব বলিয়াই পরিচিত। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সময়ে শ্রীদামোদর দেবও আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। ভট্টদেব তাঁহারই শিষ্য। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে, অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি ভক্তিবিষয়ক সংস্কৃত কাব্য এবং অসমীয়া

কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাভাগবত ও কথাগীতার (অর্থাৎ গদ্যে ভাগবত ও গীতার অনুবাদ) প্রণেতা বলিয়াই ইঁহার গৌরব সাহিত্য-ক্ষেত্রে এত অধিক। ভারতীয় ভাষা-সমূহের প্রাচীন সাহিত্যে বোধ হয় ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও লেখক গদ্য প্রবন্ধে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতা গদ্যে রচনা করিয়া ইনি এক মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা-গীতা হইতে প্রাচীন অসমীয়া গদ্যের আদর্শ স্বরূপ নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল,—

"পাছে কি প্রবর্ত্তিল, এই অপেক্ষাত সঞ্জয়ে কহন্ত, জানা রাজা, এমনে অর্জ্জুন কৃপায়ে ব্যাপ্ত হুয়া শোক লোতকে আকুল নেত্র হুয়া খেদ করিতে অর্জ্জুনক মধুসূদনে ভগবন্তে বুলিবে লাগিলা। হে পরন্তপ সুখি, এই যুদ্ধ শঙ্কটত কেনে তোমার স্বতসে মোহ ভৈল, আক সাধু সবে নতো করে স্বর্গকো নসাধে, অধর্ম্মো হয়, অকীর্ত্তিকো করে। এতেকে তুমি কাতর নকরিবা। তোমাত ইযোগ্যে নহে। অন্যায় কার্পণ্য এডি যুদ্ধক উঠা।"

উপরে যে কয়েক জন মহাকবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যাকাশে সূর্য্যচন্দ্রের মত উজ্জ্বল। যে কোনও ভাষা ও সাহিত্য তাঁহাদের লইয়া গৌরব করিতে পারে। অন্যান্য যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নামমাত্র নিম্নে উল্লেখ করিতেছি;—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কলাপচন্দ্র, রমানন্দ, পুরুষোত্তম গজপতি, কংসারি, অনন্তঠাকুর, শ্রীধরকন্দলী, গোবিন্দ মিশ্র, হরিদাস বিপ্র, নরোত্তম ঠাকুর, গঙ্গাদাস, মধুনারায়ণ, অনন্তকন্দলী (দীনেশ বাবুর উল্লিখিত অনন্ত রামায়ণের রচয়িতা), ধর্ম্মবর, জানকীনাথ, কবিকঙ্কন (মুকুন্দরাম নহে), বিশ্বেশ্বর, রঘুনাথ, রুচিনাথ ইত্যাদি। এইরূপে আরও প্রায় এক শত কবির নাম পাওয়া যায়।

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রধান। ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সহায় হইবার জন্যই দেশীয় ভাষায় সর্ব্বত্র প্রথম গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে। আসামেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাৎকালিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই দেশীয় ভাষা আলোচনা করিতেন না। কিন্তু মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সময় যখন দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল, তখন হইতে দেশভাষায় কাব্য গীত আদি রচনা করিতে পণ্ডিত সকলেরও আস্থা হইতে লাগিল। ইহাতে যশ ছিল, এবং মহারাজ নরনারায়ণের দৃষ্টান্তে রাজাগণও কবিদিগকে উৎসাহ দিতেন বলিয়া অর্থও ছিল। এই সঞ্জীবনী সাহিত্য সেই কালের সমাজের যে কি প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়াছিল, তাহা বলিবার এখানে স্থান নাই; কিন্তু আমরা সকলেই তাহা সহজে অনুমান করিতে পারি।

আমি উপরে অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যের যে সামান্য পরিচয় দিলাম, সেই সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারের তুলনায় ইহা যথার্থই অতি সামান্য। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের কোনও জন যদি প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের অনুসন্ধান করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা বাস্তবিকই কত গৌরবময়। উপরে চিকিৎসা, জীবনী ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও কথা বলা হইল না। প্রত্যেক সম্বন্ধেই জানিবার ও জানাইবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

* * * * * * *

রাঢ়ে সেন-রাজধানী।

[মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের লিখিত।]

বল্লাল-চরিতে দেখিতে পাই—

"তস্মাদ্বিজয়সেনোভূচ্চোড়গঙ্গসখো নৃপঃ।
যোঽজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং চতুঃসাগরমেখলাম্॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কলিঙ্গপতি চোড়গঙ্গ অনন্তবর্ম্মার সহিত বিজয়সেনের সখ্য ছিল। উৎকল-রাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে, চোড়গঙ্গ দেব—

"গৃহ্ণাতি স্ম করং ভূমের্গঙ্গা-গোতমগঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পশ্যৎসু বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢস্ত্রিয়া ইব॥"

এই শ্লোক হইতে মনে হয়, গঙ্গা-তীরবর্ত্তী মন্দার-দুর্গ জয় করিয়া তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে মধ্য-রাঢে প্রবেশের উপক্রম করিলে, বিজয়-সেনের সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপিত হয়। হয় ত, মিত্রপুরের মিত্রবর্ম্মার প্রবাদ, অনন্তবর্ম্মার এই ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে। অথবা, অনন্তবর্ম্মার মন্দার আক্রমণের পূর্ব্বেই বিজয়-সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই অনন্তবর্ম্মার সহিত তিনি সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে অনন্তবর্ম্মা বিজয় সেনের সাহায্যের জন্যই হয় ত মন্দার-দুর্গ আক্রমণ করেন। এইরূপ অনুমান ভিন্ন বল্লাল-চরিতের ও নরসিংহদেবের তাম্রশাসনের উপরিকথিত শ্লোকদ্বয়ের এবং দেবপাড়া প্রশস্তির

"গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসাং জিগায়"

এই শ্লোকের সামঞ্জস্য সংসাধিত হয় না। অপিচ, চোড়গঙ্গদেবেরও গৌড়-আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

চোড়গঙ্গদেব ও বিজয় সেন।

মন্দার-দুর্গ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহাই আমাদের অনুমান। গঙ্গাবংশীয়গণের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে,—

"আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবলপ্রত্যুগ্রভগ্নাবৃতি-
প্রাকারায়তোরণপ্রভৃতিতো গঙ্গাতটস্থাত্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈর্যুধি জর্জ্জরীকৃতনমদ্রাধেয়গাত্রাকৃতি-
মন্দারাধিপতির্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরানুক্রতঃ॥"

থানা লাভপুর হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পূর্ব্বে "মন্দার" নামে একটী স্থান আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নিকটেই 'মানসারা' নামে আর একখানি গ্রাম। মন্দারের এক অংশ আজিও পরিখা-বেষ্টিত রহিয়াছে। স্থানটীর নাম—জীবনকৃষ্ণপুর। জীবনকৃষ্ণপুরের দক্ষিণে "আগড়ডাঙ্গা" নামে একটী বিপুলায়তন ধ্বংসস্তূপ লোকের বিস্ময়োৎপাদন করে। চতুর্দ্দিকের বিশাল পরিখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের যে অংশটুকু মাত্র বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলেই

চোড়গঙ্গদেব বিজিত-মন্দার-দুর্গ।

পরিখার পূর্ব্ব-বিশালতা অনুভব করিতে আর কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমের পরিখাটী 'গড়খাই' নামে অভিহিত। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় শতাধিক হস্ত ব্যাপিয়া জলপূর্ণ রহিয়াছে। লোকে বলে—"সেখানে আগড়-রাজার বাড়ী ছিল। কোন্ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি নাকি রাজ্য হারাইয়াছিলেন।" আমরা এই "মন্দার" ও "তাহার অধিপতিকে" চোড়গঙ্গ-বিজিত বলিয়া অনুমান করি।

সেনবংশের পূর্ব্ব পরিচয়।

দেবপাড়া-প্রশস্তিতে 'দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনের' নাম পাওয়া যায়। তিনি সেন-বংশের পূর্ব্বপুরুষ। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলেখে সামন্তসেনকে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়কুল-শিরোদম" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কোথায় দাক্ষিণাত্য, কোথায় রাঢ়। এত দূরে আসিয়াও সেনরাজপুত্রগণ আপনাদের বংশ-গৌরব-স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। 'রাঢ়ে সেন-রাজধানীর' 'বীরনগর' নাম এই গৌরব-স্মৃতিরই দ্যোতনা মাত্র। 'গৌড়ের ইতিহাস' রচয়িতা স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি-খণ্ড হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"সৌমিনী দেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্য ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোঽভূদ্ভুবশঙ্করঃ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী হ্যামৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপি চ॥"

আমরা এই বীরসেনকেই সেন-বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করি। ভুবশঙ্কর হইতে "বৃষভশঙ্কর", 'নিঃশঙ্ক-শঙ্কর' প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বল্লালচরিতে কথিত হইয়াছে,—বীরসেন অঙ্গাধিপ কর্ণের বংশধর। তিনি অঙ্গ হইতে গৌড়দেশে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তাম্রলিপির সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। অঙ্গদেশে বীরসেনের জন্ম হইলে তাঁহাকে 'দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র' বলা যাইতে পারে কিরূপে? তাম্রলিপিতে রাঢ়ের উল্লেখ আছে, আনন্দভট্ট, বল্লালচরিতে, সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষকে গৌড়ে লইয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাম্রলিপিই সমধিক বিশ্বাস্য।

কোন্ সময়ে সেন-বংশ আসিয়া রাঢ়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; কর্ণাট বলিতে, কোন্ স্থানকে বুঝায়; এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন চোল-রাজ্যকে কর্ণাটের একাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন,—রাজেন্দ্র-চোলের সঙ্গেই সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ হয় ত রাঢ়ে আগমন করিয়া থাকিবেন।

রাঢ়ে সেনাগমন কাল-নির্ণয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"পালাধিকার-কালে মাল্লব, হূন, খস্, কুলিক, লাট প্রভৃতি জাতির সঙ্গে কর্ণাটগণও গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পরে চেদীরাজ কর্ণদেবের সময়ে, সুযোগ বুঝিয়া, কর্ণাট-বংশীয় সামন্তসেন অভ্যুত্থিত হন। মালবরাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণাটগণ চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।" গৌড়রাজমালাকার বলেন,—'চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য

গৌড় জয় করিয়া নবজিত রাষ্ট্র শাসন জন্য যে প্রতিনিধি রাখিয়া যান, তাঁহারই বংশে সামন্তসেনের অভ্যুদয়। রাজেন্দ্র-চোল রাঢ়ে আগমন করেন—১০২৪ খৃঃ। কর্ণদেবের দিগ্বিজয় আরম্ভ—১০৪০ খৃঃর কিছু পূর্ব্ব হইতে। কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্যের গৌড আক্রমণ কাল—১০৪০ হইতে ১০৭১ খৃঃ অঃ মধ্যে। ইঁহাদের কাহারও সময়ে সামন্তসেনের অভ্যুদয় হইলে, রাঢের গর্ব্ব-গৌরব সদাচার-পরায়ণ সেনরাজপুত্রগণ যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতে রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন, তাহা প্রতীত হয়। সীতাহাটী তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। সুতরাং বলিতে হয়, রাজেন্দ্র-চোলেরও পূর্ব্বে সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ কেহ রাঢে আগমন করিয়াছিলেন। "কর্ণাটলক্ষ্মীলুণ্ঠনকারিগণের শাসনকর্ত্তা" সামন্তসেনকে রাজেন্দ্রচোলের সমসাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। পাইকরে বিজয়সেনের শিলালিপির সঙ্গে "সমৃদ্ধরাঠ চেদীরাজ শ্রীকর্ণদেবের ও" একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক এক দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই ই, মহোদয় এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাইকরে গিয়া এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

পাইকরে চেদীরাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপি।

পাইকরে শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান হয়, কর্ণদেবের সহিত সেনবংশের শত্রু বা মিত্র ভাবে কোনরূপ একটা সংশ্রব ঘটিয়াছিল।

* * *

মিলন-গীতি।

[রায় সাহেব কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বিরচিত। †]

ঐ পুণ্য-পুলক পুঞ্জ
স্বর্গে মন্দার মথিয়ে
মর্ত্ত্যে মিলন-মন্দিরে
দিয়েছ গন্ধ ঢালিয়ে।
ঐ যে রাজে সরোজ-সাজে ভারতী,
প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল মোহন-মূরতি
কত ভক্ত করে মঙ্গল-আরতি
রবি-রশ্মি-রাগে বিশ্ব আলোকিয়ে।
যা'রা সাহিত্যেরে দিয়ে গে'ছে প্রাণ,
যারা গেয়ে গে'ছে হেথা গাথা গান
মা'র হাস্য-বিম্বে তাহাদেরই দান
আলোক-আলেখ্য উঠিছে ফুটিয়ে

বর্ষ গে'ল চ'লে বর্ষ এল ঘুরে,
যেবা যেথা ছিল নিকটে কি দূরে
শুনি বাণী-বীণে গান সপ্ত সুরে
ঐ সে দাঁড়ায়েছে মায়েরে ঘেরিয়ে।
সাহিত্য-সৌধের মুক্ত শত দ্বার—
তারি মাঝে রাজে লক্ষ উপচার,
এনেছে সে সাথে যাহা সাধ্য যা'র
দিতে ডালি ঢালি অঞ্জলি ভরিয়ে।
ছোট বড় নাই সবাই সমান,
সবাই তো এক মায়ের সন্তান
সবাই রাখুক মায়েরই মান
একতানে গানে প্রাণ মিশাইয়ে।

*, † হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধের শেষাংশ, এবং গীত-সঙ্গীত।

মাতৃ-বিসর্জ্জন।

[শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার এম-এ বি-এল লিখিত।]

মার প্রতি অনুরাগ পৃথিবীতে মানব-জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আছে। যে সকল জীবজন্তু পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় জলে স্থলে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত, তাহারা প্রায় সকলেই মানব-যুগের পূর্ব্বে ও ঐ যুগের প্রথম অবস্থায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও জননীর প্রতি যে সন্তান-সন্ততির মমতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জননীই শৈশবে সন্তানের একমাত্র প্রাণরক্ষক। সদ্যঃপ্রসূত-বাঘিনী বাঘকেও নিকটে আসিতে দেয় না। অরণ্যবাসী বর্ব্বর মানবদের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। ভারতে মাকেই লোকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে। আমাদের মুখে "মা-বাপ" যে রকম সহজে প্রকাশ হয়, "বাপ-মা" সে রকম হয় না।

পাশ্চাত্য বাইবেল ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি যে, জেহোবা নিজরূপে পুরুষকে সৃজন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, মানুষ যে ঈশ্বরকে নিজরূপে, আপন পিতার রূপে, আঁকিয়া লইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভয় হইতে ধর্ম্মের সূত্রপাত। মানব-যুগের প্রথম অবস্থায় মেঘগর্জ্জন, জলপ্লাবন, সূর্য্যগ্রহণজনিত ঘন অন্ধকার প্রভৃতি ভীষণ ঘটনায় মানুষ ভয়ে জড়সড় হইত। তাহারা ভাবিত, কোনো অলক্ষ্য ক্রুদ্ধ পিতার কোপে এই সব ঘটিতেছে। মা তো কখনো ওরূপ উগ্রমূর্ত্তি দেখান্ না—পিতাই সময়ে সময়ে দেখাইয়া থাকেন। এ সব পিতা ঈশ্বরের কাজ। এইরূপে পরমেশ্বরকে পুরুষরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। মা বাদ পড়িয়াছেন। সকল ধর্ম্মেই বলে—পিতা ঈশ্বর (God the father); একমাত্র বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজেই জগৎপিতার পার্শ্বে জগন্মাতা স্থান পাইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার সম্মান জগৎপিতা অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। আমরা যেমন বলি "মা-বাপ", তেমনি বলি "সীতারাম।" "রামসীতা" কদাচ বলি না। হিন্দুরা মাকে তাঁহার প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নাই। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে তাহাদের এই একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহার অবশ্য একটা নিগূঢ় কারণ থাকিবে। কারণ যাহাই হউক, আমরা সহজে দেখিতে পাই যে, সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজে স্ত্রী-জাতির মর্য্যাদা বাড়িয়া আসিতেছে। অসভ্যদের মধ্যে স্ত্রীর সম্মান কিছুমাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অল্প-সভ্য ইহুদীরাও স্ত্রীকে পুরুষের পদতলে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। * বহু সহস্র বৎসর যে অধিকার হইতে পুরুষেরা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহারা সে অধিকার পাইতেছেন। কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে অপর জাতিরা জগজ্জননীর চরণ সেবা করিবেন, এমন দিন কবে আসিবে বলা যায় না।

---

* "She was the first in the transgression, therefore keep her in subjection."—*The Bible*,

হিন্দুসমাজ-সম্ভূত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি মাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ-সমূহের যাঁহারা নেতা, তাঁহারাই এ কথার সম্যক-মীমাংসা করিবেন। তবে সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদী এবং তাঁহারা একমাত্র পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, মা জগদম্বার জন্য ব্রাহ্মমন্দিরে দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থান রাখা হয় নাই। খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেবেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টীয় 'চর্চ্চের' নকল মাত্র। * ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রাহ্মেরা যে ভাব সচরাচর ব্যক্ত করেন এবং তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতি, এই দুই বিষয় দেখিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজ যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের প্রথম অবস্থায় এদেশীয় লোকে বিদেশীয় ভাবটা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অনেক বিষয়ে ইংরেজদের অনুকরণ করিবার চেষ্টাও বেশ ছিল। এটা খানিকটা স্বাভাবিক ঘটনা। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকেরাও যে এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে বিদেশিভাবগ্রস্ত হন নাই, তাহা বলা যায় না। মহাত্মা রামমোহন, যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া কিম্বা ঈশ্বরের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া মানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন যে, যীশু ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি যীশু ঘটিত অলৌকিক কাণ্ডগুলি—যথা গোর হইতে যীশুর সশরীরে উত্থান ইত্যাদি প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি Unitarian খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে আদর্শরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্ম-উপাসনা প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮২৪ সালে তিনি (Rev. Mr. Henry Ware, Unitarian minister of Harvard College, Cambridge, United States of America) অয়ার সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে,—শিক্ষিত হিন্দুরা Trinitarian Christianity গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের Unitarian Christianity বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে কলিকাতায় Rev. Mr. Adam একটা Unitarian ধর্ম্ম-সমাজ স্থাপন করেন। সে বিষয়ে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহাকে অর্থ দ্বারা এবং অন্য রকমে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রোমান কাথলিকদের মূর্ত্তিপূজা এবং সাধারণ হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা রামমোহন একভাবে প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের চোখেই দেখিতেন। এই সকল অবস্থা দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদেশিক ধর্ম্ম-শিক্ষার গুণেই ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃতি-জননী জগন্মাতাকে পরমপিতা পরমেশ্বরের পার্শ্বে বসানো হয় নাই।

---

* রবিবারে ব্রাহ্মোপসনার প্রথা সম্বন্ধে Oxford Mission এর মুখপত্র *Epiphany* লিখিয়াছিলেন,—"The Brahmo Somaj has paid to Christianity in this as in many things, the high compliment of imitation and now keeps Sunday as a day of both rest and worship, thereby doing unintended honour both to the doctrine of the Divine Rest in the Biblical narrative which they despise, and to the Resurrection of Jesus Christ, of which the first day of the week is the festival"—*The Epiphany*, Aug. 1, 1903.

ইহাতে কি ব্রাহ্মসমাজের কোনো ক্ষতি হইয়াছে? এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। হিন্দুরা বলেন, মার কোমল ক্রোড়ে তাঁহারা পরম সুখে আছেন। মার মধুময় নাম স্মরণ করিয়া তাঁহারা যে পরম তৃপ্তি লাভ করেন, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন। মার নাম-গানে তাঁহাদের যেমন হৃদয় স্পর্শ করে, তেমন আর কিছুতেই করে না।

"এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব লব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ও যে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।"

মার সঙ্গে সন্তানের যেরূপ অপূর্ব্ব বন্ধন, মার কাছে ছেলে যে রকম আবদার করিতে পারে, প্রাণ খুলিয়া মর্ম্ম-বেদনা ব্যক্ত করিতে পারে, সেরূপ বন্ধন আর কার সঙ্গে হইতে পারে?—সেরূপ আবদার আর কার কাছে করিতে পারে? সেরূপ ভাবে মনের দুঃখ আর কার কাছে প্রকাশ করিতে পারে? যে ধর্ম্মে মার অনাদর, সে ধর্ম্ম নিতান্ত অঙ্গহীন, নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও নিরস। তবে কি এই জন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বহুল বিস্তার না হইয়া নব্বই বৎসরের মধ্যে তাহাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে?

* * *

অনুভূতি।

[রায়-সাহেব কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বিরচিত।]

দীপটি জ্বালিয়ে কে ঐ দাঁড়াইয়ে
বাণীর মন্দির-পাশে।
নীরবে সে রহে, নীরবে যে বহে
মর্ম্মদাহ তপ্তশ্বাসে॥
বুঝি ঘন ঝঞ্ঝা-বায়
দীপটি নিভিয়ে যায়,
তাই সেই আশঙ্কায়
আকুলে সে আঁখিজলে ভাসে
উহারই ত প্রতিভায়
দীপ্ত দীপ ভানু ভায়,
নিভিলে আঁধারচ্ছায়
কভু কি গো প্রভা বিকাশে
বুকে কত ব্যথা পায়,
তবু সে মানের দায়
কারে কিছু না জানায়
ব্যক্ত ব্যথা শুধু মৌনভাষে।
মুখে কিছু নাহি চায়,
এসে ম্লান-চোখে চায়,
শেষে ফিরে নিরাশায়,
ঢেলে শ্বাস সাঁঝের বাতাসে—
আশায় নিরাশ হ'লে
কারে কিছু নাহি ব'লে
অভিমানে যায় চলে
আশা নিয়ে ফিরে যে সে আসে।
কত কোটি ভাই যা'র,
তার বাণী সাধনার
এই কি গো পুরস্কার,
কাঁদিবে সে নীরবে নিরাশে।
একে একে দলে মিলে
তারে কোলে তুলে নিলে,
তার অশ্রু মুছাইলে
কত দীপ জ্বলিবে উল্লাসে।

প্রক্ষিপ্ত রামায়ণ।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয়ের লিখিত।]

৫। এই প্রবন্ধের উপপাদ্য আদর্শের বিশেষত্ব।

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের সকল আদর্শেই বাল বা আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে নারদকে বাল্মীকি-কৃত প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং দ্বিতীয়ে ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ ও ব্রহ্মার আগমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরে তৃতীয় সর্গে সকল আদর্শেই সংক্ষেপে রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এই আদর্শে তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুইটি সর্গে কই প্রকারে সমস্ত রামায়ণের বিষয়গুলি সংক্ষেপে পরিবর্ণিত হইলেও ইহার তৃতীয় স্বর্গটি একটু বিভিন্ন প্রকারের। অন্য অন্য আদর্শের তৃতীয় সর্গের সহিত এই আদর্শের চতুর্থ সর্গের পরিবর্ণিত শ্লোকসমূহের প্রায় একতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার তৃতীয় স্বর্গটি সম্পূর্ণ পৃথক্ রকমের। এস্থলে এই তৃতীয় সর্গের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইবে। কারণ, অন্য অন্য আদর্শে এইরূপ বিষয় বর্ণনার অবতারণা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামায়ণে কতগুলি শ্লোক, কতগুলি সর্গ ও কয়টী কাণ্ড আছে, সকল আদর্শেই তাহা এইরূপে প্রব্যক্ত হইয়াছে, যথা,—

'চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২॥' (৪ সর্গ, বালকাণ্ডে)

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে মোট ২৪০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোক, ৫০০ পাঁচ শত সর্গ ও উত্তরকাণ্ড সহিত মোট ৭ সাত কাণ্ড প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

টীকাকারগণও এই শ্লোকসংখ্যা ও সর্গসংখ্যা লইয়া অনেক প্রকার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ ২৪০০০ শ্লোক বা পূর্ণ ৫০০ সর্গ যেন কোন প্রকারে কেহই ঠিক মিল করিয়া দেখাইতে পারেন নাই! নিজ নিজ গণনার একতাও যেন কাহারও গণনায় কোথায়ও পরিলক্ষিত হইতেছে না।

(ক) আদি বালকাণ্ড।

এই আদর্শের আদিকাণ্ডের এই তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'আদিকাণ্ডমিতি প্রোক্তং বিস্তারস্তস্য কথ্যতে।
প্রথমং নারদপ্রশ্নো নদীগমনমেব চ॥
ব্রহ্মণো দর্শনঞ্চৈব বরপ্রাপ্তিশ্চ পুষ্কলা।
শ্লোকানাং পরিমাণঞ্চ যত্রৈতৎ পরিকীর্ত্ত্যতে॥'

আদিকাণ্ডের বিষয় বিস্তার-পূর্ব্বক বলা যাইতেছে। প্রথমে নারদকে বাল্মীকির প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, তৎপরে বাল্মীকির স্নানার্থ তমসা নদীর তীরে গমন, ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার-লাভ ও বর-প্রাপ্তি এবং রামায়ণের শ্লোকের পরিমাণ প্রভৃতি এই আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

'ইত্যেতৎ প্রথমং কাণ্ডমাদিকাণ্ডমিহোচ্যতে।
সর্গাশ্চৈব চতুঃষষ্টিঃ শ্লোকানাঞ্চাত্র কীর্ত্ত্যতে॥
দ্বে সহস্রে শতান্যষ্টৌ শ্লোকাঃ পঞ্চাশদেব তু।
বালচর্য্যা হি যত্রোক্তা রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥'

এই প্রথমকাণ্ডের নাম—আদিকাণ্ড। ইহাতে মোট ৬৪ সর্গ ও ২৮৫০ শ্লোক আছে। এই আদিকাণ্ডে মহাত্মা রামচন্দ্রের বালচরিত পরিবর্ণিত হইয়াছে।

এই বর্ণনা দ্বারা আদি বা বালকাণ্ডে মোট ৬৪ সর্গ ও ২৮৫০ শ্লোকের অস্তিত্ব বিনির্ণীত হয়। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত রামায়ণে বালকাণ্ডের সর্গ-সংখ্যা ৭৭ ও এই প্রবন্ধের অবলম্বিত আদর্শে ৮১ দৃষ্ট হইতেছে। তবে আদর্শের শ্লোক ও সর্গ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে যে বিষয় বিনির্দ্দেশক শ্লোক সমূহ আছে, তাহার সর্ব্বশেষ শ্লোকটিতে দেখিতে পাওয়া যায়;—

'অযোধ্যাসংপ্রবেশশ্চ প্রবাসো ভরতস্য চ।
অযোধ্যাবাসিনাঞ্চৈব প্রমোদঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥'

রামচন্দ্র প্রভৃতির বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রবেশ, ভরতের প্রবাস অর্থাৎ মাতামহ-কেকয়-রাজ্যে গমন এবং রামচন্দ্রের গুণপরিমুগ্ধ পৌরজনগণের প্রমোদ বর্ণনাতেই এই আদি বা বালকাণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

অন্যান্য আদর্শে এই বিষয়গুলি খুব সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই আদর্শে ইহার বর্ণনা বিস্তারিতরূপে কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু রামচন্দ্রের সদ্‌গুণবিমুগ্ধ প্রকৃতিবর্গও এই আদিকাণ্ডেই রাজা দশরথের নিকটে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সকলের অপরিসীম প্রমোদ-প্রবাহের সংপ্রবর্ত্তন করিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় না।

(খ) অযোধ্যাকাণ্ড।

'অতঃপরং দ্বিতীয়ং তদযোধ্যাকাণ্ডসংজ্ঞিতম্।
অত্রাভিষেকসঙ্কল্পব্যাঘাতশ্চৈব কীর্ত্ত্যতে॥
কৈকেয্যনুনয়শ্চৈব শোকো দশরথস্য চ।
বনপ্রয়াণং রামস্য লক্ষ্মণানুগমস্তথা॥' ইত্যাদি॥

ইহার পরে দ্বিতীয় কাণ্ড। তাহার নাম—অযোধ্যাকাণ্ড। ইহাতে রামচন্দ্রের অভিষেক-সঙ্কল্প ও তাহার ব্যাঘাত, রাজা দশরথ কর্ত্তৃক কৈকেয়ীর অনুনয় করা, দশরথের শোক, রামচন্দ্রের বনগমন ও লক্ষ্মণের রামের অনুগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

'কাণ্ডং দ্বিতীয়মিত্যুক্তমযোধ্যাকাণ্ডসংজ্ঞিতম্।
অশীতিসংখ্যকাঃ সর্গাঃ শ্লোকানাঞ্চাত্র কথ্যতে॥

ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি নবশ্লোকশতানি চ।
শ্লোকানাং দ্বেশতে চৈব ভূয়ঃ শ্লোকাশ্চ সপ্ততিঃ॥'

দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম—অযোধ্যাকাণ্ড। ইহার সর্গ সংখ্যা ৮০ এবং শ্লোক-সংখ্যা ৪৩৭০।

হেমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থে অযোধ্যাকাণ্ডের সর্গ সংখ্যা ১১৯ এবং এই আদর্শে ১২৫।

(গ) আরণ্যকাণ্ড।

'অতঃকাণ্ডং তৃতীয়ন্তু আরণ্যকমিতি স্মৃতম্।
যত্র রামো মহাবাহুর্দণ্ডকং প্রাবিশদ্বনম্॥
অনসূয়াসমস্যা চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্॥
বিরাধদর্শনঞ্চৈব বধশ্চ সমুদাহৃতঃ॥'

তৃতীয়—আরণ্যক কাণ্ড। ইহাতে রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়ার সহিত সীতার সংমেলন, অনসূয়া কর্তৃক সীতাকে অঙ্গরাগ অর্পণ ও বিরাধ বধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

'ইতি কাণ্ডং তৃতীয়ঞ্চ আরণ্যকমিতি স্মৃতম্।
সর্গাণাঞ্চ শতঞ্চৈব সর্গাশ্চৈব চতুর্দ্দশ॥
চত্বারীহ সহস্রাণি শ্লোকানাং কীর্ত্তিতানি চ।
শতঞ্চৈবাত্র বিজ্ঞেয়ং শ্লোকাঃ পঞ্চাশদেব তু॥'

তৃতীয় আরণ্যক কাণ্ডে সর্গ-সংখ্যা ১১৪ এবং শ্লোক-সংখ্যা ৪১৫০।

(ঘ) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

'অতঃপরং চতুর্থন্তু কাণ্ডং কৈষ্কিন্ধ্যমুচ্যতে।
ঋষ্যমূকগিরিপ্রাপ্তা রামস্য চ মহাত্মনঃ॥
হনূমদ্দর্শনঞ্চৈব সংবাদশ্চাত্র কীর্ত্ত্যতে॥' ইত্যাদি।

চতুর্থ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

'চতুর্থমেব কাণ্ডন্তু কৈষ্কিন্ধ্যমিতি সংজ্ঞিতম্।
সর্গাশ্চৈবাত্র বিজ্ঞেয়াশ্চতুঃষষ্টিস্তু সংখ্যয়া॥
শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে তু অষ্টশ্লোকশতানি চ।
শ্লোকানাঞ্চ শতং জ্ঞেয়ং পঞ্চবিংশতিরেব চ॥'

চতুর্থ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সর্গসংখ্যা ৬৪ ও শ্লোকসংখ্যা ২৯২৫।

(ঙ) সুন্দরকাণ্ড।

'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কাণ্ডং সুন্দরসংজ্ঞিতম্।
হনূমৎপ্লবনঞ্চৈব সুরসায়াশ্চ দর্শনম্॥' ইত্যাদি।

পঞ্চম সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সাগরলঙ্ঘন ও সুরসা রাক্ষসীর সহিত সাক্ষাৎলাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি নবশ্লোকশতানি চ।
শ্লোকানাং দ্বেশতে চৈব ভূয়ঃ শ্লোকাশ্চ সপ্ততিঃ॥'

দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম—অযোধ্যাকাণ্ড। ইহার সর্গ সংখ্যা ৮০ এবং শ্লোক-সংখ্যা ৪৩৭০। হেমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থে অযোধ্যাকাণ্ডের সর্গ-সংখ্যা ১১৯ এবং এই আদর্শে ১২৫।

(গ) আরণ্যকাণ্ড।

'অতঃকাণ্ডং তৃতীয়ন্তু আরণ্যকমিতি স্মৃতম্।
যত্র রামো মহাবাহুর্দণ্ডকং প্রাবিশদ্বনম্॥
অনসূয়াসমস্যা চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্॥
বিরাধদর্শনঞ্চৈব বধশ্চ সমুদাহৃতঃ॥'

তৃতীয়—আরণ্যক কাণ্ড। ইহাতে রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়ার সহিত সীতার সংমেলন, অনসূয়া কর্তৃক সীতাকে অঙ্গরাগ অর্পণ ও বিরাধ বধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

'ইতি কাণ্ডং তৃতীয়ঞ্চ আরণ্যকমিতি স্মৃতম্।
সর্গাণাঞ্চ শতঞ্চৈব সর্গাশ্চৈব চতুর্দ্দশ॥
চত্বারীহ সহস্রাণি শ্লোকানাং কীর্ত্তিতানি চ।
শতঞ্চৈবাত্র বিজ্ঞেয়ং শ্লোকাঃ পঞ্চাশদেব তু॥'

তৃতীয় আরণ্যক কাণ্ডে সর্গ-সংখ্যা ১১৪ এবং শ্লোক-সংখ্যা ৪১৫০।

(ঘ) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

'অতঃপরং চতুর্থন্তু কাণ্ডং কৈষ্কিন্ধ্যমুচ্যতে।
ঋষ্যমূকগিরিপ্রাপ্তা রামস্য চ মহাত্মনঃ॥
হনূমদ্দর্শনঞ্চৈব সংবাদশ্চাত্র কীর্ত্ত্যতে॥' ইত্যাদি।

চতুর্থ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

'চতুর্থমেব কাণ্ডন্তু কৈষ্কিন্ধ্যমিতি সংজ্ঞিতম্।
সর্গাশ্চৈবাত্র বিজ্ঞেয়াশ্চতুঃষষ্টিস্তু সংখ্যয়া॥
শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে তু অষ্টশ্লোকশতানি চ।
শ্লোকানাঞ্চ শতং জ্ঞেয়ং পঞ্চবিংশতিরেব চ॥'

চতুর্থ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সর্গসংখ্যা ৬৪ ও শ্লোকসংখ্যা ২৯২৫।

(ঙ) সুন্দরকাণ্ড।

'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কাণ্ডং সুন্দরসংজ্ঞিতম্।
হনূমৎপ্লবনঞ্চৈব সুরসায়াশ্চ দর্শনম্॥' ইত্যাদি।

পঞ্চম সুন্দরকাণ্ডে হনূমানের সাগরলঙ্ঘন ও সুরসা রাক্ষসীর সহিত সাক্ষাৎলাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

'ইত্যাভ্যুদয়িকং কাণ্ডং সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
নবতিঃ সংখ্যয়া সর্গাঃ শ্লোকানাঞ্চ প্রকীর্ত্তিতে॥
ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি তাবন্তোব শতানি চ।
ষষ্টিঃ শ্লোকাস্তথা জ্ঞেয়াঃ কাণ্ডেঽস্মিন্ পরিসংখ্যয়া॥'

ভবিষ্য ও উত্তর সহ এই আভ্যুদয়িক কাণ্ডে সর্গসংখ্যা ৯০ ও শ্লোকসংখ্যা ৩৩৬০।

(জ) এই রামায়ণে মোট কত সর্গ ও কত শ্লোক?

'সর্গানাং ষট্শতানীহ বিংশতিশ্চৈব সংখ্যয়া।
ইত্যেতদ্রামসম্বন্ধমাখ্যানমৃষিসম্মতম্॥
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং সর্ব্বপাপভয়াপহম্।
আখ্যানং বৈষ্ণবং দিব্যং কৃতং বাল্মীকিনা স্বয়ম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্রীয়ং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
ইত্যাদিকাণ্ডে অনুক্রমণিকা (৩য় অঃ)।

বাল্মীকি-প্রণীত এই রামায়ণে মোট সর্গসংখ্যা ৬২০ এবং মোট শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০।

৬। টীকাকার মহেশ্বরতীর্থ যতী।

রামায়ণতত্ত্বদীপিকা প্রণেতা মহেশ্বরতীর্থ বলেন, বেদমাতা গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের বক্ষ্যমাণ নির্দ্দেশ অনুসারে বাল্মীকি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; যথা,—

'গায়ত্র্যাস্তীণি চত্বারি দ্বে দ্বে ত্রীণ্যথ ষট্ ক্রমাৎ।
চত্বারি সপ্তকাণ্ডেষু স্থাপিতান্যক্ষরাণি তু॥'

এই নির্দ্দেশ অনুসারে বাল বা আদিকাণ্ডে তিন, অযোধ্যাকাণ্ডে চারি, আরণ্যকে দুই, কিষ্কিন্ধ্যায় দুই, সুন্দরে তিন, যুদ্ধ বা লঙ্কায় ছয় এবং উত্তরকাণ্ডে চারি অক্ষর—মোট গায়ত্রীর ২৪ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের সংযোজনায় রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণের সমগ্র শ্লোকের সংখ্যা বিনির্দ্দেশে মহেশ্বরতীর্থ বলিয়া গিয়াছেন,—

১। 'শ্রীমদ্বালকাণ্ডে দ্বিসহস্রাদুপরি দ্বিশতী চাশীতিগ্রন্থাঃ।'
২। 'শ্রীমদযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসহস্রাণি চতুঃশতানি পঞ্চাশদ্গ্রন্থাঃ।'
৩। 'শ্রীমদারণ্যকাণ্ডে দ্বিসহস্রাণি সপ্তশতানি ত্রিংশদ্ গ্রন্থাঃ।'
৪। 'শ্রীমৎকিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিসহস্রাণি ষট্শতানি বিংশতিশ্চ গ্রন্থাঃ।'
৫। 'শ্রীমৎসুন্দরকাণ্ডে ত্রিসহস্রং ষট্ চ গ্রন্থাঃ।'
৬। 'শ্রীমদ্যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসহস্রাণি নবশতানি নবতিশ্চ গ্রন্থাঃ।'
৭। 'শ্রীমদুত্তরকাণ্ডে ত্রীণি সহস্রাণি দ্বে শতে চতুর্ব্বিংশতিগ্রন্থাঃ।'
তদেবং চতুর্ব্বিংশতিসহস্রাণি দ্বিশতং সপ্তসপ্ততিগ্রন্থাঃ।'

১। বালকাণ্ডে ২২৮০, ২। অযোধ্যায় ৪৪৫০, ৩। আরণ্যে ২৭৩০, ৪। কিষ্কিন্ধ্যায় ২৬২০, ৫। সুন্দরে ৩০০৬, ৬। যুদ্ধে ৫৯৯০, এবং ৭। উত্তরকাণ্ডে ৩২২৪ শ্লোক।

সাকল্যে ২৪২৭০ শ্লোক। ইহাতেও ২৪০০০ হইতে প্রায় তিন শত শ্লোক মহেশ্বরের নির্দ্দেশে অধিক হইয়া পড়িল।

সর্গসংখ্যা বিনির্ণয়ে মহেশ্বর বলেন,—

'শ্রীমদ্বালকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিঃ, শ্রীমদযোধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশত্যুত্তরশতং, আরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিঃ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিঃ, সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিঃ সর্গঃ, (২) যুদ্ধকাণ্ডে এক-ত্রিংশদুত্তরশততমঃ, তদেবং পঞ্চশত্যানি সপ্তত্রিংশৎ সর্গাঃ, উত্তররামায়ণে তু সর্গা দশোত্তরষট্।'

১ম। বালকাণ্ডে ৭৭, ২। অযোধ্যায় ১১৯, ৩। আরণ্যে ৭৫, ৪। কিষ্কিন্ধ্যায় ৬৭; ৫। সুন্দরে ৬৮, ৬। যুদ্ধে ১৩১ এবং উত্তরে ১০৬ (?) সর্গ। ইহাতে মোট ৬৪৩ সর্গ সংখ্যা।

এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত আদর্শে সর্গ সংখ্যা মোট,—সর্গাণাং ষট্শতানীহ বিংশতিশ্চৈব সংখ্যয়া।' রামায়ণের মোট সর্গ-সংখ্যা ৬২০।

৭। লোকনাথ চক্রবর্ত্তীকৃতা রামায়ণ-টীকা মনোহরা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে বলিতেছেন,—

'শ্রীলোকনাথবুধ এষ মনোহরাখ্যাং
রামায়ণস্য বিদুষাং প্রমুদে তনোতি।'

পণ্ডিতগণের প্রমোদের জন্য লোকনাথ, রামায়ণের মনোহরা নাম্নী এই টীকা প্রণয়ন করিতেছেন। তিনি বিমল-বোধের সুবোধ-টীকা ও সর্ব্বজ্ঞ-বিরচিত মনোজ্ঞ-টীকার সমুল্লেখ স্বকীয় গ্রন্থে করিয়া গিয়াছেন।

সংখ্যার ন্যূনাধিক্যের কারণে লোকনাথ বলেন,—'মূর্খগণামেকৈকসর্গেষু দ্বিত্রিসংজ্ঞা-করণাদ্ ভ্রমিকয়া দৃষ্ট্যৈব আদিকাণ্ডেঽশীতিরিতি বিমলবোধঃ।' টীকাকার বিমলবোধ বলেন, আদিকাণ্ডে অশীতি সর্গ, অনভিজ্ঞ লেখক কর্ত্তৃক এক এক সর্গকে ২।৩ বিভাগে বিভক্ত করাতেই, প্রমাদ-বশতঃ রামায়ণের সর্গ-সংখ্যায় এইরূপ বিভ্রাট সংঘটিত হইয়াছে।

লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—বিমলবোধের মতে বাল বা আদিকাণ্ডের সর্গ-সংখ্যা ৮০, কিন্তু এই আদর্শের পাঠে, 'সর্গাশ্চৈব চতুঃষষ্টিঃ',—৬৪।

৮। রামায়ণার্থ-সন্দর্ভবোধিনী।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা রামায়ণার্থ-সন্দর্ভবোধিনী টীকার প্রণেতা। রামায়ণের শ্লোক সাকল্যে ইনি বলেন,—'গায়ত্র্যাচ্ছন্দসা তু সপ্তভিঃ কাণ্ডৈর্মিলিত্বা চতুঃশ্লোকোত্তরং চতুর্ব্বিংশতিসহস্রং স্যাৎ। এতান্যেবানুষ্টুপ্‌চ্ছন্দসা পুনর্ব্বিংশতিসহস্রাণি পঞ্চষষ্টি শ্লোকোত্তরাণি ভবন্ত্যত্র প্রক্ষেপমপুস্তাবয়ন্তি।'

গায়ত্রীছন্দের নিয়মে সাতকাণ্ডে সাকল্যে ২৪০০৪ শ্লোক রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অনুষ্টুভ্‌ছন্দের নিয়মে (৩২ অক্ষরে শ্লোক ধরিয়া) উহাই ২০০৬৫ শ্লোকে পরিণত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ ইহাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকেরও সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

একটী স্বাধীন রাজ্যের বিবরণ।

[শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম-আর এ-এস্ মহাশয়ের লিখিত।]

ঘাটশিলা।

ঘাটশিলা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ঘাটশিলা তখন একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। এইরূপ কত রাজ্য আমাদের দেশে উঠিয়াছে, আবার কালের বিস্মৃতি-সাগরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কিন্তু তাহাদের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। কেন-না, আমাদের দেশ পল্লীসমষ্টি।

সাম্রাজ্য কথাটা আমরা যে ভাবে বলি, ঠিক সে ভাবে তখন ছিল না। অনেক স্বাধীন রাজা ছিলেন। সম্রাট্ শুধু নিজের প্রাধান্যটুকু স্বীকার করাইয়া ক্ষান্ত হইতেন, কিন্তু সেখানকার রাজকার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না,—শুধু কর আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। তাই তাঁহার বংশ একটু দুর্ব্বল হইলেই, আমরা দেখিতে পাই—দেশটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু সত্যই তাহা নয়। আগেও দেশ ভাঙ্গা ছিল। তবে যে সংযোজক বস্তুটী সেই ভাঙ্গা অংশগুলিকে জুড়িয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর নাই। ইহা উড়িষ্যার ন্যায় জঙ্গলমহলেই বেশী দেখা যায়। যেখানে পাহাড় আছে, নিবিড় অরণ্য আছে, সেখানে শুধু একটা গড়খাই কাটিয়া, তাহার চারিদিকে প্রাচীর তুলিলেই হইত। অরণ্য ভেদ করিয়া সেই দেশ জয় করিয়া লাভ কিছু ছিল না; তাই কতকটা অপারগতার জন্য, কতকটা অনিচ্ছার জন্য, তাহাদের স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিত না।

বর্গির হাঙ্গামার পর দেশ যখন অরাজক হইয়া উঠিল, তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া, মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহলে এমনি কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্য মাথা তুলিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে গড়বেতা ও ঘাটশিলা অন্যতম। বিগত যশোহর 'সাহিত্য-সম্মিলনে' গড়বেতা-রাজ্যের ইতিহাস প্রদান করিয়াছি। এবার ঘাটশিলা-রাজ্যের ইতিহাস বর্ণন করিব। ঘাটশিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানিতে পারি নাই। ইহার পূর্ব্ব-ইতিহাসও জানিতে পারি নাই। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে, ইহার ইতিহাস আমরা পাই। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র, তার উপর তাহার ইতিহাসেও তেমন কোনও বিশেষ চিরস্মরণীয় ঘটনা হয় নাই, তাই এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এই ঘটশিলা রাজ্যের দিকে নিপতিত হয় নাই।

মেদিনীপুর যখন কোম্পানির অধিকারে আসিল, তখন এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। কোম্পানির একদল সেনা ফারগুসন সাহেবের অধীনে মেদিনীপুরে যাত্রা করিল। একে একে সকল রাজাই কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিল।

করিল না শুধু—ঘাটশিলা। ফার্গুসন সাহেব, রাজার নিকট দুই জন দূত পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা ঘাটশিলায় প্রবেশ করিতে পাইল না। কাজেই যুদ্ধ ব্যতীত আর কোনও উপায় রহিল না। ঘাটশিলার সহিত নিকটবর্ত্তী রাজাদের শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। সেই সুযোগ রাজা, কোম্পানিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কল্যাণপুর, জম্বুনি ও কাটিবন্নির রাজারা অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া সাহেবের সহিত যোগদান করিলেন। ঘাটশিলার রাজাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও ২০০০ সৈন্য লইয়া জম্বুনি হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটী মাঠে কোম্পানীর সৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই প্রান্তরের সম্মুখে নিবিড় অরণ্য ও চারি পাশে নালা ছিল। সুতরাং এখানে আত্মরক্ষার সুবিধা ছিল।

কোম্পনীর সহিত যুদ্ধ।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। সকাল বেলা। ফার্গুসন সাহেব নিজেই অগ্রসর হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজা নালার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সাহেব নিজের সৈন্যদল দুই ভাগে ভাগ করিলেন—দুই দিক হইতে একযোগে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আক্রমণ করিতে গিয়া নিজেই আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। ফার্গুসন সাহেব তথাপি দমিলেন না। শেষে তাঁহারই জয় হইল। রাজসৈন্য বিন্দের প্রান্তরে শেষ বার দাঁড়াইল। কিন্তু সেবারও তাঁহার পরাজয় হইল। শেষে ২২শে মার্চ্চ তারিখে সাহেব ঘাটশিলা অধিকার করিলেন। কিন্তু এই অধিকার করিতে কোম্পানিকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রত্যেক হাত জমি যুদ্ধ করিয়া তবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এমনি করিয়া ষোল ক্রোশ পথ যাইতে হইয়াছিল। পথে শুধু আর একটী সম্মুখ যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা পুরগ্রামের যুদ্ধ। ঘাটশিলা অধিকৃত হইলে, কিন্তু পলায়নকালে রাজা দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া গেলেন। সাহেব গিয়া দেখিলেন, গ্রামের বাড়ী ঘর দুর্গ রাজপ্রাসাদ সব জ্বলিতেছে।

রাজার সৈন্যদল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আক্রমণের জন্য লুকাইয়া ছিল। কিন্তু ইংরেজের কামানের সম্মুখে তারা আর থাকিতে পারিল না। রাজা সসৈন্যে নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু শেষে তিনিও বন্দী হইলেন। বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, সেই স্থানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কিহুকে বসান হইল। কিহু রাজা হইয়া জগন্নাথ ঢাল নাম গ্রহণ করিল। কিন্তু এই নূতন রাজাও ঠিক-মত খাজনা দিতে পারিলেন না। খাজনা বাকি পড়িয়া গেল। তখন তিনিও বিদ্রোহের উদ্যোগ করিলেন। কোম্পানি লেফ্‌টেনাণ্ট কককে দুই দল সৈন্য দিয়া ঘাটশিলায় পাঠাইলেন। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা কোম্পানির মতলব ছিল না, রাজার উপদেষ্টাগণকে সরাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের সৈন্যপ্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। কক সাহেব ঘাটশিলায় গেলেন। কিন্তু নিজে জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন কোম্পানি তাঁহার স্থানে কাপ্তেন মর্গানকে পাঠাইলেন। রাজা এবার প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইলেন। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কয় জন জমিদারের সহিত মিলিত হইয়া, কোম্পানিকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন।

রাজা জগন্নাথ ঢাল ঘাটশিলা হইতে ২০ ক্রোশ দূরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এদিকে মর্গান সাহেব ঘাটশিলা অধিকার করিলেন। কোম্পানি তখন দেখিলেন, জগন্নাথ ঢাল কিছুতেই কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করিবেন না, তখন তাঁহারা জগন্নাথকে রাজ্যচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ডান্সিটার্ট সাহেবের পরামর্শ মত কোম্পানি জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর নিমু ঢালকে ঘাটশিলার রাজত্ব প্রদান করিলেন। তার পর মর্গান সাহেব জগন্নাথ ঢালের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। বামনঘাটীর জমিদার ও ময়ূরভঞ্জের রাজাও জগন্নাথকে গোপনে সাহায্য করিতেছিলেন। জীবন রায় নামক একজন ক্ষমতাশালী জমিদার জগন্নাথের পক্ষে ছিলেন। সকল সৈন্য লইয়া জগন্নাথ কোম্পানির সিপাহী দিগকে একযোগে আক্রমণ করিলেন না। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া মর্গানকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোম্পানির সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সমক্ষে এই অর্দ্ধশিক্ষিত সেনাদল বেশী দিন যুঝিতে পারিল না। কোম্পানি পরিশেষে জয়ী হইলেন। জগন্নাথ পলায়ন করিলেন, মেদিনীপুরে শান্তি স্থাপিত হইল।

কিন্তু এই শান্তি অধিক দিন স্থায়ী হইল না। জগন্নাথ ঢাল, চুয়াড়দের হস্তগত করিয়া আবার মাথা তুলিলেন। সে সময় মেদিনীপুরে কোম্পানির বেশী সিপাহী ছিল না। জগন্নাথ ৫০০০ চুয়াড়-সৈন্য লইয়া ঘাটশিলা ও বরাহভূম আক্রমণ করিলেন। কোম্পানির অল্পসংখ্যক সৈন্য তাহাদের নিকট পরাভূত হইল। জগন্নাথ ঘাটশিলা অধিকার করিলেন। রাজা নিমু ঢাল নরসিংহগড়ের দুর্গে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। কোম্পানি বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া কাপ্তেন ফর্বেস ও লেফ্‌টেনাণ্ট নান্ নামক দুই জন সেনাধ্যক্ষ সাহেবকে পাঠাইলেন। ফর্বেস অনায়াসে ঘাটশিলা হইতে বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিলেন। নান সাহেব বরাহভূম আক্রমণ করিলেন এবং সেখানেও চুয়াড়েরা তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারি তারিখে নান্ সাহেব হঠাৎ জগন্নাথের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অকস্মাৎ আক্রমণের ফলে কোম্পানির সিপাহীরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নান্ সাহেব নিজেও আহত হইলেন। বিদ্রোহিগণ জয়লাভ করিল।

এই পরাজয়ের সংবাদ শীঘ্রই কলিকাতায় গেল। কোম্পানি নান সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট বেট্‌ম্যান সাহেবকে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে ফর্ব্বেস সাহেবও উহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখন তিন জনে একত্রে জগন্নাথকে আক্রমণ করিলেন। চুয়াড়েরা তখন জঙ্গলের ভিতর পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) জগন্নাথ আবার ঘটশিলা আক্রমণ করিলেন। তখন এড্‌ওয়ার্ড বেবার সাহেব মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট। তিনি কোম্পানির নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। জগন্নাথ এবারও বিতাড়িত হইলেন। কিন্তু ঘাটশিলা দখল করিয়াও কোম্পানি খাজনা আদায় করিতে পারিলেন না। প্রজারা সকলেই জগন্নাথের পক্ষপাতী, সুতরাং কেহ খাজনা আদায় দিতে চাহিল না। কোম্পানি তখন বাধ্য হইয়া অযোগ্য রাজা নিমুঢালকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। বৈকুণ্ঠ ঢাল রাজা হইলেন। কিন্তু ইঁহাকে লোকে মানিতে চাহিল না। শেষে কোম্পানি বাধ্য হইয়া জগন্নাথ ঢালকে স্বরাজ্যে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। জগন্নাথ এবার কোম্পানিকে কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া, কোম্পানির অধীন জমিদার মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

পরবর্ত্তী রাজগণ।

রাজা জগন্নাথ ঢাল (১৭৬৭)
রাজা নিমুঢাল (১৭৬৭—১৭৭৬)
রাজা বৈকুণ্ঠ ঢাল (১৭৭৬)
জগন্নাথ ঢাল (দ্বিতীয় বার ১৭৭৬—১৮৬৭)
রামচন্দ্র ঢাল (১৮৬৭—১৮৮৭)
শত্রুঘ্ন ঢাল (১৮৮৭—১৯০৩)

প্রমাণ-পঞ্জী।

(ক) রাজ-পরিবারের কাগজ-পত্র।

(খ) Records of the East India Company :—

1 Letter from John Fergusson to John Graham —
(a) Dated Balrampur, 13th March, 1767
(b) Dated Camp near Bind, 18th March 1767
(c) ,, Ghatsila Fort, 22nd March, 1767.

2 Letter from George Vanisttart to Richard Becher, Dated 1st June, 1768.

3 Letter from Charles Morgan to Vanisttert, Dated Norsinghus 8th July, 1768.

4 Letter from Vansittart, to Becher, Dated 28—7—68

5 ,, ,, Morgan to Resident, Dated Camp, Haldipukher, 6th Aug 1768.

6 Letter from Vansittart to Claud Russel, Collector, Dated 14th Dec. 1767.

প্রেমিক।

[শ্রীমতী লীলা দেবী বিরচিত।]

(মোরা) হরিনামের সুধা খেয়ে
বেড়াই বনে বনে,
ধাইনা কভু অন্য ফুলে,
মোরা সব অলিকুলে,
নাই কো তৃষা মোদের কভু
অন্য মধু পানে।
হরিপদ-কোকনদ
প্রাণে দেয় কি আমোদ,
আছে কি অন্য মদ
তাহার তুলনে?
নামেতেই মাতোয়ারা,
প্রেমেতেই হারা মোরা;
ভাবেতেই ঢুলু ঢুলু
ঝ'রছে দু'নয়নে;
(মোরা) হরিনামের সুধা খেয়ে
বেড়াই প্রেমের বনে।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি-কালের কথা।

[শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি-এ লিখিত।]

MRGESCHICHTE.

[মানবের উৎপত্তি, সভ্যতা-বিস্তৃতি প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার গতি কোন্ পথে প্রধাবিত, জ্ঞানার্থিজনের সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই প্রবন্ধ তৎপক্ষে সহায়তা করিবে। দুই দিক না দেখিলে, সত্যতত্ত্ব নির্ণয়-পক্ষে সংশয় আসে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসেই" বা কি মত ব্যক্ত হইয়াছে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই বা কি মত ব্যক্ত করেন, তুলনায় দুই মতের সমালোচনা করিয়া সুধিগণ সত্যতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন,—ইহাই আশা করি।—"সাহিত্য-সংবাদ" সম্পাদক।]

* * *

প্রবন্ধের বিষয় অবতারণা করিবার পূর্ব্বে দু-একটি কথা বলিতে চাই। সংস্কৃত, অবেস্তা, গ্রীক, লাতিন, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষাভাষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ একই স্থানে ছিলেন এবং গোড়ায় তাঁহাদের ভাষা কতকটা একই রকমের ছিল, এরূপ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নহে। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্লাইকার (Schleicher), ব্রুগমান (Brugmann) এবং আরো অনেকে, সেই আদিভাষা কিরূপ ধরণের ছিল—তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পুনর্গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আবাসভূমি কোথায় ছিল, তাহা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এই সকল আলোচনা হইতে আর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাক আর নাই যাক—একটি কথা বেশ বুঝা যায় যে, যিনি যে জাতীয় ভাষার চর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তিনি সেই ভাষাভাষীর দেশের নিকটবর্ত্তী কোথাও স্থানটা স্থির করিয়াছেন। আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালার মুখে শুনিয়াছি যে, বর্ত্তমানে এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জার্ম্মাণির শ্রাডার (Schrader) সাহেবও এই কথা তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেহ মধ্য-এশিয়ায়, কেহ সুইডেনে, কেহ বা রুশিয়ায়—ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি বাসস্থান নিরূপিত করিতেছেন। সকল মতের আলোচনা-পূর্ব্বক এডিনবরার স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ কিথ (Keith) বলেন যে, কাস্পিয়ান-হ্রদের কাছাকাছি মধ্য-এশিয়ার মালভূমির কোনো স্থানে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি বাসভূমি ছিল। যাহা হউক, কালক্রমে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন, এবং তাঁহাদের ভাষা পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমে ইউরোপ এবং আধুনিককালে আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

* হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন পঠিত বলিয়া পরিগৃহীত।

দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। অবশ্য একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁহাদের ভাষাভাষী লোকমাত্রেরই জাতিও যে এক হইবে, এমন নয়। অনেক জাতি ইন্দো-ইউরোপীয়গণের সংস্রবে আসিয়া তাঁহাদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে এবং পক্ষান্তরে তাঁহাদের ভাষাতেও তাহাদের ভাষার প্রভাব ঢুকিয়াছে। রক্তের মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও অনেক মিশাল চলিয়াছে।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের একত্র বাসের সময় তাঁহারা কি কি গাছপালার ও পশুপক্ষীর সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের কৃষির অবস্থা, পশুপালন এবং সামাজিক সম্বন্ধ কতটা কিরূপ ধরণের ছিল, ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা-সমূহের সাক্ষ্য হইতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইবে।

এই বিবরণ সংগ্রহে প্রাণিতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির সাহায্য লইয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণকে অগ্রসর হইতে হইবে। বিষয়টি বড় চমৎকার! কিন্তু এতদিন ইহা বাংলাতে কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই. তাই এদিকে যোগ্যতর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। অবশ্য আমি মৌলিকতার কিছুমাত্র দাবী করিতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা এবং কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জাইল্‌স (Giles) মহোদয়দের সংগৃহীত উপাদান হইতেই আমার প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রাডারের প্রবন্ধাদির উপর ভিত্তি করিয়া ইন্দো-ইউরোপীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার-পদ্ধতি, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অবশেষে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। ম্যাক্‌সমুলার (Maxmuller), শ্রাডার (Schrader) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইন্দো-ইউরোপীয় অর্থে আর্য্য-শব্দটি সাধারণের মধ্যে চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আর্য্য শব্দটি এখন ইরাণীয় এবং ভারতীয় শাখাকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কারণ, এই দুইটি জাতিই নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিব, তাহার তারিখ খৃঃ পূঃ পাঁচ হাজার হইতে আট হাজার বৎসর হইবে। অর্থাৎ, এখন হইতে প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচিত হইবে।

(১) প্রাণীদের কথা ও পশুপালন।

ঘোড়া, গাধা, গরু, ভেড়া, ছাগল, উট, মহিষ, অশ্বতর, শূকর, হরিণ, কুকুর, বীবর, ভালুক, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর সহিত ইন্দো-ইউরোপীয়গণের পরিচয় ছিল। ইহার মধ্যে অশ্ব এবং গবাদি পশুই তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসিত। আমরা এস্থলে একে একে এই সকল পশুর কথা কিছু বলিব। পরে পাখী, গাছপালা, শস্য এবং সামাজিক-সম্বন্ধের আলোচনা করা হইবে।

অশ্ব।—ইন্দো-ইউরোপীয়গণের বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বের সহিত মানব-জাতির পরিচয় ছিল। "প্রত্নপ্রস্তর" যুগের মানবের শিল্পকলায় ইহা একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপে দুই জাতীয় অশ্বের কথা জানা ছিল, এক রকম মাথা লম্বা এবং

চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যা।

[শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের লিখিত।]

চামুণ্ডাতন্ত্র-মতে,—'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

দেবী ভগবতীর এই দশমূর্ত্তিই দশমহাবিদ্যা। ইহা সিদ্ধবিদ্যা নামেও খ্যাত।

এই দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশে সাধারণের বিশ্বাস—সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন। ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উদ্যত হন, কিন্তু মহামায়া দশদিকে দশমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। যে দশমূর্ত্তিতে মহামায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই দশমহাবিদ্যা।

এই মহাবিদ্যার বিভিন্ন মূর্ত্তি বিগ্রহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, কিন্তু একত্র একস্থানে দশমহাবিদ্যার সমাবেশ—এক চাঁচড়া ভিন্ন অখণ্ড বঙ্গের—বঙ্গের কেন—সমগ্র ভারতের আর কোনও স্থানে নাই। সুতরাং বাঙ্গালার এই অদ্ভুত ও অদ্বিতীয় দেববিগ্রহ-কাহিনী যে সুধিবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, সে ভরসা আমাদের আছে।

যে চাঁচড়া-নগরে দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা যশোহর জেলার সদর-ষ্টেশনের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই নগর উত্তররাঢ়ী কায়স্থ রাজাদিগের রাজধানী বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই চাঁচড়া-নগরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণকুলে ভরদ্বাজ গোত্রে দুর্গানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই দুর্গানন্দ ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। এই ভক্তির আতিশয্যেই যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। তখন দেশে রেল-ষ্টীমার আইসে নাই। রাস্তা-ঘাট আদিও ভাল ছিল না। সুতরাং তখন তীর্থপর্য্যটন এক প্রকার সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। কিন্তু অসাধ্য হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ দুর্গানন্দ তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল তীর্থই পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কত অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহী যে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কাহারও চোখে যাহা পড়ে নাই, দুর্গানন্দের চোখে তাহাই পড়িল। তিনি দেখিলেন—ভারতের নানা-স্থানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তিবিগ্রহ একত্র সমাবেশ কোথাও নাই। এ অভাব তাঁহার প্রাণে বড় বাজিল। কি উপায়ে ইহা স্থাপিত করিতে পারে

এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক জন আত্মীয়ের সহিত তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার এ কল্পনা বাতুলোচিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। দুর্গানন্দ ইহাতে বড় ব্যথা পাইলেন, মনে মনে ভাবিলেন,—"হায়! দরিদ্রের মনোরথ মনেই বিলীন হইল।" কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সহায়। সদিচ্ছা যে-কোন ভাবেরই হউক, ভগবান নিজে তাহার পূরণ করেন। দুর্গানন্দের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

একদিন রাত্রিকালে দুর্গানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন,—যেন একজন জটাজূটধারী বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ দীর্ঘকায় বিরাট্ পুরুষ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তোমার দেবভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার সাধুসঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তুমি অবিলম্বে দেশের শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া আপন সঙ্কল্প ব্যক্ত কর। তিনি তোমার বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

এই স্বপ্ন দেখিয়া, দুর্গানন্দ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন এবং সেই রাত্রিতেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। নবাব সুজা খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। তখনকার দিনে নবাব-বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু ভগবান যখন যাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, তাহার পক্ষে কিছুরই অভাব হয় না। দুর্গানন্দের অদৃষ্ট তখন সুপ্রসন্ন। তাই, তিনি যেদিন মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলেন, সেই দিনই নবাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ-লাভ করিলেন। নবাব ধীরভাবে দুর্গানন্দের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর আপনি দেশে চলিয়া যান। আমি আপনার জমিদার চাঁচড়ার রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইতেছি। আপনি বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনার অভিপ্রেত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

তখন ধর্ম্মপ্রাণ শুকদেব রায়—চাঁচড়ার রাজা। দুর্গানন্দ তাঁহার সহিত দেখা করিলে, নিজের স্বভাবসিদ্ধ দেবভক্তিতে ও নবাবের অনুরোধে, শুকদেব বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইলেন। তিনি লোকজন ও অর্থসাহায্য দ্বারা বিগ্রহ ও দেবালয় প্রস্তুত করিতে এবং তাহার প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ধাতু, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ—কি দিয়া কাহার দ্বারা বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইবেন, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দুর্গানন্দ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তবে যেখানে মুস্কিল, সেই খানেই আসান। রাত্রিকালে দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে স্বপ্নে কহিলেন,—"বৎস, কোনও চিন্তা নাই। তোমার বাসগৃহ হইতে নৈর্ঋত কোণে তিন শত হাত দূরে জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ আছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই তোমার দ্বারে চারি জন বিদেশী সূত্রধর উপস্থিত হইবে। তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কল্য প্রত্যূষেই ঐ বৃক্ষ কাটাইয়া সূত্রধরদিগের উপর দশ-মহাবিদ্যা নির্ম্মাণের ভার দিও। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

নিদ্রাভঙ্গে দুর্গানন্দ হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। তিনি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে বাহিরে আসিতেই চারিজন বিদেশী সূত্রধর তাঁহার সম্মুখীন হইল।

তিনি স্বপ্নাদেশ-মত তাহাদিগকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট নিম্ববৃক্ষ কাটাইয়া তাহাদিগের উপর বিগ্রহ-নির্ম্মাণের ভার দিলেন। সূত্রধরগণ দশমহাবিদ্যার বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া পরে উদ্বৃত্ত কাষ্ঠে নিজেদের ইচ্ছামত গণপতি প্রভৃতি আর ত্রয়োদশটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিল। দুর্গানন্দ তাহা দেখিলেন। কিন্তু সকলই দেবাদিদেবের ইচ্ছা বুঝিয়া, তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

এদিকে রাজা শুকদেবের অর্থে উত্তর-পশ্চিমের পোতায় ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির, পূর্ব্বের পোতায় ভোগের ঘর ও দক্ষিণ পোতায় বা সদর দেউড়ীতে দ্বিতল নহবৎখানা প্রস্তুত হইয়া গেল। যথাসময়ে আষাঢ় মাসের শুভ শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রার দিন মহাসমারোহে শাস্ত্রব্যবস্থানুযায়ী দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর পোতার মন্দিরে যথাক্রমে গণপতি, বীণাপাণি, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কালভৈরব এবং পশ্চিমের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান ও শীতলা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইল। ভগবদ্ভক্ত দুর্গানন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফল ফলিল।

দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির সেবাপূজার ভার দুর্গানন্দের উপর থাকিল, আর সেবাপূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজা শুকদেব জমিদারীর লভ্যাংশের প্রতি টাকা হইতে বার্ষিক ৴১০ গণ্ডা করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজা শুকদেবের এবং তৎপুত্র রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে এই ভাবেই বিগ্রহের সেবাপূজা চলিয়াছিল। রাজা নীলকণ্ঠের পরে তাঁহার পুত্র শ্রীকণ্ঠ ১১৭১ সালে চাঁচড়া-রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। তিনি কিন্তু এ ব্যবস্থা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যতদিন জমিদারীর অবস্থা স্বচ্ছল থাকিবে, ততদিন এইভাবে সেবাপূজা চলিতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনও কারণে আয় কমিয়া যায় কিম্বা জমিদারী হস্তচ্যুত হয়, তখন দেবসেবার বিঘ্ন হইবে—দেবসেবা বন্ধ হইয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে। তাই তিনি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজ জমিদারী হইতে বার্ষিক আট সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দশমহাবিদ্যার দেবোত্তর দান করিলেন। ইহার পর সেবাকার্য্য ভালভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেবায়েৎগণ দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহার করিতেছেন—অনুমানে, ১২৪০ সালে গবর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

তখন দুর্গানন্দের পুত্র যশোমন্তের কনিষ্ঠ পুত্র কৈলাসচন্দ্র-ব্রহ্মচারী দশমহাবিদ্যার সেবায়েৎ ছিলেন। দেবোত্তর বাজেয়াপ্ত হইয়া গেলে, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ বাজেয়াপ্ত মহাল "দশমহাবিদ্যার বৃত্তির মহল" নামে খারিজা তালুক করিয়া লইলেন। কৈলাসচন্দ্র ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাই, নিজ নামে তালুক করিয়া লইলেও, ঐ তালুকের আয়ের কতকাংশ দিয়া সেবাপূজার কার্য্য চালাইতেন। নিঃসন্তান কৈলাসচন্দ্র পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র শশিভূষণ ব্রহ্মচারীর উপর বিষয়-কর্ম্ম ও দশমহাবিদ্যার সেবার ভার দিয়া একান্তে মায়ের উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শশিভূষণের হস্তে বিষয়-কার্য্য ও সেবার কার্য্য বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। তিনি মন্দির-সম্মুখে পাকা চাঁদনী

প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অকালে শশিভূষণ পরলোক গমন করায় আরব্ধ কার্য্য আর শেষ হইল না। বিষয়কার্য্যেও নানা অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। কৈলাসচন্দ্র তখন সংসার-বিরাগী ও প্রাচীন। তিনি কোনদিকেই মন দিতে পারিতেন না। ফলস্বরূপ তালুকের লাটের কিস্তি বাকী পড়ায়, গবর্ণমেণ্ট এই "দশমহাবিদ্যার বৃত্তির মহাল" নিলাম চড়াইলেন। এবার ১৫০০০০ টাকায় চাঁচড়ার রাজাবাহাদুরগণ অর্দ্ধাংশ ও যশোহর নরেন্দ্রপুরের পিরালী ব্রাহ্মণ জমিদার মহিমাচন্দ্র মজুমদার বাকী অর্দ্ধাংশ খরিদ করিয়া লইলেন।

এখন হইতে ব্রহ্মচারীদের নিজস্ব যে সম্পত্তি, তাহার লভ্যাংশ দ্বারাই কোনপ্রকারে সেবার কার্য্য চলিতে লাগিল। মহিমাবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দশমহাবিদ্যার সেবার জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। চাঁচড়ার রাজগণও মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহাদের সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ বিক্রীত হইয়া যাওয়ায় এখন তাঁহারা মাত্র ৭৲ টাকা করিয়া দিতেছেন।

শশিভূষণের মৃত্যুতে নিঃসন্তান ও সুপ্রাচীন কৈলাসচন্দ্র দেব সেবার কার্য্য লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নিজের কিছু করিবার সাধ্য ছিল না। তাই তিনি নিজের ৩০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি বাড়ীঘরসহ দেবসেবার কার্য্যে নিজ ইষ্টদেবতা খুলনা জেলার চন্দনিমহল-নিবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উইল করিয়া দেন। কৈলাসচন্দ্রের জীবিত-কালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শানুসারে বিষয়-সংরক্ষণ ও দেবসেবার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ১৩০২ সালে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, তিনি নিজেই উইলের সর্ত্তানুসারে স্বাধীনভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

যখন দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তখন সকল বিগ্রহেরই নিত্য বিশেষ জাঁকজমক-সহকারে ষোড়শোপচারে পূজা-ভোগ ও আরতি হইতে, কিন্তু এখন আর সেরূপ হয় না। এখন সেবায়েৎদিগের নিজসম্পত্তির আয় ও দেবদর্শনাগত যাত্রীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যৎসামান্য প্রণামী ভরসা। তাই সংবৎসরের মধ্যে আষাঢ় মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে—প্রতিষ্ঠার দিন, এবং দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মাত্র সকল বিগ্রহের পৃথক পৃথক পূজা হয়। এই তিন দিন পাঁঠা বলিও হয়। কিন্তু অন্যান্য দিন এক মূলঘটে একস্থানেই সকল বিগ্রহের ফুলফলে পূজা হয়। রাত্রিতে আরতি ও ভোগ হয়, কিন্তু সেও সামান্য রকমের।

দেবমূর্ত্তিসমূহ দারুনির্ম্মিত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহা অভগ্ন ও নিখুঁত অবস্থায় আছে। তবে স্থানে স্থানে রঙ্ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মাত্র চারি বৎসর পূর্ব্বে উৎকল-দেশীয় চিত্রকর দ্বারা পুনর্ব্বার বিগ্রহদিগের অঙ্গরাগ করান হইয়াছে।

মন্দিরগুলির অবস্থা এরূপ হীন হইয়াছে যে, সংস্কার সাধিত না হইলে অচিরেই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সেবায়েৎগণের অবস্থার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। চাঁচড়ার বর্ত্তমান অধীশ্বরগণও গ্রহবৈগুণ্যে এখন পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন নহেন। তাই অনন্যোপায় সেবায়েৎগণ দেবসেবার ব্যবস্থার ও ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির সংস্কার প্রার্থনা করিয়া বঙ্গের স্বধর্ম্ম-নিরত হিন্দুগণ-সমীপে বহুদিবস হইতেই কাতর আবেদন করিয়া আসিতেছেন।

মুক্তা-চয়ন।

[শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সঙ্কলিত।]

(ইংরাজী হইতে)।

১। আগামী কল্য।

(Shelly's "To-morrow")

কোন্‌খানে তুমি চিরবাঞ্ছিত
আগামী কল্য হায়?
যুবক-বৃদ্ধ-দুর্ব্বল-বলী
তোমারেই সদা চায়।
ধনী দরিদ্র সুখ-দুঃখের
অতল-সাগরে-আসি,
খুঁজিছে নিত্য তব অধরের
শুভ্র মধুর হাসি।
চির দিন ধ'রে ঘৃণা করি যারে
ত্যজিলে যাহারে বাঁচি;
নিশি-শেষে হেরি—সেই 'আজিকারি'
কোলেতে শুইয়া আছি!

* * *

২। প্রেম।

(Shakespeare)

প্রেম দেখে মন দিয়ে
আঁখি দিয়ে নহে,
রতিপতি অন্ধ তাই
কবিজনে কহে।

* * *

৩। ভক্তি ও প্রেম।

(Byron)

জ্যোতিঃ-কণা বাসনার ঘন তমসায়,
বিধাতার পূত দান—প্রেম—মর্ত্ত্যভূমে।
ভক্তিতে ভক্তের মন উপরে উঠায়,
প্রেমবলে প্রিয়তম নীচে আসে নেমে।

(সংস্কৃত হইতে)

৪। ময়নার খেদ।

খাঁচায় ঘেরা ময়না বলে
"ওহে যদুনন্দন!
তোমার নাম ত উচ্চারিলে
ঘোচে ভব-বন্ধন।
কিন্তু হে নাথ, যতই আমি
করি
ততই বাঁধন শক্ত হ'য়ে
করে অনুবর্ত্তন!"

* * *

৫। দোষগুণ।

সাধুজন বেছে লন্
অপরের গুণগুলি।
দুষ্ট লোকে তুষ্ট হ'য়ে
দোষ লয় বেছে তুলি,
রক্ত ত্যজি অনুরক্ত
শিশু মাতৃ-স্তন পানে,
জলৌকা পীযূষ ভুলি'
দেহের শোনিত টানে।

* * *

৬। পারস্পারিক প্রমাদ।

শুকচঞ্চু চুমে কিংশুক ভ্রমে
ভ্রান্ত ভ্রমর এসে,
জম্বু ফল বলি' ফেলে শুক গিলি',
প্রাণ যায় তার শেষে।

* * *

(ফার্শী হইতে)

৭। মূর্খ ও জ্ঞানী।

(ওমর খৈয়ম্)

সুজন সুধীর সাথে কাটায়ো সময়।
গুণহীন মূর্খে হেরি' যাবে দূরে স'রে।
জ্ঞানী-দত্ত বিষ খেয়ো হইয়া নির্ভয়,
অবোধের মহৌষধ ছুঁয়োনা অধরে।

* * *

৮। অভিন্ন।

(আমীর খস্রু)

তুমি আমি একজন।
দুজনার সুখের মিলন।
আত্মা তুমি, দেহ আমি,
আমি দাসী, তুমি মম স্বামী।
বল কে বলিতে পারে,—
ভিন্ন মোরা ভূলোক মাঝারে?

* * *

৯। ভিতর ও বাহির।

(হাফেজ)

কুঞ্জকাননে গোলাপের দল
দোলে নিজ মধুরসে;
বুলবুল গাহে মিঠা মিঠা বুলি
পবনের নিশ্বাসে।
গোলাপ শুকায়ে যাবে গো,
পাখী আর নাহি গাবে গো;
সৃষ্টির শোভা বাহিরে ফুটিয়া
দুদিনে মিলায়ে যায়;
স্রষ্টার শোভা দেখিতে নিত্য
আয় রে ভিতরে আয়।

* * *

(হিন্দি হইতে)

১০। ধনী ও গরীব।

(কবীর)

ধনীর পায়ে ফুট্‌লে কাঁটা
সবাই দুঃখ পায়;
পাহাড় থেকে পড়্‌লে গরীব
কেউ-না ফিরে চায়।

১১। পুত্র।

(তুলসীদাস)

পুত্র এবং মূত্রধারা একই পথে হয় ত সৃষ্ট;
ভক্তিশূন্য পুত্র গণ্য মূত্র হ'তে অপকৃষ্ট!

* * *

১২। অপরিণীতা ও অপরিণত।

কুমারী বালিকা কুসুম কলিকা
পুতুলের মাঝে থাকে ভুলে;
পতি-প্রাণা হ'লে খেলা যায় চ'লে,
পেটিকায় তাহা রাখে তুলে।
তেমতি তুলসী করিতেছ বসি'
জপ, তপ, দেব আরাধনা;
সকলি ভুলিবে যখন মিলিবে
হৃদয়ের [illegible]।

* * *

(বাঙ্গালা হইতে)

১৩। মানব-মন।

(রামকৃষ্ণ দেব)

ভূমিতে পড়িল যদি মুষ্টি সরিষার,
খুঁটিয়া কুড়ান তারে কঠিন ব্যাপার।
সংসারে মানব-মন যদি পরি' যায়,
অচিরে উঠান তারে সত্য বড় দায়!

* * *

১৪। হীরেমতি।

'হীরে-মতি' মিলে বহু বাজারেতে গেলে;
কিন্তু ভাই 'কৃষ্ণে মতি' কটা লোকে মেলে?

* * *

১৫। সংসার-কাঁঠাল।

কাঁঠাল ভাঙিতে গেলে আঠার যে ভয়!
তাই নরে নিজ করে তেল মাখি লয়।
সংসার-কাঁঠাল-ফলে ঠিক সেই মত,
কামিনী-কাঞ্চন-আঠা লাগিয়া সতত!
নির্লিপ্ত-নিঃশঙ্ক-ভাবে ভোগ যদি চাও;
তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ তেল হাতে মেখে নেও!

* *

পুস্তক-পুস্তিকা।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের "সাহিত্য সংবাদে" কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছে। এই সংখ্যায় আরও কয়েকখানির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

* * *

গান।—দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।—রায় সাহেব কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য মাত্র আট আনা। এই গান-গ্রন্থের নাম "আগমনী" বলিলেও বলা যায়। মা-জগজ্জনীর আগমনে ভক্তের প্রাণে কি ভাবকুসুম ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির পটে কি সুভাব সুন্দর ছবি প্রকটিত হয়,—এই 'গান'-গ্রন্থে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। কবিবর বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের রচনা যে কি ভাবময় মধুরিমাপূর্ণ তাহার এখন আর পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক করে না। গান-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান বঙ্গে গীত রচনায় তাঁহার আসন কাহারও নিম্নে নহে। মায়ের আগমনের দিনে 'আগমনী' মূলক এই গ্রন্থের যে সর্ব্বত্র আদর হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে আশা করি।

* * *

পাণ্ডব-গীতা ও ভারত-সাবিত্রী।—শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন প্রণীত। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। কবিরঞ্জন ক্ষেমেশচন্দ্র স্বভাব-কবি। সেকালে আমাদের দেশের কবিরা যেমন একান্তে পুষ্পচয়ন করিয়া একান্তে জননীর চরণে অঞ্জলি দিতেন; কবিরঞ্জন ক্ষেমেশচন্দ্র কতকটা সেই প্রকৃতির কবি। এক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোক, অপর (সামনের) পৃষ্ঠায় তাহার পদ্যানুবাদ—এই ভাবে এ গ্রন্থ বিরচিত। পদ্যানুবাদ সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

* * *

ভ্রান্তি-বিজয়।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। এই গ্রন্থে—"বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা" আছে। এই গ্রন্থে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন ভূয়োদর্শন, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যদিও তাঁহার প্রতিপাদ্য দুই একটী বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তি-তর্ক কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এ গ্রন্থের উপর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। দুই খণ্ডের আকার ৩৮০ পৃষ্ঠার উপর। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপন সমাজের এবং তদধীন মাহিষ্য-সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার-পক্ষেও এ গ্রন্থ সহায়তা করিবে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে মাহিষ্য সম্প্রদায়কে এবং গৌড়াদ্য-ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

বাল্য-লীলা-সূত্র।—শ্রীমল্লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীতম্। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত ও সম্পাদিত। "শ্রীশ্রীবাল্য-লীলা সূত্র একখানি সংস্কৃত পদ্য-গ্রন্থ। শ্রীহট্ট লাউড়াধিপতি রাজযোগী (কৃষ্ণদাস) দিব্যসিংহ ইহার প্রণেতা। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যচরিত ইহাতে কীর্ত্তিত।" পণ্ডিত অচ্যুতচরণ, বৈষ্ণব-সাহিত্যালোচনার প্রতিষ্ঠান্বিত। তিনি সুলেখক সহৃদয় ও পরম বৈষ্ণব। কৃষ্ণদাসের সংস্কৃত মূল ও তাঁহার পদ্যানুবাদ—বাল্য লীলা-সূত্রে—মণি কাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেই যে এই ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক জীবনী-গ্রন্থ আদরে পাঠ করিবেন, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি।

—:*:—

সাময়িক।

বেদ-বিদ্যালয়।

বেদের চর্চ্চা এ দেশে প্রায় লোপ পাইতেই বসিয়াছিল। শুভ লক্ষণ,—সংপ্রতি তৎপক্ষে একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যালয় ছিল না। এখন সে বিষয়েও চেষ্টা চলিতেছে। খুব সম্ভব, এই হাওড়া-সহরেই বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আগামী মাসের 'সাহিত্য-সংবাদে' তদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিব, আশা করি। বঙ্গদেশ বেদালোচনায় উদ্বুদ্ধ হইবে না কি?

ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ বৎসর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদিন যে ব্রাহ্মণসভা তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। নচেৎ, গবরমেণ্টের উপাধি-ভূষিত না হইলেও, নিষ্ঠায় ও জ্ঞানে তিনি যে এখন শীর্ষস্থানেই আছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণ-সভার এই নির্ব্বাচন—ব্রাহ্মণ-সভারই উপযুক্ত কাজ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

হাওড়া-সহরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের' অধিবেশন উপলক্ষে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত, বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার কয়েকটী প্রবন্ধ এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর তিনটী সঙ্গীত (তিন স্থানে), এবার 'সাহিত্য-সংবাদে' প্রকাশিত হইল। ঐ সকল প্রবন্ধ ও সঙ্গীতাদি একত্রে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলে, কি উপাদেয় সামগ্রী হইবে, সহজেই অনুমেয়। যাঁহারা ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে চাহেন, সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয়ের নামের পত্র লিখিয়া নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিবেন—এই প্রার্থনা। কেন-না, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ ছাপা হইবে। সকল প্রবন্ধ যদি ছাপা হয়, প্রতি খণ্ডের মূল্য হওয়া সম্ভব—৫৲ পাঁচ টাকা।

নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

[কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে।

দেবৈর্ভির্যাহি যক্ষি চ॥

* * *

হে অগ্নিদেব! সোম-পানের জন্য (ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য), আমাদের পরিচর্য্যার ও স্তোত্রের নিকট, আমাদের অভিলাষানুরূপ বিশ্বের সর্ব্বদেবতার সহিত; আপনি আগমন করুন; এবং (আসিয়া) আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন (অভীষ্ট-পূরণ) করিয়া দেন।

* * *

সর্ব্বত্র দেবাহ্বান।

বিপদে পরিত্রাণ-লাভের আশায়, সম্পদে সুখবৃদ্ধির কামনায়, দুঃখের দহন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি করিবার আকাঙ্ক্ষায়, সুখের অবিরাম অচ্ছিন্ন প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার স্পৃহায়, সকল সময়, সকল অবস্থায়, বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করার প্রয়োজন হয়। আস্তিক নাস্তিক সকলেই প্রকারান্তরে দেবতার আহ্বান করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আমরা মনে করি, তাঁহারাও দেবদ্বারে স্বতঃই প্রার্থী হইয়া আছেন। ইহসংসারে এমন মনুষ্য বিরল,—যাহারা কোন-না-কোনও ভাবে দেবতার শরণাপন্ন হয় নাই বা দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত নহে।

* * *

স্বরূপ কি?

দেবতার সহিত সম্বন্ধ কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু দেবতা যে কি বস্তু, তাহা অতি অল্প লোকেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা অতি অল্পজনেরই ধারণা-পথে দেবতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে। দেব-বিষয়ক কিম্বদন্তী নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। শাস্ত্রে দেখি, রূপকের কল্পনায় কল্পিত আছে, দেবতা কত কত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কত কত স্থানে কত কত ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। পুরাণে দেখি, লোক মুখে শুনি,—যজ্ঞে আসিয়া তাঁহারা যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, একের

পক্ষ হইয়া অন্যের সংহার-সাধনে প্রযত্নপর রহিয়াছেন। দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ যে কত কথাই প্রচারিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি কিছু সহসা হৃদ্‌গম হয় না যে, দেবতাই বা কি?—আর তাঁহাদের স্বরূপই বা কি? নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যত কথা উল্লিখিত আছে—সকল কথার সামঞ্জস্য-সাধন লক্ষ্য করিতে হইলে, বুঝা যায় না কি,—দেবগণ স্বরূপতঃ কি?

* * *

দেবতত্ত্ব।

দেবগণ তোমার-আমার ন্যায় দেহধারী নহেন। তোমার প্রদত্ত স্থূল-উপাদানভূত ঐ অন্নজল গ্রহণ করিতে অথবা যজ্ঞহবিঃ পান করিতে, তাঁহারা কখনও তোমার দৃশ্যমান্ স্থূলদেহে আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন না। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। বিরল বটে, কিন্তু এখনও তো যজ্ঞ হয়। বিরল বটে, কিন্তু এখনও তো যজ্ঞহবিঃ গগন চুম্বন করে! বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো দেবতার উদ্দেশে ভক্ষ্য ভোজ্য ষোড়শোপচার সাজাইয়া সেই মন্ত্রে সেই ভাবেই দেবতার আহ্বান করা হয়। কিন্তু কৈ, কেহ দেখিয়াছেন কি,—কখনও কোথাও কোনও দেহধারী দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে! কদাচিৎ সে সংবাদ শুনিতে পাই। কেহ কখনও সে বিষয় মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারেন না। কেবল এখন বলিয়া নহে; কোনকালে কখনও যজ্ঞক্ষেত্রে যে দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অনুভবে আসে না। পুরাণে রূপকে যে সকল ঘটনা পরিবর্ণিত আছে, তাহাও এ রাজ্যের নহে;—কল্পনার অতীত সে এক অন্য রাজ্যের কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

* * *

অনুধ্যানের বিষয়।

তবে কি? যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে তবে কি বুঝিব? কিরূপে কি ভাবেই বা যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপা-বিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর-দান বড়ই কঠিন; অল্পকথায়ও সে উত্তর ব্যক্ত হইবার নহে; আবার যতই অধিক কথা কহিতে যাইবে, ভাব-গ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর—বাক্যে নহে—অনুভাবনায়; বক্তৃতায় নহে—অনুধ্যানে, ভাষায় নহে—চিন্তায়। তথাপি প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে বিষয়টী একটু বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছি। মনে রাখিবেন,—দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী—শুদ্ধসত্ত্বরূপে তাঁহারা, ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, অপ্-রূপে, সত্য-রূপে, সৎস্বরূপে, তাঁহাদের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদের পাইতে চাহিবে, সেই ভাবের সূক্ষ্মসত্ত্ব পরমাণু-রূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপণ কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে আসিয়া সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে, কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না, এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া

যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ-সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। বীজবপন-রূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইল, তোমার দেহ-মন-প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মসত্ত্ব ভাব-বিভূতি—তোমার সৎ সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই দেবাধিষ্ঠান।

* * *

মানবে দেবে সম্বন্ধ।

অতঃপর, দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ কি প্রকারে স্থাপিত হ বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বলিয়াছি,—দেবগণ অশরীরী সত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের লাভ করিতে হইলে, শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সম্বন্ধ স্থূলের সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ হইলে, সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? কখনই না। সেখানে সূক্ষ্ম ব সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তা আবশ্যক করে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুই স্বতন্ত্র বহির্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, সূক্ষ্মের পক্ষে এক, বহির্জগতের ক অন্তর্জগতের পক্ষে এক,—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহা দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তি তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। মনে করুন, সম্মুখে একটী মোট পড়িয়া আমাকে তাহা বহন করিতে হইবে। এখানে আমার দৈহিক শক্তির কার্য্য ও মানসিক শক্তি প্রয়োগের কোনরূপ আবশ্যকতা করে না। কিন্তু মানসিক শক্তি দৃষ্টান্তে আবার দেখুন,—আমায় একটী বেদমন্ত্র স্মরণ করিতে হইবে। সে দৈহিক শক্তিতে কোনও কায হইবে না। একভাব—পরিদৃশ্যমান্; অপর ভাব—স্থূল-সূক্ষ্মের কার্য্য স্থূলতঃ এই দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইতে পারে। অতএব, সূক্ষ্ম শুদ্ধস দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কদাচ নহে। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া, সেই সূক্ষ্ম সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধা ভক্তি, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জন হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত ও তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষ—আর তদর্থে যজ্ঞাহুতি প্রদান—বেদে সুসংস্কৃত সে অভিহিত হইয়া থাকে। * দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক ভক্তি—যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের আমাদের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলন।

---

* সোম ও যজ্ঞ বিষয়ে, বেদ-বিষয়ক আলোচনা-মূলক প্রবন্ধাদি এবং আমাদিগের "ঋগ্বেদ-সংহিতা" বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন।

'বেদ' ও তাহার অপব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

চতুর্থ প্রবন্ধ।

এ পর্য্যন্ত বেদের যে কিরূপ অপব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। শত শত ঋগ্মন্ত্র, ব্যাখ্যার দোষে, কলঙ্ক-লিপ্ত হইয়া আছে। যেখানে রূপক বা কোনও উপমা আছে, সেখানে রূপক না ভাঙ্গিয়া, উপমা বিশ্লেষণ না করিয়া, নানা কদর্থ কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী প্রবন্ধে বেদ ও তাহার অর্থ-বিপর্য্যয়-বিষয়ে তিনটী ঋগ্মন্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। অদ্য আরও দুইটি ঋগ্মন্ত্রের কদর্থ-কল্পনার বিষয় প্রকাশ করিতেছি।

একটী ঋক্।

উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ।

সুতে হি ত্বা হবামহে॥

ঋক্‌টীর সায়ণ-ভাষ্য।

'হে ইন্দ্র কেশিভিঃ কেশরযুক্তৈর্হরিভিরশ্বৈস্ত্বং নোঽস্মদীয়ং সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যুপ-সমীপ আগহি। আগচ্ছ। সুতেঽভিষুতে সোমে নিমিত্তভূতে সতি যস্মাৎ কারণাত্ত্বাং হবামহে। ত্বামাহ্বয়ামঃ। তস্মাদাগচ্ছেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।'

দেশ-প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

'সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত। কেশরযুক্ত ঘোটকে আরোহণ করিয়া আসিয়া আপনি তাহা পান করুন। সেই জন্য আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।'

ঋক্-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য।

সূক্তের সূচনায় আমরা যে বলিয়াছি,—'এই সূক্তের মধ্যে কতকগুলি বড় সমস্যাপূর্ণ ঋক্ আছে; অবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে সে ঋকের অর্থ-পরিগ্রহে ভগবানের সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাসের ভাবই বৃদ্ধি পাইবে; পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জন সে ঋকে ভগবানের অশেষ করুণা-মহিমার অভিব্যক্তি দেখিবেন।' এই ঋক্‌টি সেই শ্রেণীর ঋক্।

ঋক্‌টি দর্শন মাত্র, ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে—তাহা লক্ষ্য করিবা মাত্র, সংশয়-

চিত্ত সাধারণ লোকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে,—'এ কি রকমের দেবতা। কেশরযুক্ত ঘোটকে আরোহণ করিয়া যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আসিয়া সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পান করিবেন—খুব দেবতা তো।' তাঁহারা দেখিবেন,—'এবার আর ঘোটকগুলির কথা উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। 'কেশিভিঃ' বিশেষণ আছে, তাহাতে ঘোটকগুলি যে কেশরবিশিষ্ট, তাহা পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইতেছে।' অতএব, ইন্দ্রদেব যে সাধারণ মানুষের অধিক কিছুই নহেন, তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। তিনি বহুলোক হইতে পারেন; তাঁহার অনেক ঘোটক ও রথ থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যে মনুষ্যেরই এক স্তরের জীব,—মনুষ্যের অতীত শক্তি তাঁহাতে যে কিছুই নাই;—ক্রমশঃ তাহাও প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িবে।

ঋকের এই এক দিক। আর এক দিক আবার দেখুন। সেদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। সেখানে 'হরিভিঃ' আর অশ্বগণকে বুঝাইতেছে না; 'কেশিভিঃ' আর কেশর-বিশিষ্ট অর্থও সূচনা করিতেছে না। সেখানে রূপক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানে মহান্ লক্ষ্য—মহৎ তত্ত্ব—ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঋকের আমরা যে 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' করিতেছি, প্রথমে তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। তার পর, বক্তব্য বলা যাইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) ত্বং 'কেশিভিঃ' (কেশরযুক্তৈঃ, কিরণান্বিতৈঃ, রশ্মিমালা-পরিবৃতৈঃ) 'হরিভিঃ (জ্যোতির্ভিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (স্বনুষ্ঠিতং যজ্ঞং, অস্মদ্-হৃদয়োৎপন্নভক্তিরসামৃতং) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'সুতে হি' (তন্নিমিত্তে প্রস্তুতে হি, অস্মদনুষ্ঠিতকর্ম্মগ্রহণার্থমিতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বায়ামঃ)। দুর্ব্বোধ্যমেতৎ স্তোত্রং। অত্র 'হরিভিঃ কেশভিঃ' ইত্যেবং শব্দসম্বন্ধত্বাৎ সংশয়ান্বিতচিত্তস্য সংশয়বুদ্ধির্জায়তে। উক্তপদদ্বয়েন চ লোকৈঃ কেশরযুক্তো ঘোটক ইতি মন্যতে। রূপকাভ্যন্তর-গতো নিগূঢ়ার্থঃ কেনাপি ন লক্ষ্যতে। কিঞ্চ হরিভিঃ পদস্য নিগূঢ়ার্থঃ কেশিভিরিতি বিশেষণেন প্রতীয়তে। হরয়ঃ কিদৃশাঃ? কেশরযুক্তাঃ। ন চ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষীভূতাঃ। পরন্তু রশ্মিমধ্যগতা জ্যোতীরূপাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতাঃ। ঋচঃ অয়মেব হি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আপনি কেশরযুক্ত ঘোটকে সংবাহিত হইয়া অর্থাৎ রশ্মিমালা-পরিবৃত জ্যোতির মধ্য দিয়া, আমাদের অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞ-সন্নিধানে (আমাদের হৃদি-নিঃসৃত ভক্তিসুধা-সমীপে) আগমন করুন। আমাদের অনুষ্ঠিত যাগাদি-কর্ম্ম (আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তিসুধা) গ্রহণের জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

ঋকের লক্ষ্য।

এইবার বুঝুন—ঋকের লক্ষ্য কি?—'হরিভিঃ' শব্দের ও 'কেশিভিঃ' শব্দের লক্ষ্য কি? 'হরিভিঃ' শব্দে যে রশ্মি বুঝায়—যে রশ্মির মধ্য দিয়া ভগবানের আবির্ভাব হয়, সে রশ্মি কেমন রশ্মি, এখানে 'কেশিভিঃ' পদ তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। যে হরিগণ ভগবানকে

যজ্ঞক্ষেত্রে (বা স্বদেশে) আনয়ন করিবে, সে হরিগণ কেমন ? না—কেশরযুক্ত। 'হরিগণ' এখানে একটু বিশ্লেষিত হইলেন। প্রথমে পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋকে স্থূলভাবে তাঁহাদিগকে 'হরি' বা 'রশ্মি' বলিয়া বুঝান হইয়াছিল। এখন আবার বলা হইল—তাঁহারা একটা বিশেষণ বা আবরণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ, সে রশ্মি বা জ্যোতিঃ, রশ্মি-মধ্যবর্ত্তী। তবেই বলা হইতেছে, আমরা সূর্য্যের বা অগ্নির যে রশ্মি বা জ্যোতি সাধারণ-দৃষ্টিতে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, 'হরি' সে দৃষ্টির বহির্ভূত। অর্থাৎ,—জ্যোতির মধ্যে জ্যোতিঃ, 'হরি' বলিতে তাহাই বুঝায়। উপনিষদের সেই যে 'অণোরণীয়ান্' ভাব—অণু হইতেও অণু-রূপ যে অবস্থা, এখানে বিশেষণে তৎ-প্রতিই লক্ষ্য আসে। আমরা তাই 'কেশিভিঃ হরিভিঃ' শব্দদ্বয়ে 'রশ্মিমধ্যবর্ত্তী জ্যোতীরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত' অর্থ প্রকাশ করিতেছি। জ্যোতির্ম্ময় দেবতা জ্যোতির মধ্যেই বিরাজমান আছেন; জ্যোতিষ্মানের গতিবিধি জ্যোতিঃপথেই সম্ভবপর। কিন্তু বলিয়াছি তো, স্বরূপেই স্বরূপ অবস্থিতি করে, সতেই সতের মিলন ঘটে। সূক্ষ্ম শুদ্ধ-সত্ত্ব তিনি,—স্থূলের সহিত স্থূলভাবে তাঁহার সম্বন্ধ কখনও সম্ভবপর নহে। স্থূল-রশ্মি দেখিয়া পাছে তুমি বিভ্রান্ত হও, তাই এই ঋক্ একটু অধিক বিশদভাবে তোমায় হরির স্বরূপ বুঝাইয়া দিলেন। বুঝাইলেন,—'রশ্মির অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ, যে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাঁহারই মধ্য দিয়া ভগবানের আবির্ভাব ঘটে।' 'আমার' বিশেষণ যেমন 'দেহী' অথচ 'দেহ' হইতে যেমন আমি স্বতন্ত্র, 'হরির' বিশেষণ 'কেশী'ও (কেশরযুক্ত) সেইরূপ। রূপক ভেদ করিলে যে প্রকৃতার্থের অধ্যাস হয়, তাহাতে ঋকের ভাবার্থ হইতে পারে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হই; কেন না, সেই অবস্থার মধ্যেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব তুমি নিত্য-বিদ্যমান আছ। আমাদের সন্নিধানে তোমার আগমন—কখন সম্ভবপর? যখন আমরা তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিব।'

এখানে এ ঋকে সাধকের যেন একটু উন্নত ভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানে যেন তাঁহার জ্ঞান, ভগবানের স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মনে হয়। কেন-না, কি ভাবে ভগবান আসিবেন, এখানে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে; পরন্তু কি জন্য তিনি আসিবেন অর্থাৎ তাঁহার আগমন-উপলক্ষে কি ভাবে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি, তাহারও আভাষ দেওয়া হইয়াছে। স্থূলের মধ্য দিয়াই এই সূক্ষ্মভাব ক্রমশঃ প্রতিভাত হয়।

* * *

এইরূপ, আরও একটী ঋক্ দেখুন,—

সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদং সবনং সুতং।

গৌরো ন তৃষিত পিব ॥

ঋকের সায়ণভাষ্য।

হে ইন্দ্র স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং স্তোমং স্তুতিং প্রত্যাগহি। আগচ্ছ। আগমনে

হেতুকচ্যতে। উপ দেবযজনসমীপে স্তুতমভিযুক্তসোমযুক্তমিদমিদানীমনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃ-সবনাদিরূপং কর্ম্ম বর্ত্ততে। তস্মাদ্গৌরো ন গৌরমৃগ ইব তৃষিতঃ সন্নিমং সোমং পিব।'

দেশ-প্রচলিত ব্যাখ্যা।

ঋকে আছে—"গৌরো ন তৃষিতঃ পিব।" ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তৃষ্ণার্ত্ত গৌরমৃগের ন্যায় এসে তুমি সোমরস পান কর।' দেবতা যেন সোমরস রূপ মদ্যপানের জন্য জিহ্বা লেহন করিতেছেন; অর্চ্চনাকারী তাই যেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতেছেন,—'তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন; আসুন, সোমরস প্রস্তুত, তৃষ্ণা-নিবারণ-কামী মৃগের ন্যায় আসিয়া তাহা পান করুন।'

যেন ছ-কড়া ন-কড়ার মানুষকে ডাকিয়া সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-দানে আপন কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লওয়া হইতেছে,—পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে এ ঋকে এই ভাবই বদ্ধমূল হয়। বেদের এরূপ ব্যাখ্যায় অঙ্গ শীতল হইয়া যায়। সাধে কি আর পাশ্চাত্যগণ বেদকে 'চাষার গান' কহিয়াছেন? নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ-পক্ষে ত্রুটি-বিচ্যুতি-হেতু অপব্যাখ্যা হইয়া পড়ে। সুতরাং এক ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া অন্যভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে নিজেদের সঙ্গে পরম-পূজ্য বেদও উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বাপর যাহার ভাবব্যত্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে, বড় কঠিন—তাহার অর্থ উদ্ধার করা। সে প্রচেষ্টায় আমরাও যে ভ্রমে না পড়িব, তাহা বলিতে পারি না। তবে জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা যে একটা ভাব কল্পনা করিয়াছি, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে' প্রথমে সে ঋকের একটু আভাষ লউন। পরে 'আমাদের বক্তব্য' অনুধাবন করুন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং' (অনুষ্ঠীয়মানং, উচ্চার্য্যমাণং) 'স্তোমং' (স্তুতিমন্ত্রং, যজ্ঞং) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আয়াহি, আগচ্ছ), 'স' ত্বং 'সবনং' (যাগাদিকর্ম্মসমীপমাগত্য) 'তৃষিতঃ' (তৃষ্ণার্ত্তঃ) 'গৌরঃ' (গৌরমৃগঃ, চন্দ্রঃ) 'ন' (ইব) 'সুতং' (সোমসুধাং) 'পিব' (পানং কুরু)। কঠিনসমস্যাপূর্ণা এষা ঋক্। কেচিদপি ইন্দ্রদেবং তৃষিতমৃগবৎ সোমপানশীলং মন্যন্তে। তদর্থং ন যুক্তিযুক্তং। উপমায়া ভাবার্থঃ—চন্দ্রো যথা কদাচিদপি সূর্য্যকিরণসম্বন্ধং ন ত্যজতি, হে দেব! তথা ত্বমেব অস্মাকং প্রতি চির প্রসন্নো ভব ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি অস্মদুচ্চারিত স্তুতিমন্ত্রসমীপে (অস্মাদুচ্চারিত যজ্ঞসমীপে) আগমন করুন, এবং এই যজ্ঞকর্ম্মসমীপে আগমন-পূর্ব্বক তৃষিত গৌরবৎ (চিরতৃষিত নিত্যসুধা-পানরত চন্দ্রের ন্যায়) আমাদের প্রদত্ত সোমসুধাপানে প্রবৃত্ত হউন।

আমাদের বক্তব্য।

'গৌরঃ' শব্দের এক প্রতিবাক্য 'চন্দ্রঃ' দেখি। ঐ শব্দের 'মৃগ' অর্থ প্রদেশ-বিশেষে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত অভিধানে সে অর্থ কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হইতে পারে, বৈদিক শব্দের অর্থ অন্যরূপ, হইতে পারে, যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন; হইতে পারে, আর কাহারও সে পক্ষে চেষ্টারও অধিকার নাই। তথাপি আমাদের অন্তরে কিন্তু 'গৌরঃ' শব্দে 'চন্দ্রঃ' অর্থই জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে, ঐ বাক্যের (গৌরো ন তৃষিতঃ পিব) অর্থ হয় এই যে, 'তৃষিত চন্দ্রের ন্যায় আপনি সুধাপান করুন।' ঐ অর্থে, উপমায় দুই দিক দিয়া দুই ভাবে একই লক্ষ্য প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সূর্য্যের জ্যোতিতে চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্, সূর্য্যের সহিত চন্দ্র একসূত্রে নিত্য-সম্বদ্ধ আছেন, জলপানে যেমন পিপাসার অভাব দূর হয়, সূর্য্যের জ্যোতিঃ গ্রহণে সেইরূপ চন্দ্রের অন্ধকার (অভাব) দূর হইতেছে। তৃষিতের ভাব এখানে পূর্ণ-প্রকটিত দেখি; জ্যোতিঃ লাভ-পক্ষে চন্দ্র চির-তৃষিত; সুতরাং সূর্য্যের সহিত চন্দ্র চিরসম্বন্ধযুত (ভাবে—চিরপানরত)। তদনুসারে এখানে এ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমাদের যাগাদিকর্ম্ম বা ভক্তিসুধা এমন অবিমিশ্র ও পবিত্র হউক,—যেন আপনি তাহাদিগকে আর পরিত্যাগ করিতে না পারেন। আপনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন, যাহা হইতে পারিলে আপনার প্রিয় হওয়া যায়, তেমন অবস্থা আমাদের সঞ্জাত হউক। আর, তাহার ফলে, আপনি আমাদের সঙ্গে চির-তৃষিতের ন্যায় চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিরাজ করুন, অথবা (পক্ষান্তরে) আমরা যেন আপনার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া যাই।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

আর এক দিক দিয়াও ঠিক এই ভাবের আর এক অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে। সুধা-পানে সুধার আধার হইয়া আছেন বলিয়াই চন্দ্রের নাম সুধাকর। যে ধন যাহার অধিকারে যত অধিক থাকে, সে ধনের আকাঙ্ক্ষা তাহার ততই অধিক হয়। নিঃস্ব ব্যক্তি শত চায়; শতী দশ শতের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে; সহস্রপতির কামনা—তিনি যেন লক্ষপতি হইতে পারেন। চন্দ্রপক্ষেও সেইরূপ মনে হয়, সুধার আধার হইয়াও তাঁহার পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্ রহিয়াছে,—সংসারের সকল সুধাপানের জন্য, সকল সৌন্দর্য্য গ্রাসের জন্য, তিনি যেন সদা ব্যাকুল হইয়া আছেন। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী আরও একটু বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। জলাধিপতি মহাসমুদ্রের—জলের তো কোনও অভাব নাই। তিনি তোয়নিধি। তথাপি, তিনি যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত নদ-নদীর সলিলরাশিকে উদরে পূরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। সে পক্ষে তাঁহার তৃষ্ণা কি অপরিসীম! চন্দ্র-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসে। তদনুসারে ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সুধাকর সুধার আধার হইয়াও যেমন সুধাপানে তৃষিত হইয়া আছেন, হে ভগবন্, আপনিও সেইরূপ সকল জ্যোতির—সকল সুধার—সকল সদ্ভাবের আধার-স্থানীয় হইয়াও আমাদের অকিঞ্চিৎকর যজ্ঞানুষ্ঠানের বা ভক্তিসুধার প্রতি চির-তৃষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।' ফলতঃ, ভগবান্ যেন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অনুগ্রহপরায়ণ থাকেন, উপমায় তাহাই বলা হইয়াছে।

—— * ——

শ্রীজয়দেব-প্রসঙ্গ।

[শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।]

(কবি-জীবনী)

কেন্দুবিল্বের কুসুমিত কুঞ্জবিতানতলে, কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের প্রেম-কম্পিত হৃদয়তন্ত্রীতে, যে দিন শ্রীগীতগোবিন্দের মধুময় সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, বীরভূমের সে এক স্মরণীয় দিন। না জানি, সে কোন্ মাধবী-উষায়,—নবোদিত অরুণের কনক-কিরণে, অজয়ের জলকলস্বনে, অলিগুঞ্জনে পিককুহরণে, মলয়ের মৃদুল আন্দোলনে, ললিতলবঙ্গ-লতার সলাজ শিহরণে, পুষ্পিত প্রতি বিটপীলতার অতুলিত সুষমায়, পাপিয়ার মোহন মূর্চ্ছনায়, রূপে রঙ্গে গানে গন্ধে, রসময়ী প্রকৃতি কবির প্রাণে সে কি অপূর্ব্ব অমৃতের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল। সৌন্দর্য্যের সেই উৎসব-সমারোহ, বিশ্বসুন্দরের সুমধুর দ্যোতনায় কবি চিত্তে কি আনন্দ-বন্যার প্লাবন তুলিয়াছিল—যাহার তট-প্লাবিনী প্রেম-পীযূষ-প্রবাহ, কত উষর ভূমি সরস করিয়া, কত তৃষিত তাপিতকে শান্তি বিলাইয়া, শোভায় সঙ্গীতে দুকূল ভরিয়া, সাগর-সঙ্গমের শরণি-স্বরূপ আজিও শত শত সরিতের মুক্তির সহায়তা করিতেছে। সে কি সঙ্গীত—যাহার সুধা-সুমধুর কান্ত-প্রতিধ্বনি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, কালের বক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া আজিও ভারতের গগন-পবন মুখরিত করিতেছে। অমর কবির অমৃত-কবিতা-পানে মর-মানব ধন্য হইয়াছে। নিঃস্বার্থপরতার সার্থক-দানে বীরভূমি কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে!

লালসার দিগ্দাহী দাবানল দেশে যে দিন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, উত্তপ্ত ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে দেশ যখন তোলপাড় হইতেছিল, মোহ-নিশিথের অমা-তামসী বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যখন নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, কেন্দুবিল্বের শান্ত-কুটীরে বসিয়া অজয়সমাহিত কবি সে দিন অমিয়-নির্ঝর রচনা করিতেছিলেন। অজয়-শীকর-স্নাত সুরভি মলয়ের স্নিগ্ধ সঞ্চরণে কেন্দুবিল্ব আমোদিত হইতেছিল। প্রেমের অনির্ব্বাণ আলোকে বীরভূমির হৃদয়-প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। নদীয়ার প্রকাণ্ড রাজপথ যখন বারাঙ্গনাগণের নূপুর-নিক্কনে ধ্বনিত হইতেছিল, সুপবিত্রা-নীরা সুরধুনীর পুলিনপরিসর যখন কাম-কথা-সংলাপে মুখরিত হইতেছিল, তখন একমাত্র কবি জয়দেবই সে ভাবের ধারা-উজান-পথে প্রবাহিত করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন,—দেশকে প্রেমের মন্ত্র, ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন। এই নিসর্গ-নৈষ্ঠিক অতীন্দ্রিয় সাধনায় সাধক সে দিনে গাহিয়াছিলেন—

"শ্রীজয়দেবভনিতমিদমুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারং।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারং॥"

কবি সরস বসন্ত সময়ের কানন-সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তদনুগত মদন-বিকারের বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই হৃদয়-মধ্যে হরিচরণ-স্মৃতি জাগাইয়া দিবার

জন্য। নিখিলের অনন্ত সৌন্দর্য্য যাঁহার অঙ্গদ্যুতি, বিশ্বের সৌন্দর্য্যে যদি তাঁহারই স্মৃতি না জাগ্রত করিয়া দিবে, তবে কে বলিল—তাহা সুন্দর? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হয়, মন চঞ্চল হয়। ইহাকে বিকার বলিতে পার। কিন্তু এ চাঞ্চল্য,—এ বিকার, তাঁহারই জন্য—যিনি রস-স্বরূপ,—আনন্দময়। এ কামনা তো আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছায় নহে। যিনি কামজয়ী, সাক্ষান্মথ মন্মথ তাঁহারই শ্রীচরণ-স্মরণের জন্য। কামনা বটে, কিন্তু বিশ্বের রূপরসস্পর্শ-গন্ধ-গানে, বিশ্ব-বিলসিত বিশ্বেশ্বরের সেবা করিবার কামনা। ত্যাগের সাধনা, প্রেমের উপাসনা। যাঁহাকে পাইলে সকল পাওয়ার সকল চাওয়ার শেষ হইয়া যায়, যাঁহার আনন্দধামে পৌঁছিলে, পতনের ভয় চিরতরে চলিয়া যায়,—সত্য সত্যই যিনি বিশ্বের একমাত্র প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু, এ কামনা তাঁহারই জন্য। তাই কবি গাহিয়াছিলেন,—'হরিচরণস্মৃতিসারং'। দেশবাসীর হৃদয়ে যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, কবি সেই সুরে সুর মিলাইয়া, তাহাকে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় সম্মিলিত করিয়া, এমন এক উচ্চ গ্রামে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন,—যাহার লয় মানবের চিরন্তন লক্ষ্য, অক্ষয় আনন্দলোকে আলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য,—এ হেন কবিকেও কেহ কেহ 'লালসার কবি' 'মদনমহোৎসবের পাণ্ডা' প্রভৃতি বলিয়া শ্লেষ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহা মহা মনীষিগণ শ্রীগীতগোবিন্দকে শ্রীমদ্ভাগবতের রসভাবসমুজ্জ্বল কবিত্বময় ভাষ্য-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। কবিজীবনীকে তাঁহারা ভক্ত প্রেমিকের, রসিক সাধকের স্মরণমঙ্গল আদর্শ-জীবন বলিয়া মনে করেন। বিরুদ্ধবাদিগণের অন্যায়-সমালোচন-শ্রবণ জনিত হৃদয়-বেদনা দূরীকরণ জন্য মহাজন-প্রদর্শিত পন্থানুসারে আমরা সংক্ষেপে কবিজীবনী আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। কবির সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরার মধ্যে দেশবাসীর যে বিশ্বাস-চিত্র প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, এ প্রবন্ধে আমরা তারেই আভাষ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে সামান্য সামান্য সূত্র আবিষ্কৃত হইলেও ভবিষ্যতে হয় তো কবিজীবনের পূর্ণ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। আশা করি, আমাদের অক্ষমতার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া দেশের সাহিত্যিক-মণ্ডলী এই আলোচনায় যোগ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ইহা বোধ হয় নিশ্চিত সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব বাঙ্গালার সম্রাট-লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। কবির পিতার নাম—ভোজদেব, মাতার নাম—বামাদেবী। পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। জন্মস্থান—বীরভূমের অজয়-তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্বগ্রাম। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিহাস হইতে আর বড় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু কবির সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে অনেক। একে একে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি, যথা,—

১ম প্রবাদ।—দক্ষিণ দেশীয় অনপত্য এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি অপত্যকামনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের নিকট মানস করেন যে,—'আমাদের পুত্র কিম্বা যাহাই হউক, আমরা তাহাকেই দেবদাস-দেবদাসীরূপে চিরতরে আপনার চরণে সমর্পণ করিব।' শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় অচিরেই তাঁহারা এক কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে দেবদাসীরূপে দান করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতি নীলাচলনাথের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন যে,—তোমরা

রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥" গৌরগতপ্রাণস্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্য-দেবের এই শ্লোকোক্ত অভিপ্রায় বিশদ করিয়া দিয়াছিলেন। নিম্নকথিত শ্লোকে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং। তথাপ্যন্তে খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥" ভগবদুপাসনার দুইটি দিক আছে,—একটি ঐশ্বর্য্যের দিক, অপরটি মাধুর্য্যের দিক। উল্লিখিত ১ম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়, জয়দেব গোস্বামী প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের উপাসক ছিলেন। ঐশ্বর্য্য হইতে সাধনার ক্রম-বিকাশে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ হইতেও বোধ হয়, ইহা প্রমাণিত হইতে পারে।

আমার ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় ধারণা কিরূপ?—কেহ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমার হৃদয় সে প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করে, বুঝিতে হইবে—হৃদয়ের সুন্দরতম ভাব-নিচয়ের তাহাই পরম পরিণতি। বুঝিতে হইবে—আমার মানস-কল্পিত উচ্চ আদর্শের তাহাই চরম অভিব্যক্তি। আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে কবিকে অনুসন্ধান করা হয় তো ব্যর্থপ্রয়াস না হইতে পারে। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, রসের ক্রম-পরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধুর্য্যের ঔৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন; এবং তাহা যে কবি-কল্পনা মাত্র নহে, সে রস-পরিপুষ্টি যে কবি-হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ-ভাগে দশাবতার-স্তোত্র এবং "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল" সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের কেবল ঐশ্বর্য্য-স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।" "শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল' সঙ্গীতে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী পুত্র ভ্রাতা পতি বন্ধু প্রভৃতিরূপে আদর্শ-মানব শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনায়—"জনকসুতা কৃতভূষণ জিত দূষণ সমর শমিত দশকণ্ঠ। অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর ॥" বলিয়া কবি সঙ্গীত শেষ করিতেছেন,—'হে জানকীকৃতভূষণ, দূষণবিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে। হে সুন্দর, সমুদ্রমন্থনকালে মন্দার ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে;—দেবগণকে অমৃত দান করিয়া তুমি সমুদ্রসম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলে। আবার রমার মুখচন্দ্রে সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া চকোরের মত তাহা পান করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন অভিনব-জলধররূপে প্রতীয়মান হইতেছ।' শ্রীরাধিকার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি লক্ষ্মী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটি দিক প্রদর্শন করিলেন। মানবাবতারের শ্রেষ্ঠ-আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের ও মানবীদেবী জানকীর পরস্পরের প্রতি প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রণয়-কাহিনী পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আরও গুরু, আরও গাঢ়, আরও মধুর। সে প্রেমের তুলনা হয় না। কবি এই গানে আদ্যন্তে যে শ্রীর নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিও গোপীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তিনিও ভালবাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্তিদান করিতে পারেন নাই। তাই ব্রজলীলার প্রবর্ত্তন,

তাই শ্রীবৃন্দাবনে মহারাসের অনুষ্ঠান। কবি জয়দেব ও বসন্তরাসের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—শ্রীরাসলীলায় লক্ষ্মীদেবী সহকারিণী হইতে পারেন নাই। তাঁহার সে-অধিকার ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠলব্ধাশীষাং য উদগাৎ ব্রজসুন্দরীনাং॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহু-যষ্টি দ্বারা ব্রজরমণীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ প্রসাদে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তদীয় হৃদয়বাসিনী হইয়াও এবং সুরবালাগণ কমল-গন্ধ ও কমল-কান্তি ধারণ করিয়াও, সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্যা রমণীগণের তো কথাই নাই।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয় না কি যে, কবির কাব্যেও যেমন, জীবনেও তেমনি, ঐশ্বর্য্য গিয়া মাধুর্য্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দের শেষে গ্রন্থসমাপ্তিসূচক আশীর্ব্বাদ-শ্লোকটি পাঠ করিলেও এইরূপ অনুমান হয়। সে আশীর্ব্বাদ শ্লোকটী, যথা,—

"পর্য্যঙ্কীকৃত নাগনায়কফণাশ্রেণী মণীনাং গণে,
সংক্রান্ত প্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্।
পাদাম্ভোরুহধারি বারিধিসুতা মক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ॥"

এই মধুর ভাবপ্রধান কাব্যের প্রতি সর্গান্তে যে এক একটি আশীর্ব্বাদ শ্লোক সংযোজিত আছে, তাহার অনেকগুলির ভাব ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত।

সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ—"দেহিপদপল্লবমুদারম্" লিখিতে কবির সঙ্কোচবোধ। শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের শিরে সমর্পণ করিবেন,—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দ্বিধা ও কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই। পারিলে, তাঁহার মনে কখনই এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—তাহার কারণ, কবির জীবন ও কাব্য ওতঃপ্রোতো-ভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেরূপ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন, সাধনা-লব্ধ সত্যগুলিও তেমনি কবির কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। সংশয় জাগিয়াছে, লেখনীও বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া শেষে তাঁহার সাধনার ধন স্বয়ং আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ।—পদ্মাবতীর ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভ এবং শ্রীভগবানের স্বহস্তে "দেহিপদ-পল্লবমুদারম্" শ্লোকলিখন। প্রবাদগুলি যদি 'গালগল্পের' মত রচিত হইত, তাহা হইলে, জয়দেব গোস্বামী যেরূপ কবিযশখ্যাতি, ভক্ত ভাবুক ও রসিক বলিয়া বৈষ্ণব মনীষিগণের হৃদয়ে তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবদ্দর্শনের একটা জাঁকালো রকমের প্রবাদ-সৃষ্টির পক্ষে তো কোনও বাধা ছিল না। পদ্মাকে পত্নীরূপে গ্রহণের সময় তিনি যেরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন, শ্লোক লিখিবার আদেশও সেইরূপই পাইতে পারিতেন। কিন্তু সত্য সত্যই প্রবাদমালা নিরর্থক 'গালগল্প' নহে।

করিয়া রাজার বিশ্বাসের জন্য মাত্র হস্ত ও পদ কর্ত্তিত করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। এখন পাছে এখানে আমরা সেই কথা প্রকাশ করিয়া দেই, তাই আমাদের এত সম্মান করিল।" এত পাপ পৃথিবী সহিতে পারেন না। দস্যুগণ এই কথা শেষ করিতে না করিতে অকস্মাৎ দারুণ ভূমিকম্পে ধরণী দ্বিধা হইয়া পাপিষ্ঠগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। বাহকগণ ফিরিয়া আসিয়া কবির নিকট দস্যুদের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে কবি কর্ত্তিত হস্তপদের দেহলগ্নাংশ ভূমিতে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দস্যু-ঘটিত সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নূতন হস্তপদলাভে কবি পূর্ব্বদেহশ্রী প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ প্রবাদ—পুরীরাজের কোনও দূর-সম্পর্কীয় শ্যালকের মৃত্যু হইলে রাণী কথা-প্রসঙ্গে পদ্মাবতীকে বলিয়াছিলেন যে,—'আমার ভ্রাতৃপত্নী সহমৃতা হইতে যাইতেছেন।' পদ্মাবতী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিয়াছিলেন,—"পতির পরলোক-প্রয়াণের পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার প্রাণ-পাখী উড়িয়া হইয়া যায় নাই, অসম্ভব ঘটনা।" রাণী এই কথা শুনিয়া পরীক্ষার জন্য পদ্মাবতীকে একদিন কবির অলীক মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করেন। শুনিবামাত্র পদ্মাবতী সেই স্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া কবি তথায় উপস্থিত হন এবং "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদ গান করিয়া সেই প্রেমনন্দনের আনন্দ—অমরীকে মর্ত্ত্যে ফিরাইয়া আনেন। ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই প্রবাদ-গুলির আলোচনা করিলে আমরা কবির কোন্ দিক কি পরিমাণে বুঝিতে পারি। প্রথম প্রবাদে কবিকে শ্রীজগন্নাথদেবের অংশস্বরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব-হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্যের স্মৃতিই জাগরিত হয়। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখবাক্য—

"যবে দেখি জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
তবে জানি আসিলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনুমননেত্র॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। কুরুক্ষেত্রের ভাব মনে পড়ে। সে ভাব ঐশ্বর্য্যের, মাধুর্য্যের নহে। কুরুক্ষেত্রে অশ্বরজ্জু হস্তে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অদৃষ্ট-নিয়ামক—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ," গোপিগণ ভালবাসিবেন কেন? বিশ্বরূপ-দর্শনের পর অর্জ্জুন চাহিয়াছিলেন—চতুর্ভুজ দর্শন করিতে। যেমন অধিকার। গোপীদিগের কিন্তু চিরপ্রার্থনীয়—দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দরের নটবর মূর্ত্তি। শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনে যিনি গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন, তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের রথে সারথী হইয়াছেন; পাত্র এক, কিন্তু বেশ ও দেশ গোপীচিত্তকে প্রফুল্লিত করিতে পারিতেছে না। তাই শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র একদিন গাহিয়াছিলেন,—"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এবঃ চৈত্রক্ষপা স্তেচোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কাদম্বানিলজাঃ সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ

কেন্দুবিল্বে গিয়া আমার অংশস্বরূপ জয়দেব গোস্বামীর করে এই কন্যা সম্প্রদান কর, সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঋণী হইবে। ব্রাহ্মণ-দম্পতি কেন্দুবিল্বে আসিয়া জয়দেবকে কন্যাদান করেন। সেই কন্যাই জয়দেবপত্নী—পদ্মাবতী।

২য় প্রবাদ।—কবি 'শ্রীগীতগোবিন্দ' লিখিতেছিলেন। কিন্তু 'স্মরগরলখণ্ডনং মম-শিরশিমণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী থামিয়া গেল। যাহা লিখিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা লিখিতে পারিলেন না। মনে সন্দেহ হইল, গ্রন্থে ডোর দিয়া কবি গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। কবি নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন, ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা-পূজা ও ভোগাদি নিবেদনের পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় লিখিতে বসিলেন। কবি স্নানে গিয়াছেন, পদ্মাবতী দেবতার ভোজ্য রন্ধনান্তে স্বামীর অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং ভগবান জয়দেবের বেশে আসিয়া কবির অভিপ্রেত "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পদটী শ্রীগীতগোবিন্দে লিখিয়া দিয়া বিগ্রহের সেবা-ভোগাদি নিয়মিত কার্য্য শেষ করিয়া আহার্য্য-গ্রহণের পর শয়নমন্দিরে গিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। মায়াময় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পদ্মা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া প্রভুর ভোজ্যাবশিষ্ট লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি নাই। ক্রমে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল। কবিদম্পতী শয়ন-মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, শূন্য শয্যা পড়িয়া আছে, কিন্তু গৃহ ভরিয়া অপূর্ব্ব সৌরভ মনকে আকুল করিয়া দিতেছে। কবি গ্রন্থগ্রন্থী উন্মোচন করিয়া দেখিলেন—বাঞ্ছিত-পাদপূরণে কবিতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবিনিন্দিত জ্যোতির্ম্ময় সে অক্ষরপাতি। আর কিছু দেখিতে না পাইয়া কবি শেষে পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদান্ন-গ্রহণে কৃতার্থ হইলেন। কবি-দম্পতীর সে কি আনন্দ, সে কি গান। সে কি নৃত্য। কেন্দুবিল্বের কুঞ্জ উৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় প্রবাদ।—দস্যু কর্ত্তৃক হস্তপদহীন হইয়া কবি পুরী-রাজভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কবিকে অভিনন্দনের জন্য পুরীরাজ এক বৈষ্ণব-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। নানা স্থান হইতে বৈষ্ণববৃন্দ তথায় আসিয়া সমাগত হইতে লাগিলেন।

একদিন পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণ অর্থলোভে বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে পুরীরাজ-মন্দিরে আতিথ্য-গ্রহণ করিল। আসিয়া দেখিল, তাহাদের কর্ত্তৃক হস্তপদহীন সেই ব্যক্তিই এখানকার সম্মিলনের অধ্যক্ষ। যাহা হউক, যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর ফিরিবে কি করিয়া। সুতরাং বুদ্ধিমানের মত অপ্রতিভভাবেই রহিয়া গেল। চিনিতে পারিয়া কবি আপনি না গিয়া অন্যের দ্বারা দস্যুদের বৈষ্ণবোচিত আদর অভ্যর্থনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। বিদায়ের দিন বাহকের দ্বারা তাহাদের সঙ্গে বহু অর্থাদি পাঠাইয়া দিলেন। বাহকেরা দস্যুগণকে অন্য সাধু অপেক্ষা তাঁহাদের এই সমধিক সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দস্যুরা এক উপন্যাস ফাঁদিয়া বসিল। বলিল,—"ঐ ব্রাহ্মণ কর্ণাটরাজ্যে ভিক্ষার্থে গিয়া চুরির অপরাধে রাজার নিকট অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া কেমন মায়া হইল। ঘাতকগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত

সুতরাং কবির সম্বন্ধে না রটিয়া পদ্মার সম্বন্ধে যে ভগবদ্দর্শন লাভ-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারও একটা অর্থ-সঙ্গতি আছে। আমাদের মনে হয়, কবি-জীবনের প্রেমের সাধনার ইতিহাস ঐ প্রবাদে নিহিত রহিয়াছে। কবি, দাম্পত্য-প্রেমের মধ্য দিয়া,—মানবীয় ভালবাসার শ্রেষ্ঠ সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতির মধ্য দিয়াই ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রতি প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্তপ্রেমের প্রকৃত অস্বাদ দান করিয়াছিল। তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই পরমপ্রেমময় রসিকশেখর করুণাধার সচ্চিদানন্দের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। পত্নীপ্রেম কবিকে বিশ্ব-প্রেমের অনন্ত ক্ষীর-সাগরে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছিল। আবার পদ্মাবতীর পতিপ্রেম এতই প্রগাঢ়, এমনই নিষ্ঠাপূর্ণ যে, ভগবান্ তাঁহাকে জয়দেব-রূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান স্বহস্তে "দেহিপদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া দিয়াছিলেন,—এই প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভগবান অপেক্ষা তাঁহার ভক্ত বড। বুঝিতে পারা যায়,—সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনাই শ্রেষ্ঠ। সাধকের মনে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সাধনায় বিঘ্ন ঘটিলে, আকুল আগ্রহে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, তিনি আপনি আসিয়া সে সমস্তের নিরসন করিয়া দেন। আরও বুঝিতে পারি, মধুর ভাবের ভাবনায়, প্রেমের সাধনায়, ভালবাসার ভূমানন্দে দেহাত্মবোধ, মমত্ববোধের স্থান নাই। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বিনষ্ট হইলে আপন পর, উচ্চ নীচ, দান প্রতিদান ইত্যাদি সকল সম্বন্ধেরই আত্যন্তিক বিলয় সাধিত হয়। সুতরাং ব্রজের কুঞ্জে—"দেহি পদপল্লবমুদারম" বড একটা বেশী কথা নহে। শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন,—"ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ "গোপী-ভাবের এমনই প্রভাব!

তৃতীয় প্রবাদ প্রচার করিতেছে যে,—মানুষকে না ভালবাসিতে পারিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, সকল অবস্থায় সকল সময়েই "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ভাবের উপলব্ধি না ঘটিলে ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। নির্ম্মৎসর, নির্ব্বিকার, নিরুপাধি, করুণাপরায়ণ না হইলে কি ভগবৎকৃপালাভ ঘটে? এই প্রবাদে কবির উদার সার্ব্বজনীন প্রীতির এক অভিনব চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। শুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। ইহা জীবনে আচরিত, বাস্তবে মূর্ত্তরূপে প্রতিষ্ঠিত। "অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং দুষ্যন্ জলে সর্ব্বগতং তমেব। অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্তমূর্ধ্নি, দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি॥" কবি এই মন্ত্রবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

চতুর্থ প্রবাদটি পদ্মাবতীর প্রেম-প্রগাঢ়তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জয়দেবের পক্ষেও ইহা একই প্রমাণের সমর্থন করে। পদ্মাবতীর মৃত্যু হইয়াছে, জয়দেব ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পদ্মাবতী যে তাঁহাকে ফেলিয়া আগে চলিয়া যাইতে পারে, ইহা কি কবি বিশ্বাস করিতে পারেন? তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে "বদসি যদি" সঙ্গীতটী গান করিলেন, পদ্মাবতী চৈতন্য-লাভ করিলেন। প্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র!

গীতগোবিন্দ আলোচনা করিলে পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।

নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে কেবল—একটী আপনভোলা দাম্পত্য-জীবনের মধুময় চিত্র। সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে। সে চিত্র কবিজীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণ-বিন্যাসে স্বর্গীয় আলোকে সদা সমুজ্জ্বল। কবি-বিরচিত এই গোবিন্দ সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয়তীরবর্ত্তী একটি নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতে পাই, প্রেম-মাতোয়ারা কবি-দম্পতি জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে দম্পতি-জীবন, প্রেমলীলার মধুর ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। আর সেই লহরী-লীলা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হইতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি—কোথায় অজয়? এ যে—কালিন্দী। গোপীনয়নকজ্জ্বলে জল কখনও কালো হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্ব কোথায়? এ তো বৃন্দাবন। জয়দেব সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত বীণাধ্বনি তো নয়। এ সেই ভুবনমোহন শ্রবণমনোরসায়ন মুরলী-নিস্বন। কবি-দম্পতি কোথায় হারাইয়া ফেলি; দেখি—কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়। দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে,—দৃষ্টিনিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনে হয়, মেঘে যেন অম্বর মেদুর হইয়া আসিয়াছে। এক মধুর কৃষ্ণতায় ধীরে ধীরে তমাল-তরু-নিকরে শ্যামায়মান বনভূমিকে ছাইয়া ফেলিতেছে। শুনিতে পাই—সেই গন্ধে ভরা অন্ধকারকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কে যেন গাহিতেছে—"নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং শ্রীরাধামাধবয়োর্জয়ন্তিষ মুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥"

—*—

রাসবিহারী।

[শ্রীমতী লীলাদেবী বিরচিত।]

নীলবরণ, কমলচরণ, হৃদয়হরণকারী।
কনক-নূপুর, বাজিছে মধুর, ময়ূর-মুকুট-ধারী॥
নয়ন-শোভন, কি মনোমোহন, বামে শোভে রাধাপ্যারী।
চাঁচর চিকণ, চিকুর সুঘন, ললাট-শোভনকারী॥

অপরূপ কালা, হেরি গোপবালা, পায়ে দেছে প্রাণ ডারি।
চাপে রাগে, অগুরু সোহাগে, শোভিত বনচারী।
মৃদু মৃদু হাসি, তায় ধরে বাঁশী, আকুল ব্রজনারী।
রাসবিহারী, পতিতোদ্ধারী, ভকত চিত্তহারী॥

প্রক্ষিপ্ত রামায়ণ।

[কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয়ের লিখিত।]

৯। গোবিন্দরাজের ভূষণ-টীকা।

গোবিন্দরাজ স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া রামায়ণের ভূষণ-টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'ইতি শ্রীকৌশিকগোবিন্দরাজবিরচিতে রামায়ণভূষণাখ্যানে শ্রীরামায়ণাখ্যানে বালকাণ্ডে কর্ণমঞ্জীরাখ্যে প্রথমঃ সর্গঃ।' শ্লোক সংখ্যা বিনির্ণয়ে গোবিন্দরাজ বলেন,—'অস্য শ্রীরামায়ণস্য গায়ত্রাক্ষরানুসারেণ চতুর্ব্বিংশতিসহস্রসংখ্যয়া প্রবৃত্তত্বাৎ প্রথমসহস্রোপক্রমে তকারঃ প্রযোক্তব্য ইতি।'

গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর 'ত' (তপঃস্বাধ্যায়নিরত ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি এক সহস্র শ্লোকের পরিসমাপ্তিতে, দ্বিতীয় সহস্র, এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের পরিসমাপ্তিতে ২৪০০০ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক রামায়ণে বাল্মীকি বিরচিত করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দরাজের মতে রামায়ণের সর্গ-সংখ্যা এইরূপ, যথা,—

'বালকাণ্ডে তু সর্গাণাং সপ্তসপ্তভিরীরিতাঃ। অযোধ্যাকাণ্ডগাঃ সর্গাঃ শতং চৈকোনবিংশতিঃ॥
আরণ্যকাণ্ডে সর্গাণাং পঞ্চসপ্ততিরীরিতাঃ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডগাঃ সর্গাঃ সপ্তষষ্টিরুদীরিতাঃ॥
সর্গাণাং সুন্দরে কাণ্ডে ত্বষ্টষষ্টিরুদীরিতাঃ। একত্রিংশচ্ছতাঃ সর্গা দৃশ্যন্তে যুদ্ধকাণ্ডগাঃ॥
দশোত্তরশতাঃ সর্গা উত্তরে কাণ্ড ঈরিতাঃ।'

গোবিন্দরামের নির্দ্দেশ-মতে সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা এইরূপ হয়; যথা,—

১।	বালকাণ্ডে	৭৭—২২৫৬।	২।	অযোধ্যায়	১১৯— ৪৪১৫।
৩।	আরণ্যে	৭৫—২৭৩২।	৪।	কিষ্কিন্ধ্যায়	৬৭— ২৬২০।
৫।	সুন্দরে	৬৮—৩০০৬।	৬।	যুদ্ধে	১৩১— ৫৯৯০।
		৭।	উত্তরে	১১০—৩০৪৩।	

সর্ব্বসমেত সর্গের ও শ্লোকের সংখ্যা যথাক্রমে মোট ৬৪৭—২৪০৬২।

গোবিন্দরাজের অভিমতে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে প্রতি সহস্র শ্লোকের পূর্ণতায় মোট ২৪০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোকে রামায়ণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, যথা,—

১।	'স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ'	বালকাণ্ডে ৩০শ সর্গে।
২।	'বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ'	" ৬৩শ "
৩।	'চতুরশ্বঃ রথঃ শ্রীমান্'	অযোধ্যা ৪৪শ "
৪।	'চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণ'	"
৫।	'বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছান্তবাহনঃ'	অযোধ্যা ৯৯ম সর্গে
৬।	'উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণং'	"

৭।	'তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ'	আরণ্যে	১২শ	সর্গে।
৮।	'মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশতিঃ'	আরণ্যে	৪০শ	"
৯।	'ততঃপরমসংহৃষ্টো হনূমান্ প্লবগর্ষভঃ'	কিষ্কিন্ধ্যা	৪র্থ	"
১০।	'নবেন্দ্রসূনুর্নরদেবপুত্রং রামানুজং'	"	৩১শ	"
১১।	(কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড সমাপ্তিতে পূর্ণ)			
১২।	'ততস্তস্য নগস্যাগ্রে'	সুন্দর	২৭শ	সর্গে।
১৩।	'নাবমানো ভবদ্ভিশ্চ'	সুন্দর	৪৬শ	"
১৪।	(সুন্দরকাণ্ড সমাপ্তিতে পূর্ণ)			
১৫।	'রক্ষোগণ পরিক্ষিপ্তে'	যুদ্ধ	১৮শ	সর্গে।
১৬।	'বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ'	"	"	"
১৭।	'উত্তরভাগারম্ভে কুম্ভকর্ণং	"	"	"
১৮।	'মরণান্তানি বৈরাণি'	"	১১২	সর্গে।
১৯।	(যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্তিতে পূর্ণ)		—	
২০।	'ততঃ প্রচোদয়াৎ সূতস্তান্ হয়ান্ রুচিরপ্রভান্'	উত্তরে	২২	সর্গে।
২১।	(৪১ সর্গ পরিসমাপ্তিতে পূর্ণ)			
২২।	(৭৮ সর্গ পরিসমাপ্তিতে পূর্ণ)			
২৩।	'ব্রাহ্মণস্য চ ধর্ম্মেণ ত্বয়া বৈ রক্ষিতঃ'	উত্তরে	৭৮	সর্গে।
২৪।	প্রবন্ধ সমাপ্তিতে পরিপূর্ণ।			

টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেন,—'লবকুশের মুখে মহাপুরুষোত্তম রামের আত্মচরিত শ্রবণ করা সঙ্গত নহে, কিন্তু সীতার চরিত্রের উৎকর্ষ বর্ণনা করাই রামায়ণকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাম বিরহী বলিয়াই তিনি সীতার চরিত্র আকর্ণন-ব্যপদেশে রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই কারণবশতঃ রামায়ণ বর্ণনায়-বাস্তবিকপক্ষে রামের প্রাধান্য নহে, সীতারই প্রাধান্য।' যথা,—'রামায়ণস্য রামৈকপরত্বে স্বেনৈব সদসি শ্রবণং ন সংগচ্ছতে, সীতা-পরত্বে সংগচ্ছত এব বিরহিণঃ কামিনীকথাস্বভাবাৎ। ইত্থং রামচরিত্র প্রতিপাদনং প্রাধান্যেন, প্রাধান্যেন তু সীতাচরিত্রমেব প্রতিপাদ্যতে।'

গোবিন্দরাজ প্রণীত রামায়ণ-টীকা-ভূষণের প্রতি কাণ্ডেরই এক একটী বিভিন্ন নামের উল্লেখ দেখা যায়; যথা,—বালকাণ্ডের নাম—'মণিমঞ্জীর', অযোধ্যা-কাণ্ডের নাম—'পীতাম্বর', আরণ্যকাণ্ডের নাম—'মণিমেখলা', কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের নাম—'মুক্তাহার', সুন্দরকাণ্ডের নাম—'শৃঙ্গারতিলক' এবং যুদ্ধকাণ্ডের নাম—'কিরীট'। উত্তরকাণ্ডের নাম পাওয়া যায় নাই। য়্যাফ্রেট সাহেব গোবিন্দরাজকৃত রামায়ণের টীকার নামই 'শৃঙ্গারতিলক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সুন্দরকাণ্ডের টীকার নামই 'শৃঙ্গারতিলক'। সমস্ত টীকার নাম "ভূষণ"। ইহাই যথার্থ।

১০। ভট্টশ্রীদেবরামকৃত বিষমপদব্যাখ্যান।

এই টীকার ক্রমে (১) ৭৭, (২) ১১৯, (৩) ৭৫, (৪) ৬৭, (৫) ৬৮, (৬) ১৩১, ও (৭) ১১১, মোট ৬৪৮ সর্গ। নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

১১। রামায়ণ-তিলক টীকা।

রামানুজ-কৃত সুপ্রসিদ্ধ টীকার নামই "রামায়ণ-তিলক" টীকা। বাস্তবিকপক্ষে রামায়ণের প্রকৃত তিলকস্বরূপ এই তিলক-টীকাই সংমুদ্রিত হইয়া জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে

'চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ। তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥'

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিয়া গিয়াছেন, যথা,—'তত্র পঞ্চশতরূপসর্গসংখ্যা ষট্‌কাণ্ডানামেব শ্লোকসংখ্যা তু সোত্তরানামিতি আহুঃ। কতককৃতস্তু উক্তসংখ্যাপেক্ষয়া ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গসংখ্যাধিক্যদর্শনাচ্চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাপেক্ষয়া শ্লোকসংখ্যায়া অপি আধিক্যদর্শনাচ্চ উত্তরকাণ্ডীয়সর্গসংখ্যানুক্তেশ্চ প্রক্ষিপ্তোঽয়ং শ্লোকোনত্বার্ধ ইতি আহুঃ।'

উক্ত শ্লোকে যে ৫০০ সংখ্যক সর্গের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা বাল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও যুদ্ধ এই ছয় কাণ্ডের, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ২৪০০০ হাজার শ্লোক কিন্তু সপ্তকাণ্ডের শ্লোক-সংখ্যাই হইবে। যাহা হউক, এইরূপ সংখ্যার বিনির্দ্দেশ করিলেও সর্গ-সংখ্যাতে ৩৬ সংখ্যক সর্গের আধিক্য দর্শনে, শ্লোক-সংখ্যাতেও ২৪০০০ হাজার শ্লোক হইতে সংখ্যাধিক্য থাকায়, এবং উত্তর-কাণ্ডের সর্গ সংখ্যা ইহাতে না থাকায়, এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই গণনীয়।

উপরে যে ছয়খানি টীকার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেও রামায়ণের মোট সর্গ-সংখ্যা অথবা মোট শ্লোক-সংখ্যা প্রকৃত-প্রস্তাবে বিনির্ণীত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে পারা যায় না। অথচ, রামানুজ যাহা 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া মনে করিতেছেন, সেইরূপ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেও তিনি নিরস্ত হয়েন নাই।

১২। নানা আদর্শের সর্গ ও শ্লোক তালিকা।

এইস্থলে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত অনুসারে রামায়ণের সর্গ ও শ্লোক সংখ্যার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

			মহেশ্বর।	গোবিন্দ দেববাম।	প্রথম আদর্শ।	দ্বিতীয় আদর্শ।	Gasper Garrisio
১।	আদি বা বাল-কাণ্ডে	সর্গ	৭৭	৭৭	৭৭	৬৪	৬৪	৮০
		শ্লোক	২২৮০	২২৫৬		২৮৫০	২৫৫০	
২।	অযোধ্যা-কাণ্ডে	সর্গ	১১৯	১১৯	১১৯	৮০	১১৪	১২৭
		শ্লোক	৪৫৫০	৪৪১৫	..	৪৭০	৪১৭০	...
৩।	আরণ্যক কাণ্ডে	সর্গ	৭৫	৭৫	৭৫	১১৪	৯০	৭৯
		শ্লোক	২৭৩০	২৭৩২	..	৪১৫০	৪১৫০	..
৪।	কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে	সর্গ	৬৭	৬৭	৬৭	৬৪	৫৪	৬৩
		শ্লোক	২৬২০	২৬২০	.	২৯২৫	২৯২৫	...
৫।	সুন্দর-কাণ্ডে	সর্গ	৬৮	৬৮	৬৮	৪৩	৪৩	৯৫
		শ্লোক	৩০০৬	৩০০৬	...	২০৪৫	২০৫৫	...

			অহেশ্বর।	গোবিন্দ রাজ।	দেবরাম।	প্রথম আদর্শ।	দ্বিতীয় আদর্শ।	Gasper Garrisio
৬।	যুদ্ধ-কাণ্ডে	সর্গ	১৩১	১৩৬	১৩১	১০৫	১০৫	১১৩
		শ্লোক	৫৯৯০	৫৯৯০	...	৪৫০০	৪৫০০	...
৭।	উত্তর-কাণ্ডে	সর্গ	১০৬(?)	১১০	১১১	৯০	৯০	(নাই)
		শ্লোক	৩২২৪	৩০৪৩	...	৩০৬০	৩৩৫০	...

গ্যারিসিও (Gaspare Garrisio) কর্ত্তৃক ইউরোপ-খণ্ড হইতে ষট্‌কাণ্ড-সংবলিত বাল্মীকির রামায়ণের যে অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, উপরের তালিকায় তাহারও সর্গ সংখ্যা ধৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত আদর্শদ্বয়ের সহিত এই রামায়ণের একতা অনেকটা পরিলক্ষিত হইলেও, নানারূপ পাঠ-বৈষম্যও প্রচুর পরিমাণে ইহাতে আছে। অধিকন্তু সাহেব মহোদয় উত্তর-কাণ্ডকে রামায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার এই সংস্করণে উত্তরকাণ্ড একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু কোনও টীকাকার কর্ত্তৃকই উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই। উত্তরকাণ্ড সর্ব্বত্রই রামায়ণের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

১৩। প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

এস্থলে দুইখানি বঙ্গাক্ষর-লিখিত আদর্শ-গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক সমুদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে, (রামানুজ প্রভৃতি টীকাকরগণ যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,) বাস্তবিক-পক্ষে সেই সকল শ্লোক আর্ষ কি অনার্ষ, অথবা ভাল কি মন্দ, তাহা সহৃদয় সুধিবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৩। (ক) দশরথ ও ভরত।

ভরতকে মাতামহ-রাজ্যে শত্রুঘ্নের সহিত পাঠাইবার সময় রাজা দশরথ তাঁহাকে অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শত্রুঘ্নের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, মাতামহ কেকয়-রাজ, মাতুল যুধাজিৎ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পৌরজানপদ প্রকৃতিবর্গের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, এবং কিরূপে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষণীয়,—রাজা সেই সকল বিষয়েই স্বপুত্র ভরতকে স্নেহাভিষিক্ত মধুর বচনে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশের উপসংহারে রাজা দশরথ, স্বপুত্র ভরতকে বলিয়াছিলেন,—

'ক্ষণমপ্যাসিতুং তাত বৃথৈব ন হিতং তব। কুশলাবেদিনো দূতা নিত্যং প্রেষ্যাশ্চ তে মম॥
হ্লাদিতং হি মনো মে স্যাৎ কুশলং শ্রবণাত্তব॥'

বৎস, তুমি কদাচ আলস্যে বৃথা সময় নষ্ট করিও না,—সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-কার্য্যে অবহিত থাকিবে। আমি যেন দূতমুখে প্রত্যহই তোমার কুশল-সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারি। কারণ, তোমার মঙ্গল-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেই আমার মন প্রফুল্ল থাকিতে সমর্থ হইবে।

রামায়ণে বর্ণিত আছে,—পুত্র-চতুষ্টয় রাজা দশরথের বাহুচতুষ্টয়েরই অনুরূপ ছিলেন। উপরের বর্ণনা তাহাই সম্যক্ প্রকারে প্রমাণিত করিতেছে।

১৪। রাম ও ভরত।

মাতুলালয় গমন-কালে ভরত আসিয়া রামের চরণ-বন্দনা করিলে, রাম বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া ভরতকে গাঢ়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—

'কৈকেয়িমাতরিহ মাং স্মরেস্ত্বং সহ-লক্ষ্মণম্। শত্রুঘ্নসহিতঞ্চ ত্বাং স্মরিষ্যামি সলক্ষ্মণঃ ॥'

ভরত, লক্ষ্মণ ও আমি অযোধ্যাতে থাকিলাম। দেখিও, কেকয়-রাজ্যে গিয়া যেন লক্ষ্মণকে ও আমাকে স্মরণ করিতে ভুলিয়া না যাও,—কেন-না, আমি ও লক্ষ্মণ এখানে থাকিয়া শত্রুঘ্ন ও তোমার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুলমনা হইয়া থাকিব।

সৌভ্রাত্রের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহা হইতে আর অধিক প্রস্ফুট কি হইতে পারে ?

১৫। দশরথ ও রাম।

রামের বনবাস গমন—কালে রাজা দশরথ, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—

'কীর্ত্তিমায়ুর্বলং শৌর্য্যং ধর্ম্মং চাপ্নুহি শাশ্বতম্। যশসো বৃদ্ধয়ে ভূয়ঃ পুনরাগমনায় চ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মৎসত্যং পরিপালয়ন্ ॥'

'বৎস রাম, তোমার কীর্ত্তি, আয়ু; বল, শৌর্য্য ও ধর্ম্ম অনন্তকাল স্থায়ী হউক। সুনির্ম্মল যশের অতিবৃদ্ধি ও অযোধ্যায় পুনর্ব্বার আগমনের জন্য আমার সত্যপালন-পূর্ব্বক তোমার গমন-পথ শুভজনক হউক।' রামের প্রতি দশরথের ইহাই আশীষ-বাণী।

১৬। সুমিত্রা, রাম ও লক্ষ্মণ।

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্। অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥"

লক্ষ্মণ, রামকে তোমার পিতা দশরথের তুল্য জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে, এবং জানকী সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিয়া শুশ্রূষা করিবে, তুমি নিবিড় অরণ্যকেই অযোধ্যার সুখপ্রদ রাজ-প্রাসাদের তুল্য জ্ঞান করিবে। বৎস, অধিক আর কি বলিব, মন প্রফুল্ল রাখিয়া তুমি রামচন্দ্রের অনুগমন কর।

সুমিত্রার এই একটি উক্তিই তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বাক্-প্রপঞ্চ দ্বারাও তাহা হইতে কিছুতেই অধিক আন্তরিকতা পরিব্যক্ত হইতে পারে না,—এ কথা যথার্থ হইলেও, অনাদরে পরিত্যক্ত-প্রায় বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলিও উল্লেখযোগ্য।

'অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং সহ রামেণ লক্ষ্মণ। শুশ্রূষ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রামং লোকহিতে রতম্ ॥
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র তারিতাহং সবান্ধবা। যস্ত্বং ত্যক্ত্বা প্রিয়ান্ দারান্ মাঞ্চ রামমনুব্রতঃ ॥
সমস্থো বিষমস্থো বা রামস্তে পরমা গতিঃ। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুশ্চ তে ॥
তস্মাদস্য প্রযত্নেন ত্বং শরীরং প্রতিপালয়। বিজনে বসতোঽরণ্যে সীতয়া সহিতস্য চ ॥
এষ পুত্র সতাং ধর্ম্মো যস্ত্বমিচ্ছসি সেবিতুম্। তস্মাত্ত্বয়া তৎপরেণ শুশ্রূষ্যোঽয়ং গুণাকরঃ ॥
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠোঽপ্রমত্তেন রামো রাজীবলোচনঃ। ত্বয়া পুত্র বনে সেব্যঃ পরিপাল্যশ্চ সর্ব্বথা ॥
উচিতং বঃ কুলে বৎস জ্যেষ্ঠভ্রাত্রনুপালনম্। দানং দীক্ষা তপশ্চৈব তনুত্যাগোমৃধেষ্বপি ॥
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং পুত্রং সুমিত্রা রামমব্রবীৎ। ত্বয়াপি রাম রক্ষ্যোঽয়ং লক্ষ্মণঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥

ভক্তোঽনুরক্তোঽনুগতো ভ্রাতা ভৃত্যঃ সুহৃচ্চ তে। ত্বয়াঽয়ং সর্ব্বথা রক্ষ্যস্ত্বঞ্চৈবানেন রাঘব॥
এবমস্ত্বিতি রামস্তাং সুমিত্রামভ্যভাষত। চক্রে কৃতাঞ্জলিশ্চৈনামভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্॥'

বনবাস যাইবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ স্বীয় মাতা সুমিত্রার চরণে প্রণত হইলে, তিনি স্নেহভরে স্বীয় পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'বৎস লক্ষ্মণ, রামের সহিত গমন কালে তোমাদের পথ শুভ হউক। রাম সকল ব্যক্তির হিতে একান্ত অনুরক্ত। তুমি তোমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুশ্রূষায় একমনে নিরত থাকিবে। বৎস, তুমি যে নিজের প্রিয়তমা পত্নীকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, রামের অনুগমনে সমর্থ হইয়াছ, ইহাতে তোমার ন্যায় সৎপুত্র পাইয়া আমি নিজের বান্ধবগণ-সহ বাস্তবিকই ধন্য হইয়াছি। বৎস, তুমি এই কথা নিশ্চয় জানিও যে, সম্পদ্ বা বিপদ—উভয় অবস্থাতেই রাম তোমার একমাত্র অবলম্বন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরু রামকে তোমার নিজের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বলিয়া জ্ঞান করিবে। সীতার সহিত বিজন বনে বাসকালীন রামের শরীর-সংরক্ষণে যেন তোমার কখনও প্রমাদ না ঘটে। হে পুত্র, তুমি যে রাম ও সীতার এইরূপ সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছ, নিশ্চয় জানিও যে, ইহাই সাধু ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত পরম ধর্ম্ম। আমি অধিক আর কি বলিব, সর্ব্ব গুণাকর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রামের শুশ্রূষা সংরক্ষণ আদেশপালনে তুমি কখনও প্রমাদগ্রস্ত হইও না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি এইরূপ অনুরক্ত থাকা, সৎপাত্রে দান, যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ, তপশ্চর্য্যা-পরিগ্রহ এবং ধর্ম্মযুদ্ধে দেহপাত করা,—এই সমুদয়গুলিই তোমাদের কুলোচিত ধর্ম্ম বলিয়া জানিও।'

দেবী সুমিত্রা, স্বপুত্র লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া, তখন মহামতি রামকেও বলিতে লাগিলেন,—'বৎস রাম, তুমি শত্রুঞ্জয়ী। লক্ষ্মণকে তোমারই একমাত্র রক্ষণীয় বলিয়া জানিও। কারণ, লক্ষ্মণ তোমারই গুণে সমাসক্ত, অনুরক্ত, ভক্ত, ভৃত্য ও সুহৃৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।'

'মা, আপনার আজ্ঞা আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য',—এই বলিয়া রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মাতা সুমিত্রার চরণে প্রণত হইলেন।

এই সব দিব্য-চিত্রসম্পদের জন্যই রামায়ণ সভ্য-জগতের একমাত্র বরণীয় আদর্শ হইয়াছে।

১৭। দশরথের পুত্রস্নেহ।

'যমিচ্ছেচ্চ পুনর্দ্রষ্টুং ন তং দূরমনুব্রজেৎ। বশিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা ইত্যূচুস্তং নৃপস্তদা।
তেষাং তদ্বচনং নিশম্য রাজা গুরূণাং বিনিগৃহ্য বাক্যম্।
তস্থৌ প্রযান্তং সুতমীক্ষমাণো বিষাদশোকব্যথিতান্তরাত্মা॥'

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রথারূঢ় রামের অনুধাবনে প্রবৃত্ত রাজা দশরথকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন,—'মহারাজ, যাঁহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে মনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, দূর-প্রযাত সেই প্রিয়জনের অনুগমনে অধিক দূর অনুসরণ করা, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।'

গুরুগণের এই উপদেশ-বাক্যে রামের অনুসরণে রাজা দশরথ নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি একদৃষ্টিতে রামের পথ অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। তখন দুর্ব্বহ শোকে ও বিষাদে তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি বিদলিত হইয়া যাইতে লাগিল।

১৮। বনে রাম ও সীতা।

'তদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ। অস্য পার্শ্বে তরুপুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেশরৈঃ॥'

বন-ভ্রমণে পরিশ্রান্তা সীতাকে রাম, রম্য সুশীতল শিলাতল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—'তোমার জন্যই সুবিস্তৃত শিলাপট্ট এইস্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে। অতএব এস, এই স্থানেই উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি। দেখ, দেখ, ইহার চারিপার্শ্বে তরুর কুসুম-কেশর-রাশি সুগন্ধ বিস্তার করিয়া কিরূপ অবিরল বৃষ্টি-ধারার ন্যায় নিপতিত হইতেছে।'

মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ সমুদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৯। স্নেহ ও কর্ত্তব্য।

এই সংসারে দেবত্ব, নরত্ব অসুরত্ব বা তির্য্যক্‌ত্ব, সমুদয়ই অলঙ্ঘনীয় স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির প্রতিকূলতা বা অনুকূলতাতেই মনুষ্যত্ব হইতে তির্য্যক্‌ত্ব অথবা দেবত্ব সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে;—নিজ নিজ মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মানুষ দেবতাও হইতে পারে, দানবও হইতে পারে, আবার ঘৃণিত তির্য্যক্‌ত্বও তাহার পক্ষে অবশ্য সম্ভবনীয় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ সুশ্রুত-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ম্মণা লভতে যস্মাদ্দেবত্বং মানুষাদপি।" (৩৯ অ০ উত্তরতন্ত্রে)

মানুষ-কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব-লাভেও সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব, দেখা যাইতেছে, কর্ম্মই মানুষকে দেবতা করিয়া থাকে, কর্ম্মই তাহাকে দানব করিয়া ফেলে এবং আবার কর্ম্মের প্রভাবেই তাহাতে তির্য্যক্‌ত্বের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে।

রামায়ণের কবি এই কর্ম্মের প্রভাবই সুপ্রস্ফুটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্র ত এক-বাক্যেই বলিয়া গিয়াছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,'—যাহা কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই যখন নাই, তখন সৎ বা অসৎ, ভাল বা মন্দ,—সবই ত এক শাশ্বত ব্রহ্মেরই পরিণাম! সকলই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু হৃদয়ের যে অকপট সরল ভাবাবেশ ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি করাইয়া দেয়, ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেয়, ব্রহ্মের অস্তিত্বে প্রমাদ না ঘটায়, 'সকলই ব্রহ্ম'—এই নিত্য জাগরণের সংপ্রকাশের হেতুভূত হয়, তাহার প্রভাবেই মানুষের তির্য্যক্‌ত্ব বা নরত্ব ঘুচিয়া ক্রমে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। মানুষের সেই দেবত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়—তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত কাম, ক্রোধ ও লোভ।

গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—

'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥'

নরকের দ্বার ও আত্মঘাতের তিনটী কারণ, জীবের নিজ শরীরেই বর্ত্তমান থাকে। সেই তিনটী এই,—কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব এই তিনটীকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া, নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

রামায়ণে রামের চরিত্রে এই দেবত্বের পরিপূর্ণ প্রভাব পরিস্ফুট হওয়াতেই রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য অন্য মহান্ অবতার-চিত্রেও এইরূপ

বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হওয়াতেই তাঁহারাও সনাতন বিষ্ণুর অবতার হইতে পারিয়াছেন। সকলই যে ভগবানের বিভূতি, তাহা ত তিনি স্বয়ং গীতাতেই বলিয়া গিয়াছেন,—

'যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥"

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন এবং প্রভাব-বিশিষ্ট, সেই সমুদয়ই আমার তেজের সাক্ষাৎ অংশ বলিয়া জ্ঞাত হইবে।

রামায়ণে বাল্মীকি কর্ত্তব্যের চিত্রেরই পরাকাষ্ঠা প্রস্ফুটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। রাম বা সীতার ত কথাই নাই; ইহাতে দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য সকলের সুচরিত্র, যাহা দেবত্ব-লাভের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ উপযোগী, সেইরূপ সর্ব্বসম্পূর্ণ প্রভাব-প্রোজ্জ্বলিত করিয়াই সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামের ও সীতার প্রভাব সকলের উপরে। তাহাতেই প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়-সরসীরুহে রাম ও সীতা, প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদরূপে,—অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে—সুবিরাজিত হইয়া রহিয়াছেন। এই অভিচিন্তনে তর্ক নাই, সন্দেহ নাই, মোহ নাই, কিন্তু কেবলমাত্র সুনির্ম্মল চিত্তক্ষেত্রেই এই সুপ্রভাব সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তব্যের চিত্র রামের চরিত্রে যেরূপ পরিস্ফুরিত হইয়াছে মহামতি ভরতের চরিত্রেও তাহার কোনও অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। মাতার আকস্মিক দুরপণেয় কলঙ্ক-কালিমা দূরীকরণের জন্যই ভরত জীবন্ত-অযোধ্যাপুরী সমভিব্যবহারে রামচন্দ্রকে ফিরাইতে আসিয়াছেন।

'রামস্তু ভরতং দৃষ্ট্বা শিরসা পাদয়োর্গতম্। অপাসর্পদ্ দ্রুতং কিঞ্চিদ্ বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ॥
ততঃ পাদৌ চ সংগৃহ্য ভরতো ন্যপতৎ ক্ষিতৌ। রুদন্নতিতরামার্ত্তঃ কূলাদ্ বৃক্ষ ইব চ্যুতঃ॥
স সর্পন্নিব মেদিন্যাং শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ। অচেষ্টত মুহুর্দীর্ণঃ সর্ব্বতঃ সুস্বরং রুদন্॥
মাতরশ্চাস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সীতা চ জনকাত্মজা। অরুদংশ্চাত্র কারুণ্যাদ্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ॥
সযোধশ্রেণিনিগমঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতঃ। তস্মিন্মুহূর্ত্তে দুঃখার্ত্তঃ সর্ব্বঃ প্ররুদিতো জনঃ॥
অপি পুষ্প প্রমোক্ষেণ সর্ব্বাঃ প্ররুদিতা লতাঃ। নরাণাং কিং পুনস্তেষাং মনো যেষাং হি মানুষম্
ভরতং বাষ্পদীনাক্ষং স্নেহাদাগতবিপ্লবঃ। গাঢমাশ্লিষ্য দুঃখার্ত্তং রামো বচনমব্রবীৎ॥

সাধু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ সাধু বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।
শোকার্ত্তান্ সম্বিবেক্ষাস্মান্ সাধ্বিতঃ প্রতিগম্যতাম্॥

ন ত্বাং শক্নোম্যহং দ্রষ্টুমেবম্ভূতং নৃপাত্মজম্। শোকভারসমাক্রান্তং সীদতীব হি মে মনঃ॥
শাপিতোঽসি ময়াবীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। ন চত্বামভিভাষেয়ং যদ্যযোধ্যাং ন গচ্ছসি॥
এবমুক্তস্তু ভরতঃ প্রগৃহ্যাশ্রূণ্যবাঙ্মুখঃ। পূর্ব্বমুক্ত্বা প্রসীদেতি রাঘবং স ততোঽব্রবীৎ॥
অলং শপ্তেন যাস্যামি যদ্যেবং পরিতপ্যমে। অদ্যাহং জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্য্যাং তব প্রভো॥
গমিষ্যে সর্ব্বথাঽযোধ্যাং মাতৃভিঃ সহ রাঘব। প্রকর্ষন্নহতীং সেনাং কিন্তু বিজ্ঞাপয়ামি তে।
অপি স্মরসি সুব স্বাং ন্যাসধর্ম্মাং নৃপশ্রিয়ম্॥ * * *

তং প্রহৃষ্টতরো রামো ভরতং গমনোৎসুকম্। সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্ব্বাক্যৈস্তথেত্যভিদধে পুনঃ॥

ভরত, রামকে আযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয়, নীতি ও

করিলেন। কিন্তু পিতার সত্যপালনে হিমালয়-সদৃশ অটল শ্রীরামচন্দ্রের অটুট হৃদয় কিছুতেই কর্ত্তব্য-পথ হইতে একপদও পরিস্খলিত হইল না। রাম যখন দেখিলেন শোকার্ত্ত ভরত, তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন, তিনি তখনই একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু অবিরল বাষ্প-প্রবাহে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় পরিপ্লাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভরতও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছিলেন না; তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া রামের পদ-যুগল ধারণ পূর্ব্বক কুলচ্যুত বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে অবিরল বাষ্প-ধারায় ভরতের নয়ন যুগল প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। ভরতের এই শোকদুর্ভর দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, সীতার সহিত জননীগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাষ্পধারায় সকলেরই মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভরতের সঙ্গে গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ, পৌর ও জানপদগণ, যোদ্ধৃবর্গ ও ভৃত্য-সমূহ,—যাঁহারা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, এই মর্ম্মস্পৃক্ শোকদৃশ্যে তাঁহারা কেহই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিয়া থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই, বাষ্প-প্রবাহে বক্ষঃস্থল পরিপ্লাবিত করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে রোদন-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন! মানুষের কথা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে, অচেতন বৃক্ষ-লতাদিও অবিরল পুষ্পের ভার পরিত্যাগ ছলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া এই শোকে সমবেদনা দেখাইতেছিল।

অতঃপর রাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুজল-পরিপ্লুত-নয়ন ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ভাই, শোক ও স্নেহের পরাকাষ্ঠা তুমি খুবই দেখাইয়াছ। কিন্তু ইহা স্থির জানিও, এক্ষণে আর শোকের অবসর তিলমাত্রও নাই। শোক হইতে কর্ত্তব্যই প্রধান, ইহা মনে স্থির জানিয়া এখন হৃদয়ে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক তোমার অশ্রুধারা সংবরণ কর। দেখ, তোমার এই শোকাবেশে আমরা সকলেই শোকে কর্ত্তব্য-বিমূঢ়প্রায় হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আর শোক-প্রকাশের অবকাশ তোমার একেবারেই নাই। তুমি নিজ মনের ধৈর্য্যরজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আর কালবিলম্ব না করিয়া এস্থান হইতে অতি শীঘ্র অযোধ্যাতে প্রতিগমন কর। দেখ, তোমাকে এইরূপ শোকসমাচ্ছন্ন দেখিয়া আমি কিছুতেই আমার হৃদয়ের ধীরতা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতে পারিতেছি না। কারণ, তোমার এই শোকসন্তাপে আমার মনও শোকের ভারে যেন মোহতমিস্রায় নিমজ্জিতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, ভাই স্থির হও, আর শোক না করিয়া, অযোধ্যাতে ফিরিয়া যাও। যদি তুমি ইহাতেও কিছুতেই এস্থান হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার সহিত কোনও কথাই বলিব না। আমি আমার নিজের, সীতার ও লক্ষ্মণের দিব্য দিয়া তোমাকে এই সব কথা বলিতেছি, ইহা স্থির জানিও।'

রামের এই কথা শুনিয়া ভরত অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, 'আপনি এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন' বলিয়া রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—'আর্য্য, আপনি শপথ করিবেন না। আমি এখানে থাকিলে যদি তাহা আপনার মনঃসংক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কিছুতেই সেইরূপ ঘটিতে দিব না। আপনি ইহা

স্থির জানিবেন যে, আমি আজ নিজের জীবনপাত করিয়াও আপনার প্রিয় আচরণ করিতে ত্রুটি করিব না। কারণ, আপনিই আমার একমাত্র প্রভু। আমি সৈন্যসামন্ত ও মাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাতে ফিরিয়া গিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন-পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিব। কিন্তু শ্রীচরণে আমার এই নিবেদন যে, আপনি কিছুতেই এই কথা ভুলিয়া যাইবেন না যে, এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার, আপনি আপনার এই বনবাস পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসরের জন্য, আমার হস্তে গচ্ছিত রাখিতে দিয়াছেন।'

ভরতের এই কথায়, তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, রাম অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে আমি আমার ন্যাসীভূত রাজ্যভার গ্রহণ করিব' বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

এই সময়ে শরভঙ্গ মুনির শিষ্যগণ বন্যফলমূলাদি উপহার-দ্রব্য আনিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাম অতি সম্মানের সহিত মুনি-প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিলেন। এই উপহার-দ্রব্যের মধ্যে কুশবিনির্ম্মিত পাদুকা-যুগলও বর্ত্তমান ছিল। তাহা দেখিয়া,

'অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ। বশিষ্ঠো বাক্যকুশলো দৈন্যং হর্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ন্॥
অধিরোপ্যার্য্যপাদাভ্যামিমে গৃহ্ণীষ্ব পাদুকে। এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতঃ॥'

মহামুনি বাক্যবিশারদ বশিষ্ঠ, শোকসন্তপ্ত ভরতকে তখন বলিতে লাগিলেন,—'বৎস ভরত, এই কুশনির্ম্মিত পাদুকাযুগল, রামচন্দ্রের পাদদ্বয়ে পরিধান করাইয়া উহাই রামের প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি অযোধ্যায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। ইহার প্রভাবে প্রকৃতিপুঞ্জের সম্যক সংরক্ষণ-বিধায়ক সকল কার্য্যই অবাধে সুসম্পন্ন হইবে।' সেই সময়ে প্রকৃতিবর্গ সকলেই বশিষ্ঠদেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সময়োচিত সুখ ও দুঃখ উভয়ের অভিবর্দ্ধক এই বাক্যগুলি একমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছিল। ভরতও তখন গুরুবাক্যে তদনুরূপ বিধান সমাধান করিয়া রামের চরণ-যুগল বন্দনা-পূর্ব্বক সর্ব্বজনসহ অযোধ্যা-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২০। উপসংহার

রামচরিত্রের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ যেমন অমৃতের উপভোগে কিছুতেই তৃপ্তি-লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ রামের পবিত্র-চরিত্রেও মনের ঔৎসুক্যের সফলতার পর্য্যাপ্ত হইল, এইরূপ বোধ হয় না। এই প্রস্তাবও কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বিরক্তির আশঙ্কা করিয়া, এই স্থানেই এই প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল। এই প্রবন্ধে যে সকল শ্লোক সমুদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা প্রায়শঃ প্রক্ষিপ্তের অবজ্ঞতায় প্রচলিত রামায়ণের কলেবর হইতে পরিচ্যুত হইয়া বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথির কলেবর গুহাতে নীরবেই সমাধি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কালক্রমে ঐ সকল পুস্তকের জীর্ণদেহ-পঞ্জরের তিরোধানের সহিত এই সকল সৎকবিতাবলীও মহান্ অনন্তের অনন্ত কলেবরেই অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। এই সকল কবিতাবলী ঠিক মহামুনি বাল্মীকির বিরচিত কিনা, তাহা যদি তাঁহার আত্মপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া প্রমাণ করিয়া যান, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে তাহা হইলেই তাঁহার সুপ্রমাণে সকলে বীত-সন্দেহ হইতে সমর্থ হইতে পারেন! তবে বাল্মীকির

বীণার মধুর ঝঙ্কারের সহিত যেন এই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষিত কবিতাবলীর মধুরতার কোনও প্রভেদ নাই। এইরূপ বিশ্বাসে সেই গুলির কয়েকটী মাত্র সযত্নে সংগ্রহ-পূর্ব্বক, নিতান্ত আশঙ্কার ও উপেক্ষার আক্ষেপ-সম্ভাবনার মধ্যেই লেখক এস্থলে উপস্থিত করিয়াছে। আদিকবি বাল্মীকির মধুর বীণারঝঙ্কারের মধুর নিস্বন ও মধুর রামনামের স্বভাবসিদ্ধ সুজন-হৃদয়ের সমাকর্ষণী শক্তিই এইগুলি সাধারণ্যে উপস্থিতি করিতে সাহস প্রদান করিয়াছে।

উপসংহারে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইব। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কালনেমির বৃত্তান্ত আছে, তাহা সকলেই জানেন। এই রামায়ণেও কালনেমি বধ-বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিষয়-বিনির্দ্দেশে ইহার সমুল্লেখ রামায়ণের সূচীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধিকন্তু তালজঙ্ঘাদি বধ ও অঙ্গদ-কর্ত্তৃক রাবণের সমক্ষেই মন্দোদরীর কেশাকর্ষণপ্রভৃতি বৃত্তান্তও ইহাতে সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরকাণ্ডে প্রচলিত রামায়ণে অনভিব্যক্ত অনেক বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখা যায়।

টীকাকারগণ রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের সর্গ ও শ্লোকসমূহের সংখ্যা-নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকসংখ্যা যে ঠিক ২৪০০০ চব্বিশ হাজারেই পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ কেহই নিশ্চয় করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সর্গ-সংখ্যা বিনির্ণয়েও এইরূপ বৃথা প্রয়াসই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন্‌টি বাল্মীকির কৃত আর কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত,—তাহার সম্যক্ নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইয়াছে, তখন প্রক্ষিপ্তের অন্তরালে না রাখিয়া রামের সুচরিত্র-অঙ্কনে সুপবিত্র বলিয়া যদি এই উপেক্ষিত গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কন সম্পাদন করিয়া, কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা জননয়নের সম্মুখীন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহ ও পরকালের সুমঙ্গল-সংসাধনের সহিত এই লুপ্তপ্রায় রত্নরাজির অস্তিত্বও জনসমাজে থাকিয়া যাইতে পারিত।

এস্থলে লেখক এই কথা হৃদয়ের একান্ত কৃতজ্ঞতার সহিত ব্যক্ত করিতেছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের সংগৃহীত এসিয়াটিক-সোসাইটিতে সুরক্ষিত গভর্ণমেণ্ট কলেকশনের পুঁথি অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধের বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি, লেখকের হৃদয়ের অসম্ভব আবেগের এই বিক্ষিপ্ত পরিচয়, সহৃদয় সামাজিকগণ, নিজ নিজ ঔদার্য্যগুণে তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন।

তোমারি।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মজুমদার, বিদ্যাবত্ন বি-এ বিরচিত।]

রাগিণী সাহানা—ঝাঁপতাল।

নিয়ত সারা ভুবন মাঝে তোমারি লীলা চলে ;
তোমারি জ্যোতি বিজলীরূপে নিবিড় মেঘ-কোলে।
তোমারি প্রীতি শিশুর প্রাণে, তোমারি গীতি বিহগ-গানে,
তোমারি বাঁশী কীচক-বনে, তটিনী-কলকলে।
জোছনা-মাখা-মধুর রা'তে, তোমারি খেলা প্রকৃতি সাথে,
আঁধার-ভরা আকাশ-পথে তোমারি বাতি জ্বলে॥

ন্যায়-রহস্য।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ শিরোমণি মহাশয়ের লিখিত।]

(২০)

"বিকল্পোপপত্ত্যা কেনাপ্যুপায়েন বা ভ্রান্তিং জনয়িত্বা প্রতিপক্ষবচনবিঘাতোঽর্থশ্ছলমিতি বিঘাতো ব্যাঘাতক বা ইতি॥"

শব্দার্থের বিকল্পোপপত্তি দ্বারা অথবা অন্য কোনও উপায়ে বক্তার ভ্রান্তি জন্মাইয়া যাহা দ্বারা বক্তার কথার ব্যাঘাত জন্মায় ঐ ব্যাঘাতকর অর্থকেই ছল কহে।

'কেনচিৎসাধর্ম্ম্যেণ কথঞ্চিদ্বৈধর্ম্ম্যেণ চ যস্য ধর্ম্মস্য প্রত্যবস্থানংসংস্থিতিঃ এবং স্বেতরপ্রতিষেধশ্চ জায়তে স বহুব্যাপকো ধর্ম্মো জাতিস্তেনায়ং ঘট ইত্যাদি জ্ঞানমিতি তস্মাচ্চ কস্য চদ ধর্ম্মস্য যদি ক্বচিদুদাহরণসাধর্ম্ম্যেণ সাধনং ক্বচিচ্চোদাহরণবৈধর্ম্ম্যেণ প্রতিষেধশ্চ ক্রিয়তে স বাক্যাবাক্যভাবো জল্প ইতি যথা শব্দস্য ঘটাদ্যুদাহরণসাধর্ম্ম্যেণ জন্যত্বাদিনা শব্দে অনিত্যত্বস্য সাধনং নিত্যত্বস্য প্রতিষেধশ্চ ক্রিয়তে এবমাত্মাদ্যুদাহরণবৈধর্ম্ম্যেণ চ নিত্যত্বস্য প্রতিষেধোঽনিত্যত্বস্য চ সাধনং শব্দমাত্রে ঘটাদিবজ্জন্যত্ব জাতিস্বীকারান্নিত্যত্বপ্রতিষেধ এবমাত্মাদিবচ্ছব্দো ন জন্যত্বাভাববানিতি শব্দমাত্রে জন্যত্বাভাবস্যাস্বীকারাচ্চ নিত্যত্বপ্রতিষেধঃ তথাচানিত্যঃ শব্দো জন্যত্ব জাতিমত্ত্বাৎ ঘটাদি জন্যদ্রব্যবৎ যথাস্থাল্যাদি দ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকং দৃষ্টং তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ইতি তস্মাজ্জন্যত্ব জাতিমত্ত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি নিগমনম্। অত্র তু শব্দমাত্রস্য জন্যত্বমঙ্গীকৃত্যৈব তথা জাতিমত্ত্বেন হেতুনা শব্দস্যানিত্যত্বং সাধ্যতে প্রতিবাদী তু চরমসূক্ষ্মশব্দস্য জন্যত্বং নাঙ্গীক্রিয়তে তস্য তু মতে শব্দঃ শব্দান্তরযোগেন জন্য শব্দো জায়তে তত্রৈব জন্যত্বং স্বীক্রিয়তে ন সর্ব্বত্রেতি। জন্যত্ব তু ক্ষিত্যাদিপরমাণ্বাদিবচ্চরমসূক্ষ্মশব্দে ন বিদ্যতে তস্মাদহেতুরিতি। তথোভয়োপক্ষয়োরস্বীকারাৎ সংশয়ো জায়তে কিং তত্ত্বমিতি। তথা জাত্যা শব্দস্যানিত্যত্বসাধনং যত্র সজল্প এব ইতি জল্পবাক্যোদাহরণার্থমেব জাতিরুক্তা। যথা সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিরিতি ইতঃপরং সামান্যবিশেষজাতিলক্ষণং স্পষ্টমুক্তমিতি॥'

কোনরূপ সাধর্ম্ম্য দেখাইয়া বা দেখিয়া বা উহার বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ দ্বারা যে ধর্ম্মের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ সংস্থিতি বোধ হয়, এবং যে স্বেতর-ধর্ম্মের অর্থাৎ স্ব-ভিন্ন অপর ধর্ম্মের প্রতিষেধক হয় অর্থাৎ ঘটত্বাদি, পটত্বাদির প্রতিষেধক হয়, অর্থাৎ যেখানে ঘটত্ব থাকে, সেইখানে পটত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকে না—ইত্যাদিরূপে যে ধর্ম্মের উপস্থিতি হয়, ঐ ধর্ম্ম যদি বহুত্বের ব্যাপক হয়, তাহা হইলে উহাকে জাতি-নামক পদার্থ কহে। ঐ ঘটত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারাই ঘটাদির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে; অর্থাৎ, যাহাতে ঘটের ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহাই ঘট; এবং যাহাতে পটের ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহাই পট। ঘট পট নহে, পটও ঘট নহে। ইত্যাদিরূপে পরস্পর-প্রতিষেধক বহুত্ব ব্যাপক ধর্ম্মই জাতি। এই ধর্ম্মকে হেতু করিয়া যদি কোনও স্থলে বা কোনও সময়ে উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য দ্বারা কাহারও সাধন ও উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য

দ্বারা যা বৈধর্ম্মিকে উদাহরণ দেখাইয়া কোনও ধর্ম্মের প্রতিষেধ করা হয়, অর্থাৎ উদাহরণে যে ধর্ম্ম আছে, উহা ঐ সাধ্য বস্তুটীতে নাই ইত্যাদিরূপে জাতি-ধর্ম্মটী যদি পূর্ব্বোক্তবাদলক্ষণান্বিত বাক্যেতে সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাকে জল্প কহে। যেমন, মনে কর, ঘটাদি বস্তু জন্য বলিয়া উহাতে জন্যত্ব জাতিধর্ম্ম থাকে, অতএব উহা অনিত্য। তদ্রূপ শব্দেরও জন্যত্ব ধর্ম্ম আছে; অর্থাৎ জন্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দ-মাত্রেরই অনিত্যত্ব সাধন করা যাইতে পারা যায়। যাহাতে জন্যত্ব থাকে, সে অনিত্য; উহাতে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। অতএব শব্দেও জন্যত্ব থাকে বলিয়া শব্দ অনিত্য। অতএব শব্দেতেও নিত্যত্বের প্রতিষেধ করা যাইতে পারে, এবং আত্মাদি নিত্যবস্তুগত বৈধর্ম্ম্য উদাহরণ দ্বারা শব্দ-মাত্রেরই নিত্যত্বের প্রতিষেধ ও অনিত্যত্বের সাধন করা যাইতে পারা যায়। বস্তুতঃ ঘটাদি বস্তুর ন্যায় শব্দ-মাত্রেরই জন্যত্ব স্বীকার হেতুই শব্দ-মাত্রের নিত্যত্ব নাই, এইরূপ বলিতে হইবে, এবং আত্মাদি নিত্য-বস্তুর ন্যায় শব্দ জন্যত্বাভাব-বিশিষ্ট নহে বলিয়াই শব্দ-মাত্রে জন্যত্বাভাবের অস্বীকার-হেতু শব্দ-মাত্রেরই নিত্যত্বের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অতএব ঘটাদি বস্তুর ন্যায় শব্দ অনিত্য; যেহেতু, উহাতেও জন্যত্ব ধর্ম্ম আছে। যেমন, স্থাল্যাদি দ্রব্য উৎপত্তি-ধর্ম্মক দেখা যায়; তদ্রূপ শব্দও উৎপত্তি-ধার্ম্মিক বলিয়া জন্যত্ব-জাতি-বিশিষ্ট। অতএব শব্দকে অনিত্য বলিতে হইবে;—এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যই নিগমন।

কিন্তু বাদী, শব্দ-মাত্রেরই জন্যত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার করতঃ, জন্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দ-মাত্রেরই অনিত্যত্ব-সাধন করিতেছেন, পরন্তু প্রতিবাদী চরম সূক্ষ্ম-শব্দের জন্যত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। উঁহার মতে যে শব্দ শব্দান্তরযোগে উৎপন্ন হয়, উহারই জন্যত্ব-ধর্ম্ম, অন্যের নহে। যেমন, ক্ষিত্যাদির পরমাণুতে জন্যত্ব নাই; তদ্রূপ অনাহত সূক্ষ্ম শব্দেতেও জন্যত্ব নাই। অতএব অনাহত সূক্ষ্ম-শব্দ নিত্য। ঐ শব্দ-পক্ষ-স্থলে উহাকে (জন্যত্বকে) অহেতু বলিতে হইবে। এইরূপে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই উভয়ের মত অস্বীকার করায় সংশয় হইতেছে। ইহার তথ্য কি? এইরূপে জন্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দ-মাত্রের অনিত্যত্ব সাধন করা হয়। যে বাক্যেতে ঐ বাদ-লক্ষণাক্রান্ত বাক্যকে জল্প বলিতে হইবে, সূত্রকার মহর্ষি গৌতম জল্প-বাক্যের উদাহরণের নিমিত্ত প্রথম সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য দ্বারা জাতির লক্ষণ করিয়া পরে স্পষ্ট করিয়া সামান্য ও সামান্য-বিশেষ জাতির কথা বলিয়াছেন।

'যদ্বা সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যামেব ঘটত্বাদি জাতিরপজ্ঞায়তে যথা ঘটস্য সাধর্ম্ম্যেণ কপাল-কপালিকা সংযোগবত্ত্বেনায়ং ঘটো জ্ঞায়তে যতোঽস্মিন্ কপালকপালিকা সংযোগো দৃশ্যতে অন্যত্র কলসবৎ তথাত্র সংযোগবত্ত্বাদনুমীয়তে ঘটত্বং জাতিরিতি ঘটত্বং কলসত্বঞ্চৈকা জাতিরিতি। এবং—বস্তুবৈধর্ম্ম্যেণাপি সহায়েন তথা জ্ঞায়তে। বি-অন্যত্রাবস্থিতধর্ম্মো যস্য স, বিধর্ম্মস্তস্যভাবো বৈধর্ম্ম্যঃ। বস্তুতো যো ধর্ম্মঃ স্বস্মিন্নতিষ্ঠত্যপরস্মিংস্তু তিষ্ঠতি স তস্য বৈধর্ম্ম্য ইতি যাবৎ। যথা তুরিতন্তু সংযোগাদি ব্যাপারজন্য-তন্তুসংযোগবিশেষবত্ত্বাদিস্তু পটাদেধর্ম্মঃ স ঘটস্য বৈধর্ম্ম্য স্তন্তুত্বেন ঘটবৈধর্ম্ম্যেণ সহায়ভূতেন চ ঘটসাধর্ম্মেণায়ং ঘটো ন পট ইতি জ্ঞায়তে। এবং জল্পবাক্যোদাহরণার্থমেব সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিরিতি বক্ষ্যতি।'

যদ্বা, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই ঘটত্বাদি জাতি জানা যায়, যথা, অন্যত্র কপালকপালিকা

সংযোগ দেখিয়াই ঘট বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তদ্রূপ এখানেও কপালকপালিকা সংযোগ দেখিতেছি, অতএব ইহাও ঘট, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপে ঘটাদির সাধর্ম্ম্য দ্বারাই ঘটাদি বস্তু জানা যায়। অন্যত্র, কলসে কপালকপালিকা সংযোগ দেখিয়া যেমন ঘটত্বের অনুমান হয়, তদ্রূপ ইহাতেও যখন কপালকপালিকা সংযোগ দেখিতেছি, তখন নিশ্চয়ই ইহাতেও ঘটত্ব জাতি আছে, ইহা অনুমিত হইতেছে। ঘটত্ব ও কলসত্ব একই জাতি। ঘটাদি বস্তুর বৈধর্ম্ম্য দ্বারাও ঘটাদি বস্তু জানা যাইতে পারে, (বি-অন্যত্রাবস্থিতো ধর্ম্মো যস্য) এই বিগ্রহে, বিধর্ম্ম এই শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে বৈধর্ম্ম্য এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ, যে ধর্ম্ম যাহাতে থাকে না পরন্তু অন্যত্র থাকে, তাহাকেই উহার বৈধর্ম্ম্য কহে; যথা, তুরিতন্তুসংযোগাদি ব্যাপার জন্য তন্তু-সংযোগ বিশেষবত্ত্বাদি পটাদির ধর্ম্ম, সে ঘটের বৈধর্ম্ম্য। তদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্টের ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ ঘট বৈধর্ম্ম্য তন্তু সংযোগ-বিশেষ দ্বারা পটকে জানা যায় ও যাহার বৈধর্ম্ম্য তাহাকেও জানা যাইতে পারে। অন্যথা, ইহা উহার বৈধর্ম্ম্য—এই জ্ঞান হইতে পারিত না, সুতরাং বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান দ্বারাও ঐ ধর্ম্মীর ও ঐ বৈধর্ম্মীর জ্ঞান সামান্যতঃ হয়, বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঘটের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই ইহা ঘট, ঘট নহে,—এইরূপে নিশ্চয় হইয়া থাকে। বৈধর্ম্ম্য-বিশিষ্ট, স্ববৃত্তি-ভিন্ন হইয়া স্বেতরবৃত্তিত্বরূপসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এইরূপে বৈধর্ম্ম্য-সহায়ক সাধর্ম্ম্য দ্বারাই ইহা ঘট, ইহা পট নহে, ইত্যাদি-রূপে নিশ্চয় হইয়া থাকে। জল্প-বাক্যে জাতির কথা আছে বলিয়াই সূত্রকার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রথমতঃ জাতির লক্ষণ বলিবেন, অর্থাৎ একপক্ষে সাধর্ম্ম্য দ্বারা জাতি-ধর্ম্মের সাধন, অপরপক্ষে বৈধর্ম্ম্য দ্বারা উহার ইতর-ধর্ম্মের প্রতিষেধক ধর্ম্মকে জাতি বলিবেন। যদ্বা, একটী ধর্ম্মেরই সাধন ও প্রতিষেধ, পক্ষভেদে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা বুঝিতে হইবে।

বস্তুতস্তু যা সমানার্থং সূতে সা জাতিঃ। যেন ধর্ম্মেণ বহূনামেকত্বং প্রতিপদ্যতে সধর্ম্ম-বিশেষো জাতিঃ বক্ষ্যতি চ সূত্রকারঃ। "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতি" রিতি। ব্যাখ্যাতবৈঃ তদ্ভাষ্যকারেণ "যা সামানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিন্নেষ্বধিকরণেষু, যয়া বহূনীতরেতরতো ন ব্যাবর্ত্তন্তে, যোঽর্থোঽনেক প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্তং তৎসামান্যম"। "যচ্চকেষাঞ্চিদ্ভেদং কুতশ্চিদ্-ভেদং করোতি তৎ সামান্যবিশেষ জাতি"রিতি। পরাঽপরাভেদতঃ সামান্যং সামান্যবিশেষ-জাতিরিতি জ্ঞেয়ম্। যা পুনঃ পরা অপরা চ দ্রব্যত্বাদিঃ সা খলু সামান্যং সামান্যবিশেষ-জাতিশ্চেতি। গগনত্বাদিস্তু একপ্রত্যয়করত্বান্ন জাতিরিতি। তথা চ জল্পবাক্যপ্রজ্ঞানার্থমেব জাতিলক্ষণং বক্ষ্যতি সূত্রকারঃ। "সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি" রিতি। সাধর্ম্ম্যেণ বৈধর্ম্ম্যেণ বা যস্য প্রত্যবস্থানং সংস্থিতিঃ প্রতিষেধো বা সধর্ম্মবিশেষো জাতিঃ প্রমাণমনপেক্ষ্য সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যামেকস্য সাধনমপরস্য প্রতিষেধ এব মেকঃ সাধয়তি তদন্যঃ প্রতিষেধতি চ ইত্যেবং সাধ্য ধর্ম্মঃ প্রতিষেধ্য ধর্ম্মশ্চ জাতিরিতি জল্পলক্ষণে ব্যক্তং ভবিষ্যতি।

বস্তুতস্তু যে ধর্ম্ম সমান অর্থকে প্রসব করে অর্থাৎ বহু পদার্থকে একত্বে প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ বহুকে এক বলিয়া বোধ করায়, তাহাকেই জাতি কহে। সূত্রকার পরে জাতি শব্দের এইরূপ অর্থই ব্যক্ত করিবেন, যথা,—"সামানপ্রসবাত্মিকা জাতি"রিতি। সামানার্থ-প্রসবকারিণীকে জাতি কহে। এই সূত্র-ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যথা—ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণেতেও সমান

বুদ্ধি অর্থাৎ অভিন্ন বোধ অর্থাৎ বিভিন্নাকার বহু বস্তুকে অভিন্ন/এক বস্তু বলিয়া জ্ঞান জন্মায় যে ধর্ম্ম, উহাকে জাতি কহে; যথা—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু আকাশাদি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও দ্রব্যত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে উহারা এক দ্রব্য পদার্থ। দ্রব্য বলিতে ক্ষিত্যাদি নয়টি পদার্থকেই বুঝা যায়, দ্রব্যত্ব জাতি উহাদের সকলেরই অভিন্নবোধক ধর্ম্ম। ক্ষিতিত্বাদি ধর্ম্ম-ভেদে উহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও দ্রব্যত্ব জাতি ধর্ম্ম দ্বারা উহারা ব্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অর্থ অনেক প্রত্যয়ানুবৃত্তি অর্থাৎ ইহা ঘট ইহাও ঘট, উহা দ্রব্য 'তাহাও' দ্রব্য ইত্যাদিরূপে প্রত্যয়ের অনুবৃত্তির নিমিত্ত-কারণ হয়, উহাকে (পদার্থত্বাদিকে) সামান্যাখ্য জাতি কহে। যদি উহা (ঐরূপ ধর্ম্ম) কোনও কোনও পদার্থ হইতে ভিন্ন করিয়াও কোনও কোনও বস্তু হইতে অভেদ বোধ করায়, তাহা হইলে উহাকে সামান্য-বিশেষ জাতি কহে। পরাপর জাতি-ভেদেই সামান্য ও সামান্য-বিশেষ জাতি বুঝিতে হইবে। দ্রব্যত্বাদি জাতি অপেক্ষাকৃত পরা ও অপরা হয় বলিয়া, উহাদিগকে সামান্য ও সামান্য-বিশেষ জাতিও বলা যাইতে পারা যায়। গগনত্বাদি ধর্ম্ম একমাত্র গগনের প্রত্যয়-জনক বলিয়া জাতি নহে।

জল্প-বাক্য বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এক্ষণে সূত্রকার জাতির কথা বলিবেন, যথা,—"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি"রিতি। কোনও বস্তুর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা অর্থাৎ কোনও প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া যে কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দেখাইয়া কোনও ধর্ম্মের সাধন, অপর পক্ষে উহার প্রতিষেধ, বা একপক্ষ যে ধর্ম্মের সাধন করিতেছেন অপর পক্ষ উহারই প্রতিষেধ করেন, ঐ ধর্ম্ম বা উহার সাধক বা প্রতিষেধক যে ধর্ম্ম, অথবা জল্প-বাক্যে ঐরূপে যে ধর্ম্ম সাধ্য ও যে ধর্ম্ম প্রতিষেধ্য, উহাকে জাতি বলে। ঐরূপে জাতি-দোষ-দোষিত বাদবাক্যই জল্প। ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

কেচিত্তত্র জাতিশব্দো ন সামান্যাদি জাতিবাচক ইতি বদন্তি; পরন্তু প্রতিষেধ-প্রসঙ্গ-পরং বর্ণয়ন্তীতি যথা নিষ্ক্রিয় আত্মা বিভুত্বাদ্যাগণবৎ, প্রতিবাদী তু সক্রিয় আত্মাসংযোগ-বত্ত্বাদ ঘটপটাদিবদিতি অয়ন্তু হেতুর্ব্যভিচারদোষেণৈবদোষিতো জাতিরিতি নিরর্থকম্। সংযোগস্তভয়নিষ্ঠো ভবতি সচোভয়ক্রিয়াজন্যঃ ক্বচিদেকক্রিয়জন্যো ভবতি, অতো নসংযোগবতাং সর্ব্বেষাং ক্রিয়াবত্ত্বং ধর্ম্মস্তস্মাৎ ক্রিয়াসাধ্যকেসংযোগবত্ত্বং হেতুর্ব্যভিচারীতি। যদি ব্রূয়াৎপ্রযুক্তেহেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে সা জাতিরিতি তর্হি সর্ব্বত্রানুমানহেতৌ জাতিদোষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তন্নেষ্টম্ তস্মাৎ প্রতিষেধপ্রসঙ্গ এব জাতিরিতি, ছলে বচনবিঘাত এব প্রতিষেধস্তত এব যত্র সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং ক্রিয়তে তত্র স চ প্রতিষেধোজাতি-র্ব্যক্তব্যা সাহি দোষান্তরমাপেক্ষ্যৈব জায়তে। সত্যং জল্পলক্ষণোক্ত জাতিপ্রদর্শনার্থমেব সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিরিতি বক্ষ্যতি পরন্তত্র জাতিঃ পদার্থ ইতি বক্তব্যম্ বক্ষ্যতি চ সূত্রকারো "ব্যক্ত্যাকৃতি জাত্যয়স্তুপদার্থেতি। তথাহি "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতি"রিতি জাতিলক্ষণং বক্ষ্যতি। জাতি শব্দস্য প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থ ত্যাগো নিরর্থকঃ জল্পবাক্যে জাতিকোষপ্রদর্শনার্থমেব সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিরিত্যুক্তমেবঞ্চ জাতিপদার্থ-বিজ্ঞাপনার্থং সমান-প্রসবাত্মিকা জাতিরিত্যুক্তমিতি।

কোনও তার্কিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন,—এখানে যে জাতি শব্দ দেখা যায়, উহা প্রকৃত জাতি পদার্থপর নহে, অর্থাৎ, সামান্যাদি জাতিবাচক নহে, উহা প্রতিষেধপ্রসঙ্গপর বলিতে হইবে। যথা,—কেহ বলিল, আত্মাগগনের ন্যায় বিভু (অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী) বলিয়া নিষ্ক্রিয়। ইহার উত্তরে প্রতিবাদী বলিলেন,—আত্মা ঘটাদির ন্যায় সংযোগবিশিষ্ট বলিয়া সক্রিয় বলিতে হইবে। এই সংযোগহেতু, ব্যভিচার দোষেই দোষিত অতএব এখানে জাতি দোষ নিরর্থক। সংযোগ উভয়নিষ্ঠ হইয়া থাকে ও উহা উভয়ের ক্রিয়াজন্য হয়। কোথাও বা সংযোগ এক, ক্রিয়া জন্য হয়। অতএব সংযোগ থাকিলেই যে সর্ব্বত্র ক্রিয়া থাকিবে, এইরূপ কোনও নিয়ম হইতে পারে না। ক্রিয়া সাধ্য স্থলে সংযোগকে ব্যভিচারী-হেতু বলিতে হইবে। যদি বল, হেতু প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মায়, তাহার নাম জাতি, তাহা হইলে অনুমানস্থল-মাত্রেই ঐ জাতি-দোষ ঘটিতে পারে, উহাও ইষ্ট নহে। তাহা হইলে যে পঞ্চ-অবয়ব-সম্পন্ন বাক্যকে পরম ন্যায় বলা হইয়াছে, তাহা হেতু-প্রয়োগ-মাত্রই জল্প বাক্য হইয়া পড়ে। অতএব প্রতিষেধক প্রসঙ্গকেই ঐরূপ স্থলে জাতি বলিতে হইবে। ছলেও (ছল বাক্যেতেও) বচন-বিঘাত-রূপ প্রতিষেধ দেখা যায়। অতএব সাধর্ম্ম্য দ্বারা যে সাধন ও প্রতিষেধ, তাহার নাম জাতি। এই জাতিদোষ, দোষান্তরকে অপেক্ষা করিয়াই হয় অর্থাৎ হেত্বাদিতে দোষ থাকিলেই হয়।

সত্য, জল্পলক্ষণোক্ত জাতি প্রদর্শনের নিমিত্তই সূত্রকার মহর্ষি গৌতম, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থানকে জাতি বলিবেন, পরন্তু এখানে জাতি বলিতে জাতিপদার্থকেও বুঝিতে হইবে। সূত্রকার স্বয়ংই ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিকে প্রদার্থ বলিলেন ও উহার লক্ষণও বলিবেন,—"সমানপ্রসবাত্মিকাজাতি"বিতি। সমান অর্থকে যে প্রসব (প্রকাশ) করে, তাহাকে জাতি কহে। এইরূপ জাতির সুস্পষ্ট লক্ষণও পরে বলিবেন। অতএব এখানে জাতি শব্দের প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। জল্প-বাক্যের জাতি-দোষ প্রদর্শনের নিমিত্তই সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থানকে (প্রতিষেধকে) জাতি বলিয়াছেন, এবং জাতি-পদার্থ বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত সমান অর্থকে যে প্রকাশ করে, তাহাকে জাতি বলিয়াছেন।

যত্র বিপ্রতিপত্ত্যা অপ্রতিপত্ত্যা বা নিগ্রহং পরাজয়ং প্রাপ্নোতি তৎযদবা বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানমিতি। অন্যথা প্রতিপত্ত্যা এবং বিপ্রতিপদ্যমানঃ যদ্যপরস্তদিব প্রতিপত্তিকথনেন নিন্দতি তদা স পরাজয়ং প্রাপ্নোতি এবং যদি প্রতিপক্ষেণ দোষিতমপরো নোদ্ধরতি পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি তদাস পরাজয়ং প্রাপ্নোতীতি। যথা নবকম্বলোঽয়ং পুরুষ ইত্যুচ্যমানে কশ্চিদাহ ন সম্ভাস্য নবানিকম্বলানীতি তথা বিপ্রতিপদ্যমানমপর আহ কিমর্থং ভবতা স্যাবিপরীতার্থং পরিকল্প্য তস্য বাক্যার্থস্য প্রতিষেধঃ ক্রিয়তে নবং নূতনং কম্বলমস্যেতি বিগ্রহে তদবাক্যার্থঃ সংগচ্ছতে ইতি বিপ্রতিপদ্যমানস্য নিন্দাবাদেন স পরাজয়ং প্রাপ্নোতীতি স পুনর্যদি ব্রূতে ত্রীণি বাসরাণি পশ্যামীদং কম্বলং কথমস্য নূতনত্বং জ্ঞাপ্যতামিতি। এবং পুনঃস্থাপিতং স্ববাক্যং নোদ্ধরতি তদাসৌ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি স যদি পুনর্ব্রূতি অজীর্ণত্বমেব নূতনমিতি বক্তুরভিপ্রায়মিতিবাক্যার্থসঙ্গতিঃ।

যদ্বানেনবিক্রয়ার্থমানিতং কম্বলং ন ব্যবহৃতমিতি। এবং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বহুত্বাদ্দেশতঃ কালতো বস্তুকল্পনাদিভেদাদ্বহূনি নিগ্রহস্থানানি ন ভবন্তীতি।

যে বিষয় বিপ্রতিপত্তি দ্বারা বা অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতিপত্তির অভাবে পরাভব হয়, তাহাকে নিগ্রহ-স্থান বলে; অথবা বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকেই নিগ্রহ-স্থান কহে। যথা,—একজন বিপ্রতিপত্তিকারীকে অর্থাৎ অন্যথা-রূপে শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তিকারীকে যদি ঐ প্রতিপত্ত্যর্থ কথন দ্বারা আক্রমণ করা হয়, অর্থাৎ আপনি কি নিমিত্ত পূর্ব্ববক্তার বাক্যার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া উঁহাকে (পূর্ব্ব-বক্তাকে) নিগ্রহ করিতেছেন, উঁহার প্রকৃতার্থ এই'—যদি এইরূপে নিন্দা করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিপ্রতিপত্তিকারী ব্যক্তি পরাভূত হয়। যদি সে পুনর্ব্বার আপন পক্ষ স্থাপন না করে, এবং যদি প্রতিপক্ষ-কর্ত্তৃক দোষিত বা স্থাপিত অর্থের প্রতিষেধ না করা হয়, তাহা হইলে সে পরাজয়-প্রাপ্ত হয়। যথা,—একজন বলিল, এই পুরুষ নবকম্বলধারী।' এই কথা শুনিয়া কেহ বলিল,—এই ব্যক্তির তো নয়খানা কম্বল নাই। তখন ইনি কিরূপে নবকম্বলধারী হইলেন?' এইরূপে বিপ্রতিপত্তিমান্ ব্যক্তিকে অর্থাৎ ঐরূপে ঐ বাক্যের বিপরীতার্থকারী ব্যক্তিকে কেহ বলিলেন,—'আপনি কি নিমিত্ত ঐ বাক্যের বিপরীতার্থ কল্পনা করিয়া উঁহার প্রকৃতার্থের প্রতিষেধ করিতেছেন?' নূতন কম্বল যাহার, এই অর্থেতে ঐ বাক্যার্থ সঙ্গত হইতে পারে।' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তিকারী পরাজয়-প্রাপ্ত হয়,—যদি সে আপন পক্ষ স্থাপন না করে। ঐ ব্যক্তি যদি বলেন,—আমি উঁহার ঐ কম্বল তিন দিন যাবৎ দেখিতেছি, তখন উঁহা নূতন কম্বল ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন?' এইরূপে পুনর্ব্বার স্বমত স্থাপিত হইলে, যদি উঁহার উদ্ধার না করা হয়, তাহা হইলে প্রথম ও তৃতীয় বক্তা নিগ্রহীত হয়। পুনর্ব্বার যদি উঁহার উত্তরে বলেন,—অজীর্ণতাই নূতনত্ব বুঝিতে হইবে।' ইহাই পূর্ব্ব-বক্তার অভিপ্রায় বলিতে হইবে। এইরূপে ঐ বাক্যার্থ সঙ্গত হইতে পারে, অথবা ঐ ব্যক্তি বিক্রয়ের নিমিত্তই তিন দিন ঐ কম্বল আনিতেছে, উঁহা ব্যবহৃত হয় নাই। অতঃপর প্রতিপত্তির অভাবে বিপ্রতিপত্তিকারী দ্বিতীয় বক্তা নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হইলেন। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ও দেশকাল ও বস্তু-কল্পনাদির ভেদে নিগ্রহ-স্থান অনেক প্রকার হয়, বলিতে হইবে।

* * *

আশ্রয়ের অসারতা।

[শ্রীদীননাথ মজুমদার এম্-এ মহাশয়ের লিখিত।]

নিজগাত্র-প্রতিবিম্ব প্রতি পলে পলে
করে প্রতারণা।
কভু দীর্ঘ কভু খর্ব্ব কভু পদতলে
লোটে সত্ত্বাহীনা॥
দেহযন্ত্র-জাত ছায়া দেহে পরিণতি
সেও যাদুকরী।

(তবে) জীবনের প্রেমছন্দ কোথা লভে যতি
আকুলি ঝঙ্কারি॥
অচঞ্চল নাহি কিছু নিত্য আবর্ত্তন
হেরি বিশ্বময়।
তবে কেন প্রাণতন্ত্রী বাজি অনুক্ষণ
চাহে প্রাণাশ্রয়॥

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি-কালের কথা।

[শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি-এ মহাশয়ের লিখিত]

প্রাচীনকালের প্রাণীদের কথা।

কুকুর।—জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কুকুরই প্রথমে মানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার সহচর হইয়াছিল। সুইট্‌জারলণ্ডের অতি পুরাকালের হ্রদ-আবাস-সমূহে ইহাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। বোধ হয়, নেকড়ে বাঘই পোষ মানিয়া কুকুরে পরিণত হইয়াছে। ডেনমার্কে প্রাচীন অবশেষ-সমূহ হইতে দেখা যায়, কুকুরই একমাত্র পোষাপ্রাণী ছিল। অবেস্তায় কুকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে এবং এই দেবপ্রিয় পশুকে বধ করিলে ভীষণ শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। গ্রীসদেশের লোকেও কুকুরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। আমাদের দেশে একালে কুকুরের সম্মান না থাকিলেও, সেকালে যুধিষ্ঠির স্বর্গগমনের সময় কুকুর সঙ্গে লইয়াছিলেন, দেখা যায়। ইউরোপীয়েরা এখানে কুকুরকে কত আদর করেন। হাঙ্গেরী-দেশের ভাষায় কুকুরকে kutya (কুত্যা) বলে। ইহা শুনিয়া আমাদের 'কুত্তা'র কথা মনে পড়ে।

শূকর।—এই জন্তুর পোষমানা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু প্রমাণ নাই। ইহা সহজেই বুঝা হইয়া পড়ে। সূ-ধাতুর মানে প্রসব করা। তাহা হইতেই শূকরের নামের উৎপত্তি। বাস্তবিকই এত দ্রুত-বংশবৃদ্ধি আর কোনো প্রাণীর হয় কিনা সন্দেহ।

মৃগ।—এই জন্তু ইন্দো-ইউরোপীয়গণের সুপরিচিত ছিল। ইহা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। মাত্র একজাতীয় মৃগ পোষ মানিয়াছে। প্রত্ন-প্রস্তর-যুগে এবং তুষার নদীর যুগে (Palæolithic and glacial age) 'রেন্‌ডিয়ার' (Reindeer) নামক মৃগ ইউরোপের দক্ষিণে আল্পস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং সুইট্‌জারলণ্ডে এখনও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কালক্রমে ইহা আবার উত্তর দিকে সরিয়া যায়। ইউরোপে অনেক প্রকার মৃগের কথা জানা ছিল। ইহাদের সাধারণ নামের ভিতর হইতে শৃঙ্গধরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভল্লূক।—ইহার ইংরেজী নাম bear শব্দটী brown শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্লাভ-ভাষায় ভালুকের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ, ঐ দেশে নানারকমের ভালুক দেখা যায়। প্রাচীন স্লাভ-ভাষায় ভালুকের নাম ছিল med-vedu, সংস্কৃত মধ্বৎ (মধু+অৎ) অর্থাৎ মধুভক্ষণকারী। রুশিয়া-দেশের লোকে আবার সময় সময় আদর করিয়া ভালুককে Little Michæl নাম দিয়া থাকে। কোন্ গুণে এই বিচিত্র জন্তুটি এমন আদরের নাম পাইল, তাহা সৃষ্টিছাড়া রুশেরাই জানে।

উষ্ট্র ও হস্তী।—সেমেতিক (Semetic) ভাষার 'গমল' (gamal) শব্দটি পারস্য যুদ্ধের পর গ্রীসে আমদানী হয়। বর্ত্তমানে ইংরেজীতে ইহা camel শব্দে পরিণত

হইয়াছে। সংস্কৃত 'ক্রমেলক' কথাটি লোককল্পনাপ্রসূত বর্ণচোরা শব্দমাত্র। ইরাণ-দেশের লোকেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই উষ্ট্রের সহিত পরিচিত। ইহাদের ভাষায় 'উষ্ট্র' বলিতে 'পোড়া-রংএর পশু' বুঝায়। বেদের প্রাচীনতম মন্ত্র-সমূহে উষ্ট্র শব্দে মহিষকে বুঝাইত। উষ্ট্র ইরাণ-দেশের লোকের নিকট পবিত্র বিবেচিত হইত। ইউরোপে ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী জন্তু ছিল এবং প্রথম প্রথম ইহার কথাও কেহ জানিত না। সেইজন্য ঐ মহাদেশের ভাষা-সমূহে ইহার কোনও সাধারণ নাম নাই। উত্তর ইউরোপের ভাষাগুলির মধ্যে খৃষ্টান জেহাদের (crusade) পর ইহার নামের আমরা প্রথম উল্লেখ পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নামে উষ্ট্র না বুঝাইয়া হস্তীই বুঝাইত। রোমানরা এশিয়া-মাইনরে পিরহিক যুদ্ধের সময় (Pyrrhic War) এই জন্তুর প্রথম পরিচয় পায় এবং ইহার নাম দেয়—"সর্পহস্ত"। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানিবল ইতালীতে প্রথম হস্তী আনেন। কেবল দেখাইবার জন্যই ইহা আনা হয়। রাইন নদীর পূর্ব্বদিকে কিম্বা আল্পস-পর্ব্বতের উত্তরে কদাচ ইহাদিগকে দেখা যায় নাই। এই কারণে টিউটন এবং স্লাভজাতি সমূহ ভ্রমণকারিগণের মুখে শুনিয়া অথবা চলিত রকমের ছবি দেখিয়া এই জন্তুর পরিচয় লাভ করে।

হোমারের ইলিয়দে (Illiad) হস্তিদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়া-মাইনরের হস্তিদন্ত বাণিজ্যের একটি প্রধান সামগ্রী ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এমন কি, প্রত্নপ্রস্তর-যুগের হস্তিরদন্তের ব্যবহার ছিল। ভাষার সাক্ষ্য হইতে বোধ হয়, ভারতের হস্তিদন্ত আরবগণের হাত দিয়া বাণিজ্যের সামগ্রীরূপে মিশর দেশ হইয়া ইউরোপে রপ্তানি হইত।

মূষিক।—ছোট ছোট প্রাণীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় আমল হইতেই ইন্দুর নিজগুণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চুরি করা অর্থসূচক মুষ্ ধাতু হইতে ইহার নামের মূল অর্থ 'চোর' ছিল, ইহাই বোধ হয়।

বীবর।—এই জন্তুও ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের। ইহার সংস্কৃত নাম—বক্র। পূর্ব্বদেশ হইতে এই জন্তু পশ্চিমে যায়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ইহা (বীবর জন্তু) 'ফসিল' (fossil) অবস্থায় পাওয়া যায়।

থরগোস।—এই প্রাণীরও উল্লেখ এতৎপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

(২) পক্ষী।

জন্তু-জানোয়ারের বিবরণ কতকটা পাওয়া গেল। কিন্তু পাখীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। সেকালের পাখীর সঙ্গে এ কালের পাখীর নামের মিল ধরা বড় শক্ত। বিশেষতঃ, ছোট ছোট পাখী চেনাই দুষ্কর। তা'ছাড়া পাখীরা মধ্যে মধ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে। কাজেই একই স্থান কালক্রমে অনেক প্রকার পাখীর আবাস-স্থল হইতে পারে। অনেক পাখীর নাম তাহাদের ডাক হইতে হইয়াছে,—যেমন, কোকিল, ঘুক ইত্যাদি।

ঈগল পাখী, হাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি কয়েকটী পাখীর নাম পাওয়া যায়। মুরগী ইউরোপে পরে আমদানী হইয়াছে। গ্রীক-নাট্যকার আরিষ্টফেনিস (Aristophanes) মুরগীকে পারস্য দেশীয় পক্ষী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

(৩) গাছ-পালা ও কৃষি।

এখন গাছ-পালার কথা কিছু বলিব। পাখীর চেয়ে গাছ-পালার নাম ঠিক করা আরও দুরূহ। যদিও গাছ-পালা সংখ্যায় ঢের বেশী পাওয়া যায় এবং তাহাদের নাম লইয়া নির্ঝঞ্ঝটে আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এখানেও বেশ একটু মুস্কিল আছে। (১) প্রথম কথা এই যে, গাছ-পালার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলিকে সনাক্ত করাই কঠিন। (২) তাহাদের আদি-উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করাও অসম্ভব। কাজেই তাহাদের দেশবিদেশে বিস্তারের বিষয় নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। (৩) একদেশ হইতে এক রকমের গাছ-পালা কেন যে অদৃশ্য হইবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, অবশ্য জীবজন্তুর বেলায় এটা কতকটা পারা যায়। (৪) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বিভিন্ন শাখায় একই নাম বিভিন্ন গাছের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে কোনটি কি, তাহা ঠিক করাই দুষ্কর। খাওয়ার জন্য উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইত। ঔষধের জন্য যে সকল গাছ-গাছড়া ব্যবহৃত হইত, সেগুলি অবশ্য বিশেষ সাবধানতার সহিত তফাৎ করা হইত। কিন্তু এক দেশের লোক অন্য দেশে বসতি করিলে, সেই দেশের গাছের নাম তাহারা নূতন দেশের কোনও অনুরূপ নূতন বৃক্ষকে দিত। (৫) উদ্ভিদের চাষ পশু-পালনের বহু পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, এক জায়গায় স্থির হইয়া না বসিলে চাষবাস কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অন্ততঃ, কিছুকালের জন্যও একস্থানে থাকা দরকার।

উৎপাদিত শস্যাদির নামের আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, এখানে গোলমাল আরও গুরুতর। যেমন, corn কথাটির মানে ইংলণ্ডে গম, স্কটলণ্ডে 'ওট', জার্ম্মাণীতে 'রাই', সুইডেনে 'যব' এবং আমেরিকাতে 'ভুট্টা'।

সম্ভবতঃ ঔষধের জন্যই প্রথমে গাছ-গাছড়ার চাষ করা হইত এবং পরে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য-উদ্ভিদের চাষ আরম্ভ হয়। বোধ হয়, শস্যের মধ্যে যবের চাষই প্রথম হইয়াছিল; কারণ, ইহা যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হইত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা যেখানে যেখানে কথিত হয়, সেখানকার সর্ব্বত্র-প্রচলিত খুব কম গাছের নামই পাওয়া যায়। সেইজন্য অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যেই এক একটী সাধারণ নাম আবদ্ধ। ভুর্জ্জবৃক্ষ, উইলো, ঝাউ, ওক প্রভৃতি কয়েকটি বৃক্ষের নাম প্রায় সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়। ফল এবং ফুলের সাধারণ নাম ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যেই নিবদ্ধ। সর্ব্বত্রই প্রচলিত এরূপ নাম পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।

শস্য।—ইউরোপে সুইট্জারলণ্ডের হ্রদবাসিগণের আমল হইতেই শস্যের উৎপাদন-প্রক্রিয়া জানা ছিল। বস্তুতঃ তার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র আর তিন রকম শস্য ইউরোপে নূতন আসিয়াছে,—প্রাচ্য-দেশ হইতে চাউল, আমেরিকা হইতে ভুট্টা এবং বেদিয়াগণ কর্ত্তৃক আনীত buck wheat নামক একজাতীয় শস্য। মেসোপটেমিয়ার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে চাউলের আমদানী হইয়াছিল। ইংরাজী rice শব্দটি সম্ভবতঃ তামিল arichi হইতে আসিয়াছে। ইউরোপে ধানের চাষ হয় না।

অধুনাতন গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের প্রথম আরম্ভ যত অল্প দিনের মনে করা গিয়াছিল, তাহা নয়। পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল—প্রথমে শিকারী জীবন, তার পর ভ্রমণশীল জীবন এবং তার পর কৃষিজীবন (hunting, pastoral and agricultural life) আশ্রিত হয়। এই ক্রম কিন্তু সব সময়ে ঠিক থাকে না। অনেক সময় দুইটী কিম্বা তিনটি অবস্থাই একই সঙ্গে থাকিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ মৃগয়া ও নিকৃষ্ট রকমের কৃষি একই জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। কারণ পুরুষেরা শিকারে বাহির হইয়া গেলে বাড়ীর মেয়েরা মাটি খুঁড়িয়া গাছপালা লাগাইত। বাগানের যন্ত্রপাতিই চাষবাসে আদি যন্ত্র। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষি-সম্বন্ধীয় দেবতাগণ বেশীর ভাগই স্ত্রী। এমন কি, সুদূর প্রত্নপ্রস্তরযুগেও গমের মত একপ্রকার শস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিতের মতে একত্রবাসের সময়েই ইন্দো-ইউরোপীয়গণ লগুনের ব্যবহার অবগত ছিলেন। যব, ধান, দুর্ব্বা প্রভৃতির নাম অনেক ভাষা হইতেই পাওয়া যায়। কাস্তে, জাঁতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসেরও উল্লেখ দেখা যায়। পেষা, চষা, তুষ করা প্রভৃতি কার্য্য-নির্দ্দেশক শব্দও পাওয়া যায়। রুটি-সেঁকা ব্যাপারও সে সময় জানা ছিল।

(৪) পারিবারিক সম্বন্ধ-বাচক নাম-সমূহ।

পারিপার্শ্বিকের উপরেই সমাজের অবস্থা এবং পারিবারিক সম্বন্ধ নির্ভর করে। আগে সকলের ধারণা ছিল যে, সমাজের আদিম অবস্থায় যৌন-সম্বন্ধের কোনও নিয়ম ছিল না। কিন্তু ইহা যে একবারে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বরঞ্চ, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-ব্যভিচার প্রবল হয়, ইহাই দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানেও অতি অসভ্যতম বর্ব্বরগণের মধ্যেও যৌন-সম্বন্ধ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত এবং সম্পূর্ণ নিয়মিত দেখা যায়। ইংলণ্ডের আধুনিক শ্রেষ্ঠ মানবতত্ত্ববিৎ ডাঃ হ্যাডন এই মত পোষণ করেন।

পুরুষ এবং স্ত্রীর বহুবিবাহ কালক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা পরে রক্ষিতানারীর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু এই রক্ষিতাগণের সন্তান আইন অনুসারে গণনীয় হইলেও, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত না। সিজারের (Cæser) লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার সময় ইউরোপে অসভ্যগণের মধ্যে দল-বিবাহ (group marriage) প্রচলিত ছিল। গ্রীক হেরোডোটাসও নানাজাতির মধ্যে অনুরূপ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ-প্রথাও বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রচলিত ছিল। দ্রৌপদীর বহু-বিবাহের কথা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রথা সেমেতিক জাতির মধ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল এবং এখনও তিব্বত ও দক্ষিণ ভারতের মালবারে প্রচলিত আছে।

পতি, পত্নী।—পতি কথাটি প্রথমে দেবতাদিগের নামের সঙ্গে এবং পরে গৃহকর্ত্তার নামের সহিত ব্যবহৃত হইত। পত্নী কথাটি পরে আসিয়াছে, ইহার মানে—'বিবাহিতা স্ত্রীলোক'। 'পতি' শব্দের অর্থ পূর্ব্বে 'প্রভু' অথবা 'স্বামী' ছিল—husband নয়। বীর শব্দও পতি অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং গুজরাটী ভাষায় এখনও হয়। জায়া শব্দের অর্থ,

পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ডেলব্রুকের (Delbruck) মতে, সন্তান-ধারিণী নয়;—যাঁহার সাহায্যে জাতি বা বংশ বিস্তৃত হইয়া থাকে, তিনি জায়া। বিবাহবাচক কোনও সাধারণ কথা ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিবাহ মানেই কন্যাকে গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। এরিষ্টটল (Aristotle) বলিতেছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগের ভাষায় এমন কোনও শব্দ পাওয়া যায় না, যাহার দ্বারা 'বিবাহিত অবস্থা' এই ভাবটি প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিবাহকালীন শুভদৃষ্টির প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। এক কথায় পিতামাতা বুঝাইতে কোনও প্রাচীন শব্দ পাওয়া যায় না;—যেমন সংস্কৃত পিতরৌ বা ইংরেজী parent। নানা প্রকার পারিবারিক সম্বন্ধ বুঝাইতে প্রায় সকল ভাষাতেই অনেকটা একই রকমের শব্দ-সমষ্টির উদ্ভাবনা হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যতদূর পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পিতার নাম অনুসারেই পুত্রের নামকরণ হইত। কিন্তু বিবাহ-সম্বন্ধ স্বীকার করা হইত। ইহা ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ সিদ্ধান্তে আমরা ইহা হইতে উপনীত হইতে পারি না।

পুন্নামক নরক হইতে যে ত্রাণ করে সেই পুত্র। পুত্র শব্দের এই প্রচলিত কল্পিত ব্যাখ্যাটির ভিতর কিছুমাত্র সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। পু ধাতুর অর্থ বোধ হয় 'ক্ষুদ্র', 'ছোট,' 'ত্র' টি প্রত্যয় মাত্র। দুহিতা শব্দের যে কবিত্ব কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যা পণ্ডিত-প্রবর ম্যাক্সমূলার করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নয়। প্রাচীন আর্য্যপরিবারে দুগ্ধ দোহনের ভার কন্যার উপর ছিল বলিয়া তাহার নাম—দুহিতা। কেহ আবার দুহিতা মানে কল্পিয়াছেন, দুগ্ধপোষ্য (suckling), যেন পুত্র দুগ্ধপোষ্য নয়। আর একজন কবি-ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যাখ্যা করেন—যে তাহার ছোট ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে সেবাশুশ্রূষা মানুষ করে, সেই দুহিতা। ভ্রাতা ও স্বসা শব্দ প্রায় সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়।

নপাৎ শব্দ—যাহা আমাদের বাংলায় নাতি বুঝায়—পূর্ব্বে অধস্তন পুরুষের ছোট ছোট ছেলেপিলে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। পিতার সম্বন্ধ ধরিয়াই জ্ঞাতিগণের নাম করা হইত। মাতার সম্বন্ধে আত্মীয়গণের নাম বেশীর ভাগই পরে আসিয়াছে। পিতৃব্য শব্দের সাদৃশ্যে পরে মাতৃব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যেঠা খুড়ার ছেলেদিগকে ভাই বলা হইত। এই সকল হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার আভাষ পাওয়া যায়।

বধূর দিক হইতে বিবাহ-সম্বন্ধে আত্মীয়গণের নাম পাওয়া যায়। ননদ, দেওর প্রভৃতির প্রতিশব্দ মিলে, কিন্তু শালা, শালী প্রভৃতির নয়। শ্বশুর শাশুড়ী সাধারণতঃ পতির পিতা ও মাতা অর্থে ব্যবহৃত হইত। তবে ঋগ্বেদের এক স্থলে (১০।৩৪।৩) শ্বশ্রূ শব্দ স্ত্রীর মাতা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে পাঠকবর্গের কতকটা উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা বা ভাষা যতটা সাদাসিদা ও সরল ছিল বলিয়া মনে করা হয়, তাহা নয়। সভ্যতা ও ভাষা উভয়ই বুদ্ধির সঙ্গে জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। জর্ম্মাণ পণ্ডিত শ্লাইকার (Schliecher 1859) ভাষায় যে সরলতা কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে সরলতা

তাহার মোটেই ছিল না। আবার ফরাসী পণ্ডিত পিক্‌তে (Pictet 1859) ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতার যে উজ্জ্বল সরল চিত্রখানি আঁকিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক নয়। সকল কালে সকল দেশেই ভাল মন্দ থাকে। প্রাচীনকালে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যেও তাহাই ছিল এবং তজ্জন্য যে জটিলতা থাকা উচিত, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

* * *

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব।

[বিদ্যাদিত্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত।]

কর্ম্মী-পুরুষের কৃতিত্ব জগতের অশেষ কল্যাণ-সাধনের নিদান হইয়া থাকে। বাক্-সর্ব্বস্ব বলিয়া বাঙ্গালী যে অপবাদের বোঝা মাথায় লইয়া বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা দূরে ফেলিয়া বঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে বাঙ্গালী আজ কৃতী পুরুষের স্থান অধিকার করিতেছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গলাই কেবল বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র নহে, বাঙ্গালার বাহিরেও শক্তিমান্ বঙ্গসন্তান নানা কল্যাণকর কর্ম্ম-পরম্পরায় যশস্বী হইয়াছেন। পুস্তক আমাদের মনে হয়, "বঙ্গের বহিরে বাঙ্গালীর" মত "বঙ্গের ভিতরে বাঙ্গালীর"ও চরিতাখ্যান লিখিত হওয়া উচিত। কারণ, এই সকল বিষয়ের যতই অনুশীলন হইবে, ততই সমাজের ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। সংসারের অর্দ্ধেক লোক কি করে, বাকী অর্দ্ধেক তাহার কোনও খোঁজ-খবরই রাখে না। কর্ম্মী হয় তো "ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ" বা "ন কৃত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ" নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই কাজে প্রবৃত্ত হয়েন। জগতের জন্যই তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া থাকেন; কিন্তু জগতকে কাজে ভিন্ন কথায় জানাইতে তাঁহারা বড়ই কুণ্ঠিত। কিন্তু কর্ম্মের শক্তি এতই প্রবল যে, তাহার প্রভাব জগতে কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, বরং দশ জনে তাহার খোঁজ খবর রাখিলে, চর্চ্চা করিলে কর্ম্মীর উদ্দেশ্য শীঘ্র সফল হইয়া থাকে, জগৎও ধন্য হয়।

যে কথা বলিতেছিলাম, বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব। উড়িষ্যা, বিহার, বঙ্গ যখন একশাসনে ছিল, তখন ঐ সকল দেশে কথিত-ভাষায় পার্থক্য থাকিলেও, অন্য এক প্রকার ঐক্যভাব ছিল। এখন শাসনের বিভিন্ন ব্যবস্থা হইলেও আবার অন্যান্যভাবে সেই ভাবের কিছু কিছু যে রক্ষা না হইতেছে, তাহা নহে। বিহার, আসাম, উৎকল ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি যেখানে কেন বাঙ্গালী থাকুন না, বাঙ্গালার সঙ্গে তাঁহাদিগের একটা মূল ঘনিষ্টতা অপরিহার্য্য থাকিবেই থাকিবে। অনেকে বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে ঐ সকল দেশে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বা আবার বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল দেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও বঙ্গের সমাজ ছাড়িতে পারেন নাই। শীঘ্র ছাড়িতে পারিবেন বলিয়াও সম্ভাবনা নাই। বিবাহাদি আদান-প্রদান এখনও তাঁহাদিগের বঙ্গ-সমাজেই হইতেছে ও হইবে। তবে মহার্ণবে পোতদ্বয়ের সম্মিলনের ন্যায়

কোথায়ও কখনও যোগ্য সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিলে, তাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সমাজেও কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা একবারে মূল-সমাজের সংশ্রব-শূন্য হইতে পারেন নাই, পারিবেনও না, পারা উচিতও নয়।

ইহা ছাড়া বঙ্গভাষার এক অনুপম চিত্তচমৎকারিণী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালীরও হৃদয় চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় নিজের দেশের দিকেই ঘুরিয়া থাকে। বঙ্গের সমাজও প্রবাসী বাঙ্গালীর কম আদরের জিনিষ নহে। সমাজ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও তাঁহারা সমাজের সংশ্রব ছাড়া হইতে চাহেন না। বরং (loopholes of retreat) প্রবাসের শান্তিময় নির্জ্জন কুটীরের গবাক্ষদ্বার দিয়া মূল-সমাজের সার-শিক্ষণীয় ভাগ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা তৎপ্রতি আরও ভক্তিমান্ হইয়া পড়িতেছেন। ফলে, সর্ব্বত্রই আজ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রবাস সমাজ ধীরে ধীরে শক্তিপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙ্গালার বাহিরে যে যে স্থানে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আছে, তাহার সমগ্র বিবরণ ইচ্ছা থাকিলেও প্রকাশ করিবার সুযোগ নাই। কেবলমাত্র বারাণসীধামে বঙ্গমাতার যে সকল কৃতী-সন্তান বহুকাল হইতে বসবাস করিতেছেন বা ইদানীং আসিয়া অবস্থান করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে, অন্যান্য কথার মধ্যে, আপাততঃ আজকালকার মত দুই চারিটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

কাশীধামে যত বাঙ্গালী বাস করেন, বাঙ্গালার বাহিরে একস্থানে এত বাঙ্গালী আর কুত্রাপি নাই। রেলপথের সুবিধা হওয়ায় এবং এলাহাবাদ ও পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার থাকায় অনেক বাঙ্গালী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করেন। বিগত লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র যুক্ত প্রদেশে (United Provinces of Agra and Oudh) ২২,৬১২ জন বাঙ্গালীর বাস। তন্মধ্যে কেবলমাত্র কাশীধামেই ১২,৬০৭ জন, পুরুষ ৫২৩৩ জন। নানাকারণে এই পুণ্যক্ষেত্রে বারাণসীধামে এত বাঙ্গালীর নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইয়াছে। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে অনির্দ্দিষ্ট-ভাবেও কত বাঙ্গালী যে এই স্থানে অবস্থান করেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

মনুষ্য সমাজবদ্ধ না হইয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিধানও এইরূপ সমাজ বন্ধনের পরিণতি। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা সেই ধর্ম্মের অনুমোদিত সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানেন না, তাঁহাদিগের মধ্যেও নানা সভাসমিতি, ক্লাব প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর সখ্য সংস্থাপনের বিধান দেখা যায়। কাশীধামেও ক্রমশঃ অধিক বাঙ্গালীর বাস হইতে আরম্ভ হওয়ায় কোনরূপ সমাজবন্ধনের নানা প্রকার প্রচেষ্টা হইতে থাকে। যাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী কয় জন সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন, জীবনে মরণে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, স্বতঃই এই চিন্তা সেখানকার অনেকের মনে জাগিয়া উঠে। বহুকাল হইতে কাশীধাম বাঙ্গালীর নানা কীর্ত্তি-কলাপ-মণ্ডিত। আজকালকার বাঙ্গালী অধিবাসিগণের অন্তরে সেই প্রাচীন গৌরবের স্পর্দ্ধা

অন্তর্নিহিত আছে। তাঁহারা সকলে তদুপযোগী আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর উপযুক্তই হইয়াছে। আজকালও কাশীধামের অলিতে-গলিতে যেখানে সেখানে অহল্যাবাঈ ও রাণীভবানীর কাশীস্থ কীর্ত্তিগুলির মধ্যে কাহার কীর্ত্তি অধিক ও বেশী পরিমাণে লোকহিতকর, তাহার বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। অনাথ আতুর বা স্থবিরের জন্য অন্নসত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় দেবদেবীর প্রতিষ্ঠায় ও সেবার বন্দোবস্তে, বড় বড় পাকা ঘাট বাঁধাইয়া লোকের স্নানাদির সৌকর্য্যবিধানে, রোগীর জন্য দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপনেও এই কাশীধামে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অনুজ্জ্বল নহে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের যে সুপরিচালিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান দেশে দেশে কাশীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহার মূলেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব।

অনেক দিন হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ঐ দেশের ২৫।৩০ হাজার বাঙ্গালীর মধ্যে পুত্রকন্যাগণের শিক্ষা-বিধানের সুব্যবস্থা ক্রমশঃ এক সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। অপরাপর সহরে এক এক স্থানে ৪'৫ শত কি এক হাজার পর্য্যন্ত বাঙ্গালী থাকিলেও কাশী-সহরে ১২।১৩ হাজার বাঙ্গালীর ঐ বিষয়টী কালসহকারে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। বাসন্তী বিবির হিন্দু-কলেজ যখন ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও সেইখানে ছেলে পাঠাইতে থাকেন; সুতরাং কাশীতে বাঙ্গালী-ছাত্রবৃন্দের সমাবেশ ও সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। এইখানের ছোটবড় বিদ্যাস্থানসমূহে নানা রকমের সুযোগ ও সুবিধা থাকিলেও বাঙ্গালীর পক্ষে বড় এক বিষম অসুবিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজকালকার হিসাবে ধরিতে গেলে, কাশীর Queen's College ও Central Hindu College উচ্চশিক্ষার আদর্শস্থান না হইলেও তৎকালে দেশের মধ্যে যে বিশিষ্ট বিদ্যাস্থান বলিয়া পরিচিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাহা অযথা নহে। কিন্তু তাহাতেও বাঙ্গালীর অসুবিধা ছিল। নিম্নস্তরের পাঠশালা বা স্কুল-গুলিও সেইরূপ অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে নাই। ভূকৈলাসরাজের সুপ্রাচীন জয়নারায়ণ কলেজ এবং স্কুলও হস্তান্তরিত হইয়া বাঙ্গালীর সেই অসুবিধা-মোচনের সহায়তা করিতে পারে নাই। এই সকল স্কুল-কলেজে ঐ দেশের প্রচলিত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায়ই শিক্ষা প্রদত্ত হইত; বাঙ্গালা পড়াইবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। প্রায় ৬০ ষাট্ বছরের পুরাতন বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলের বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দেরাও ঐরূপ বাঙ্গালা পড়িবার সুবিধা পাইত না। মনে হয়, ক্রমশঃ "বাঙ্গালী-টোলা" নামটীতেই বাঙ্গালীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইত; কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বাঙ্গালার বদলে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী ছাত্রগণকে হিন্দী ও উর্দ্দু শিখিতে হইত। ঘরে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালা শিখাইবার বন্দোবস্ত কয় জনে করিতে পারিতেন? ভাষার মধ্য দিয়াই যে জাতির জাতিত্ব সংরক্ষিত হয়, ইহা অবিসংবাদী সত্য। বাঙ্গালা ভুলিয়া যে বাঙ্গালী বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিতে পারে, ইহা অসম্ভব। বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ-বলেই বাঙ্গালী আজ পৃথিবীর চক্ষে জ্ঞানগরিমায় গরীয়ান্ হইয়াছেন—বাঙ্গালাভাষার প্রসারিণী শক্তিতেই বাঙ্গালী আজ পৃথিবীর মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র সাহিত্য-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের

উদ্যোগ করিতেছেন—বাঙ্গালাভাষার একনিষ্ঠ সেবকগণের সর্ব্বতোমুখী ঐকান্তিকতার ফলেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ "শাখারোধস্থগিতবসুধামণ্ডল" ও "মণ্ডিতাশ" হইয়া বেদকীর্ত্তিত সুপবিত্র পঞ্চনদের প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের মহাসঙ্ঘের নালন্দা প্রভৃতি মগধের বৌদ্ধবিহার বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অথবা ফরাসী-দেশীয় 'একাডেমীর' মত পৃথিবীর নানা স্থানের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর গৌরব-স্পর্দ্ধী হইতেছেন। বলিতে লজ্জা হয়, ইদানীন্তনকালে এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি লোকের একটা অশ্রদ্ধাভাব জাগরূক হইয়াছে। যদিও নানা বিশিষ্ট কারণে সেই সভ্যতা লোপ পাইবার নহে, তথাপি উহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ ও নিষ্ঠাবান্ সেবকের অভাবে উহার বর্ত্তমানকালে এক 'যবস্থব' অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে, এ দেশের প্রাচীন আদর্শের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত-গৌরব হইতেছে। আর সেই নালন্দা, দ্রাবিড়, মিথিলা নাই, নবদ্বীপ, বাকুলী, বিক্রমপুর বা কোটালীপাড়ের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে। ভাটপাড়ার আর সেই প্রাচীন স্পর্দ্ধা কৈ? পক্ষান্তরে কালোচিত অভিনব আদর্শে কোনও নূতন শিক্ষাকেন্দ্রও ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। বরং বাঙ্গালীই সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছেন এবং অঙ্গুলীহেলনে সমগ্র আর্য্যভূমির অধিবাসিবৃন্দকে আহ্বান করিতেছেন। প্রাচীনের আদর্শে এবং অভিনবের উন্মেষে বাঙ্গালী আজ জীবনসমস্যায় সারভূত সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার উন্নতি দ্বারা "প্রায় নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয়" ভাবাপন্ন নিজ সন্তানগণকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জাতীয় উদ্বোধনের যে সাড়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীরও তাহাতে চৈতন্য হইয়াছে। কেন্দ্র হইতে নবজীবনের নবশিক্ষার যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ বৃত্তাকারে চারিদিকে সর্ব্বত্রই বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে। কাশীবাসী বাঙ্গালী প্রবাসে সেই জাতীয় জীবনের অসংখ্য কলঙ্কক্ষালনের জন্য নিজে মাতৃভাষাকে দেবীর মত ভক্তের চক্ষে দেখিয়া চরণে প্রণত হইয়াছেন, আর বলিতেছেন—

"যত্নজলে পাদ-ধুয়ে রসনা আসনে বসাইয়ে তোমা মাতঃ হেরি একবার,
চিন্তা-চন্দনেতে মাখি ভকতি-প্রসূনে যথা-সাধ্য বাঞ্ছা মনে দিব উপহার।"

বিশ্বেশ্বর তাঁহাদিগের এই অভীষ্ট-সাধনে সহায় হইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, অন্নপূর্ণা তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

---

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার H. Stanley Jevons (Pof of Economics) সাহেব বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"It is unfortunately correct to say that there is as yet no modern centre of learning in India. Calcutta is the nearest approach thereto, because its university has a connsiderable library and there are many post-graduate students. Its professors and lecturers do write books, some of them of permanent utility and an atmosphere of culture is being created leading to the growth of a Bengali literature of marked individuality and considerable literary merit." *The Statesman*, Dak Edition, June 15, 1919, page 3.

বৈদ্যবিদ্যার আলোচনা।

আমাদের সকল জ্ঞানের মূল আমাদের সকল কর্ম্মের ভিত্তি যে বেদ, সেই বেদ হইতে আমরা এখন অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আমরা এখন অনেকেই 'বেদ' এই নামটি মাত্র জানি; কিন্তু বেদ যে কি, তাহা কিছুই বুঝি না বা বুঝিবার চেষ্টাও করি না। যদি কাহারও কখনও সে পক্ষে প্রচেষ্টা আসে, তাহাতেও নানা অন্তরায় ঘটে। কেন-না, বেদ যে কি—তাহা জানিবার বা জানাইবার সুযোগ কিছুই নাই। পরন্তু যাহাদিগকে বেদ মার্গ অনুসরণের সোপান বলিয়া মনে করি, তৎসমুদায় বিভ্রান্ত পথে প্রধাবিত, এবং তাহার কোনটী বা ভগ্ন, কোনটী বা কণ্টকাচ্ছন্ন।

সেই পথের একটী পথ—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবর্ত্তন-মূলক কুভাব-পরিপোষক, অপর পথ—দেশের অল্পসংখ্যক একদেশদর্শী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরিগৃহীত সঙ্কট-সমস্যা-মূলক। প্রথমোক্ত পথে যাঁহারা চলিবেন, তাঁহারা কতকগুলা ভ্রান্তমতের পোষণে বাধ্য হইবেন; শেষোক্ত পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে অন্ধকারের মধ্যে হাঁতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে মাত্র। প্রথম পক্ষ বেদকে অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার চিত্রপট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, সুতরাং বেদের প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সেইখানেই শেষ হইয়া যাইতেছে। অপর, শেষোক্ত পক্ষ বেদকে আপন গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেছেন, বেদ যে কি—তাহা নিজেও জানিতেছেন না, অপরকেও জানিতে দিতেছেন না। এক পক্ষ বেদের কদর্থ প্রচার করিতেছেন, অন্য পক্ষ অধিকারী অনধিকারীর দোহাই দিয়া গ্রন্থিটাকে দিন দিন দৃঢ়ই করিতেছেন। ফলে, বেদ 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' আচ্ছন্ন রহিয়া যাইতেছে।

সত্যকে মিথ্যা-রূপে প্রতিপন্ন করাও শ্রেয়ঃ নহে, আবার সত্যকে প্রকাশ হইতে না দেওয়াও মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহা সত্য, যাহা জ্ঞান, তাহা স্বপ্রকাশ। কেন তাহাতে মিথ্যার আরোপ কর? কেনই বা তাহাকে চাপা দিয়া রাখিতে চাও? দুইরূপ ব্যবহারই সমাজের ও ধর্ম্মের ঘোর অনিষ্টসাধক। সেই অনিষ্ট-নিবারণ-পক্ষে একটা চেষ্টা হয়, সত্য যাহা তাহা সত্য-রূপে প্রকাশ পায়,—এজন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে মনুষ্যসমাজের পরম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। বেদ কি? বেদ-বিদ্যা আবার কি প্রকারে বঙ্গদেশে পুনঃপ্রচারিত হইতে পারে? এ বিষয় এখন সহৃদয় মাত্রেরই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ আলোচনার জন্যই 'বেদসভা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং স্থানে স্থানে বেদ-বিষয়ক সভা-সমিতির অনুষ্ঠান চলিতেছে।

হাওড়ার "সাহিত্য-সম্মিলন" প্রথমে এ আন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। তার পর "বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ" তাহার সহায়ক-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীও সে আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, বেদের আলোচনা শীঘ্রই বঙ্গদেশব্যাপী হইবে, ক্রমে হিন্দুমাত্রেরই বেদার্থ-গ্রহণে এবং বেদ-বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্তি আসিবে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে দুইটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

হাওড়ায় বেদ-সভা।

হাওড়া "সাহিত্য-সম্মিলনের" উদ্যোগে গত ২রা কার্ত্তিক (১৯এ অক্টোবর) রবিবার। অপরাহ্নে হাওড়ার 'সাহিত্য-সম্মিলন' কার্য্যালয়ে (ডিউক লাইব্রেরী হলে) পণ্ডিত-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। নানা স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলী অনেকেই এবং বিভিন্ন স্থানের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ ঐ সম্মিলনে যোগদান করেন। তদ্ভিন্ন, স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ-বি-এল, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রভৃতি আসিয়া সভায় যোগ দিয়াছিলেন। স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, নড়াইলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তৃতার আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায়, বেদ-মন্ত্রের কিরূপ অপব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ কুফল ফলিতেছে, তাহা প্রদর্শন করা হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যার আলোচনায় পণ্ডিতগণ সকলেই লাহিড়ী মহাশয়ের মতের পোষণ করেন। উপসংহারে সুলেখক সুবক্তা সুধী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন, এবং বেদ-বিদ্যার প্রচার-বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় সকলেই বেদ-বিদ্যার উদ্বোধনে উৎসাহিত হন।

শান্তিপুরে পণ্ডিত-সম্মিলনী।

"বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের" উদ্যোগে গত ২৪এ কার্ত্তিক (১০ই নবেম্বর) সোমবার শান্তিপুরে পণ্ডিত-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এ কাব্যতীর্থ মহাশয় পুরাণ-পরিষদের পক্ষ হইতে ঐ সম্মিলনী আহ্বান করেন। সভায় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, রাণাঘাটের সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসর এবং স্থানীয় কৃতবিদ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপের গৌরব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অহিভূষণ কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীহরি স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যা-প্রচারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন,—'বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে যাহাতে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।' নদীয়ার মহারাজ বাহাদুরকে এবং নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে পৃষ্ঠপোষক মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়া, ঐ পক্ষে চেষ্টা করা হইবে, অতঃপর তাহাই স্থির হয়। সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের স্বনামপ্রসিদ্ধ

উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় ওজস্বিনী বক্তৃতায় নবদ্বীপে বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-পক্ষে যাহা করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। কৃষ্ণনগর এ পক্ষে সহায় হইবেন, আভাষ পাওয়া যায়।

শান্তিপুরে এই পণ্ডিত-সম্মিলনী অহ্বান-পক্ষে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের ত্যাগ-স্বীকার ও উদ্যোগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের পৃষ্ঠপোষক-রূপে তিনি ঐ সভার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন; এবং পণ্ডিতগণের পাথেয় প্রভৃতি দানে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হন। তাঁহার দ্বারা শান্তিপুরে যে বেদ-বিদ্যা-প্রচারের সহায়তা হইবে, শান্তিপুর যে গৌরবান্বিত হইবে, তাহা আশা করা যায়।

পুস্তক-পুস্তিকা

রাজা হরিশ্চন্দ্র।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের ইনি একজন প্রতিভাশালী লেখক। যে পরিবারের মুকুটমণি মধ্যে পরিগণিত রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ; ক্ষিতীন্দ্রনাথও সেই পরিবারেরই রত্ন-স্থানীয়। আপনার জয়ঢক্কা আপনি স্কন্ধে করিয়া বাজাইতে পারেন নাই বলিয়াই কিছু পিছাইয়া আছেন, একটু অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন; নহিলে, ইঁহারও রচনার মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা, যে বিচার-পদ্ধতি, যে সদ্ভাব-নিবহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা 'সাহিত্য-রথি'-গণের মধ্যে এক প্রকৃষ্ট আসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা সংপ্রতি ক্ষিতীন্দ্র-নাথের প্রণীত সাত খানি পুস্তিকা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার যে খানিই দেখি, সেই খানিই সুশিক্ষার, সদ্ভাবের ও সদ্জ্ঞান-প্রচারের সহায়-স্থানীয়। ছোট ছোট পুস্তকগুলি, কিন্তু রত্নকণা-স্বরূপ। অদ্যকার আলোচ্য 'হরিশ্চন্দ্র' দেশ-প্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র রাজার আখ্যায়িকা-মূলক; অথচ, জ্ঞানের ভাণ্ডার। এ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত। বৈদিক, পৌরাণিক, কিম্বদন্তীমূলক সকল কাহিনীই তুলনায় এ গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে বহু অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন, যোগ্য আসন লাভ করুন—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

একটির প্রাধান্য।

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম্-এ মহাশয়ের লিখিত।]

নিশা চায় লক্ষ আঁখি ফেলি—
দিবা-ভালে একটি নয়ন;
তবুও ধরার আলো
গোধূলিতে হয় কালো,
বিশ্বে করে অন্ধতম কেলি—
নাহি হাসে নীলিম গগন॥

মনোযন্ত্রে কত দ্বার আছে
হৃদয়ের এক ক্ষুদ্র পথ,
সেই পথ রুদ্ধ হ'লে
প্রাণবায়ু যায় চ'লে,
জড়দেহ প'ড়ে রয় পাছে
শক্তিহীন মনোপথ যত॥

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক
ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত
"বেদ" সম্বন্ধে
সংবাদ-পত্রের অভিমত।

The Vedas are a storehouse of ancient learning, embalming the culture, ideals, aspirations and endeavours of our ancestors in the remote past. They have withstood the ravages of time and stand to-day as embodying the yearnings of India's virile soul long before the dawn of the world's history. To feel the pulse of India, it is necessary that the inner significance of the Vedas should be clearly recognised. Nothing, therefore, could give us greater satisfaction than to see the Vedas and other sacred books widely read and their message properly laid to heart. When the late Mr R. C. Dutt conceived the plan of presenting the Bengali-reading public with the translation of Rig Veda Samhita, it caused a remarkable outburst of gratification, showing that the popular mind was highly in favour of such studies. Considerable time has elapsed since then, patient and laborious researches of scholars have brought to light new facts, view points and truths, and new light has come to be thrown upon many obscure points. We are exceedingly glad, therefore, that Pundit Durgadas Lahiri has undertaken the gigantic task of bringing out a new edition of the Vedas in Bengali with interpretations rendered according to new points of view. This is not the first time that he takes upon himself such a MAGNUM OPUS as his "PRITHIBIR ITIHASHA" which had already run into seven volumes and has excited the admiration of all interested in the subject, abundantly testifies. It is satisfactory to learn that his interpretations which display considerable learning, erudition and thought, have met with the whole-hearted support of the venerable Pundits of reputed centres of Sanskrit learning. Pundit Durgadas Lahiri's methods of exposition are quite illuminating. He prefaces each Sukta with appropriate observations and renders

the Riks thoroughly understandable by the disjoining of words, paraphrase, literal translation and lastly, a comprehensive discussion of the whole subject. It will, thus, be seen that he leaves nothing to be desired by those who even with little or no equipment in Sanskrit, want to assimilate the teachings of the Vedas. Sayana's commentary is also translated in its proper place The lengthy introduction is a mine of valuable information which deserves to be carefully read We are sure the ardent support of the public will be forthcoming in an abundant measure to make the undertaking an unqualified success. Already there has been an awakening of the public conscience and institutions are contemplated for the propagation of Vedic studies. The University also encourages the wider study of the Vedas. At such a time Pundit Durgadas Lahiri has deserved well of the community by bringing out such a great work of abiding value, in a way quite worthy of it. We wish his venture all success.—THE BENGALEE, 14th Nov., 1919.

* * *

The Vedas have attracted the minds of the savants in all ages. Even if we go so far back as the days of the "Brahamanas," the "Aranyakas", the "Upanishads," the "Darshans," and the "Purans," we find that very abstruse discussions were carried on the Vedas and their character—whether they were "Nitya", "Pramanya," and "Apauruseya". Coming to recent times, we find that the savants, in the west, are carrying on valuable investigations on the Vedas from their points of view and several treatises have already come into existence, breathing deep researches and profound learning And the "Manasputras" of these western savants in this country, have also, of late, come out with several treatises on the Vedas, but they have not been able to "free themselves from that hypnotic magic which makes them often place blind reliance on the authority of foreigners who, even claiming to be scholars, are seldom free from bias, religious or social" It is quite refreshing to find that Pandit Durgadas Lahiri of the "Prithibir Itihas" fame has brought out a Bengali edition of the Rig Veda Samhita from the Indian cultural point of view, with an Introduction, running over 64 pages, replete with very useful information. Following the Introduction, we have the well-known and authoritative "Vedanukramanika" (Introduction to the Vedas) by Sayanacharyya, with its Sanskrit text and a lucid Bengali rendering thereof. Next come the "Agni-Suktas," "Vayu Suktas," "Aswin Suktas," "Indra Suktas" and with these the volume under review closes. The other "Suktas" would appear in another

volume to be published hereafter. Pandit Durgadas has given very appropriate Prefatory Remarks to each group of "Suktas," and has given "Pado-Bisleysana" (disjoining of words) to each "Rik," and an "Anvaya" (prose-rendering or rather paraphrase) of the same in Sanshrit, and a literal translation of it in Bengali. Pandit Durgadas gives next the "Bhasya" by Sayan of each "Rik"—the Sanskrit text of the "Bhasya" and a translation of the same in Bengali. Last comes the "Bisadartha" in Bengali of each "Rik" by the learned Pandit, which is an illuminating exposition of the recondite matter from the Indian point of view. We have read the book with profound interest and have been very much struck with the deep researches of the learned Pandit in the abstruse realm of the Vedas His conception of the Vedas and their origin and their inter-penetrating character of the Shastras do really credit to him. We should commend the book to all, who are interested in the Vedic culture. Now that the Vedas occupy the prominent place in the higher Sanskritic studies of the Calcutta University, we hope that Pandit Durgadas' book would be recommended as a text-book for the M. A. Examination.—AMRITA BAZAR PATRIKA, Oct. 29, 1919.

* *

"পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী বেদ-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একটী বিস্তৃত ভূমিকার পরে তাঁহার ঋগ্বেদ বাহির হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে মহান্ গ্রন্থখানি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা মাত্র। মূল টীকা ইত্যাদি যাহা যাহা প্রাপ্তব্য ও প্রকাশিতব্য, তাহা ত বাহির হইতেছেই; তাহা ছাড়া সরল বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে। বেদের সম্বন্ধে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের মতের বিস্তারিত সমালোচনা ও ভ্রান্ত-মতের খণ্ডন যেখানে যাহা আবশ্যক, পণ্ডিত মহাশয় সেইখানে তাহা সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার বেদের সংস্করণ সাধারণের পক্ষে সবিশেষ সুখপাঠ্য করিয়া তুলিতেছেন। "বেদ মূর্খ কৃষকের গান" ইত্যাদি কথা লইয়া হিন্দুসমাজে কতই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও ঐ প্রকার মতের আলোচনা করিয়া বেদবিশ্বাসী হিন্দু আধুনিক-প্রকাশিত বেদ-সংস্করণের প্রতি কতই ভ্রূকুটী করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, লাহিড়ী মহাশয়ের সংস্করণ পাঠে সকলই তৃপ্তিলাভ করিবেন। বেদ যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, অহিন্দুর ভ্রান্ত ও একদেশদর্শিতাপূর্ণ সমালোচনায় যাহাতে বেদের প্রতি লোকের অভক্তি না হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারক এই সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই সুনিপুণ সঙ্কলন নিশ্চয়ই সর্ব্বসাধারণের নিকটে সবিশেষ সমাদৃত হইবে। আশা করি, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া এই মহান্ কার্য্য সম্পূর্ণ করার সামর্থ্য প্রদান করিবেন।—বাঙ্গালী, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

—*—

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা।] [পৌষ ও মাঘ, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ॥

প্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি, অপ্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি, লুপ্তগৌরব দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যতক্ষণ আমাদের সামর্থ্য থাকিবে (যতক্ষণ আমরা অসমর্থ না হইব) সকল দেবতারই পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। হে দেবগণ। আমাদের অর্চ্চনীয় (আপনারা) যে সকল দেবতা আছেন, কোনও দেবতার অর্চ্চনায় আমি যেন (কদাচ) বিরত না হই।

কেন ভেদ-ভাব?

হে সর্ব্বেশ্বর। সর্ব্বময়! তুমি তো সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান। কোন্ দেবতায় তুমি নাই? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি! তবে কেন বিভ্রম আসে? তবে কেন ভেদ-ভাবে দেখি? তবে কেন দেবতায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ নীচ-মহৎ গুণের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করি? 'অমুক দেবতা বড', 'অমুক দেবতা ছোট', 'অমুক দেবতায় গুণের আধিক্য আছে', 'অমুক দেবতায় গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি', 'অমুক দেবতা বৃদ্ধ মাহাত্ম্যশূন্য হইয়াছেন', 'অমুক দেবতা নবীন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন',—এ সকল চিন্তা কেন মনে আসে? এ সকল অতি নীচ কল্পনামূলক! মন্ত্র তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

ইতর-বিশেষ নাই।

যাঁহার সামান্যমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যিনি সাধনার একটু উচ্চস্তরে পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই দেবতার মধ্যে ইতর-বিশেষ ক্ষুদ্র-মহৎ দেখিতে পান না; তাঁহার দৃষ্টিতে দেবতা সকলই সমান,—

সকলই অভিন্ন।

তাই তিনি কোনও দেবতাকে ছোট ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন

না, অথবা কোনও দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা [illegible] বড় ভাবিয়া তাঁহার পূজার জন্য অধিকতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হন না। দেবতার সম্বন্ধে কোনরূপ ভব-তম ভাব সাধকের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। সকল দেবতার চরণেই তিনি সমান ভক্তিভরে প্রণত হন,—সকল দেবতাকেই তিনি ধ্যান ধারণার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন।

যেন ভাব-ব্যত্যয় না হয়।

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ যেন ঐ ভাবের ব্যত্যয় না হয়। জ্ঞান থাকিতে, সংজ্ঞা থাকিতে, আমরা যেন কোনও দেবতাকে ভেদভাবে দর্শন না করি। ধনী তুমি, দেবারাধনায় ধনের সদ্ব্যবহার করিতে চাও? সকল দেবতার প্রতি সমান-দৃষ্টিতে পূজায় প্রবৃত্ত হও। তুমি শাক্ত—শক্তির উপাসক। তোমার প্রতিবাসী শৈব—শিবের উপাসক। তাই, তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি দ্বন্দ্বই না চলিয়াছে। কিন্তু শিব-শক্তি কি ভিন্ন? ভ্রান্ত। কেন তোমার এ বিভ্রম আসে? বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রতিই বা কেন তোমার বিরাগ ভাব দেখি? আবার, বৈষ্ণবই বা কেন তোমার ইষ্টদেবতা কালী-তারা-মহাবিদ্যার নাম শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন? হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান পারশী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-উত্তেজনার তো অবধিই নাই। পরন্তু এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যেই বা কত দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। খৃষ্টানের রোমান্-কাথলিক প্রোটেষ্টেন্টের মধ্যে, মুসলমানদিগের সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে, কত কাল ধরিয়া কি শোণিতস্রাবী দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অঙ্কে তাহা কি ভীষণ রক্তবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে—প্রত্যক্ষ করুন। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আজিও হিন্দু-সমাজকে কলঙ্ক-কলুষিত করিয়া রাখে নাই কি? মন্ত্র বলিতেছে,—ভগবান্ কহিতেছেন,—'ভেদ-বুদ্ধি পরিহার কর। যতক্ষণ জীবন আছে, যতক্ষণ সামর্থ্য পাও, সকল দেবতাকে—সকল দেবভাবকে—ভগবানের সর্ব্ব-প্রকার বিভূতিকে—অভিন্নভাবে দর্শন কর,—এক ভাবিয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত হও।'

সার উপদেশ।

মন্ত্রের শেষ উপদেশ,—তুমি সকল দেবতাকে সমান ভক্তি সহকারে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাও,—'হে দেবগণ! আমার মতি-গতি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেও। আমি যেন সকল দেবতাকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হই। আমার হৃদয়ে যেন সংসারের সকল দেবতার প্রতি সর্ব্বথা সমান অনুরাগ সঞ্জাত হয়। কোনও দেবতার পূজা-অর্চ্চনায় যেন আমার বিরক্তি না ঘটে,—বিরতি না আসে। কোনও দেবতার সম্বন্ধ যেন আমার হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়,—সকল দেবতার সর্ব্বরূপ দেবভাবে আমার অন্তর যেন সদা পরিপূর্ণ থাকে। সর্ব্ব-দেবতায় সমদর্শন, সকল প্রকার দেবভাবের বিকাশ—যেন আমাতে প্রাপ্ত হয়, হে দেবগণ, তাহাই বিহিত করুন।' বলা বাহুল্য, এই ভাবই সাধনার প্রকৃষ্ট ভাব,—এই অবস্থাই সাধকের পরম শ্রেয়ঃ অবস্থা। বিভিন্ন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইতে, উচ্চাবচ স্তরগত দেবতার আরাধনায় ন্যস্তচিত্ত হইতে হইতে, ভব-তম প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া

দেবগণের সন্ধানে লইতে লইতে, মানুষ শেষে এই অবস্থায়ই উপনীত হয়। অগ্রসর হইতে হইতে, ক্রমেই তাঁহার ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। শেষে তাঁহার আত্মোদ্বোধ হয়, শেষে তিনি দেবদ্বারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানাইতে পারেন,—

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ॥"

—*—

'বেদ' ও তাহার ব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

বড়ই সমস্যার বিষয়—বেদের সোমতত্ত্ব। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় সোম-সম্বন্ধে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে ভ্রমসংস্কার একবার মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা উৎপাটন করা বড়ই কঠিন। বিতর্ক-স্থলে সকলেই সায়ণের দোহাই দিয়া। কিন্তু সায়ণ কি বলিয়াছেন এবং কেন বলিয়াছেন, তাহা কেহ চিন্তা করিয়াও দেখেন না।

অনেক স্থলে উপমান উপমেয় উদাহরণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে হয়। মনে করুন—একটী শিশুকে বুঝাইতে হইবে, হস্তী কিরূপ? যদি বলা হয়, হস্তীর কাণ কুলার মত। তাহাতে শিশু অনেক সময় কুলাকেই হস্তীর কাণ বলিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারে। এইরূপ, যদি বলা যায়,—হস্তীর শুণ্ড কদলীবৃক্ষের ন্যায়, আর সে যদি তাহাতে কদলীবৃক্ষকেই হস্তি-শুণ্ড বলিয়া ধরিয়া লয়; বুঝিয়া দেখুন দেখি, তাহাতে হস্তী-বিষয়ে তাহার হৃদয় কি প্রমাদপূর্ণ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া রহিল। এইরূপ অনেক বিষয়ে অনেকের ভ্রমধারণা সঞ্জাত হইয়া থাকে।

আমরা অতঃপর দুইটী ঋক্‌মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিবেন, কি বিষয়ে কি ধারণা কেমন করিয়া মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। একটী ঋক ও তাহার পদবিশ্লেষণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্দ্ধো ভবতি সোতবে।
উলূখলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুলঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। গ্রাবা। পৃথুবুধ্নঃ। ঊর্দ্ধঃ। ভবতি। সোতবে।

উলূখলসুতানাং। অব। ইৎ। উং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ॥ ১॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অতঃপর ঐ ঋকের সায়ণভাষ্য কি প্রচলিত আছে, তাহা লক্ষ্য করুন। সায়ণভাষ্য, যথা :—

"হে ইন্দ্র যত্র যস্মিন্নজ্ঞঃসবকর্ম্মণি সোতবেঽভিষবার্থং গ্রাবা পাষাণঃ পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূল ঊর্দ্ধ উন্নতো ভবতি তস্মিন্ কর্ম্মণ্যুলূখলসুতানামুলূখলেনাভিষুতানাং রসমবেৎ স্বকীয়ত্বেনাবগত্যৈব জল্গুলঃ। ভক্ষয়॥"

এই সায়ণ-ভাষ্যকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার কতই না অপব্যাখ্যা চলিয়াছে! প্রচার এই যে, পাষাণ-খণ্ডের উপর সোমলতা পোষণ করা হইত। স্থূলমূল পাষাণ-খণ্ডকে যখন যজ্ঞক্ষেত্রে ঊর্দ্ধভাবে স্থাপিত করা হয়, সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া, তখনই ইন্দ্রদেব যেন সন্তুষ্ট হন। উলূখল (উদূখল) হইতে নিঃসৃত সোমরসের ন্যায় অর্থাৎ পরিশ্রুত সোমরস মনে করিয়া তিনি তখনই তাহা পান করেন। প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; (১) "হে ইন্দ্রদেব! যে যজ্ঞস্থলে স্থূল নিম্নভাগবিশিষ্ট পাষাণ-সোমকণ্ডনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, সে স্থানে আপনি উদূখলে অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান করুন।" (২) "যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থ স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।" যাঁহারা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সোমরসকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। এ প্রকার ব্যাখ্যা দেখিলে, স্বতঃই মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-প্রস্তুতের আয়োজন দেখিয়াই মত্তপ ইন্দ্রদেব হর্ষান্বিত হইয়া তাহা গ্রহণার্থ আগমন করেন।

আমাদের অর্থ।

অতঃপর এই ঋকের যে অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এ সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের কৃত 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা' ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেখুন :—

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণি) 'গ্রাবা' (পাষাণবদ্বিশুষ্কা হৃদয়ঃ) 'সোতবে' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং, ভগবৎকার্য্যে ইতি যাবৎ) 'পৃথুবুধ্নঃ' (স্থূলমূলঃ, দৃঢ়তাসম্পন্নঃ) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, সদ্ভাবাপন্নঃ) 'ভবতি' (অস্তি), 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিতানাং

মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা, স্বকীয়ত্বেনাবগতৈব) 'উ' (সর্ব্বতোভাবেন) তৎকর্ম্ম 'জল্‌গুলঃ' (ভক্ষয়, গ্রহণং কৃত)। সদ্ভাববিবর্জ্জিতঃ পাষাণ-বদ্বিশুষ্কঃ কঠোরহৃদয়ো যদা ভগবদ্ভক্তিরসেন আর্দ্রো ভবতি, ভগবান্ তদা তদ্‌হৃদয়ং বিশুদ্ধং পরিশ্রুতং ইতি মত্বা তত্র অধিষ্ঠানং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। যে কর্ম্মে পাষাণের ন্যায় বিশুষ্ক এই হৃদয়, ভগবৎ-প্রীতি সাধনের নিমিত্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সদ্ভাবাপন্ন (উন্নত) হয়, পেষণযন্ত্রনিষ্কাষিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় জ্ঞান করিয়া, আপনি সেই কর্ম্ম গ্রহণ করুন (করেন)। (১ম—২৮সূ—১ঋ)।

* * *

আমাদের বক্তব্য।

ঋক্‌টীতে সোমলতার কোনও নাম-গন্ধ নাই। আমাদের মনে হয়, কোনও কালে কোনও প্রদেশে কি একটা প্রক্রিয়া পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আর, তাহা উপলক্ষ করিয়া, মন্ত্রের অর্থ সেই ভাবেই গ্রহণ করা হইতেছিল। কাহারও ব্যাখ্যার প্রতি আমরা কোনরূপ দোষ-খ্যাপন করিতেছি না। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্র যখন যে ভাবে প্রয়োগ হইত, ভাষ্যকারগণ তদনুসারেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মে প্রয়োগ-কালে যথাযথ উচ্চারণ কার্য্যকরী হয়, অর্থের কোনও প্রয়োজন হয় না,—ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। সায়ণাদি সেই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহাই আমরা মনে করি। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে কর্ম্মের উপযোগী অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যরূপ অর্থের (ভাবার্থগ্রহণের) তিনি আবশ্যকতা মনে করেন নাই। পরন্তু 'সোম' বলিতে মাদকদ্রব্য বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

আমরা অবশ্য মন্ত্রগুলিকে অন্য-দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান এই যে,—মন্ত্রের অর্থ সার্ব্বজনীন; আর উহার প্রয়োগের উপযোগিতা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ মন্ত্র—শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের—সকল প্রকার পূজা-অর্চ্চনার প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয়; অথচ, উহার ভাবার্থ কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের বা কর্ম্ম-বিশেষের উদ্দেশ্যসাধক নহে। এইরূপ, এ ঋক্‌মন্ত্রটীকেও আমরা কর্ম্মবিশেষের (সোমলতার রস প্রস্তুতের সময়ের মাত্র) উপযোগী বলিয়া মনে করি না। মন্ত্র নিত্যসত্যবৎ-প্রতীত হয়। উহার প্রয়োগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্ম্মে অসম্ভব নহে।

অতঃপর ঋক্‌টির মধ্যে যে গভীর ভাব—নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিহিত আছে, তাহার একটু আভাষ দিবার চেষ্টা পাইতেছি। ঋকের এক একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন; সে ভাব পরিগ্রহ হইবে। 'গ্রাবা' পদ পাষাণার্থবোধক। গ্রহণার্থক 'গ্রহ' ধাতু উহার মূল। হৃদয় সদসৎ ভাবরাশি গ্রহণ করে বলিয়া ঐ শব্দে হৃদয়কে বুঝাইতে পারে। 'গ্রাবা' পদ বিশেষভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্য—ঐ পদে পাষাণবৎ বিশুষ্ক কঠোর হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। মনুষ্যমাত্রই পাপ-কর্ম্মের অধীন। পাপের প্রভাবে হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন বিশুষ্ক ভাব

ধারণ করে। প্রথমে এইরূপ সাধারণ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইল। ভাষে বলা হইল,—'তুমি যত বড় পাপীই হও না কেন, পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয় যে তুমি, তুমিও উদ্ধার পাইতে পার।' কেমন হইলে? কি প্রকারে? 'পৃথুবুধ্ন' এবং 'ঊর্দ্ধঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে, বলিতেছে,—'যদি তুমি স্থূলমূল অর্থাৎ ভগবানের প্রতি দৃঢ়চিত্ত হইতে পার, যদি তুমি উন্নত অর্থাৎ সদ্ভাবাপন্ন হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার উদ্ধার-লাভ ঘটিবে। হও না কেন—পাপী। হওনা কেন—অভিশপ্ত। ভয় কি? একবার 'সোতবে' অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে দৃঢ়চিত্ত ও সদ্ভাবসমন্বিত হও দেখি। ভগবান তোমায় উদ্ধার করিবেন।' কেমনভাবে উদ্ধার করিবেন? 'উলূখলসুতানামিব' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। পাপীর চিত্ত যখন ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, সে যখন ভগবানের প্রতি একাগ্র হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মে মতিযুক্ত হইতে পারে; অতীত কর্ম্মের জন্য তখন তাহার অন্তরে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। উলূখলের উপমায় এখানে সেই সার্থকতা দেখি। উলূখলে মুসলাঘাতে ধান্যাদি যেরূপ পুনঃপুনঃ আহত ও পিষ্ট হইয়া নিস্তুষ অবস্থায় নির্গত হয়, আত্মগ্লানি-রূপ মুসলের আঘাতে পাষাণ-হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহ সেইরূপ আহত ও পিষ্ট হইয়া কলঙ্ক-রহিত অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নিস্তুষ বা মলরহিত শস্যের সার (চাউলাদি) যেমন লোকের ভক্ষণীয় হয়, ভগবানে ন্যস্ত হইলে, পাপীর চিত্তবৃত্তি-সমূহও সেইরূপ ভগবানের গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পাপী। ভয় করিও না; ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হও। উলূখলে নিষ্পেষিত শস্যাদির ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া কলঙ্করহিত হও। ভগবান তোমায় অবশ্যই দয়া করিবেন। ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

* * *

অতঃপর আর একটী ঋক্ ও তাহার প্রচলিত ভাষ্য-ব্যাখ্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। ঋক্‌টি, তাহার পদ-বিশ্লেষণ, ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি লক্ষ্য করুন। যথা,—

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।

উলূখলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। দ্বৌহইব। জঘনা। অধিহসবন্যা। কৃতা।

উলূখলহসুতানাং। অব। ইৎ। উং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ ॥ ২ ॥

ঋকের সায়ণভাষ্য ও প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

"যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিষবণ্যা উভে অধিষবণফলকে দ্বাবিব জঘনা। দ্বৌ জঘনপ্রদেশাবিব। জঘনং জঘন্যতেরিতি যাস্কঃ। নি০ ৯।২০। কৃতা। বিস্তীর্ণে কৃতে সম্পাদিতে। অন্যৎ পূর্ববৎ॥"

ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই ব্যাপার উপলব্ধ হইবে। যথা,—"হে ইন্দ্রদেব, যে স্থানে সোম কণ্ডন করিবার নিমিত্ত উপযোগি ফলকদ্বয়, জঘনদ্বয়ের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে স্থানে আপনি উদূখল-সংস্কৃত সোমরস আপনার অবগত হইয়া পান করুন।" (২) "যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষব-ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিযুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।"

আমাদের ব্যাখ্যা।

অতঃপর আমাদের 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা', বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা দেখুন,—

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যদা) 'জঘনা ইব' (জঘনৌ, জঘনপ্রদেশৌ ইব, সম্যক্‌মিলনপরৌ ইতি যাবৎ) 'দ্বৌ' (দেহমনসী) 'অধিষবণ্যা' (অধিষবণ্যৌ, ভগবৎকর্ম্মণী) 'কৃতা' (কৃতৌ, বিনিযুক্তৌ) ভবতঃ, তদা 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাষিতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা) উ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জঙ্গল' (ভক্ষয়, গ্রহণং কুরু তৎকর্ম্ম ইতি শেষঃ)। বয়ং যদা ভগবৎকর্ম্মণি অবচ্ছিন্নভাবেন দেহমনসী বিনিযোজয়াম, তদা ভগবদনুগ্রহং লভাবহে ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন জঘনপ্রদেশের ন্যায় (যুক্তভাবে অভিন্ন হইয়া) দেহ ও মন ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়, তখন পেষণযন্ত্র-নিষ্কাষিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় মনে করিয়া, আপনি সে কর্ম্মকে গ্রহণ করেন (করুন)। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

এ ঋকের বড় সমস্যা-মূলক পদ—'জঘনা' ও 'অধিষবণ্যা'। এ পর্য্যন্ত যত ভাষ্যকারের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এক মর্ম্মের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সকলেরই ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য দুই খানা প্রস্তর যখন জঘনের ন্যায় বিস্তৃত হয়।' ইত্যাদি।

প্রথম ঋকে একখানা প্রস্তরের বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখানে দুই খানা প্রস্তর কল্পনা করা হইল। কেন-না, মূলে 'দ্বৌ' শব্দ আছে। কিন্তু জঘনের ন্যায় দু'খানা পাথর কিরূপে বিস্তৃত থাকিবে, কেহই তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। সোমরস-কণ্ডনরূপ অর্থ আমনন করিলে হইবে বলিয়াই বোধ হয় দুই খানা পাথর ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, ঋকটি ভালরূপে বুঝিতে হইলে, 'জঘনা' পদের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করা একান্ত

আবশ্যক। 'জঘন' শব্দে 'মিলনস্থান' 'সঙ্গমস্থান' ভাব ব্যক্ত করে। তাই 'জঘন' শব্দে, "কটিদেশের সম্মুখভাগের নিম্নদেশ" বুঝায়, তাই "গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং-স্মৃতং," "প্রয়াগং জঘনস্থানমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ" প্রভৃতি বাক্য শিষ্ট-প্রয়োগ মধ্যে পরিগণিত। তাহা হইলে, "দ্বৌ জঘনৌ ইব" বাক্যে "দুইয়ের মিলনের ন্যায়" ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন, সে দুই—কোন দুই? দুই খানা পাথর পড়িয়া থাকিলেই যে ভগবান কৃপাপরায়ণ হন, তাহা মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা তাই নির্দ্দেশ করি, এখানে স্থূল প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের বিষয় কথিত হয় নাই। এখানে দেহের সহিত মনের জঘন বা সম্মিলন বিষয়েই লক্ষ্য রহিয়াছে। দেহ আর মন—এই দুই যদি অভিন্নভাবে এক হইয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এ ক্ষেত্রে নিষ্পেষণ যন্ত্র-নিঃসৃত (উলূখল-নিঃসৃত) নির্ম্মল দ্রব্য-গ্রহণের উপমার সার্থকতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেহ আর মন—একযোগে অভিন্নভাবে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পক্ষে অশেষ বাধা ও অন্তরায় আছে। সেই সকল বাধা ও অন্তরায় উত্তীর্ণ হওয়াই—নিষ্পেষণ-যন্ত্রের মধ্য হইতে নির্গত হওয়া। পাপের কত প্রলোভন! পুণ্যপথে অগ্রসর হওয়ার কত অন্তরায়। তাহাতেই উলূখলের পেষণ-আঘাত পাইয়া বহির্গত হওয়ার উপমা আসে। ফলতঃ দেহ-মনে এক হইয়া যখন ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, তখনই শ্রীভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইবে,—ইহাই ঋকের ভাবার্থ।

... ...

বেদের যে কিরূপ অপব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে, এইরূপ বহু প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। কর্ম্মে মন্ত্র যে ভাবেই ব্যবহৃত হউক না কেন, যে শব্দ যে অর্থেই প্রযুক্ত হউক না কেন, মন্ত্রের নিগূঢ় ভাব—উদার, উচ্চ মহান্ সার্ব্বজনীন সদ্ভাবপূর্ণ।

—— * ——

উদ্বোধন-সঙ্গীত।

[শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী মহোদয়ের বিরচিত। *]

(১)

নমামি মা বাগীশ্বরী, ভবভ্রমহারিণী।
সত্ত্বরূপা তুমি তাই শুভ্রকায়াধারিণী॥

শত দল বশে রাখ,
অবিদ্যা-স্বপন-নাশে,
নাদ, বিন্দু, যত তত্ত্ব,
ধর তাই বীণা করে,
শুন আদিদেবপ্রিয়া,
তোমা যেন নাহি ভুলে,

শতদলে তাই থাক,
বেদশয্যাশায়িনী।
সব তব করায়ত্ত,
আদিবক্তিকারিণী,
আনন্দের মুগ্ধ হিয়া,
শান্তিবিদ্যাদায়িনী।

* এই সঙ্গীতটী, বেদ সভার অধিবেশন উপলক্ষে রচিত, শঙ্কর-মঠে গীত হইয়াছিল।

মহাকবি শ্রীহর্ষ।

(২)

[প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি মহাশয় বিরচিত।]

শ্রীহর্ষের জন্মস্থান বারাণসী। ইহাতে মতভেদ থাকিলেও ডাক্তার ৺রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য', প্রথম ভাগে, 'শ্রীহর্ষ' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও শ্রীহর্ষের জন্ম কাশীতে,—ইহা স্বীকার করিয়াছেন। জৈনলেখক রাজশেখর সূরী স্বকৃত 'প্রবন্ধকোষে'ও ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজশেখর বলেন,—"শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রদেবের পুত্র মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রদেবের সভাসদ ছিলেন।" জয়ন্তদেব সম্বন্ধেও রাজশেখর বলেন,—জয়ন্তচন্দ্র 'পঙ্গুল' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি অনিহীলবারাপত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্ত্তী।" ডাক্তার বুলার সাহেব বলেন,—"জয়ন্তচন্দ্র কাষ্ট্রকুল ক্ষত্রিয়। ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন।" রাজশেখর বলেন,—"গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জয়ন্তচন্দ্র।" বুলার সাহেব বলেন,—"জয়ন্তচন্দ্রই জয়চন্দ্র।" কিন্তু জয়চন্দ্র বা জয়চ্চন্দ্র—গোবিন্দদেবের পুত্র নন্—পৌত্র, ইহা প্রাচীন লেখমালার দানপত্রে স্পষ্টই পাওয়া যায়। এই যে নামের বিভিন্নতা, ইহাতেই বোধ হয়,—'বিজয়চন্দ্র,' 'জয়ন্তচন্দ্র' ও 'জয়চন্দ্র' এই তিনটী নাম দ্বারা একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কাজেই রাজশেখর বা বুলার সাহেব প্রাচীন লেখ-মালার বংশ-পরিচয়ের দিকে দৃষ্টি করেন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। প্রাচীন লেখমালার মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র, বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র বা জয়চন্দ্র। তবে জয়চন্দ্র কে? জয়ন্তচন্দ্র কি বিজয়চন্দ্রের ডাকনাম? লাহোর কলেজের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মা, 'নির্ণয়সাগর' হইতে প্রকাশিত নৈষধচরিতের ভূমিকায় 'জয়ন্তচন্দ্র' নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধকোষের মতানুসরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"অয়ঞ্চ জয়ন্তচন্দ্রো জয়চন্দ্র এব।" নামের গোল না মিটিলেও আমি শ্রীহর্ষের শ্লোকের বলে, 'গোবিন্দনন্দনতয়া' এই স্পষ্টোক্তির বলে, এবং কামদেবের সঙ্গে তুলনার বলে, তথা শ্রীহর্ষের স্বকৃত 'বিজয়প্রশস্তি' কাব্যের বলে, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মহারাজ বিজয়চন্দ্রকেই মহাকবি শ্রীহর্ষের সম্মানকারী ও আশ্রয়দাতা রাজা বলিয়া গণ্য করি। শ্রীহর্ষের পিতাও, শ্রীহীরও—কান্যকুব্জ ও কাশীর অধীশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমমাহেশ্বর, অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-ত্রয়াধিপতি বিবিধ বিদ্যাবিচার বাচস্পতি, শ্রীমদ্-বিজয়চন্দ্রদেবেরই সভাসদ্ ছিলেন। বিজয়চন্দ্রদেব কাশীতেই অধিককাল থাকিতেন। তাঁহার সভার সভ্য পণ্ডিতগণও কাশীতে বাস করিতেন। শ্রীহীরও কাশীবাসী ছিলেন। কাজেই কাশীতেই শ্রীহর্ষের জন্ম, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। বিজয়চন্দ্রের সভাসদের মধ্যে শ্রীহীর একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। হীরের সময়েই কাশীরাজের সভায় একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন,—ইনিই 'উদয়নাচার্য্য'। যাহা হউক, এই নৈয়ায়িক

আসিয়া বিজয়চন্দ্রের প্রধান সভাসদ্ শ্রীহীরকে বিচারে পরাস্ত করেন, এবং রাজার সম্মুখে, শ্রীহীরের পাণ্ডিত্যগর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীহীর খুব অপমানিত হন এবং এই অবমাননার বিষাদে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকালে শ্রীহীর তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীহর্ষকে তাঁহার শত্রু পণ্ডিতের কথা বলিয়া যান। তখন শ্রীহর্ষের বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। মুমূর্ষু পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীহর্ষ, এই বয়সেই তাঁহার বিধবা জননী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের ভার জ্ঞাতিগণের উপর অর্পণ করিয়া, বিদেশে গমন করেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ আচার্য্যগণের নিকট অতি যত্ন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ষড়ঙ্গ বেদ, সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতিষ, বিবিধ কলাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। তাহাতেও মনস্তুষ্টি না হওয়ায়, সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিয়া কোনও সদ্‌গুরুর নিকট চিন্তামণি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি গঙ্গাতীরে কোনও নির্জ্জন স্থানে এই চিন্তামণি-মন্ত্র এক বৎসর কাল জপ করিতে থাকেন। জপের ফলে, তিনি চিন্তামণি-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা তিনি নৈষধচরিত মহাকাব্যের প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকে স্বয়ংই লিখিয়া গিয়াছেন। "তচ্চিন্তামণি-মন্ত্র চিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে"। ইহার বঙ্গভাষা এই,—'শৃঙ্গার-রসের ভঙ্গিতে অতিমনোহর এই নৈষধচরিত মহাকাব্য তাঁহার (শ্রীহর্ষের) চিন্তামণি মন্ত্র-চিন্তার ফলস্বরূপ।" কবির এই নিজ উক্তিতেই বুঝা গেল,—তিনি চিন্তামণি-মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরা (ভারতীদেবী) তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। বিদ্যাদেবীর সাক্ষাৎকার পাইয়া ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বজয়ী বর লাভ করিয়া, তিনি জনসমাজে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি এখন অনুপ্রাস জড়িত দুর্ব্বোধ শব্দরাশি প্রয়োগ করিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতেন। কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। ইহাতে তাঁহার অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। এরূপ বিদ্যা-লাভও বিষাদের কারণ হইল। এই বিষাদ নিবারণের জন্য কিছুদিন ধরিয়া তিনি চূড়ামণি-মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। আবার ভারতী প্রত্যক্ষা হইলেন। শ্রীহর্ষ ভারতীকে বলিলেন,—"মা, অতিবুদ্ধিও আমার দোষের হেতু হইয়াছে। যাহাতে আমার কথা লোকে বুঝিতে পারে, তাহার উপায় আপনি করুন।" সরস্বতী বলিলেন,—"তাহা হইলে, তুমি এক কাজ কর। মধ্যরাত্রে স্নান করিয়া ভিজা মাথায় দধি পান কর, পশ্চাৎ শয়ন কর। কিছু কফের বৃদ্ধি হইলে, তোমার এ দোষ কাটিয়া যাইবে।" শ্রীহর্ষ তাহাই করিলেন। সেই দিন হইতেই বিশিষ্ট পণ্ডিত-লোকে তাঁহার কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারিত। তাহার পর তিনি যতই পণ্ডিতসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই সকলে তাঁহার বাক্যের দুর্ব্বোধতার জন্য বিরক্ত হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিল,—"তুমি মাষকলাই সিদ্ধ করিয়া ভোজন কর। তাহা হইলে তোমার এ সব দোষ নিবৃত্ত হইবে।" তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তিনি এবার শ্রীহর্ষের কথা অনেকটা বুঝিতে পারিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শ্রীহর্ষ! কি ঔষধ সেবন করিয়া তোমার কথার দুর্ব্বোধতা সারিল? শ্রীহর্ষ উত্তর করিলেন,—"অশেষ শেমুষীমোষ-মাষমশ্নামি কেবলম্"। ইহার অর্থ,—অশেষ-বুদ্ধিনাশক মাষ-কড়াই খাইয়া শ্রীহর্ষের বুদ্ধির ধার কিছু কমিয়াছিল। এখন তিনি জনসমাজে আসিয়া

দু'কথা বলিতে পারেন। অনেক সুশিক্ষিত লোকে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতেও পারেন। এই অবস্থায় নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কাশীর রাজা যিনি, তিনিই কান্যকুব্জের রাজা। শ্রীহর্ষ লোকের নিকট জানিতে পারিলেন, এই রাজার নাম—বিজয়চন্দ্র অথবা জয়ন্তচন্দ্র। পণ্ডিত শ্রীহীর ইঁহার সভাসদ ছিলেন। শ্রীহীরকে যিনি বিচারে পরাস্ত করেন, সেই পণ্ডিতই এখন রাজসভার প্রধান সভ্য, রাজার নিত্যসহচর। তিনি একদিন সাহসে ভর করিয়া রাজা বিজয়চন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। নির্জ্জনে রাজদর্শন কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে না। তিনি যখন রাজার নিকট গেলেন, তখনও রাজা বহু লোকে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীহর্ষ রাজার নিকট গিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—'আমি অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আপনার নিকটে আসিলাম।' ইহা বলিয়া রাজার তুষ্টিসাধন জন্য পূর্ব্বোক্ত 'গোবিন্দনন্দনতয়া' ইত্যাদি স্বরচিত শ্লোকটিও বলিলেন। শ্লোকটি শুনিয়া রাজা ও রাজসভার সমস্ত লোকই পরিতুষ্ট হইলেন, এবং শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহার পিতৃবৈরী, তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীহর্ষ ন্যায়-দর্শনের ভ্রমসকল দেখাইতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ তর্কের বিধান কি করিয়া হইতে পারে, তাহাও নির্ভীকস্বরে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীহর্ষের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে রাজসভা যথাই মুগ্ধ হইল। শেষে তিনি এই শ্লোকটী বলিয়া নিরস্ত হইলেন,—

"সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে
তর্কে বা ময়ি সংবিধাতরি সমং লীলায়তে ভারতী॥
শয্যা বাস্তমৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাস্তৃতা
ভূমির্ব্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতাম্॥"

ইহার ভাবার্থ এই—সাহিত্য-শাস্ত্র অতি সুখবোধই হউক অথবা তর্কশাস্ত্র অতি দুর্ব্বোধই হউক, এতদুভয়েই আমি নিপুণ প্রবন্ধকার। কাজেই আমার প্রতি বাগ্দেবী বিলাস সমান। ইহাই স্ত্রীজাতীর স্বভাব,—বিলাসের যোগ্য-ব্যক্তি মনোরম হইলে, তাহার দৈন্য বা আঢ্যভাবের প্রতি তাঁহারা লক্ষ্য করেন না।

সাহিত্য-জগতে উক্ত শ্লোকটী আদরণীয় হইলেও উহা আধুনিক রুচিতে একটু অনুপাদেয়। সেইজন্য উহার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক রহিলাম। ইহার দ্বারা শ্রীহর্ষ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, সরস-সাহিত্য-শাস্ত্র ও দুর্গম ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র—এই উভয় শাস্ত্রেই আমি ভারতীর সমান কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীহর্ষের এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতৃবৈরী পণ্ডিত কহিলেন,—

"হিংস্রাঃ সন্তি সহস্রশোঽপি বিপিনে শৌণ্ডীর্য্যবীর্য্যোদ্ধতা-
স্তৈস্তৈকস্য পুনঃ স্তবীমহি মহঃ সিংহস্য বিশ্বোত্তরম্।
কেলিঃ কোলকুলৈর্মদো মদকলৈঃ কোলাহলো কাহুলৈঃ
সংহর্ষো মহিষৈশ্চ যস্য মুমুচে সাহংকৃতে হুংকৃতে॥"

অর্থ,—শৌণ্ডীর্য্য-বীর্য্যোদ্ধতাঃ (প্রচণ্ডবীর্য্যে অতিশয় উদ্ধত) সহস্রশ অপি (হাজার

হাজারও) হিংস্রাঃ (হিংস্রজন্তুগণ) বিপিনে (বনে) সন্তি (বাস করে) [কিন্তু, তাহাদের মধ্যে] তস্য (সেই) একস্য (একমাত্র) সিংহস্য (সিংহের) বিশ্বোত্তরং (লোকাতীত) মহঃ (তেজের), [আমরা] স্তবীমহি (প্রশংসা করিয়া থাকি)। যস্য (যাহার,—যে সিংহের) সাহঙ্কৃতে (সগর্ব্ব) হুংকৃতে (হুঙ্কার,—সিংহনাদ) [শ্রুত হইলে] কোলকুলৈঃ (শূকরগণ), কেলিঃ (ক্রীড়া), মদকলৈঃ (মত্তহস্তিগণ) মদঃ (মত্ততা), কাহলৈঃ (ম্লেচ্ছজাতিগণ,—বন্য বর্ব্বর জাতি) কোলাহলঃ (দলবদ্ধভাবে, পশু-তাড়নার চিৎকার), মহিষৈঃ চ (এবং মহিষগণ) সংহর্ষঃ (হৃষ্টভাব), মুমুচে (পরিত্যাগ করিয়াছে)।

শ্রীহীরের পরাভবকারী পণ্ডিতের উদ্দেশ্য,—যদিও আমি তোমার পিতাকে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করিয়াছি, তজ্জন্য আমার প্রতি তোমার হিংসা, তোমার উপরও আমার হিংসা হইতে পারে, তথাপি তোমার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব যে অসাধারণ, ইহার প্রশংসা আমি অবশ্যই করিব।

পিতৃবৈরীর মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীহর্ষ নিক্রোধ হইলেন। রাজা বিজয়চন্দ্রও তাঁহাদের উভয়ের সম্মেলক গাঢ় আলিঙ্গনের অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও সন্তুষ্টমনে পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। বিদ্বেষ দূর হইল, সদ্ভাব স্থাপিত হইল। রাজাও তিনি শ্রীহর্ষের অনুপম পাণ্ডিত্যে মোহিত হইলেন। কান্যকুব্জের ও কাশীর একমাত্র অধীশ্বর মহারাজ বিজয়চন্দ্র শ্রীহর্ষকে তৎক্ষণাৎ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন তাঁহার পিতা যেমন, তাঁহার সভায় সভ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন, শ্রীহর্ষ তেমনই রাজসভায় সভ্যপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা শ্রীহর্ষ নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"তাম্বূলমাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।" যিনি কান্যকুব্জের মহারাজের নিকট হইতে প্রতিদিন দুইটী তাম্বুল (পান) ও আসন (প্রধান সভ্যের বসিবার যোগ্য আসন) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'লভতে' এই বর্ত্তমানা লট্ বিভক্তি থাকায়, নৈষধচরিত রচনার সময়ই তিনি সভ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হইল। এদিকে প্রবাদও ইহার অনুকূল। রাজা বিজয়চন্দ্র বা জয়চন্দ্রের আদেশেই শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক প্রবাদ। নৈষধচরিত মহাকাব্য রচিত হইলে, রাজা তাঁহার অন্যান্য সভ্যগণের সহিত সাগ্রহে তাহা সম্পূর্ণ শ্রবণ করেন, এবং "সুষ্ঠুতমমিদম্" বলিয়া প্রশংসা করেন। কেবল প্রশংসা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; যাহাতে শ্রীহর্ষের নৈষধ মহাকাব্য আর্য্য-জগতে বিজয়-লাভ করে, তজ্জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। রাজা শ্রীহর্ষকে বলেন,—"আপনি এই কাব্যখানি লইয়া, কাশ্মীর-প্রদেশে গমন করুন। কাশ্মীরের সারস্বত অরণ্যে (বিদ্যাবিদ্যালয়) পণ্ডিতগণকে ইহা প্রদর্শন করুন, এবং তত্রত্য সারস্বতপীঠে ভারতীদেবীর হস্তে ইহা প্রদান করুন। ইহা নির্দ্দোষ কাব্য বলিয়া সপ্রমাণ হইলে, ইহা নির্বিঘ্নে জগদ্বিখ্যাত হইবে। আপনার কাশ্মীর গমনের সুযোগ ও সমস্ত ব্যয় আমার রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে।"

মহারাজের নিকট এই কথা শুনিয়া, মহাকাব্য নৈষধচরিত লইয়া, শ্রীহর্ষ কাশ্মীর-গমনে উদ্যত হইলেন। কান্যকুব্জ ও কাশীর অধীশ্বর তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীহর্ষ রাজার আগ্রহে অল্পদিনের মধ্যেই নির্বিঘ্নে

কাশ্মীরে সারস্বত অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে কাব্যখানি দেখাইলেন এবং ভারতী পীঠও তাহা স্থাপন করিলেন। কিন্তু ভারতীর পীঠস্থান হইতে তাহা যেন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে শ্রীহর্ষ পীঠস্থানিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ভারতি! ভারতি!" তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ, তাহাতেই কি তোমার বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটিল? তুমি নিকৃষ্ট প্রবন্ধের ন্যায় আমার এ নৈষধচরিত মহাকাব্য কেন দূরে নিক্ষেপ করিলে?" ইহার উত্তরে দৈববাণী হইল,—"হে নিন্দক! তোমার কি মনে নাই, তুমি, তোমার এই নৈষধচরিত মহাকাব্যের একাদশ সর্গে ৬৪ শ্লোকে আমাকে 'বিষ্ণুর পত্নী' বলিয়া আমার চিরকুমারীত্ব খণ্ডন করিয়াছ! এই অকারণ নিন্দার জন্য আমি তোমার পরনিন্দাসূচক কাব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তুমি কি জান না যে ব্রহ্মচারী অথবা ব্রহ্মচারিণীগণ মর্ম্মভাষককে 'উদ্বেগজনক' বলিয়া ঘৃণা করেন?"

সরস্বতীর এই কথা শুনিয়া শ্রীহর্ষ বলিলেন,—"দেবি! আপনি বর্ত্তমান মন্বন্তরে ব্রহ্মচারিণী হইলেও অপর মন্বন্তরে বিষ্ণুর পত্নী কি ছিলেন না? পুরাণও তো আপনাকে বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে এ সত্য কথায় কেন কোপ করিতেছেন? বিশেষতঃ, ক্রুদ্ধ হইলেই কি কেহ কলঙ্কের হাত হইতে ত্রাণ পায়?

শ্রীহর্ষের এই কথায় বাগ্‌দেবী আদর করিয়া পুস্তকখানি পুনশ্চ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে নৈষধচরিত মহাকাব্য স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীরও আদরণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তথাপি, কাশ্মীরস্থ সারস্বতপীঠের পণ্ডিতগণ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও কাশ্মীরের রাজা মাধবদেবকে এ পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। অথচ, কাশ্মীরাধিপতি মাধবদেবের জয়পত্র না পাইলে, এ ঘটনা যে সত্য, তাহাও অন্যত্র বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। শ্রীহর্ষ তত্রত্য পণ্ডিতগণকে অনুরোধ করিলেও, তাঁহারা ইহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া রহিলেন। ইহাতে অনেক মাস কাটিয়া গেল। শ্রীহর্ষের নিকট যাহা অর্থ ছিল, তাহা ফুরাইল। একে একে পরিচ্ছদ যান, বাহন সমস্তই বিক্রয় করিতে হইল। উল্লেখ আছে,—তাঁহার শকটের বাহন বলীবর্দ্দ (বলদ্) ও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। গোবিক্রয় নিষিদ্ধ হইলেও আপৎকালে তাঁহাকে তাহা করিতে হইয়াছিল। শেষে একবস্ত্র হইয়া অনশনে কোনও একটী নদীর বাঁধা-ঘাটের উপরিস্থিত শিবমন্দিরে বসিয়া রুদ্রমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন সেই ঘাটে কাশ্মীর-প্রদেশের দুইটী বউলোকের বাড়ীর দুইজন উচ্চ অল প্রকৃতির ঝি জল আনিতে গমন করে। জল ভরিবার সময় কথায় কথায় তাহাদের বিবাদ আরম্ভ হয়। বিবাদের পরিণামে মারামারি ও কলসী ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়। এইজন্য তাহারা রাজকুলে (আদালতে) গিয়া পরস্পর অভিযোগ করিল। বিচারক সাক্ষ্য চাহিলেন। তাহারা অপকারী শ্রীহর্ষকে সাক্ষী মানিল। শ্রীহর্ষ সে দেশের প্রাকৃত ভাষা জানিতেন না। ধর্ম্মাধিকরণের আদেশে তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হইল। তিনি বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিবাদের মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই দুই দাসীর কথোপকথন সমস্তই মুখস্থ বলার মত অবিকল বলিলেন। ধর্ম্মাধিকরণিক শ্রীহর্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীহর্ষ সংস্কৃত-ভাষায় বলিলেন,—'আমি বিদেশী। ইহাদের ভাষা আমি জানি না। কেবল তাহাদের কথা শুনিয়া অবিকল বলিলাম।' রাজা তাঁহার এই 'অবধারণ' শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

'আপনি এ দেশে কি জন্য আসিয়াছেন।' তখন তিনি তাঁহার কাশ্মীরাগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মাধিকরণিক আদর করিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। শ্রীহর্ষও তাঁহার ব্যবহারে জানিতে পারিলেন, ইনিই কাশ্মীরের অধীশ্বর মহারাজ মাধবদেব। তখন তাঁহার নিকট জয়পত্র প্রার্থনা করিলেন। রাজাও কাশ্মীরের পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সারস্বত পীঠের ঘটনা শুনিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'এরূপ সত্য ঘটনা তাঁহাকে কেন এতদিন জানান হয় নাই, এবং কেনই বা এরূপ কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার এতদিন ঘটে নাই?' রাজার এই কথার উত্তরে কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ নীরব রহিলেন। রাজা তাঁহাদের ঈদৃশ ঔদাসীন্য দেখিয়া এবং তাঁহাদেরই দোষে শ্রীহর্ষকে এত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে,—ইহা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলা বাহুল্য, শ্রীহর্ষ এবার অনায়াসেই জয়পত্র পাইলেন। কাশ্মীরের মহারাজ মাধবদেব, কান্যকুব্জের মহারাজ বিজয়চন্দ্রের নিকট নৈষধ-চরিতের বিশুদ্ধতা ও সারস্বত-পীঠে সরস্বতীর পুস্তক-গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া একখানি 'লেখ' (পত্র) দিলেন এবং কাশী গমনের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়া শ্রীহর্ষকে বিদায় করিলেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিবার সময়, পথে শ্রীহর্ষ কাব্যপ্রকাশকার মম্মদভট্টের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীহর্ষ তাঁহাকে নৈষধচরিত শুনাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন,—'তোমার এ কাব্যখানি রচিত হইবার পূর্ব্বেই আমার কাব্যপ্রকাশ লিখিত হইয়াছে। তাহা না হইলে, তোমার এ কাব্য হইতে আমার কাব্যপ্রকাশের দোষ পরিচ্ছেদের জন্য অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিতাম।'

এ প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। তবে মম্মদ ভট্ট স্বয়ং যখন তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যপ্রকাশে নৈষধচরিতের শ্লোক উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ইহাকে বিখ্যাত মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার অবশ্যই করিয়াছেন।

এখন শ্রীহর্ষ বারাণসীধামে আসিয়া কান্যকুব্জ ও কাশীর অধীশ্বরের নিকট প্রতিপত্তির সহিত অক্ষুণ্ণ সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দর্শনশাস্ত্রের গবেষণায় সুমার্জ্জিত কাব্যরসের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া নিজজীবনকে ও জগজ্জনকে পবিত্র আনন্দধারা দান করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিজয়চন্দ্রের গুণাবলি স্মরণ করিয়া, তাঁহার নামে শ্রীহর্ষ একখানি কাব্য রচনা করিলেন। এ কাব্যখানির নাম—'শ্রীবিজয়প্রশস্তি'। কান্যকুব্জ ও কাশীর রাজসভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে যে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সে সব গ্রন্থের নাম মহাকাব্য নৈষধচরিতের অঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছেন। নৈষধচরিত কাব্যখানি দময়ন্তী ও নলের ঘটনাবলী লইয়া রচিত। নলচরিতের সমস্ত ঘটনা মহাভারত প্রভৃতিতে যেভাবে বর্ণিত আছে, এ কাব্য তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। নলদময়ন্তীর জীবনের কতক ঘটনা লইয়া শৃঙ্গার-রসের নূতন ভঙ্গীতে কবি শ্রীহর্ষ তাঁহার প্রৌঢ়োক্তিকে নানা ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেবের অনুসরণ করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই। একখানি মহাকাব্যে নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় যতদূর দিতে হয়, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তি কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহা কম বাহাদুরী নয়। শ্রীহর্ষের কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে যেমন কান্যকুব্জেশ্বরের রাজসভা আনন্দময় হইয়াছিল, তেমনই পণ্ডিতবহুল ভারতবর্ষও আনন্দিত হইয়াছিল। রাজ-

সিংহাসনের নিকট সম্মানিত, জগতের নিকট পূজিত, শ্রীহর্ষ আনন্দ-মন্দাকিনীর পূতধারায় নিমগ্ন হইয়া অনেক দিন কাটাইলেন। তাঁহার সংসার আনন্দময় হইল। সকলের নিকটেই তিনি সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি বহুলরূপে পাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষবয়সে তাঁহাকে সদুঃখে রাজসভা পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার কবিত্বময় পাণ্ডিত্যময় জীবনেও একটা সংসারের বিষাদ আসিয়া প্রবেশ করিল। এই বিষাদের বিষদাহে তাঁহাকে লোকসমাজও পরিত্যাগ করিতে হইল। জপ হইতেই তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল, পুনশ্চ জপেই তাঁহার জীবনের অবসান হইল।

শ্রীহর্ষ যখন কাশীতে কান্যকুব্জেশ্বরের রাজসভায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন, তখনও এই কান্যকুব্জকুলে, একটী বিধবা রমণী, সধবা হইবার আশায়, প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আশাও পূর্ণ হইল। এই রমণীর কুদৃষ্টিতেই শ্রীহর্ষ তাঁহার উচ্চ আসন ভাঙ্গিয়া দিলেন বা তাঁহার সে আসন ভাঙ্গা পড়িল। এই রমণীর নাম—সুবহদেবী। ইনি খুব বিদুষী ছিলেন। তজ্জন্য ইঁহার গর্ব্বও পর্ব্বত প্রমাণ ছিল। ইনি বিদ্যায় ভূতলকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করেন। সেই হেতু, পণ্ডিতগণ ভয়ে ভয়েই যেন ইঁহাকে 'কলাভারতী' উপাধি দান করিয়াছিলেন। তাহাতেও ইনি তুষ্ট ছিলেন না। সাক্ষাৎ ভারতী হইবার জন্য ইঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। কেবল বিদ্যায় এত বড় আশা পূর্ণ হয় না; প্রচুর ধন থাকিলে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কোনও রাজা-রাজড়া না ধরিতে পারিলে, ধনলাভের উপায় আর কি আছে? এইরূপ ধনতৃষ্ণার লালসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া অনহিল্লপুরে বসিয়া আছেন; এমন সময় কান্যকুব্জেশ্বরের প্রধান চর তথায় গমন করেন। সুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। চতুর রাজা সুবহদেবীর হৃদ্‌গত ভাব বুঝিয়া লইলেন। সুবহদেবীর রক্ষক ও চরের নিকট ব্যক্ত করিল,—'মহাশয়, আমি অনেক স্ত্রী-পুরুষের কাপড় কাচি; কিন্তু সুবহদেবীর সাটীখানি কাচিয়া রৌদ্রে মেলিয়া দিলে, কেতকীফুলের মত সুগন্ধ নির্গত হয়। ভ্রমরেরাও দলে দলে আসিয়া সেই সাটীর উপর উপবেশন করে। আমার বোধ হয়, ইনি কোনও দেবী হইবেন, অথবা নারীজাতির মধ্যে ইনি 'পদ্মিনী' হইবেন। অনহিল্লপুরের অধিবাসীরাও সুবহদেবীকে পদ্মিনী স্ত্রীই বলিয়া থাকে'। সুবুদ্ধি চর ভাবিল,—'এমন সুন্দরী বিদুষী ললনা রাজার ভোগ্যা হওয়াই উচিত। রাজা বিজয়চন্দ্র তো বৃদ্ধ, কিন্তু রাজকুমার 'জয়চন্দ্র' যুবা। দুদিন পরে ইনিই রাজা হইবেন। এখন ইনিই সমস্ত রাজকার্য্য স্বহস্তে করিতেছেন। রাজ্যাভিষেকও অচিরে হইবে। এখন এই রমণীরত্নটী লইয়া তাঁহাকে উপহার দিলে, আমারও কিছু লাভ আছে। কিন্তু ইনি বিধবা। ইঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা যুবরাজের অভিপ্রেত হইবে কি না? যাহা হউক, প্রস্তাব চলুক।'

চর পদ্মাকর সুবহদেবীর কথা যুবরাজের কর্ণগোচর করিলেন। যুবরাজ শুনিলেন,—রূপে, গুণে ও বিদ্যায় সুবহদেবী মরজগতে অমর ললনা। বিধবাবিবাহ তো শাস্ত্রে আছে। একবার কাশীর পণ্ডিত-সমাজের মত গ্রহণ করা হউক। কাশীর পণ্ডিতগণ মত দিলেন। কেবল মহাকবি শ্রীহর্ষ মত দিলেন না। অধিকন্তু শ্রীহর্ষ সুবহদেবীকে পদ্মিনী স্ত্রী বলিতেও কুণ্ঠিত। পদ্মিনী স্ত্রী বিধবা হইতে পারে না। পদ্মিনী স্ত্রীর সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-সমুদয়

শ্রীহর্ষ ব্যক্ত করিলেন। তাহাতেও কোনও ফল হইল না। জয়চ্চন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। সুবহদেবী যুবরাজের 'ভোগিনী' স্ত্রী হইলেন। ভোগিনী স্ত্রীর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিলেও তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না। মহিষী হওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। বিজয়চন্দ্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ জয়চ্চন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই অবসরে কলাভারতী সুবহদেবী নামে মহিষী না হইয়াও কাজে পাটরাণী হইলেন। তাঁহার আদেশ রাজার আদেশের উপরে উঠিল। এখন তিনি রাজসভার প্রধান পণ্ডিত শ্রীহর্ষকে জব্দ করিবার অবসর পাইলেন। শ্রীহর্ষ লোকসমাজে 'নবভারতী' বলিয়া খ্যাত। সুবহদেবীও কলাভারতী। এই ভারতীতে বিদ্যার রাজত্ব লইয়া বেশ বিবাদ বাধিল। শেষে চতুঃষষ্টি-কলার কোন্ কোন্ কলা শ্রীহর্ষ জানেন, ইহা জিজ্ঞাসা করা হইল। শ্রীহর্ষ বলিলেন,—আমি নবভারতী, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার সমস্তই আমার আয়ত্ত।' তখন সুবহদেবী বলিলেন,—'আপনি যখন 'নবভারতী', তখন সর্ব্বকলাবিৎ হইবেন, সন্দেহ কি? আচ্ছা, আপনি আমার পদধারণের যোগ্য উপানৎ (জুতা) এক জোড়া প্রস্তুত করিয়া আমাকে পরাইয়া দিতে পারিবেন কি?' শ্রীহর্ষ কলাবিদ্যার অভিমানে তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু মনে মনে বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। মন্ত্রসিদ্ধ সদ্ব্রাহ্মণেও জগদ্বিখ্যাত মহাকবি শ্রীহর্ষকে, একটা কুলটা স্ত্রী, রাজার প্রেমাস্পদ হইয়া চর্ম্মকারকে যেমন জুতার জন্য আদেশ করে, তেমনি তাঁহাকে বলিল। তিনি সমস্ত মনোভাব গোপন করিয়া এক মাসের মধ্যে তাঁহাকে চর্ম্মপাদুকা আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গোপনে একজন চর্ম্মকারকে চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণের ভার দিলেন, এবং স্বকীয় কলাবিদ্যার সমস্ত অভিজ্ঞতা তাহাতে প্রয়োগ করিলেন। যথাসময়ে মনিমুক্তাখচিত কোমল-চর্ম্মময় অতিসুন্দর চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মিত হইল। এক মাসের মধ্যেই সুবহদেবীর নিকট তাহা প্রেরিত হইল। সুবহদেবী জুতার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ জুতা-পরাইতে জানেন কি না, ইহা না দেখিলে, তিনি সর্ব্বকলাজ্ঞ, ইহা কিরূপে প্রমাণ হইবে? এই কথা বলায়, শ্রীহর্ষ রাজসভার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। শেষ জীবনে নির্জ্জনে জপতৎপর হইয়া তিনি দেহবিসর্জ্জন করেন। পিতা শ্রীহর্ষের অপমান প্রতিশোধের নিমিত্ত জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীহর্ষ-বিবিধ বিদ্যা অর্জ্জন করেন, এবং চিন্তামণি মন্ত্র জপ করিয়া অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতৃশত্রু উদয়নাচার্য্য বা অজ্ঞাতনামা অপর কোনও পণ্ডিত শ্রীহর্ষের 'পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব যে উচ্চতর ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার পিতৃশত্রুজয়ের প্রতিশোধ। তাঁহার মহাকাব্য নৈষধচরিত জগতে অতুলনীয়। তাঁহার প্রতিভাময় পাণ্ডিত্যে কান্যকুব্জ বা কাশীর রাজসভা আলোকিত হইয়াছিল। কিন্তু কলাভারতী সুবহদেবীর চর্ম্মপাদুকাই নবভারতী শ্রীহর্ষের শেষজীবন অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। হায় রে কর্ম্মফল। তোমার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

উপসংহারে আর একটু কথা জানাইয়া রাখা প্রয়োজন। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' নামক গ্রন্থ বলেন,—'আদিশূর নামক বঙ্গাধিপতি তাঁহার প্রাসাদোপরি গৃধ্র পতিত হওয়ার ভাবী বিঘ্ন নিবারণ জন্য হোম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এ দেশের কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাদৃশ হোম করিতে জানেন না। ইহা শুনিয়া আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন

ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ নামক একজন ব্রাহ্মণ এদেশে আসেন। এই শ্রীহর্ষকেই অনেকে নৈষধচরিত মহাকাব্যের রচয়িতা বলেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা বিচার্য্য। এত বড় একটা কথা শ্রীহর্ষ তাঁহার কাব্যে কেন যোজনা করিলেন না, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নয়? কেহ কেহ রত্নাবলী-নাটিকা ও আগানন্দ নাটক উক্ত শ্রীহর্ষকৃত বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাও অসঙ্গত। এই দুই দৃশ্য-কাব্য কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কৃত। ইহা তত্তদ্‌গ্রন্থেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর অষ্টম তরঙ্গে আছে,—

"সোঽশোষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেবান্তরেষ্বপি॥"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে,—শ্রীহর্ষ অনেক দেশের ভাষা জানিতেন এবং সেই সকল ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বহুবিদ্যার সাগরস্বরূপ ছিলেন; ইঁহার সুখ্যাতি দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্রই ছিল। কিন্তু এই শ্রীহর্ষই নৈষধচরিতের কবি কিনা, তাহা রাজতরঙ্গিণী স্পষ্ট বলেন নাই।

—— * ——

বাঙ্গালীর ভাব ও রুচি।

(শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, চিত্রকলা-বিনোদ, এফ-এন-বি-এ, মহাশয়ের লিখিত।)

নির্ম্মল আমোদ, সৌন্দর্য্যানুভূতি, সঙ্গীত, কাব্য এবং চিত্রাদির উপভোগ, মনুষ্য-জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদ। এই সংসার-সংগ্রামে রত কঠোর-জীবনের পক্ষে তাহা সঞ্জীবনী সুধা। বাঙ্গালী সে সুধারসে বঞ্চিত। সাহিত্য-সম্রাট সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র, এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ * * * কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য।" কিন্তু "এ সকল দোষ স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায় কোনমতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য-ভূস্বামীর গৃহপরিপাট্যের বিষয় তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরাজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র-সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল ঘটিয়াছে। নচেৎ, সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল (এখন যত সস্তায় হয়—বিশেষ দেশীয় শিল্প), সন্নিবেশের পারিপাট্য

নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল (এখন যত সংক্ষেপে চলে)। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য-সম্বন্ধেও বাঙ্গালীর উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য, গীত—সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্য-বিচারশক্তি, সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদন-সুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই। বাঙ্গালীর জীবন সৌন্দর্য্য-বিহীন। তাহার শয়ন, উপবেশন সবই বিসদৃশ। তাহার পোষাক ও ভূষণের কোনও পারিপাট্য নাই। যাহাতে জীবনের চারিদিক সুন্দর ও সুখময় হয়, সে বিষয়ে তাহার কোনও জ্ঞান নাই। কতকগুলো হাব্‌জা গোব্‌জা যা'তা' হইলেই হইল। অনুশীলন-বিরত বাঙ্গালীর শিল্পের প্রতি অনাদরই ইহার কারণ। যে পুত্রের বিবাহে ধনী বহু অর্থব্যয় করিয়া কুরুচি-সম্পন্ন ময়ূরপক্ষী, কাগজের মনুমেণ্ট, কাগজের হাতী, কাগজের ঘোড়া, ছাই ভস্ম ইত্যাদি বাহির করিয়া বিবাহ-যাত্রায় মহাধুম হইল বিবেচনা করিয়া গর্ব্বিত হন। তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখ, দেখিবে তাহা সুরুচিসঙ্গত শিল্পকার্য্য-শূন্য—এমন কি, হয় তো তাঁহার মৃত পিতামাতার চিত্রাদি পর্য্যন্ত তথায় দেখিতে পাইবে না।

জাতির মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্মগ্রহণ ব্যতীত, সুরুচির প্রবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রাণে সকলেই মস্তক অবনত করে। ভিন্নমতাবলম্বীর ভিন্নমত সে দীপ্ত কিরণের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা জাতির ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিলে প্রতিভার সে শক্তির ফল অতি বিলম্বে ফলে, অথবা অকালে ফলিয়া বিনষ্ট হয়। সে সময়কার কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহ ও আগ্রহ ব্যতীত বাঙ্গালা-ভাষায় নূতন স্রোত বহিত কি না, সন্দেহ। ইংরাজি প্রভাব ও স্বদেশীয় ভাব বিদ্যমান না থাকিলে, দ্বিজেন্দ্রলালের বীরত্বব্যঞ্জক পরুষভাবের সঙ্গীত ও নাটকগুলি রচিত হইয়া বোধ হয় সহজে সকলের নিকট আদরপ্রাপ্ত হইত না। কিন্তু উন্নতরুচির সুকুমার কলা-চিত্রাদি জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বাঙ্গালায় উপস্থিত কিনা বলিতে পারি না। তবে থিয়েটারে, মাসিকপত্রে, সচিত্র পুস্তকে এবং বিক্রয়ার্থে প্রকাশিত চিত্রাদি দেখিলে, বাঙ্গালীর রুচির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর থিয়েটারে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় 'গথিক্ থাম্', ভেল্‌ভেট্ ও চুম্‌কি-বসানো চক্‌চকে পোষাক হইলেই বাঙ্গালী দর্শকের আর প্রশংসা ধরে না। থিয়েটারে সীতা, জ্যাকেট পরিয়া বাহির হইলে, বাঙ্গালী দর্শকের নিকট তাহা অসঙ্গত নহে। মদন-ভস্মের মহাদেবের কপালে ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌ব, সুইচ্ টিপিলে জ্বলিয়া উঠিলে, দর্শকের করতালির চোটে অস্থির। থিয়েটারে, অপ্সরাগণ গেঞ্জি-গায়ে অথবা সার্কাসের মেয়েদের মত পোষাকে উপস্থিত হইলে দর্শক অধিক মুগ্ধ হন। সন্ন্যাসী গেরুয়া কাপড়ের উপর গেরুয়া সার্ট পরিধান করিয়া আসিলে, কবির কবিত্ব লোপ হয় কিনা, বাঙ্গালী দর্শকের নিকট তাহা বিবেচ্য। "ভারতীয় কলা পদ্ধতি" অনুযায়ী, বোধ হয় গেরুয়া রংয়ের জাপানি আলখাল্লা পরিধানে বিশেষ কোনও দোষ হইতে পারে না। বশিষ্ঠ এবং গৌতম পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। নব্যমতে তাহা আপত্তিকর নহে। মানুষের বর্ণসঙ্কর দোষ হইতে পারে, কিন্তু পোষাকের ভাগ হইতে পারে না। মানুষের সে দোষটাও "পেটেল বিলের" দ্বারা উঠাইয়া দিতে পারা যায়। সে

কালের ব্রাহ্মণগণ বর্ণসঙ্কর দোষ পরিত্যাগের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত এই মৃতজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন। তাহাকে ভাঙ্গিতে হয় ভাঙ্গ, কিন্তু ভাঙ্গিলে সকল বিষয়েই তোমার এই ক্ষীণস্রোত, পৃথিবীর অন্যান্য প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া বিলুপ্ত হইবে। পুরাতনের সে প্রভুত্ব না মানিবার জন্য তাহা তুমি ভাঙ্গিতে চাও। কিন্তু তোমার গড়িবার সে শক্তি কৈ? সে শক্তি থাকে ভাঙ্গ, আপত্তি নাই। থিয়েটার—জাতীয় রুচির একটা পরিচয়স্থল। সঙ্গীত, কাব্য এবং চিত্র,—এই ত্রিবিধ কলাবিদ্যার সমন্বয়ে তাহা গঠিত। তাহার দ্বারা পুরাতত্ত্বের নানা তথ্য সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। বাঙ্গালীর থিয়েটার কি সে ভাবে তৈয়ারী। তাহার সে রুচি আছে কি? উদ্ভাবনাকারী সৃষ্টি-শক্তিই কাব্য-কলাদির প্রধান উদ্দেশ্য। সুধু পরে কি হ'লো ভাবের ধাঁধা দিয়া লোকের মনকে গ্রন্থের শেষদিকে নিয়ে চলা, বা কথার জালবোনা কাব্য নহে। আপন কবিত্বশক্তির দ্বারা কোনও একটা বিষয়ের পূর্ণবিকাশ সাধন করিবার অক্ষমতাই ইহার মূল কারণ। ইহা অতি নিম্নশ্রেণীর কৌশল—ইহাতে প্রকৃত রসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আজকালকার লেখকদিগের লেখায় কিন্তু ইহাই প্রাণস্বরূপ. চিত্রে টকটকে রংয়ের প্রয়োগ ঠিক এই ভাবের। দূষণীয় টকটকে রংয়ে দর্শকের চোখ ঝল্‌সিয়া দিয়া চিত্রের ভাব উপলব্ধি করা হইতে বঞ্চিত করে। কাব্য-কলা ম্যাজিক্ দেখাইবার জিনিষ নহে। ধাঁধা দেওয়া, বাজী দেখানো বা কুহকদৃষ্টি করা, তাহার উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত রসের উপভোগের জন্যই কাব্য-কলার জন্ম। নাটক, কার্য্যকারণের গতির দ্বারা পরস্পরের মিলন সূচন, চরম-পরিণতি এবং সমাপ্তি প্রভৃতি নিয়মগুলির প্রতি প্রধানভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালীর নাটকে সুধু চীৎকার থাকিলেই জমিয়া যায়। হিন্দু-সতীকে সতীত্ব-কারণ বিপদগ্রস্ত না করিয়া বেশ হয় বাঙ্গালীর নাটক জন্মলাভ করিতে পারে না। ইহা বাদ দিয়া নাটক লেখা, বোধ হয় আধুনিক বাঙ্গালী-নাট্যকারের নিকট অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আর কোনও গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, এ দোষ নাই। বরং তিনি হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহার "মেবার পতনে" স্বদর্পে গাহিয়াছেন—"চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীয়, হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়গর্ব্বে আপ্পাবীর।" তাঁহার এ রুচির সমর্থনে আমরা বলিতে পারি—"None but the brave, None but the brave, None but the brave, deserves the fair."

বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্য নাই বলিলেও চলে। সেই মামুলি আমাদের রাধাকৃষ্ণ ও দেবদেবীর প্রতিমা চিরকাল ধরিয়া একই ছাঁচে ঢালা হইয়া আসিতেছে, কোনও উন্নতি নাই। পুরাতনের গতি ছড়াইয়া নূতন ভাবে এই সকলের উন্নতি করিতে গেলে, দেবভাব নাই বলিয়া বাঙ্গালীর মহা আপত্তি। অদক্ষ শিল্পী অথবা কুমারের হাতে গড়া যাহা আছে, তাহাই কি দেবভাব? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে দেবভাব-প্রকাশের কৌশলটা অতি নিম্নশ্রেণীর বলিতে হইবে। কেন-না, প্রতিমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চোখ-মুখ প্রভৃতি যে রেখায় নির্ম্মিত হয়, তদপেক্ষা অধিক ভাবব্যঞ্জক সুকৌশলময় রেখায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে

বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু সে সকল রেখার সহিত বাঙ্গালী পরিচিত নহে। যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহা বুঝা—শিক্ষা অনুশীলন এবং সময় সাপেক্ষ। বাঙ্গালীর সে শিক্ষায় ইচ্ছা নাই, অনুশীলন এবং সময়েরও অভাব। অতএব, যাহা আছে, তাহাই থাকে। যদি কেহ কিছু নূতন করিতে গেলেন, অমনই শিক্ষা ও অনুশীলন বিরত ব্যক্তিগণ তীব্র সমালোচনা দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া দেন। তাঁহাদিগের কথা—শিল্প বুঝি না, দেবভাব নাই, কিছু হয় নাই। শিল্প না বুঝিয়া কিছু হয় নাই বলিতে পারা, আমাদের নিকট খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। আর প্রকৃত দেবভাব যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে শিল্পী ও প্রকৃত বোদ্ধাদিগেরও মাথা ঘুরিয়া যায়—অন্যের কথা তো সামান্য। দুর্গা-প্রতিমায় সর্ব্বশক্তিময়ী মহাশক্তির ভাব দুর্গাতে, মহাশৌর্য্যময় দেবসেনাপতির ভাব কার্ত্তিকেয়তে, জ্ঞান ও সিদ্ধিদাতৃভাব গণেশেতে; বাণীবিদ্যা-প্রদায়িনীর ভাব সরস্বতীতে এবং ভাগ্যরূপিণী মহৈশ্বর্য্যময়ীর ভাব লক্ষ্মীতে, আছে বলিয়া তো বোধ হয় না।

চিত্রিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে, কৃষ্ণ আড়নয়নে রাধার প্রতি আর রাধাও তদ্রূপভাবে কৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া আছেন,—ইহাই বাঙ্গালীর মনোমুগ্ধকারী দেবভাব। অধিকন্তু, কৃষ্ণের মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের ন্যায় হওয়া চাই। পুরুষের মত হইলেই কৃষ্ণ চুয়াড় হইয়া যাইবেন—দেবভাব হইবে না। কিরীট-কবচধারী বীরবেশে অর্জ্জুনের রথের সারথ্য করিতেছেন এমন শ্রীকৃষ্ণ কেহ অঙ্কিত করিলে, বাঙ্গালীর রুচি বলিবে—কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলাম না, তোমার কৃষ্ণ লইয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি গৃহে বসিয়া থাকি। যত প্রকার রস আছে, তাহার মধ্যে কি চিত্রে, কি কাব্যে, বাঙ্গালী একটি-মাত্র রস—কেবল আদিরসটিই—বুঝেন। এটি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে। অন্য রস বুঝিলেও তাহা তত প্রিয় নহে। বাঙ্গালীর মাসিকপত্রে, সুচিত্র পুস্তকে, এবং অপর কারণে প্রকাশিত বা অঙ্কিত যে সকল চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভাবের অভাব ও শত দোষ থাকে, এবং তাহা হইতে বাঙ্গালীর সুরুচির কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু—"সুখময় মাখা প্রেম গোফ্ নাই মোলায়েম" ভাবের সুধু এক-খানি ঢলঢল লালসাপূর্ণ মুখ কোনও চিত্রে থাকিলেই, রচনা সম্বন্ধীয় বহুদোষ সত্ত্বেও, তাহা সমালোচনার মহাপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। নারী-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যাহা মনোরম, তাহা তাহার দেবীভাব ও পবিত্রতা। পুরুষ সৌন্দর্য্য অন্য প্রকার। শিল্প-সৌন্দর্য্য তাহারও মনোমুগ্ধকারী। কিন্তু ভাবের বিকাশ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের মূল। Michael Angelo র "Lost Soul" নামক চিত্রে—ঘৃণা, ভয়, ক্ষোভ, যন্ত্রণা প্রভৃতি বহুবিধ ভাবের সংমিশ্রণে যে বিকট মুখখানি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী তাহা দর্শন করিলে উহাকে দূরে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু শিল্পী তাঁহার কি অসীম শক্তির পরিচয় এই মুখখানিতে দিয়াছেন! কোথাও একটু ত্রুটি নাই, গোঁজামিল নাই—প্রত্যেক পেশী, শিরা, ত্বকের গতি-সঞ্চালন দ্বারা ভাব উদ্গীর্ণ করিয়া শিল্প-শক্তির দম্ভ প্রকাশ করিতেছে। ইহাও সৌন্দর্য্য-দর্শকের চিত্ত-আলোড়নকারী মহাসৌন্দর্য্য। Michael Angelo যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ শিল্পের লীলাভূমি—বঙ্গদেশ নহে। বাঙ্গালী

অত্যন্ত ভাবপ্রবণ জাতি—খোলে ঘা পড়িতে না পড়িতেই বিহ্বল। হরিশ্চন্দ্রের চিত্র দেখিলেই, কাঁদিয়া আকুল—শিল্পীর কৃতিত্ব তাহাতে নাই, থাকুক। "ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির" দ্বারা তাহার এই ভাবপ্রবণতার পরীক্ষা হইতেছে। এমন একদিন আসিবে, যে দিন ইহার প্রভাবে, শুধু সাদা কাগজ দেখিয়া বাঙ্গালী চিত্রের ভাব উপলব্ধি করিবে। "ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি" সম্বন্ধে আলোচনা আমি আমার অন্য প্রবন্ধে করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে শিল্পীর স্বাধীনতা নাই। শিল্পীর উদ্ভাবনা বা সৃষ্টিকারী শক্তি কখনও সাধারণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে না। সকলে সে শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার না করা ব্যতীত, সে শক্তির পরিচয় পাওয়া এবং তাহা হইতে রস উপলব্ধি করা, দুর্ঘট হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে জানে না। সকলই স্ব স্ব মতপ্রধান, শিল্পী তাহার নিকট তুচ্ছ। কাজেই বাঙ্গালীর শিল্পোন্নতি নাই। যে জন্তক আপন উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা জাতীয় গৌরবের পরিচয় প্রদান করিবে, তাহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করা বাঙ্গালা-দেশে নাই। গুণীর গুণের পূজা নাই; তাহারা হুকুমের চাকর। প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল। রাজসরকার হইতে তাহাদের পেন্‌সন্ বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, তাঁহাদের মান-মর্য্যাদাও ছিল। সে সময়ে তাই শিল্প ও বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পোন্নতি এবং বাণিজ্য দ্বারা বিবিধ জাতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিলে, আমাদের জাতীয় অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়। এ বিষয়ে কেহ কি কখন ভাবিয়া থাকেন? আমাদের শিক্ষা সাধনা অনুশীলন রুচি প্রভৃতি দেখিয়া সত্য সত্যই কবির কথায় বলিতে হয়:—

"সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননি—
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর-নি"

আমরা বাঙ্গালীর যথেষ্ট নিন্দা করিলাম। এ নিন্দার যত ভার সমস্তই আমাদের নিজেদেরই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। সে ভার উন্মোচন করিতে হইলে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে—চাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। আমাদের উন্নতির পথ-প্রদর্শক সে শিক্ষার ভার কে লইবেন? আমরা যখন হতাশ হইয়া দূরশূন্য অনন্তআকাশপানে চাহিয়া দেখি, তখন একটি উজ্জ্বল তারা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আশার আলোক ঢালিয়া দিতেছেন। তিনিই আমাদের ভরসা-স্থল। বাঙ্গালীর নবজীবনের কর্ণধার, ভারত-পূজ্য দেশমান্য, আমাদেরই বঙ্গমাতার অভূতপূর্ব্ব সুসন্তান—স্যর আশুতোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বঙ্গভাষা প্রবর্ত্তিত করিয়া যে মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়াছেন, তাহা আজ নয়, কিন্তু শীঘ্রই সকলে তাহার ফল উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষা যে কি বিশাল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল এবং বাঙ্গালা-ভাষা যে কিরূপ উন্নত-মার্গে চলিল, তাহা বাঙ্গালী একবার ভাবিয়া দেখিলে ভক্তির ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিবে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলে, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে, সর্ব্ববিষয়ে গুণগ্রহণ-ক্ষমতাগুণে অচিরাৎ বঙ্গের কলা-সৌষ্ঠব বহুগুণে ভূষিত হইয়া, বাঙ্গালীর রুচি ও সৌন্দর্য্যানুশীলনের পরিচয় দিবার মত পূর্ণগৌরবময় হইয়া উঠিবে।

—*—

হরিদাস ঠাকুরের জন্মপল্লী।

(২)

[প্রফেসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, এম-আর-এ-এস, মহাশয়ের লিখিত।]

প্রবাদ,—হরিদাস ঠাকুর যবন-পালিত ছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহোদয় নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিলেও, তাঁহার যবন-সংশ্রব-দোষ অস্বীকার করেন নাই। হরিদাস ঠাকুর নিজেই চিরজীবন হীনজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া দীনতার অতিমাত্রা দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মণকুমার মুসলমানের গৃহে থাকিয়া, মুসলমানের অন্নে পালিত হইলে, ব্রাহ্মণ আর থাকেন না, মুসলমান হইয়া যান। ইহাই সামাজিক নিয়ম। সম্ভবতঃ হরিদাসও এইজন্য আপনাকে কখনও মুসলমান ভিন্ন অন্যজাতীয় বলিতেন না। তবে দুঃখের বিষয়, আমাদেরই এই অঞ্চলের দুই এক জন লেখক এই সম্বন্ধে চাক্ষুস-প্রমাণ-সংগ্রহের ভঙ্গি দেখাইয়া, অথচ বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, "হরিদাস হিন্দু নহেন,—মুসলমান, বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া-হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন"—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু যে হরিদাস বাল্য হইতে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, যিনি নামমাহাত্ম্যের প্রথম-প্রবর্ত্তক, তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোথা হইতে পাইলেন? তখনও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় নাই। হরিদাস যে চৈতন্যদেবের ৩৫ বৎসরের বড়। কোন্ ধর্ম্ম-প্রচারক মুসলমান পুত্রকে বৈষ্ণব-চূড়ামণি করিয়াছিলেন? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত হিন্দুর গৃহে হরিনামের-মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য, হরিদাসরূপী এক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুকদেবের মত ধর্ম্মভাব লইয়াই হরিদাস ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনি নিজে পরের নিকট শিক্ষিত বা দীক্ষিত না হইয়া, শত শত লোককে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই নবমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে হরিদাস কিরূপে 'যবনপালিত' হইলেন, তাহাই দেখিব। এ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। একটী গল্প এই,—হরিদাসের পিতার আকস্মিক মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র দুই বৎসর ছিল। তাঁহার সতীলক্ষ্মী মাতা, পতির সহিত সহমৃতা হন। তখন নিরাশ্রয়

---

* "শাশ্বতী" মাসিকপত্রে (১৩১৩) কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত 'যবন হরিদাসের বাস্তুভিটা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। উহার লেখক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু কবিশেখর মহাশয়, কেঁড়াগাছিকে জয়ানন্দের ভাট কলাগাছি বলিতে চান না। তিনি বলেন,—ভাট কলাগাছি গ্রাম, সোণাই নদীর পশ্চিম পারে এবং হাকিমপুরের দক্ষিণে ও তারালী (ম্যাপ Talari) গ্রামের উত্তরে ছিল। সেইস্থানে 'হ'রের ভাঙ্গণ' নামক স্থানই হরিদাসের জন্মস্থান। এ মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। সোণাই-নদী ভাঙ্গিয়া গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া, সেখানে কোনও পরিচয় নাই। কলাগাছিও কখনও পশ্চিম-পারে ছিল না। উহা এখনও পূর্ব্বপারে আছে। তাহার বর্ত্তমান নাম—কেঁড়াগাছি এবং উহা এক্ষণে ছিলকী পরগণার অন্তর্গত হইলেও পূর্ব্বে বুড়নের মধ্যে ছিল, ইহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

রোরুদ্যমান বালকের রক্ষার্থ, জনৈক মুসলমান কাজি তাঁহাকে লইয়া নিজ পুত্রের মত প্রতিপালন করেন।' এই গল্প সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। হরিদাসের জ্ঞাতি চক্রবর্ত্তিগণ ও প্রতিবেশী ভট্টাচার্য্যগণ তদবধি ১৭।১৮ পুরুষ ধরিয়া কলাগাছিতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও মনোহর চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন। মনোহরের নন্দকিশোর বিগ্রহ এখন হইতে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও চক্রবর্ত্তী-বংশীয়দিগের সেবাধীন ছিলেন এবং তাঁহার দেবোত্তর-সম্পত্তি চক্রবর্ত্তীগণই ভোগদখল করিয়াছেন। এমন সম্পত্তিশালী এবং প্রতিপত্তিশালী মনোহর চক্রবর্ত্তীর একমাত্র শিশুপুত্রকে স্নেহের কোলে আশ্রয় দিবার কেহ কি সেই বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে ছিলেন না? পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তীপাড়ায় লোকসংখ্যা যথেষ্ট ছিল। অনেক বাড়ী নির্ব্বংশ হইয়াছে। বহুসংখ্যক ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। সহমৃতা সতীর দিব্যকান্তি শিশুকে রক্ষা করিতে হিন্দুর মধ্যে কেহ অগ্রসর হইবেন না, অপর পার হইতে একজন মুসলমান আসিয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দে লইয়া গেল;—ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। নিশ্চয়ই হিন্দু মুসলমানের বিবাদ-বিসম্বাদ ইহার মূলীভূত কারণ ছিল। যে যুগে হরিদাসের জন্ম, তখন হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার কতক আভাষ মৎপ্রণীত "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" দিয়াছি। * "পীরালী" অপবাদ-গ্রস্ত হিন্দু-মুসলমানের উৎপত্তিই এই বিবাদের ফল। এখনও খুলনা পরগণার নানা স্থানে 'পীরালী' মুসলমানগণের বাস রহিয়াছে।

হরিদাসের স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে স্থানীয় ও বংশানুক্রমিক প্রবাদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত-বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পুনরায় তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হাকিমপুরের মুসলমানদিগের সহিত কেঁড়াগাছির চৌধুরীদিগের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বহুকাল হইতে চলিয়াছিল। বহু বার চৌধুরীরা 'লুটপাট' করিয়া মুসলমানদিগকে উদ্বাস্ত করিত এবং সুবিধা পাইলে মুসলমানেরাও চৌধুরীদিগের বাটীতে পড়িয়া লুটপাট ও বিস্তর ক্ষতি করিত। সেই বিবাদ-মূলে লুটপাটের সময় অসহায় পাইয়া মাতা ও পিতামহীর সহিত হরিদাস অপহৃত হন। প্রাণনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতামহীর পিসী ও পিতামহী আর ২।১টি স্ত্রী এবং ২।৪টি বালক শিশুও অপহৃত হয়। চৌধুরীরা সে সময়ে কোনরূপ বাধা দিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কিছু পরে লোকবল সংগ্রহ করিয়া সকলকেই উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল হরিদাসকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। হরিদাস দিব্যকান্তি শিশু ছিল। একটী বৃদ্ধ মুসলমান তাহাকে লইয়া হাকিমপুরের উত্তরপাড়ায় রাখে। কিছুদিন পরে বর্ষাকালে স্বর্ণ বা সোণাই নদীর পশ্চিম পাড় ভাঙ্গিতে থাকে এবং সেই ভাঙ্গন এত অধিক হয় যে, যে বাড়ীতে হরিদাসকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে বাড়ীটা ভাঙ্গনের মধ্যে পড়ে। সেখানে দহ পড়িয়া গিয়াছিল। সে দহ এখনও আছে। বৃদ্ধ মুসলমানটী আশ্রয়হীন হইয়া, হরিদাসকে লইয়া, তারালী গ্রামের উত্তরপাড়ায় বা হাকিমপুরের দক্ষিণপাড়ায় † আসিয়া বাস

* "যশোহর খুলনার ইতিহাস", ১ম খণ্ড, ৩৬১পৃঃ।

† কবিশেখর মহাশয় যে ইরের ভাঙ্গনের কথা বলেন, তাহা এইস্থানে অবস্থিত। উহা সেই প্রতিপালকের বাড়ী।

করে। হরিদাসকে কখনও সেই মুসলমান তাহাদের ভাত খাওয়াইত না; দুগ্ধে চাউল পক্ক করিয়া খাইতে দিত। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই সমস্ত জাগ্রত অবস্থায় হরিনাম করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া কাটাইত। হরিদাসের সন্ন্যাস অবলম্বনের বহুকাল পরে (দশ হইতে পনর বৎসর) হরিদাসের মাতা, হরিদাসের পিতামহীকে লইয়া কাশীবাস করিতে যাইবার সময়, ঐ ভিটাবাড়ী লাহিড়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া কাশী যান। লাহিড়ীদিগের পর আমার পিতামহ উক্ত ভিট্টা খরিদ করেন। হরিদাসের পিতা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চতুষ্পাঠী করিয়া পড়াইবার জন্য ঐ ভিট্টা দানে পান এবং রামপ্রাণ চক্রবর্ত্তীর পিতামহের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, ঐ ভিট্টায় আসিয়া বাস্ করেন। ঐ ভিট্টায় হরিদাসের জন্ম হয়। এ সমস্ত দলিল আমার নিকট আছে।"

প্রবাদ ও দলিলাদির উক্তির প্রমাণে যতটা সত্য নির্ণয় করা যায়, বেদান্ত-বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল দলিল দেখিবার সুযোগ আমার না ঘটিলেও তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি। পত্রোক্ত গল্পের সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও হরিদাস যে হিন্দু-মুসলমানের বিপদের জন্য অপহৃত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান-গৃহে পালিত হইয়াছিলেন, তাহা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি। তিনি জন্মান্তর-সংস্কার-বশে যে হরিনাম গাহিতেন, হরিকথা বলিতেন, এবং উহা যে মুসলমানদিগের প্রীতিকর হইত না, তাহা সত্য কথা। সম্ভবতঃ মুসলমান-পরিবারে বিবাহের উদ্যোগ হইলেই তিনি পলায়ন করিয়া সুদূর বেণাপোলের জঙ্গলে আশ্রয় লন ও পরে ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়েন। হরিদাসের পরবর্ত্তী সময়ের ভক্তজীবন দিনের মত আলোকিত।

হরিদাসের জীবন আদ্যোপান্ত ভক্তের জীবন, তাহাতে ফুটিয়াছে মাত্র এক শক্তি অর্থাৎ পরমা-ভক্তি। তাঁহার জীবনের যে অংশ এই ভাবের প্রতিরোধী, উহাই বাল্যজীবন এবং উহাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভাল করিয়া চিত্রিত ছবির রং ফলাইবার জন্যই চিত্রফলকের রঙ কল্পিত হয়; কিন্তু চিত্রই যদি ভাস্কর-তুল্য সমুজ্জ্বল হয়; তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী চিত্র পটের অন্য রঙ থাকে না, সবই ঔজ্জ্বল্যময় হইয়া পড়ে। হরিদাসের পরজীবন ভক্তিরসে এমনি সমুজ্জ্বল হইয়াছিল যে, কেহ তাঁহার প্রচ্ছন্ন বাল্যজীবনের সংবাদ লয় নাই। এখনও সে সংবাদ লইবার প্রয়োজন নাই। পরাভক্তির প্রচ্ছদপটে সে জীবন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সে আস্তরণ উন্মোচনের প্রয়াস ঐতিহাসিকের বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তির নিকট তর্কের প্রসার নাই।—

আর একটী কথা বলিলেই আমার শুষ্ক-তর্ক শেষ হয়। বেণাপোলে লব্ধহীরা হরিদাস-

---

* হরিদাসের মুসলমান-প্রতিপালকের নাম, কেহ বলিয়াছেন, জাহেরউদ্দিন এবং কেহ বলেন—হরিবুল্যা বা হবুল্যা কাজি। ইহা এক্ষণে ঠিকভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কাজি বংশে একজন হরিবুল্যা কাজি ছিলেন, তাহা সত্য। কাজিরাই হাকিমপুরের আদিম বাসিন্দা। সে বংশে এখন একজনমাত্র জীবিত আছেন। তাঁহার নাম—খয়রাৎ আলি, বয়স ৩০ বৎসর। তিনি এখনও বিবি ফতেমার নামীয় লাখেরাজ (এখন বাজেয়াপ্ত তালুক) ১৪০/০ বিঘা জমি ভোগ করিতেছেন। বিবি ফতেমা—হবিবুল্যার বংশজাত।

ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যখন তাহার অপকর্ম্মার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, তখন সে সাধারণের উপকারার্থ কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। উহা এখনও এই প্রদেশে "হীরার জাঙ্গাল" বা হীরানটির জাঙ্গাল বলিয়া খ্যাত। উহার একটি জাঙ্গাল সম্ভবতঃ হীরার জন্মস্থান হইতে পুরুষোত্তমের দিকে গিয়াছিল, অন্য একটি সে বেণাপোল হইতে গুরুদেব হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ রাস্তা নানা গ্রামের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল। এখনও কুশখালি হইতে কলাগাছি, হাকিমপুর দিয়া সারাপোল পর্য্যন্ত এবং সাপুর, খালসি, হেলাতলা, দিগী ও প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া হীরানটীর জাঙ্গালের অস্তিত্ব দেখা যায়। অনেকস্থলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এই রাস্তা আধুনিক সরকারী রাস্তার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মোট কথা, হীরার হৃদয়ের সহিত তাহার গুরু-গৃহের সম্বন্ধের চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

বৈষ্ণব-ভক্তগণের মধ্যে কেহ হরিদাস ঠাকুরের জন্মপাট দেখিবার জন্য প্রয়াসী হইলে, এই দুই পথে সে স্থানে যাইতে পারেন। এক পথ—ই, বি, রেলের ঝিকরগাছা ষ্টেসন হইতে ষ্টীমারে সরসকাটি, তথা হইতে পদব্রজে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায় ৫-মাইল দূরে কলারোয়া এবং কলারোয়া হইতে পুনরায় জাল রাস্তা দিয়া ৫ মাইল দূরে সোণাবাড়িয়া ও তথা হইতে দক্ষিণ-মুখে ৫।৬ মাইল গেলে কেরাগাছি পৌছান যায়। উহার অপর পারেই হাকিমপুর। দ্বিতীয় পথ—উক্ত রেলের গোবরভাঙ্গা ষ্টেসনে নামিয়া নৌকাপথে যমুনা নদী দিয়া ১১ মাইল দূরে, খাড়াপোল এবং তথা হইতে ৭ মাইল দূরে হাকিমপুর। সেখানে সোণাই নদী পার হইলেই অপর পারে কেঁরাগাছি বা কলাগাছি। আশা করি, অচিরে হরিদাস ঠাকুরের জন্মপল্লীতে ৺মনোহর চক্রবর্ত্তীর ভিট্টায় তাঁহার ভক্ত-পুত্রের জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাণের মধ্যে কেমন ঝঙ্কার আসিতেছে—"আসিবে, সে দিন আসিবে"

নর-নারায়ণ।

[শ্রীমতী লীলাদেবী বিরচিত]।

ধন্য হে তুমি নরনারায়ণ ধন্য হে তুমি ধনঞ্জয়।
ধন্য করিলে ধরণীর ধূলি, গড়িলে স্বর্গ অবনীজয়।
অক্ষয় তূণ গাণ্ডীব গুণে জিনিলে ভুবন ত্রিদশপুর
হে চিরবিজয়ী বীর্য্যেতে তব বশীভূত যত দানবশূর
নিখিলের নাথ অখিলের পতি সারথী তোমার, হে অর্জ্জুন।
ঘোষিছে তোমার জয়ের মহিমা সার্থক তব ধনুক তূণ।
ধন্য হে তুমি, হে মহা-প্রেমিক, ধন্য তোমার প্রেমের ডোর;—
যা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে শ্রীহরি চিরটী দিবস রজনী ভোর।
ধন্য হে দাতা, তোমার দয়ায় লভিল জগৎ গীতার গান,
ক্ষুধিত তৃষিত মর্ত্ত্যের তরে সুধার উৎস অমৃত-দান।
শক্তি প্রেমের সমন্বয়ে অপূর্ব্ব তুমি, হে অর্জ্জুন।
হে কিরীটি, তব অতুল কীর্ত্তি সার্থক তব ধনুক-তূণ।

রাজা গোপীচাঁদ।

[শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত।]

"হাড়ি সিদ্ধা বলে জয়বিধি কর্ম্মের বুঝ ফল।
এইবারে বুঝে নেও মুই রাজার মনের বল॥
যদ্যপি না দেখে রাজার ছাইলা রাইয়তের ভিতি ফিরিয়া।
সুখে সুখে নিগাম বেটাক পন্থ হাটেয়া॥
যদি দেখে রাজার ছাইলা রাইয়তের ভিতি ফিরিয়া।
ইহার চাইতে অধিক দুক্ষ দেইম বৈদেশক নিগিয়া॥
মুখের অমৃত ফেলাইতে মহারাজ প্রজাগণক দেখিল।
পন্থে বসিয়া মহারাজ কান্দিতে লাগিল॥
গুরু যৎতুকুন যাও মুই উদাশিন হইয়া।
তোমরা সকল আশিল মোর পাছত সাজিয়া॥
আর না যাওঁ গুরুবাপ সন্ন্যাসক নাগিয়া।
নেও নেও তোমার ডোর আর কপিন ফিরিয়া॥"

রাজা গোপীচাঁদ পথে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যমনস্ক ভাবে—

"পায়ের গোড়া দিয়া পাও চুলকাইল। কুঞ্জি-বিন্নার খড়কা দিয়া দন্ত খিলান করিল।
সুবুদ্ধি ছিল রাজার কুবুদ্ধি লাগাল পাইল। বার বচ্ছরের দুক্ষ রাজার কপালে বসিল।"

এই অলক্ষ্মী-কার্য্যে লক্ষ্মী গোপীচাঁদকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। রাজা গোপীচাঁদ তখনই শ্রীভ্রষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। হাড়িসিদ্ধাও, কার্য্য উদ্ধার হইল ভাবিয়া, উজির নাজির প্রভৃতি আমাত্যগণ ও প্রজাবর্গকে রাজার অনুসরণ করিতে না দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

"দুঃখ মনে রাইত প্রজা ফিরিয়া ঘরে গেল। বৈদেশ সহর বলি সাধু পান্থ মেলা দিল॥
কতক দূর যায় ব্রহ্মচারী কতক পন্থ পায়। আর কতক দূর গেলে তিন ক্রোশের রাস্তা যায়॥"

রাজধানী হইতে বাহির হইয়া 'ময়নামতির কোটে' অর্থাৎ ময়নামতির বাসভবনে উপস্থিত হইয়া হাড়িসিদ্ধা গোপীচাঁদকে জননীর নিকট প্রথম ভিক্ষা লইবার আদেশ করিলেন।

"এক আজ্ঞা না পায়া রাজা দোন আজ্ঞা পাইল। জননীর মহলক যাইয়া মা মা বলি খাড়া হইল॥
ভিক্ষা ভিক্ষা বলি রাজা চেঁচাইতে লাগিল। এক দরজা দুই দরজা তিন দরজায় গেল॥
চারি দরজায় থাকিয়া ময়না ছাইলাক দেখিল।"

আহার করিয়া ময়নামতী পুত্রকে ভিক্ষা লইতে বলায়, রাজা বলিলেন,—

"মা জননী আমার গুরু আছে পান্থে বসিয়া,
কেমন করিয়া অন্ন খাব তোমার মহলে বসিয়া।"

গোপীচাঁদ জননীর অনুরোধ ছাড়িতে পারিলেন না। শীঘ্র করিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন—

"হাঁসিল চিতে বুড়ি ময়না মন্দির ঘরত গেল। এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিল।
সুবর্ণের থালিত অন্ন পারশ করিয়া। বলে-আইস আইস সোণার চাঁদ অন্ন খাও গিয়া॥"

গোপীচাঁদ জননীর সহিত ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়া "সুবর্ণের থালিতে অন্ন দেখি রাজা কাঁদিতে লাগিল"। জননী পুত্রকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া অন্ন আহার করার জন্য পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিলে রাজা গোপীচাঁদ বলিতে লাগিলেন ঃ—

"জননী, যখন আছিলাম ধর্ম্মী রাজা জগতের ঈশ্বর।
সুবর্ণের থালির অন্ন আমি খাইয়াছি বিস্তর॥
এখন হইলাম আমি কোড়াকের ভিখারী।
সুবর্ণের থালির অন্ন আমি খাই মা কি করি॥"

গোপীচাঁদ সুবর্ণের পাত্রের অন্ন, অলাবু পাত্রে ও সুবর্ণ ভৃঙ্গারের সুবাসিত জল, শুষ্ক তুম্বীফল-নির্ম্মিত কমণ্ডলুতে গ্রহণ করিয়া ভোজনাদি শেষ করিলেন। জননীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ময়নামতী,—

"অমূল্য হীরারত্ন মাণিকরত্ন রজতকাঞ্চন, হরিদ্রা মাখিয়া কোচে নিলে যত ধন।
পুত্রধনের কাছে আমি কান্দিয়া কাটিয়া, পুত্রের ঝোলায় ভিক্ষা দিলেন ঢালিয়া॥"

ময়নামতী ভিক্ষা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—

"বৈদেশ সহর যাদু সাবধানে যাইও, গুরুদেবের সঙ্গে যাদু গল্প না করিও।
পরস্ত্রী দেখিয়া বেটা হাস্য না করিও। পরনিন্দা যাদু মোর মুখে না আনিও।
ব্রাহ্মণ বৈষ্টম দেখি না করিও হেলা। গৌবমুণ্ড হয়া প্রণাম জানেয়া পায়ের নিও ধূলা॥"

গোপীচাঁদ জননীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, দ্বিতীয় ভিক্ষা অদুনা পদুনা রাণীর নিকট লইতে আদেশ করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী পুনরায় তিন ক্রোশ পথ চলিয়া, নিজ রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, রাণীদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, অদুনা-পদুনা রাণী রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজার ভিখারী-বেশ দর্শন করিয়া, তাঁহারা হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উভয় ভগ্নী রাজার পদতলে পতিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা খেতুয়াকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"কি আমার প্রমাদ ঘটিল মহলে আসিয়া। দেখ যৎতুকুন যাঁও মুই সন্নাসী হইয়া॥
তোমরা সকল বধ হইল আমার চরণে পড়িয়া। আর যাব না গুরুর সহিত সন্ন্যাসী হইয়া॥"

হাড়িসিদ্ধা যোগবলে জানিতে পারিয়া, রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, অস্ত্রাঘাতে দুই রাণীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সম্ভবতঃ একটু রসিকতা করার জন্য অদুনার মস্তক পদুনার স্কন্ধে এবং পদুনার মস্তক অদুনার স্কন্ধে সংযোগ করিয়া দুইজনকে দুই পদাঘাত করিলে, উভয় রাণী প্রাণ পাইয়া হাড়িসিদ্ধার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হাড়িসিদ্ধা উভয় রাণীকে প্রবোধ দিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ, নবীন সন্নাসীকে লইয়া, যাত্রা করিলেন।

হাড়িসিদ্ধা গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোরতা শিক্ষা দিবার মানসে, যোগবলে নানা প্রকার কণ্টকযুক্ত জমিতে তপ্ত বালুকাময় বর্ত্ম সৃষ্টি করিয়া নবীন সন্নাসী গোপীচাঁদকে

লইয়া যাইতে লাগিলেন। গোপীচাঁদ পথের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, গুরুদেবের চরণতলে পতিত হইলে, গুরুদেবের দয়ার সঞ্চার হইল। হাড়িসিদ্ধা বলিতে লাগিলেন,—

"ইহাতে পাইলে দুক্ষ বেটা পায় ফুটিয়া কাঁটা।
ইহার চাইতে অধিক দুক্ষ যার ঘরে গাভুর বেটা॥
এমত দুখিয়ার দুক্ষ গরম বালাত হাঁটে।
ইহার চাইতে অধিক দুক্ষ যাঁর পরার বাড়িত থাটে।
ইহাতে পাইলু দুক্ষ পথে ফুটিয়া হাঁড়ি।
ইহার চাইতে অধিক দুক্ষ কাঞ্চাচুলের আঁড়ি॥" ইত্যাদি।

গোপীচাঁদ পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে দেখিয়া, নিদ্রাদেবীকে আকর্ষণ করিয়া, গোপীচাঁদকে আট দিন পর্য্যন্ত ঘুম পাড়াইবার জন্য তিনি আদেশ করিলেন। নিদ্রাদেবী তখনি হুকুম তামিল করিলেন।

"এক রাজ্জা না পায়া নিন্দালি বেটী দোন রাজ্জা পাইল।
আট দিনকার নিন রাজার চক্ষুত ঢালি দিল।"

গোপীচাঁদ বৃক্ষতলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। গোপীচাঁদের সুখে নিদ্রা হওয়ার জন্য হাড়িসিদ্ধা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্ররাজকে স্মরণ করিলেন।

"তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রমুনি সাজিয়া আসিল। হেটমুণ্ড হয়া ইন্দ্র প্রণাম জানাইল॥

ইন্দ্ররাজ উপস্থিত হইলে হাড়িসিদ্ধা তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন,—

"কিবা কর ইন্দ্রমুনি নিচন্তে বসিয়া, হাঁড়িয়া কোণে হীমানি বাতাস দেও ছাড়িয়া।
আট দিন পর্য্যন্ত নিন্দ্রা পাকক রাজার ছাইলা বৃক্ষতলে সুতিয়া।"

তখনি আজ্ঞা পালন হইল। বায়ুকোণে মেঘ লাগিয়া ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবী মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মন্দ মন্দ বাতাস বহিতে লাগিল। হুকুম তামিল করিয়া, ইন্দ্রমুনি প্রস্থান করিল। অতঃপর হাড়িসিদ্ধা গোপীচাঁদের সুখে গমনের জন্য সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ-বাসনায়, গোদা যমকে স্মরণ করিলেন। অমনি যমপুরীতে সাড়া পড়িয়া গেল।

"সাজ সাজ বলিয়া যম সাজিতে লাগিল। ছোট বড় যত যম সকলি সাজিল॥
যম সাজে একৈনা, যার মুখ তিন কোণা, অকিনা যমের দফাদার।
যম সাজে আফাল, যার অষ্ট কপাল, ঐটা সাজে যমের সর্দ্দার॥
যম সাজে বিদ্ধমান, হস্তি হেন যার কাণ, ঐটা সাজে যমের দেওয়ান।
চেঙ্গেরা চেঙ্গেরা যম সাজে জুয়ান যমের ভাই। বিদ্ধমান যম সাজে কত লেখা-যোখা নাই॥
চেঙ্গেরা চেঙ্গেরা যম সাজে গলায় বসের কাঁঠি। যুয়ান যুয়ান যম সাজে মাথায় সোণার টুপী।
বিদ্ধমান যম সাজে হাতে কাষ্ঠা তোলা। আবাল যম খাড়া হইতে মেদ্যত ঢোকা লাগিল॥
তার পচ্চাৎ সাজে যম আবাল যমের জেঠ। আসমানের চাইতে যমটা চার আঙ্গুল খাট॥
কতক দূর যায় যম কতক পান্থ পায়। আর কতক দূর গেলে হাঁড়িসিদ্ধার নাগাল পায়।
হাঁড়িসিদ্ধার নিকট যায় যম খাড়া হইল। হেটমুণ্ড হয়া যম প্রণাম জানাইল॥

যম, দূতগণ ও পাত্রমিত্র সহ, হাড়িসিদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলে, হাড়িসিদ্ধা তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন ঃ—

"কিবা কর যম বেটা নিচন্তে বসিয়া। এইটে হইতে খোলা হাটির বন্দর দেও সাল্লি বাঁধিয় ॥"

হাড়িসিদ্ধা যে খোলাহাটির বন্দর পর্য্যন্ত রাস্তা বাঁধার আদেশ করিলেন, ঐ খোলাহাটি পার্ব্বতীপুর রেল ষ্টেশনের পরেই রংপুর লাইনের খোলাহাটি রেল-ষ্টেশন। খোলাহাটি ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল উত্তরে করতোয়া নদী। বৎসর বৎসর বারুণী স্নানের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৪।২০ দিন পর্য্যন্ত তথায় এক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। বারুণী স্নানের দিন অসংখ্য যাত্রী স্নান উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া স্নান ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিয়া থাকে। ঐ মেলার মালিক রাণী রাসমণির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিমহোদয়গণ। তাঁহারা ঐ মেলায় প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা আয় করিয়া থাকেন। কিন্তু করতোয়া নদীতে জল না থাকায় যাত্রীরা কাদায় মাথা পুঁজিয়া তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। এক বৎসরকার আয় যদি তাঁহারা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে স্নানের বা মেলার যায়গায় নদীর পঙ্কোদ্ধার হইয়া যাত্রীদিগের স্নান ও পানীয় জলের সুবিধা হইতে পারে। যাহা হউক, ঐ করতোয়া নদীর নিকটে উত্তর দিকে হীরা-নটীর বাটী ছিল। ১২ কড়া কড়ির বিনিময়ে ১২ বৎসরের জন্য হাড়িসিদ্ধা গোপীচাঁদকে হীরা-নটীর বাটীতে বন্ধক রাখিয়াছিলেন। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে হীরা নটীর বাটীর প্রাঙ্গণ কাচঢালা ছিল। এখন বাটীর ভগ্নাবশেষের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে করতোয়া নদী-তীরে অদ্যাপি রাজা গোপীচাঁদের ঘাট বর্ত্তমান আছে। ঐ ঘাটে প্রত্যহ ১২ বার ভার করিয়া জল লইয়া গোপীচাঁদ হীরা-নটীকে প্রদান করিতেন। যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করা হইবে।

বাংলা শব্দার্থতত্ত্ব।

[শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি-এ মহাশয়ের লিখিত]

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ভাষার বাহিরের দিকটা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কোন্ ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের নিয়ম কিরূপ, শব্দ-বিন্যাস, স্বরনির্দ্দেশে কিরূপ হইবে, কেবল এই সকল বিষয়ই—তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু যে জিনিসটা বস্তুতঃ ভাষার প্রাণ, শব্দের সেই অর্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে। এই বিষয়টি যে প্রয়োজনীয় নহে, এমন নয়, কিম্বা ইহা বড় বড় মাথার খোরাক যোগাইবার উপযুক্ত নয়, এমনও নহে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক, বিষয়টি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। তাহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।

মাত্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ, প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মিশেল্ ব্রেয়াল (Michel Breal) যথারীতি অবতারণা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তিনি Essai de Semantique নামক পুস্তকে তাহার বিষয় লেখেন। এই পুস্তকের

ইংরাজী অনুবাদ মিসেস হেন্‌রি কাষ্ট (Mrs. Henry Cust) কর্ত্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর ব্রেয়াল, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার গবেষণা-সমূহ ফরাসিদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিষয়টি কিরূপ কঠিন এবং গুরুতর, তাহা অধ্যাপক ব্রেয়ালের এই কথা কয়টি হইতে বুঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—"বার বার বিষয়ের কঠিনত্বের দ্বারা প্রতিহত হইয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আর এ দিকে হাত দিব না। যত বার কাজটি আরম্ভ করিয়াছি, তত বারই আমাকে ইহা ছাড়িতে হইয়াছে। যাহা হউক, অবশেষে পুস্তকখানি প্রকাশ করাই সাব্যস্ত করিলাম।" ব্রেয়াল যে সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রধানতঃ মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত। কাজেই তিনি যে সমস্ত ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার বাহিরেও এই নিয়ম-গুলি সমানভাবে খাটে। তিনি ভূমিকায় বলিতেছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য—আপাততঃ কেবল একটা চলনসই 'প্লান' খাড়া করা। কারণ, শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে এখন অনুসন্ধান কিছুই হয় নাই, যথারীতি অনুসন্ধান করিতে গেলে দুই চারি পুরুষ ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদগণকে পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

শব্দকোষ-সঙ্কলন-বিদ্যাতেই শব্দার্থতত্ত্বের আরম্ভ। ১৮২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এবং ১৮৩৯ অব্দে প্রকাশিত লাটিন ভাষা-সম্বন্ধে রাইসিগ (K. Reisig) যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় রাইসিগ এ বিষয়ে আর বেশী কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই ছাত্র আগাথন বেনারি (Agathon Benary, 1834) শব্দার্থতত্ত্বকে কোষ-সঙ্কলন-বিদ্যার গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া ইহাকে এক বৃহত্তর এবং গভীরতর অর্থ দেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম শব্দের বাহিরের আকার এবং ভিতরের অর্থের দিকের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখান। শুধু শব্দ নয়, এমন কি, শব্দের প্রত্যয়াদিও অর্থের দিক হইতে আলোচনার তিনিই সূত্রপাত করেন।

অধ্যাপক ব্রেয়াল যখন তাঁহার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতও এদিকে কিছু কিছু কাজ করিতেছিলেন। ব্রেয়ালের পরেই সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ-পণ্ডিত পাউলের (Paul) নাম করিতে হয়। ভাষার ইতিহাসের তথ্য-বিষয়ক তাঁহার Principien der Sprachgeschichte নামক পুস্তক, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রে সে গ্রন্থ এক যুগান্তর আনিয়া দেয়। এই পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ে, অধ্যাপক পাউল শব্দার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি-সুচিন্তিত কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। ষ্ট্রঙ্ লোজমান এবং হুইলার (Strong, Logeman & Wheeler) একযোগে পাউলের এই পুস্তকের একটি ইংরাজী সংস্করণ প্রস্তুত করেন।

লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পোষ্টগেট (Postgate), ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, "ট্রিনিটি" কলেজের 'ফেলো' পদ-গ্রহণ-মানসে শব্দার্থতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হন।

কিন্তু উপযুক্ত উপাদানের অভাবে শীঘ্রই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। পরে তিনি এই বিষয়টি লইয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন।

আজকালকার ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রুগমান (Brugmaun) এবং বেশ্‌টেল্ ও হিয়ারডেগেন (Beckitel and Heerdegen) ও ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিৎ সুইট (Sweet) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও শব্দার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত, এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণও, অনেকে শুনেন নাই। অবশ্য যে হিন্দুজাতির ব্যাকরণ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, এ বিষয়টি যে পুরাকালে তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে। যাস্ক (খৃঃ পূঃ ৫ম-শতাব্দী) তাঁহার নিরুক্তের মধ্যে, যেখানে নিম্নলিখিত ভাবে তর্ক করিতেছেন সেখানে, আমরা শব্দার্থতত্ত্বের মূল-কথা সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ পাই। তিনি বলিতেছেন—"ঘাসকে তৃণ বলা হয়, কেন-না, ইহাতে খোঁচা লাগে। সেইজন্যই এই অর্থযুক্ত তৃ ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে যে জিনিসেই খোঁচা লাগে, তাহাকেই এই নামটি দেওয়া হয় না কেন—যেমন ছুঁচ কিম্বা শর্শা। আবার স্তম্ভকে 'স্থাণু' বলা হয়। কেন-না, ইহা স্থির অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে। সেইজন্যই ইহা স্থা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে যাহাই কোনও জিনিসকে খাড়া করিয়া রাখে, তাহকেই স্থাণু বলা হয় না কেন?"

পাণিনিও (খৃঃ পূঃ ৩৫০) যে শব্দার্থতত্ত্ববিষয়ে কিছু ভাবেন নাই, এমন নহে। প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৫৬ সূত্রের নীচে তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ব্যাকরণে অর্থতত্ত্বের বিষয় কিছু আলোচনা না করিয়া, শুধুই শব্দ বিশ্লেষণ করা হইবে। কারণ, ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা অর্থ নির্দ্ধারিত হয় না। দেশে যেরূপ নিয়ম চলিত আছে, সেইরূপই হয়। যেমন একজন অজমূর্খ, যে জীবনে ব্যাকরণ কি জিনিষ—তাহাই জানে না, তাহাকে রাজপুরুষের কথা বলিলে, সরকারী কর্ম্মচারীই বুঝিবে, স্বয়ং রাজাকে নয়।

মীমাংসা ও ন্যায় দর্শনের মধ্যে এবং বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত ব্যাকরণে টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতির ভিতর, এখানে সেখানে মাঝে মাঝে, শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার-পুস্তক-সমূহেও শব্দের অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কিন্তু এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত, শব্দার্থতত্ত্ববিষয়ে কোনও নিয়মিত আলোচনা আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পুণার অধ্যাপক গুণে (Dr P D. Gune) তাঁহার নবপ্রকাশিত তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের পুস্তকে (Imtroduction to Comparative Philology, 1918) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার তারাপুরওয়ালা (Dr J. J S. Taraporewala) তাঁহার লেক্‌চার-নোটে (1917-18) শব্দার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতে গিয়া, সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছেন।

বাঙ্গালাভাষার এই ধরণের কাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। শব্দার্থ-বিজ্ঞান যে তুলনামূলক

ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেই ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপনাই মাত্র সেদিন ভারতের মধ্যে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, ডিগ্রির জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের দিকটাই (Phonitics) সুধিগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছে। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি আর এস, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আশা করা যায়, এখন হইতে এই বিষয়ে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। সাজসরঞ্জাম এবং মালমশলার অভাব নাই, যাহা কিছু অভাব—লোকের। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকজনের ভাষাসংক্রান্ত পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি হইতে অনেক মালমশলা যোগাড় হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও ঐ দিকে হাত দেয়, এমন লোক কৈ? শব্দার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র অসীম বলিলেই হয়। কিন্তু বোধ হয়, সমগ্র জগতে ২০ জনের বেশী পণ্ডিত এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

"আমাদের এই বিজ্ঞানটির এখন নিতান্ত শিশু-অবস্থা। ইহার জন্য প্রধান কাজ এখন মালমশলা সংগ্রহ করা।" অধ্যাপক পোষ্টগেট এই কথা কয়টি বলিয়া আবার বলিতেছেন—"এই বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যাহা জানে, তাহাকে তাহা লইয়াই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ, তাহার মাতৃভাষা হইতেই তাহাকে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। এই বিজ্ঞানের এমন অবস্থা নয় যে, ইহা নিতান্ত নগণ্য কর্ম্মীর যৎসামান্য চেষ্টাও অবহেলা করিতে পারে।" এই ভরসাতেই আমার মত সামান্য ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছে।

এই বিজ্ঞানের প্রথম অভাব—একটি উপযুক্ত পরিভাষার সঙ্কলন। গ্রীসের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রোট সাহেবের ভ্রাতা অধ্যাপক গ্রোট (Grote) একটি পরিভাষা তৈয়ারি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Journal of Philology নামক ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় প্রথম কয়েক ভাগে, তাঁহার মৃত্যুর পর, কতকগুলি প্রবন্ধে এই পরিভাষা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার নামকরণ প্রণালী তত সুবিধাজনক না হওয়ায়, সাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। এমন কি, এই বিজ্ঞানের নামটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব করিয়াছেন। গ্রীক-ভাষায় rhema বলিয়া একটি কথা আছে। তাহার মানে—"যাহা কথিত হইয়াছে ('a thing said')"। ইহা হইতে অধ্যাপক পোষ্টগেট প্রস্তাব করেন—Rhematology নাম। অধ্যাপক ব্রেয়াল গ্রীক semains (to signify) হইতে নাম করিয়াছেন—Semantics Phonetics যেমন ধ্বনিতত্ত্ব, Semantics সেইরূপ অর্থতত্ত্ব। কিন্তু বাংলায় অর্থশাস্ত্র (Politics) সম্পর্কে, অর্থ শব্দটি পূর্ব্ব হইতেই প্রযুক্ত হওয়ায়, আমরা এই বিজ্ঞানের বাংলা নাম দিতে চাই—শব্দার্থতত্ত্ব। অবশ্য 'শব্দ'-কথাটী আমরা এখানে অনেকটা গ্রীক rhema (a thing

said) এই অর্থে ব্যবহার করিব। এই বিজ্ঞানে শব্দ, শব্দ-সমষ্টি এবং বাক্যের (word, phrase and sentence) অর্থ আলোচিত হওয়া উচিত। আমরা আপাততঃ প্রথম দুইটীর ভিতরেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব।

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ (Dr T. G. Tucker) শব্দার্থ-পরিবর্ত্তনের নিয়ম-সমূহ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সে দিকে আমরা প্রথমেই পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। "অর্থপরিবর্ত্তনের মূল নিয়ম এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং সম্ভবতঃ হইবেও না। এই পরিবর্ত্তনের ধারা এবং প্রকৃতি কিরূপ, এই সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী কিছু করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। অর্থপরিবর্ত্তন বিষয়ে মনই একমাত্র নিয়ামক। সুতরাং জটিল মনস্তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত এই পরিবর্ত্তনের নিয়মগুলিকে আমরা ছাঁটিয়া কাটিয়া ঠিক আইনের আকার দিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি যে, কতকগুলি শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ হয়, কতকগুলির অর্থের সংকোচ ঘটে। আবার কতকগুলির অর্থ এক হইতে আর একে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের ধারা আমরা শব্দের ইতিহাসের মধ্য দিয়া হয় তো অধিকাংশ সময়েই অনুসরণ করিতে পারি। কিন্তু কোন্ মূল কারণে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা আমরা ধরিতে পারি না। কেন যে একজাতীয় কতকগুলি শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ না হইয়া সম্প্রসারিত হইবে, কিম্বা ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটিবে,—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।" (Introduction to the Natural History of Language, p 373)

অধ্যাপক সেইস্ (Sayce) বলিতেছেন—Just (ন্যায়বান্), কিম্বা beauty (সৌন্দর্য্য) ইত্যাদি শব্দ অনেকটা সর্টহ্যাণ্ড নোটের মত—একটি কথার ভিতরেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি ভাবের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। কিন্তু কথাটি শুনিবামাত্র একজনের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, আর একজনের মনেও ঠিক তাহা হইতে পারে না। এইখানেই অর্থ-পরিবর্ত্তনের মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে। (Intro to Science of Language, Vol I, p 337).

ব্যাল্ডুইনের Dictionary of Philosoply and Psychology নামক অভিধানে শব্দার্থ-বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—"শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস এবং ক্রমাভিব্যক্তি নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে যাহাতে আলোচনা করা হয়, তাহাই শব্দার্থ-বিজ্ঞান।" এই বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যাগুলি আমেরিকার অধ্যাপক ওয়রটেল (Oerteal) এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"কি কি উপায়ে একটি ভাষা প্রত্যেক ভাবটি প্রকাশ করিয়াছে? একই শব্দ কতগুলি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে? আবার একই ভাব কতগুলি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে?" অধ্যাপক টাকারের মতানুযায়ী অর্থ-পরিবর্ত্তনের প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নলিখিত ভাবে নির্দ্দেশিত হইতে পারে, যথা (১) শব্দের অর্থের অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপ্তি, যাহাতে 'করিয়া, শব্দটী বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। (২) কোনও কিছুর নামের ভিতর

একটি কোনও জিনিসের প্রাধান্য—যাহাতে ঐ নামটি শেষে ঐ প্রধান বিশিষ্ট জিনিসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়, (৩) ভাবের স্বাভাবিক সংশ্লিষ্টতাবশতঃ একটি গৌণ অর্থের অজ্ঞাত সংযোগ এবং ক্রমশঃ ঐ গৌণ অর্থেই শব্দের প্রয়োগ নিবদ্ধ হওয়া, কিম্বা অর্থ-সম্প্রসারণ হইয়া ঐ গৌণ অর্থের মুখ্য অর্থের সহিত যোগ হওয়া; (৪) শব্দের অর্থ পরিষ্কার করিতে গিয়া, অথবা তাহাতে জোর দিতে গিয়া আলঙ্কারিক ভাবে (figurative) শব্দের প্রয়োগ এবং তাহা হইতে অর্থের সম্প্রসারণ হওয়া; (৫) মানসিক ভাবের উত্তেজনা-হেতু প্রসারিত অথবা সঙ্কীর্ণ অর্থে শব্দের অপব্যবহার, (৬) ঘুরাইয়া মিষ্টি করিয়া কথা বলা কিম্বা ঠাট্টাচ্ছলে বলার সময় আস্তে আস্তে নূতন অর্থে প্রযুক্ত কথাটির নূতন অর্থটিই গ্রহণ, (৭) অজ্ঞানতা বা ভুয়ো-পাণ্ডিত্য-বশতঃ শব্দের ব্যবহারে শিথিলতা। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূলে তিনটি প্রক্রিয়া ঘটে:—(১) অর্থ-সঙ্কোচ (২) অর্থ-প্রসারণ (৩) অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন।

অধ্যাপক হুইট্‌নি (Whitney, Study of Language, p 106) সমস্ত রকমের অর্থ-পরিবর্ত্তনকেই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন; (১) বিস্তৃত অর্থের সঙ্কোচ, (২) সঙ্কুচিত অর্থের বিস্তার। জার্ম্মাণ-জাতীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পট্ (Pott, Etymologische Forschungen, Intro.) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিরূপে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং তাহার নিয়মই বা কি।

বাংলা-ভাষায় কিরূপে এই অর্থপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার কতক নমুনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-সমূহে প্রদর্শনের ইচ্ছা রহিল। অন্যান্য ভাষাতেও যে-ব্যাপার ঘটিতেছে, বাংলা ভাষাতেও তাহাই হইতেছে। শব্দের অর্থের অবনতি, প্রকারান্তরে অর্থপ্রকাশ, অর্থের উন্নতি, দ্রব্যবাচিত্ব হইতে শব্দের গুণবাচিত্ব লাভ এবং ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া, অর্থের সঙ্কোচ, প্রসার, আলঙ্কারিক অর্থ, বিভিন্নার্থতা, সমবায়ার্থ, সমাসের অর্থ, নামের সহিত অর্থের সম্বন্ধ, শব্দের অপব্যবহার-হেতু অর্থ-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

অর্থের সঙ্কোচই ভাষার সাধারণ নিয়ম। কারণ, মানুষ চায়—এক একটি ভাব-প্রকাশের জন্য এক একটি শব্দ। কাজেই শব্দের অর্থ শীঘ্র শীঘ্র একটিমাত্র ভাবের সহিত জড়িত হইয়া যায় এবং এইরূপে অর্থও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

মুক্তা-চয়ন।

[শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সঙ্কলিত।]

১। আগামী কল্য।

(Shelley's "To-morrow".)

কোনখানে তুমি চিরবাঞ্ছিত আগামী কল্য হায়! যুবক বৃদ্ধ দুর্ব্বল-বলী তোমারেই সদা চায়।
ধনী দরিদ্র সুখ-দুঃখের অতল সাগরে ভাসি', খুঁজিছে নিত্য তব অধরের শুভ্র মধুর হাসি।
চিরদিন ধ'রে ঘৃণা করি যারে ভাজিলে যাহারে বাঁচি,
নিশিশেষে হেরি—সেই "আজিকারি" কোলেতে শুইয়া আছি!

বঙ্গের অঙ্গার।

[শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিবচিত।]

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এ দেশে কয়লার খনি অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহারই ফল-স্বরূপ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল কোল-কোম্পানির আবির্ভাব। এই কোম্পানিই এদেশে কয়লাখনির কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক এবং সম্ভবতঃ এই কোম্পানীর রাণীগঞ্জের কয়লাখনিই ভারতবর্ষের প্রথম কয়লার খনি। তদবধি এই কয়লা খনির কার্য্য ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে উহা অতি ধীর ভাবে অগ্রসর হইলেও বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের প্রারম্ভ হইতে অতি দ্রুতবেগে ইহার কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। এখন বঙ্গের অঙ্গারের দিকে কেবল ইউরোপীয়গণের নয়, অতি ধীরগামী বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণেরও, দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই কয়লা-খনির কৃপায় বিগত চারি বৎসরের মধ্যে অনেকেই কমলার কৃপা আশাতীত পরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে, এই 'সাহিত্য সম্মিলনে, এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে তাহা বোধ হয় কাহারও নিকট নিতান্ত অতৃপ্তিকর বা অসংলগ্ন (out of place) আলোচনা বোধ হইবে না।

কয়লা নানাবিধ; তাহার গুণও বিভিন্ন। তরুলতা-গুল্মাদির দেহাবশেষ অর্থাৎ কাষ্ঠের চরম পরিণতি—পাথুরিয়া কয়লা। যেরূপ কর্দ্দম বালুকা প্রভৃতি কাল-সহকারে প্রস্তরে পরিণত হয়; সেইরূপ উদ্ভিদের দেহ কাল-সহকারে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়া থাকে। পরিণতির পরিমাণ অনুসারে কয়লার গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। পরিণতির শেষ সীমায় যাহা উপনীত, তাহাই শ্রেষ্ঠ কয়লা।

নিম্নবঙ্গে, বিশেষতঃ যশোহর খুলনা বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার সময় এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ "জোব" মৃত্তিকা পাওয়া যায়। শুষ্ক হইলে উহা অগ্নি-সংযোগে জ্বালান যায়। সুন্দরবন-প্রদেশে ইহাকে "জোবমাটি" বলে। বিল প্রভৃতির ধাপ পচিয়া "জোবে" পরিণত হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—পিঠ (peat)। উদ্ভিদের কাষ্ঠ হইতে কয়লায় পরিণত হইবার পথে ইহাই প্রথম সোপান। পিটের পরবর্ত্তী অবস্থার কয়লার নাম "লিগনাইট"। ইহা এক প্রকার ব্রাউন (Brown) রঙ্গের অসম্পূর্ণ পরিণতির কয়লা (vegatable matter incompletely mineralized) ইহাতে 'পিট' অপেক্ষা অঙ্গারক বা কার্ব্বণের ভাগ অধিক এবং অদাহ্য পদার্থ বা ভস্মের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। ইহার গুরুত্বও পিট অপেক্ষা অধিক। এই "লিগনাইটের পরবর্ত্তী অবস্থায় আমরা "বিটুমিনাস কোল" বা সাধারণ কয়লা প্রাপ্ত হই। ইহা দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তন্মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, আর কতকগুলি dull বা ঔজ্জ্বল্য-বিহীন। ইহাতে লিগনাইট অপেক্ষা কার্ব্বণের ভাগ অধিক এবং অদাহ্য পদার্থ বা ভস্মের

ভাগ কম। ইহা লিগনাইট অপেক্ষা কঠিন এবং ইহার গুরুত্বও লিগনাইট অপেক্ষা অধিক। ইহা হইতে লিগনাইট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তাপ পাওয়া যায়। য়্যানথ্রেসাইট নামক ভঙ্গপ্রবণ ও কঠিন ধূম্রবিহীন কয়লাই চরম পরিণতির কয়লা (অর্থাৎ ইহা compllletely naturalzed vegetable matter)। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লা। ইহার রং উজ্জ্বল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ইহার উত্তাপ অতিশয় অধিক, কিন্তু সহজে জ্বলে না এবং ইহার গুরুত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

উদ্ভিদের কাষ্ঠাবস্থা হইতে পাথুরিয়া কয়লায় চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশগুলি দেখাইবার জন্য, কয়লার বিভিন্ন অবস্থার রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা,—

পদার্থের নাম।	কার্ব্বণ।	হাইড্রোজেন।	অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন	এক কিউবিক ফুটের ওজন যত পাউণ্ড।
কাট	৫০	৬	৪৪	৩১
পিট ...	৬০	৬	৩৪	৫৩
লিগনাইট	৬৮	৫	২৭	৬৫
বিটুমিনাস কোল (সাধারণ কয়লা) ...	৮৬	৫	৯	৮১
য়্যানথ্রেসাইট	৯৫	২·৫	২·৫	৯৩

কাঠ হইতে য়্যানথ্রেসাইটের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কার্ব্বণের ভাগ ও গুরুত্ব অধিক হইতে থাকে এবং অন্যান্য পদার্থের ভাগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মহীশুর রাজ্য ব্যতীত আর কোথায়ও য়্যানথ্রেসাইটের খনি নাই। মহীশুরেও উহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে দার্জ্জিলিঙের নিকট একটি দুই ফিট সিম আছে। ব্যবসায়-হিসাবে লাভজনক না হওয়ায়, উহা উত্তোলন করিবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।

আমরা সচরাচর যে সকল কয়লা দেখিতে পাই, উহা বিটুমিনাস কোল। বঙ্গের অঙ্গার সমস্তই এই জাতীয়। কয়লার মধ্যেও উপরের স্তরের কয়লা (top seam coal) অপেক্ষা সর্ব্ব-নিম্নস্তরের কয়লা (bottom seam coal) শ্রেষ্ঠ। এই কয়লা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—রাণীগঞ্জ ও বরাকর। তাহার মধ্যে বরাকর-শ্রেণীর কয়লা অপেক্ষা রাণীগঞ্জ-শ্রেণীর কয়লা শ্রেষ্ঠ। যে কয়লার মধ্যে যত অধিক দাহ্য-পদার্থ থাকে ও যত কম ভস্মের ভাগ বা অদাহ্য পদার্থ থাকে, তাহার মূল্য তত অধিক। এই হিসাবে বাজারে চারি প্রকারের কয়লা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে বাজারে first class coal বলে, তাহার নিম্নে good second class, তাহার পর second class, এবং নিকৃষ্ট কয়লাগুলিকে third class কোল বলে। ফার্ষ্ট ক্লাস কোল উজ্জ্বল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; উহাতে ধূম কম হয়, উহা হইতে উত্তাপ অধিক পাওয়া যায় এবং পোড়াইলে ভস্মাবশেষ

অতিশয় কম থাকে। Good second class কোলের রং তত উজ্জ্বল নহে; দেখিতে কতকটা dull রং-বিশিষ্ট, ইহা পোড়াইলে first class কোল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভস্মাবশেষ থাকে। চাপকয়লাগুলিকে ষ্টীম, খণ্ড খণ্ড কয়লাগুলিকে শ্লাক এবং রবল ও গুঁড়া কয়লাকে ডাষ্ট কহে। কল কারখানা প্রভৃতির এবং কোনও কোনও ষ্টীমারের ইঞ্জিন চালাইবার নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর (first class) অথবা উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীয় (good second class) ষ্টীম-কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা হইতে রন্ধনাদির জন্য কোক প্রস্তুত হয়। ছোট ছোট কল-কারখানা প্রভৃতি চালাইবার জন্যও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমুদায় কয়লার মধ্যে তৈলময় পদার্থের ভাগ অধিক; তাহার গুঁড়া "ওভেনে" পোড়াইয়া হার্ড কোক প্রস্তুত হয়। হার্ড কোক প্রস্তুত করিবার সময় উপযুক্ত ওভেন ব্যবহার করিলে, আলকাতরা ও ক্রিয়োজোট প্রভৃতি বাই-প্রডাক্ট পাওয়া যায়। হার্ড কোকের তাপোৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত উহা লৌহ-ঢালাই প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হার্ডকোক প্রস্তুত করা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়।

বঙ্গদেশে যে সমুদায় কয়লা-ক্ষেত্র বা "কোল-ফিল্ড" আছে, তাহার মধ্যে—(১) "রাণীগঞ্জ-ফিল্ড", (২) ঝরিয়া ফিল্ড, (৩) গিরিডি ফিল্ড, (৪) উত্তরকরণপুর ফিল্ড, (৫) দক্ষিণকরণপুর ফিল্ড ও (৬) রামগড় ফিল্ড—এই ছয়টী ক্ষেত্র বা কোলফিল্ডই প্রধান। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া ফিল্ডই কেবল কয়লা-সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। গিরিডি-ফিল্ডে first class coal বা প্রথম শ্রেণীর কয়লার খনি-সমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার অতি সামান্য অংশে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই ই-আই-রেলকোম্পানীর সম্পত্তি এবং তাঁহারা উহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় (reserve) করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য ফিল্ড বা ক্ষেত্রগুলিরও অদ্যাপি উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি (development) হয় নাই।

রাণীগঞ্জ কয়লা-ক্ষেত্র (Raniganj coal-field)।—এই ফিল্ডে রাণীগঞ্জ ও বরাকর উভয় শ্রেণীর কয়লাই পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে "শাঁকতোড়" (Sanctoria) ও "ডিসেরগড়" এই দুই টি সিম বা স্তর প্রধান। শাঁকতোড়, বা sanctoria সিমকে স্থানবিশেষে "জয়রামডাঙ্গা বটম সিম" ও "চরণপুর বটম সিম" বলিয়া থাকে। এই সিমের সর্ব্বত্রই প্রথম শ্রেণীর কয়লা (first class coal) পাওয়া যায়। ডিসেরগড সিম প্রধানতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মেল লাইনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। স্থান-বিশেষে উক্ত রেলপথের পূর্ব্ব দিকে ডিসেরগড সিমের কিছু কিছু বিস্তৃতি থাকিলেও, সেই সমুদায় অংশে যে সকল কয়লার খনি আছে, তাহা ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণে উত্থিত আগ্নেয় প্রস্তরাদি দ্বারা স্থানে স্থানে বিভক্ত ও দগ্ধ অঙ্গারের স্তরে পরিণত হইয়াছে। "শাঁকতোড়" ও "ডিসেরগড"—উভয় সিম হইতেই আমরা first class coal বা প্রথম শ্রেণীর কয়লা প্রাপ্ত হই। রাণীগঞ্জ ফিল্ডে "রাণীগঞ্জ কয়লার" আর যে সমুদায় সিম আছে,

তাহার কয়লা তত ভাল নহে। উহার মধ্যে চরণপুর টপ, রঘুনাথবাটী ও মুবিক সিম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য রাণীগঞ্জ-ক্ষেত্রে "বরাকর কয়লার" যে সকল সিম বা স্তর আছে, তাহার মধ্যে লায়েকডিহি, রামনগর ও বেগুনিয়া সিম প্রধান। এই সকল সিমের কয়লাও উৎকৃষ্ট এবং ঝরিয়া কোল ফিল্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "বরাকর কয়লা" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত গৌরাংডিহি ও শালানপুর সিম হইতে "বরাকর কয়লা" পাওয়া যায়। তবে উহা তত উৎকৃষ্ট নহে। রাণীগঞ্জ কোলফিল্ডে "রাণীগঞ্জ" ও "বরাকর" উভয় শ্রেণীর কয়লা পাওয়া গেলেও, এই ফিল্ডের "বরাকর কয়লার পরিমাণ, "রাণীগঞ্জ কয়লার" তুলনায় অতিশয় কম।

Jharia coalfield বা ঝরিয়া-ক্ষেত্র।—এই ক্ষেত্রেও "রাণীগঞ্জ" ও "বরাকর" উভয় শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায় কিন্তু এই ফিল্ডের "বরাকর কয়লার" তুলনায় "রাণীগঞ্জ কয়লার" পরিমাণ অতিশয় কম। ঝরিয়া ফিল্ডের কয়লা "শাঁকতোড বা Sanctoria" ও "ডিসের-গড়" সিমের কয়লা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। এই ফিল্ডে "বরাকর কয়লায়" ৫ হইতে ৩০ ফুটের অন্ততঃ ১৭টী সিম আছে। তাহার মধ্যে এই সমুদায় সিমগুলি নম্বর করা হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটী তাহার বিশেষ নম্বর দ্বারা পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উহার মধ্যে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৭ সিম হইতে প্রথম শ্রেণীর কয়লা (first class coal) পাওয়া যায়। কিন্তু সিমগুলির একটি দোষ আছে, উহার মধ্যে কোনও কোনও সিমের কয়লা সকল স্থানে একরূপ নহে। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, সামান্যমাত্র ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি কয়লা-খনির মধ্যে একটিতে প্রথম শ্রেণীর কয়লা (first class coal) এবং অপরটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর (second class coal) একই সিম হইতে উত্তোলিত হইতেছে। রাণী-গঞ্জ কোল ফিল্ড" ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্য্য চলিলেও "ঝরিয়া কোল ফিল্ড" ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও উল্লেখযোগ্য কলিয়ারী দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ কেবল রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া ফিল্ডের কয়লা। ঝরিয়া কোলফিল্ড হইতে প্রতি বৎসর যত কয়লা উত্তোলিত হয়, রাণীগঞ্জ কোল-ফিল্ড হইতে তাহার অন্ততঃ দেড় গুণ কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাণীগঞ্জ ফিল্ডের কয়লা ক্রমশঃই শেষ হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ঝরিয়া ফিল্ড এ বিষয়ে অগ্রগামী হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এই কয়লা-ক্ষেত্র বা কোল-ফিল্ড (coal field) গুলি বরাকর ও দামোদরের উপত্যকা-ভূমি লইয়া সংগঠিত। রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়ার প্রায় সমগ্র কয়লা-ভূমি দামোদরের উত্তর এবং অজয় ও বরাকরের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এই নদত্রয়ের বেষ্টনের মধ্যে সংস্থিত। দামোদরের দক্ষিণে এবং অজয়ের উত্তরে, এই নদদ্বয় পার হইয়া, যে কয়লার সিম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য এবং উহার কয়লাও নিকৃষ্ট। এই সমগ্র কয়লা-ভূমি একটি Metamorphic rock এর বেষ্টনে সম্পূর্ণরূপ পরিবেষ্টিত। এই শৈল-মালার আবেষ্টনের বাহিরে আদৌ কয়লা নাই।

এক সময়ে এই সকল স্থান বহু লতাগুল্ম-বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল।

পরে এই ভূভাগ কোনও নৈসর্গিক কারণে বসিয়া যাওয়ায়, উহা জলে মগ্ন হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তিকালে নদ-নদী প্রভৃতি দ্বারা আনীত কর্দ্দম ও বালুকা দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে থাকে। এইরূপ বহু যুগ গত হইলে ভূগর্ভের উত্তাপে এবং চাপে ঐ সমুদয় উদ্ভিজ্জের দেহাবশেষ কয়লায়, তাহার উপরিস্থ কর্দ্দমাদি শ্লেট প্রস্তরে এবং তদুপরিস্থ বালুকাস্তর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বালুকাপ্রস্তর বা স্যাণ্ডষ্টোনে পরিণত হইয়াছে। এই সমুদায় লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদি যে কত দিনে কয়লায় পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যে স্তর যত পুরাতন, তাহার কয়লা তত উৎকৃষ্ট এবং উপরের স্তরের কয়লা অপেক্ষা নিম্নস্তরের কয়লা ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ।

কয়লার স্তরের উপর যে শ্লেট প্রস্তরের আবরণ ও তাহার উপর যে স্যাণ্ড ষ্টোনের ছাত থাকে, তাহা এরূপ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে যে, উপর হইতে তাহার অবস্থা দেখিয়াই অভিজ্ঞগণ নিম্নে কয়লা আছে কি না, বলিয়া দিতে পারেন। কোনও কোনও স্থলে এই স্যাণ্ড-ষ্টোনের ছাত ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোথাও বা উহা ভূপৃষ্ঠের অনেক নিম্নে থাকে। কয়লা, শ্লেট ও স্যাণ্ড-ষ্টোনের স্তরগুলি সমান্তরালভাবে অবস্থিত, কিন্তু উহা প্রায়ই ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল-ভাবে না থাকিয়া inclined বা হেলানভাবে থাকে। যে স্থলে কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে উঠিয়া আসে, তাহাকে সেই স্তরের আউটক্রপ (outcrop) বলে। যে স্থলে কোনও একটা সিম বা স্তরের আউটক্রপ উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট সামান্য পরিমাণ খনন করিলেই কয়লা পাওয়া যায়। এইরূপে কয়লাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীগর্ভ অথবা পাহাড়ের খণ্ডের মধ্য হইতে মাটি কাটার ন্যায় কাটিয়া কয়লা বাহির করিয়া লওয়া যায়। এইরূপ খাদকে "কোয়ারি" খাদ কহে।

কোনও কয়লার স্তর যে দিকে ঢালু হইয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে গিয়াছে, তাহাকে উহার side 'ডিপসাইড' বা নাবাল দিক বলে। আর যে দিকের স্তরটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে ভূমির উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে উহার outcrop side বা আউট ক্রপের দিক বলে। আউট ক্রপের মুখের নিকট 'ইনক্লাইন" বা সিঁড়ি খাদ করিয়া কয়লা উত্তোলন করা হয় এবং ডিপের দিকে "পিট-খাদ" বা খাড়া খাদ প্রস্তুত করিয়া কয়লা উত্তোলিত হয়। ইনক্লাইন বা সিঁড়ি খাদ করিবার কার্য্য চালাইতে পারিলে, অতি অল্প ব্যয়ে কার্য্য চালান যাইতে পারে।

কয়লা অনুসন্ধান (প্রস্পেক্টিং prospecting)।—যাঁহারা কয়লা ভূমি চেনেন, তাঁহারা অনেক সময়ে উপর লইতে জমির প্রকৃতি দেখিয়াই তাহার নিম্নে কয়লা আছে কি না, বুঝিতে পারেন। কয়লা খনির উপরে যে স্যাণ্ড-ষ্টোনের ছাত থাকে, তাহার এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যে, উপর হইতে দেখিলেই অনেকটা চেনা যায়। কোনও স্থানে কয়লা খনি আছে এরূপ অনুমান হইলে, সেই স্থানের নিকট যে সকল নদী নালা নির্ঝর বা পাহাড়ের ঘর আছে —তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হয়। এইরূপ পরীক্ষা করিবার সময় এই সকলের কোন না-কোনও স্থানেও অনেক সময় কয়লার অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ হয় কয়লা না হয় শ্লেটের আবরণ বা স্যাণ্ডষ্টোনের চালের অংশ-বিশেষ দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত একপ্রকার নরম পাংশুবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহা, অথবা কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার মৃত্তিকা আছে, তাহা,—কয়লা-খনির অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। পরীক্ষা করিতে করিতে out crop "আউটক্রপ" পাওয়া যায়, ভালই; নতুবা, যে সমুদায় "ফসিল" বা মৃত্তিকার স্তরে স্তরে যে সমুদায় জীব ও উদ্ভিদাদির দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে কোনও স্থানে কয়লার খনি আছে—এরূপ প্রমাণ পাইলে, উহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, এবং উক্ত খনিতে কতগুলি সিম বা স্তর পাওয়া যাইতে পারে এবং প্রত্যেক স্তরের thickness বা গভীরতা কত, কয়লা কিরূপ এবং কত নিম্নে উহা পাওয়া যাইতে পারে,—তাহা নির্ণয় করবার নিমিত্ত, বোরিং বা ভূগর্ভ ছিদ্র করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কলসীর ভিতরের গুড় যেরূপ বোমা মারিয়া পরীক্ষা করা হয়, ভূগর্ভস্থ পদার্থের স্তর-সকলও সেইরূপ বোরিং করিয়া পরীক্ষা করা হয়। বোরিং করিবার সময় ভূগর্ভস্থ পদার্থ-সকল এক দুই অথবা তিন ইঞ্চি পরিধি-বিশিষ্ট দণ্ডের আকারে বাহির হইয়া আসিতে থাকে। প্রথম হইতে উহার পরিমাণ ধরিয়া কত নিম্নে কি পদার্থ আছে, তাহা জানা যায়। উহা উপরে সাজাইয়া রাখিবার সময় উহার মাপ লিখিয়া রাখিবার প্রথা আছে। বোরিং দুই প্রকার। বাষ্পীয়-যন্ত্র-পরিচালিত ডায়মণ্ড ড্রিল-বোরিং ও হ্যাণ্ড বোরিং। আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ডায়মণ্ড ড্রিল সিষ্টেমে বোরিং করিতে হইলেই হ্যাণ্ড বোরিঙের এর যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডায়মণ্ড ড্রিল বোরিং এ দীর্ঘে ২ অথবা ৩" ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট একটী নিরেট rod উঠিতে থাকে, উহা হইতেই ভূগর্ভের যত ফিট নিম্নে যে স্তরে যত ফিট যে পদার্থ আছে, তাহা জানিতে পারা যায়। এইরূপে কয়লা-ভূমির বিভিন্ন স্থানে (একই লাইনে না পড়ে একপভাবে) ৩টী বা ততোধিক বোরিং করিয়া যদি ব্যবসা চালাইবার উপযোগী কয়লার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে রীতীমতভাবে কয়লা উত্তোলনের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ কয়লা-খনির কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত কোনও improved Vergin Soil লইবার আবশ্যক হইলে, প্রথমতঃ কয়লা-ভূমির মালিকের নিকট হইতে কয়লা-ভূমি পরীক্ষা করিবার অনুমতি বা প্রস্পেক্টিং লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়; তাহার পর পরীক্ষা করিয়া ব্যাবসায়োপযোগী কয়লার সিম পাওয়া গেলে, মাইনিং লিজ লইয়া কার্য্যারম্ভ করা হয়। এই জন্য ভূমির মালিককে বিঘা প্রতি একটা সেলামি ও টন প্রতি একটা রয়্যালটী দিতে হয়। সাধারণতঃ ৯৯৯ বৎসরের জন্য মাইনিং লিজ লওয়া হইয়া থাকে। বন্দোবস্তীয় কয়লা-ভূমিতে যদি আউট ক্রপের মুখ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প মূলধন লইয়াই কয়লা উত্তোলনের কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। আউটক্রপের মুখের নিকট একটী ইনক্লাইন বা সিঁড়ি খাদ করিলে সহজেই কয়লার সীম ধরা যায়। এইরূপ খাদ প্রস্তুত করিতে হইলে ডিনামাইট সাহায্যে পাথর উড়াইয়া দিয়া একটী সর্পগতি বিশিষ্ট ঢালু সুড়ঙ্গ কাটিয়া ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতে হয়। এইরূপে কিছু দূরে অগ্রসর হইলেই কয়লার স্তরের মধ্যে উপনীত হওয়া যায়। উঠা-নামা করিবার জন্য এই সমুদায় সিঁড়ির ধাপগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে কয়লার স্তরের মধ্যে

উপস্থিত হইয়া সুঁদ বা গ্যালারি কাটিয়া কয়লা রা... ধর করা হয়। কয়লা গাঁইতি দ্বারা খুঁড়িয়া লইয়া ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া কুলিরা মাথা... বোঝায় উপরে উঠাইয়া থাকে। কয়লা খনন করিবার সময় প্রত্যেক খননকারী কুলির নিকট ... একটী করিয়া ক্রাসিন তৈলের আলো থাকে। সাধারণতঃ একপরিবারভুক্ত দুই অথবা চারি ... লোক এক সঙ্গে কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে স্বামী-স্ত্রী দুই জনে অনেক স্থলে দৈনিক ১৵র এক টাকা দুই আনা হইতে ১॥০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে। খনির মধ্যে প্রথমে 'মেন গ্যালারি' প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে উভয় পার্শ্বে 'সাইড গ্যালারি' চালান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্যালারীর পরিসর ৮ আট ফিট রাখিলে গ্যালারীর মধ্যের দেওয়াল বা পিলারের পরিসর অন্ততঃ ১৬ ফিট রাখা উচিত। পিলারের পরিমাণ খনির গভীরতা ও কয়লা-খনির ছাতের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোনস্থলেই গ্যালারীর দ্বিগুণের কম পিলার রাখা হয় না। এই রূপে প্রথমে খনি হইতে ভূগর্ভস্থ কয়লার তৃতীয়াংশের অধিক উত্তোলিত হইতে পারে না। অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ কয়লা পিলারের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। গ্যালারীর কয়লা সমুদায় তোলা শেষ হইলে, "পিলার কাটাই" আরম্ভ করা হয়। পিলার কাটাই এর কার্য্য অতিশয় কঠিন। ইহাতে বিশেষ দক্ষতা, সতর্কতা ও নিপুণতার আবশ্যক হয়। কয়লা-ভূমির উপর লোকালয় থাকিলে, পিলার কাটাই আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তাহা উঠাইয়া দিতে হয়। নতুবা ঘর বাড়ী পড়িয়া এবং জমি ধসিয়া লোকের প্রাণহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ভিতরে কাঠের "চাড়া" দিয়া "পিলার কাটাই" করা হয়। ইহাকে চলিত কথায় "টীম্বারিং" কহে। যে সকল স্থানের পিলার কাটিয়া লওয়া হয়, তাহার উপরস্থ জমী অনেক সময় পিলার কাটার সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়া যায়। পিলার কাটাই করিবার সময় সতর্কতার অভাব হইলেই লোকের প্রাণহানি ঘটিবার সম্ভাবনা।

বন্দোবস্তীয় কয়লা-ভূমিতে যদি আউট-ক্রপের মুখ না পাওয়া যায়, অথবা dip side বা ডিপের দিক হইতে যদি কয়লা উত্তোলন কার্য্য চালাইতে হয়, তাহা হইলে কার্য্যারম্ভের সময় আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধন আবশ্যক হয়। কারণ, এরূপস্থলে পিট বা খাড়া খাদ প্রস্তুত করিয়া বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত উত্তোলন-যন্ত্রের সাহায্যে টবে করিয়া কয়লা উত্তোলন ও উঠা-নামা করিতে হয়। কয়লা-খাদের মধ্যে অনবরত জল ঝরিতে থাকে। এই সমস্ত জল এক একটী নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জল অনবরত তুলিয়া ফেলা আবশ্যক; নতুবা খাদ জলে ডুবিয়া কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত অনবরত খাদ হইতে জল তুলিবার জন্য প্রতি এক শত কয়লাভূমির নিমিত্ত অন্ততঃ দুই তিনটী ষ্টীম ইঞ্জিনের দ্বারা পরিচালিত 'পাম্প' আবশ্যক। এই "জল মারাই" কার্য্যের ত্রুটি হইলে অথবা প্রতিদিন খাদে যে পরিমাণ জল সঞ্চিত হইতে পারে, প্রতিদিন খাদে সেই পরিমাণ জল পাম্প করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা না থাকিলে, খনির কার্য্য চালান বিশেষ কষ্টকর হয়। বিশেষতঃ, বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া খাদ ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। প্রত্যেক কলিয়ারি-ম্যানেজারকে এদিকে বিশেষ সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য চালাইতে হয়।

খনির মধ্যে বায়ু-চলাচলের জন্য air-shaft বা বায়ু চলাচলের পথ রাখিতে হয়। বড় বড় কলিয়ারীর মত খনির অভ্যন্তর-ভাগের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ কলিয়ারীতেই কেরোসিনের আলো ব্যবহৃত হয়। যে সমুদায় কলিয়ারীতে কায়ার-ডাম্প নামক গ্যাস থাকিবার সম্ভাবনা, তথায় "ডেভিস্ সেফ্‌টি ল্যাম্প" নামক আলো ব্যবহার করা উচিত। খনির কার্য্য চালাইবার পক্ষে বৈদ্যুতিক আলোই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও নিরাপদ। ইহাতে খনিতে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য করা যায়।

কখনও কখনও ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণে ভূপৃষ্ঠের আবরণ ভাগ-বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভস্থ অগ্নিময় তরল ধাতব পদার্থ-সমূহ ঊর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত হয়। কোনও কয়লা ভূমির ভিতর দিয়া উহা উৎক্ষিপ্ত হয়। কোনও কয়লা ভূমির ভিতর দিয়া উহা উৎক্ষিপ্ত হইলে, যে স্থান বিদীর্ণ হইয়া উক্ত পদার্থ সকল উঠিয়া থাকে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ কয়লা দগ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে "ডাইক" বলে। ডাইকের মধ্যস্থলে সাধারণতঃ একটি কঠিন "লৌহ-প্রস্তরের (iron-stone) প্রাচীর ও তাহার উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দগ্ধাঙ্গারের কঠিন আবরণ থাকে। কয়লা অথবা কয়লা-ভূমিস্থ অন্যান্য প্রস্তরাদি যেরূপ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে, "ডাইকের" মধ্যে সেরূপ কোনও স্তরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা আগা-গোড়াই নিরেট থাকে। খনির কার্য্য চালাইবার সময়, গ্যালারির মুখে "ডাইক" পড়িলে আর গ্যালারী চালাইবার পথ থাকে না। তখন ডিনামাইট সাহায্যে ডাইক ভাঙ্গিয়া অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইবার পথ করিতে হয়। খনির কার্য্য চালাইবার পক্ষে ডাইক একপ্রকার নৈসর্গিক বাধা।

খনির কার্য্য চালাইবার আর এক বাধা—"ফল্ট" (fault)। ভূপৃষ্ঠের চাপে এবং ভূমিকম্প বা কোনও নৈসর্গিক কারণে সময় সময় কয়লার স্তর বা সমগুলি স্থানে স্থানে বিপর্য্যস্ত ও ভগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপে উহার (ভগ্নস্তূপের) এক অংশ স্বস্থানে থাকিলেও অপর অংশ হয় উপরে উঠিয়া যায়, না হয় নীচে নামিয়া পড়ে। কয়লা-স্তরের এই বিপর্য্যয়কে "ফল্ট" কহে। যাহা উপরে উঠিয়া যায়, তাহাকে upthrow এবং যাহা নীচে নামিয়া যায়, তাহাকে downthrow বলে।

উপসংহারে বিগত ৪০ বৎসর বঙ্গদেশে কয়লা-খনির কার্য্য কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছে—তাহা দেখাইবার জন্য, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের প্রারম্ভ হইতে কয়লার বাজারের কোনও স্থিরতা না থাকায় মূল্যের তালিকা প্রদর্শিত হইল না।

বৎসর।	উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ।	বৎসর।	উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ।
১৮৮০	১০১৯৭৯৩ টন।	১৮৯৫	৩৫৪০০১৮ টন।
১৮৮৫	১২৯৪২২৪ "	১৯০০	৬১১৮৬৯২ "
১৮৯০	২১৬৮৫২১ "	১৯০৫	৮৪১৭৭৩৯ "
		১৯১০	১২০৪৭৪১৬ "

বেদ কি ?

[বিদ্যাদিত্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত।]

বেদ—জ্ঞানবিজ্ঞানের পূর্ণভাণ্ডার। বেদে কি নাই বলা যায় না—ইহাতে সকলেই আছে; অথচ, আমরা অনুধাবন বা অনুশীলনের অভাবে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। বাঙ্গালা দেশে বেদচর্চ্চা লোপ পাইবার অনেকগুলি কারণ বর্ত্তমান ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেইগুলি ক্রমে অপসারিত হইয়া দিব্য-জ্ঞানের বিকাশ-পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও স্মৃতি লইয়া আমাদের বাল্যকালটা কাটিয়া গিয়াছিল, বেদান্ত, পুরাণ, সাংখ্য প্রভৃতিরও চর্চ্চা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে তখনই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু বেদচর্চ্চার সূত্রপাত তেমন করিয়া অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, এখন চতুষ্পাঠীতে, সংস্কৃত-পরীক্ষা-কেন্দ্র-গুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্ব্বত্রই সংস্কৃত চর্চ্চার প্রাবল্য-সন্দর্শনে আমাদিগের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদচর্চ্চার ও যে সমধিক উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা ইংরাজী শিক্ষিত সকলেই যেন এতদিন সংস্কৃত বা ভারতীয় প্রাচীন কলাবিদ্যার সার্থকায় সন্দিহান হইয়াই নাক সিট্‌কাইতেন। এখন ক্রমে ক্রমে সে ভাব দূর হইতেছে। এ দেশের প্রাচীন-ধরণের পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও বিদ্যাবত্তার অভাব নাই। বাঙ্গালায় অপরাপর দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত থাকিলেও, বেদচর্চ্চানিরত ব্যবসায়ী পণ্ডিতের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলার বাহিরে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহাদের বিদ্যানুশীলনের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে অদ্যাপি চমৎকৃত হইতে হয়। একে তো সংস্কৃতসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারিণী শক্তি আছে, তাহাতে আবার বেদবিদ্যার অপরিসীম সৌন্দর্য্যে যে এক মনপ্রাণবিমোহন লালিত্য অনুভূত হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। বাঙ্গালী এই সুললিত বেদবিদ্যার চর্চ্চায় এখন যে একেবারে উদাসীন, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালার বাহিরে যাঁহাদিগের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বেদবিৎ পণ্ডিতগণের অভাব নাই; তবে তাঁহারা বাঙ্গালার বাহিরে, অনেকে ভ্রমক্রমেও এদেশে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহা হউক, তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালার গৌরব এবং বেদচর্চ্চাবিহীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের কলঙ্ক-মোচনের জীবন্ত সাক্ষী।

এই যে চিত্তচমৎকারিণী বেদবিদ্যা, আমাদের দেশের লোক ইহাতে এখনও কেন উদাসীন, এ কথার মীমাংসা যে না হয়, এমত নহে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতাবলম্বী আমরা এখনও বেদকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বিজ্ঞান বলিয়া মানিয়া থাকি। যে সকল দর্শন-বিজ্ঞান ভারতের নিজস্ব বলিয়া আজও ভারতবাসী স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া থাকেন, সেইগুলির মূল—বেদ। "বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলম্",—এ কথাটী নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য নহে। প্রবন্ধান্তরে আমি "ধর্ম্ম" শব্দের সুবিস্তৃত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। * তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,

* "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আজকাল প্রতীচ্যদর্শনে যাহাকে Natural Law বলা হয়, বর্ণ শব্দে তাহাও সূচিত হইয়া থাকে। এই Natural Law প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য হইতে সাধর্ম্ম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানে ইহার ভিন্ন ভিন্ন Law নির্দ্ধারিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু 'বেদ'—সেই সকল ধর্ম্মের মূলাধার। বহুকাল এতদ্দেশে সেই প্রাচীন কলাবিদ্যা (Arts, and Sciences) গুলির অনুশীলনের অভাব হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যে সকল সংহিতা বা পুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্তই বেদমূলক হইলেও পৃথক্‌ভাবে অধীত হইবার যথেষ্ট উপাদানে পরিপূর্ণ। মনু অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকগণ যে সকল ধর্ম্ম-কথা বিনিবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন, তাহার অনুশীলনও আশানুরূপ হয় না। ফলে, অঙ্গের অস্তিত্বাভাবে অঙ্গীর বিদ্যমানতা লক্ষিত হইতেছে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চার অভাবে সেই ধর্ম্মমূল বেদ হতাদর হইতেছে, ইহা বুঝিতেই হইবে।

প্রতীচ্য জগতের বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিক্ষার একটুকু ক্ষীণ প্রবাহ বহিতেছে বলিয়া মনে হয়। ফলে আমাদিগের সেই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির প্রতি আস্থা যেন একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। শুধু এ দেশের নয়, অপর দেশের মনীষিবৃন্দেরাও এ দেশের "তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর" প্রাচীন শাস্ত্রগুলির প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়িতেছেন। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির যতই অনুশীলন হইতে থাকিবে, বেদচর্চ্চার পথ ততই উন্মুক্ত ও সুগম হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে শাস্ত্রচর্চ্চায় এখন যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে বেদবিদ্যানুশীলন আর অধিক দিন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় লুপ্ততেজ হইয়া থাকিতে পারিবে না। স্বতঃই আবার বেদবিদ্যা ক্রমশঃ লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিবে এবং লুপ্তগৌরব এই ভারত সমাজ অচিরেই আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়া জগদ্বাসী লোকলোচনের দর্শনীয় হইয়া উঠিবে। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদিগের এখন বড়ই সুযোগ-সম্পন্ন, আদান-প্রদানের সময় আসিয়াছে। আমরা যাহাতে এই সময়ে কর্ত্তব্য-বিচ্যুত না হই, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। শস্যের পরিপক্কতার ন্যায় সকল কর্ম্মেই কাল অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। এই কালা-ত্যয়েই আবার সকল কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়।

পরিতাপের বিষয়, একদিনও আমরা আমাদিগের লুপ্তস্মৃতি কলা-বিদ্যা-গুলির একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলাম না। যে সকল Arts and sciences ভারতীয় প্রাচীন বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর সুবিদিত ছিল, ক্রমশঃ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমি নিজেও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখন ও আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। যাহা হউক, বৈদেশিক বিদ্যাবানেরা এ বিষয়ে আমাদিগের বড় কম সহায়তা করিতেছেন না। তাঁহারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক শাস্ত্রতথ্য আবিষ্কার করিয়া অবিরত আমাদিগের আনুকূল্য করিতেছেন। তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির অনুশীলন-প্রবৃত্তি একটু একটু করিয়া উদ্রিক্ত হইতেছে। এই উদ্রেক স্বাভাবিক

---

* মাসিকপত্রে "কলাবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ (অসম্পূর্ণ) দ্রষ্টব্য।

এবং ইহার ফলেই ধর্ম্মমূলক বেদত্রয় আয়ত্ত করিবার সুযোগ ঘটিবে। অন্যপক্ষে, বেদ অনায়ত্ত হইলে এই গুপ্তির প্রকৃষ্ট জ্ঞান চিরকাল সুদূর-পরাহত থাকিবে। শাস্ত্রকারগণই বলিয়াছেন যে,—"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদব্যাখ্যার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে।" সুতরাং যদি সেই প্রাচীন ইতিহাস পরম্পরার জ্ঞানই না থাকে, পঞ্চলক্ষণ পুরাণ সমূহের সর্গ-প্রতিসর্গাদি বংশপরিচয়ই যদি লাভ না করিতে পারিলাম, তবে বেদব্যাখ্যার সাফল্য-লাভ কি প্রকারে হইবে? আর দুর্ব্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিত বেদ যদি আবহমানকাল অন্ধতামসাচ্ছন্ন পুঁথির কুক্ষিতেই থাকিয়া যায়, তবে কে ইহার জন্য সঞ্জীবনী-সুধার অন্বেষণে উদ্‌যুক্ত হইবে? বেদ ত বড় কথা। কলা কাব্য প্রভৃতি রসসাহিত্যও অপব্যাখ্যায় কলুষিত হইয়া থাকে। মল্লিনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"ভারতী-কালিদাসস্য দুর্ব্ব্যাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিতা। এষা সঞ্জীবনীটীকা তামস্যোজীবয়িষ্যতি॥" কবিবর কালিদাস ও মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথের কাল, অপৌরুষেয় বেদের তুলনায়, অতি সামান্য। সেই সামান্য কালের মধ্যেই যখন সহজ-বোধ্য কলাসাহিত্যের এত ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল; তখন বেদের কি দশা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অধুনিক প্রচেষ্টার ফলে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে অসাড় সমাজদেহে যেন আবার স্পন্দন আসিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ৺কাশীধামের "বেদোদ্ধারিণী-সমিতির" পণ্ডিতমণ্ডলীও এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভগবান্ বিরাট বেদপুরুষ এই সকল শুভাকাঙ্ক্ষী সুধিবৃন্দের সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পচন্দনবর্ষণে সুশোভিত করুন। আশা আছে, বেদবিদ্যা অচিরেই এদেশ আবার বিলুপ্ত মহিমার উদ্ধার করিয়া জাজ্বল্যমান ভাবে প্রাচীনকালের মত লোক শিক্ষায় স্থান অধিকার করিবে।

যে কথা বলিতেছিলাম। যদি বেদের ইতিহাস ও পুরাণগত ব্যাখ্যারই অভাব রহিল, তবে 'বেদ কি', তাহা কি প্রকারে সহজে বুঝা যাইবে? সকলেই জানেন,—সুপ্রাচীন বেদ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, আমাদিগের দেশে বেদচর্চ্চা যে পরিমাণে হইয়া থাকে, বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে বেদচর্চ্চা তদপেক্ষা কম হইয়া থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে ভাষার পরিপন্থিভাব নাই। এদেশে আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হয় তো বেদ কিংবা যে কোনও শাস্ত্রচর্চ্চা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, বৈদেশিকগণ বৈষয়িক-ভাবেই সেই সকলের অনুশীলন করিয়া থাকেন। নানা কারণে কালসহকারে আমাদিগের সেই আনুষ্ঠানিক অনুশীলনেরও নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রবিরল হইয়া যাওয়ায়, বেদোক্ত বিধি-ব্যবস্থার জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এখন এক প্রকাণ্ড বিভীষিকায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা কেবল জাতীয়-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূলস্তররূপে বেদ-গ্রন্থাদি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই ইউরোপীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিগণের বেদ-ব্যাখ্যানে বা তাহার যথাযথ তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে যে আরও কত অন্তরায়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তবে আমরা বেদ-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্র চর্চ্চায়ও শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছি; ইউরোপীয় ও আমেরিকার মনীষিগণ এখনও নানা জড়-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে

নানা নিগূঢ় অধ্যাত্মবিস্তারও অনুশীলনে অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই এই সকল শাস্ত্র-সমূহের মূল-ভিত্তি বেদ, এখন তাঁহাদিগের নিকট আর মোক্ষমূলারের বর্ণিত আদিম অসভ্য জাতির গল্পগুজব ও কুসংস্কার বা গান মাত্র নহে। বহুকাল এই বিরোধী মত চলিয়া আসিতে-ছিল, এবং সেই মত যে কেবল তথাকথিত বৈদেশিক শিক্ষিতগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, এতদ্দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞান-পরাঙ্মুখ ইংরাজীনবীশ অনেকেই তাহা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বলা বাহুল্য, 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' —এই উপদেশের অধীন হইয়া, দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সকল অসমীচীন মত দূরে পরিহার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন এবং যাহাতে অন্যেও যথাযথরূপে বিশ্বাস করিতে পারে তাহারও সুসিদ্ধ কারণ-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সভ্যজগতের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যসমূহের মূল-সূত্রগুলি বেদ-বেদাঙ্গেরই অন্তর্নিহিত আছে। (The Vedas embody the principal con-ceptions forming the body of modern scientific literature)। যাঁহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, লোকপূজ্য জগদ্গুরু সেই মহাপুরুষগণ সুদূরে লোকলোচনের বহির্ভাগে অবস্থান করেন না। তাঁহারা আমাদিগেরই সমাজে, আমাদিগেরই মধ্যে, আমাদেরই মত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা কখনই "on the hill and far away" পর্ব্বতের পরপ্রান্তে সুদূর-দেশে অবস্থিত নহেন। সুখের বিষয়, ইদানীন্তনকালে তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যও আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডের নানা দেশে অত্যুদয় লাভ করিতেছেন। মহামতি মোক্ষমূলার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত আর অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না। বেদ-সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের এই মতদ্বৈধভাব এখন সকল মহাদেশের লোকই সামঞ্জস্যের চক্ষে দেখিতেছেন। আমেরিকাখণ্ডে ইদানীন্তন কালে ইহার যে প্রকৃত চর্চ্চা হইয়াছে, তাহার সকল বিষয় আমা-দিগের গোচর হয় নাই বটে, কিন্তু দুই চারি জন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহার কিছু কিছু সন্ধান করিয়াছেন মাত্র। প্রাচীন মতের মন্ত্রশিষ্য আমরা এখনও বেদকে যে অখিল-ধর্ম্মমূল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা অযথা বা অলৌকিক নহে,—তাহা বৈদেশিকগণের পরিবর্ত্তিত মতেও প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই সকল আধুনিক মতামত সম্বন্ধে বঙ্গদেশে সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লেখালেখিও দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়পাদ প্রভৃতি অনেকে * বেদসমূহের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণপ্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান শাস্ত্রের (Exact Sciences) বিদ্যাবত্তা বেদে সম্যক্‌রূপে প্রকটিত আছে, এ কথা এখন তাঁহারা ইংরাজী সাময়িক-পত্রের স্তম্ভে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, বৈদেশিকগণ এখন দেশীয়গণের মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও নিঃসংশয়িতরূপে সুপ্রমাণ করিতেছেন। জৈমিনি, সায়ণ ও অপরাপর সকলেই বেদকে ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্ম প্রাকৃত নিয়মের নামান্তর মাত্র। Natural Law সকল বিজ্ঞানেরই মূলীভূত ও উদ্দিষ্ট। বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্ম হইতেই এই সকল প্রাকৃত নিয়মের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞ-ক্রিয়া যে

* Quarterly Journal of the Mythic Society, July, 1912

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা বৈদেশিক-মাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন। (Dhaima is synonymous with Natural Law, inasmuch as it arises after the performance of Jajna, which, in its turn, is equivalent to scientific experimentation.) বেদোক্ত দেবগণ প্রকৃতির প্রতিলিপি ভিন্ন কিছুই নহে (Agents of Nature), কারণ, দেবগণের যে সকল গুণবর্ণনার কথা বেদ হইতে বিদিত হওয়া যায়, প্রকৃতির প্রতিনিধিগণও সেই সকল গুণ গুণান্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞে দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া বিনির্দ্দিষ্ট আছে, প্রকৃতির প্রতিনিধিরও সেই সকল ক্রিয়াসম্পাদনে আহূত হইয়া থাকে। দেবগণ আমাদিগের রোগে আরোগ্য বিধান করেন, মনোরথ পূর্ণ করেন, defensive offensive অস্ত্র-শস্ত্রের কাজ করিয়া থাকেন। স্থূল কথা, তাঁহারাই আমাদিগকে সত্তা প্রদান করিয়া সম্যক্‌রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। Agents of Nature, যাহাদিগকে আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকৃতির প্রতিনিধি বলিয়াছি, তাহাদিগের সেই কাজ।

বেদবিষয়ক প্রাগুক্ত সাধারণ মন্তব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বেদসংহিতার ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্দে বৈদেশিক লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত মত-সমূহ উপনিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের একজন এমনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের প্রথম ঋক্‌টীতে উল্লিখিত অগ্নি ও Oxygen অভিন্ন নহে এবং উহাতেই Oxygen প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী দুইটী বিনিবদ্ধ রহিয়াছে, যথা—প্রথমটী Electrolysis of water, অর্থাৎ তাড়িৎ-সংযোগে জলের বিশ্লেষণ, এবং দ্বিতীয়টী—decomposition of potassium-chlorate অর্থাৎ পটেসিয়াম ক্লোরেট নামক বস্তুর উপাদান-বিশ্লেষণ। ঋগ্বেদেই হাইড্রোজান প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং তাড়িৎ সংযোগ সহকারে হাইড্রোজান ও অক্সিজানের সংমিশ্রণে জল-উৎপাদনের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে বলিয়া এখন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদের এই সকল সুপ্রণালী সঙ্গত সিদ্ধান্ত হইতেই আধুনিক Organic Chemistry উৎপত্তি, ইহা আর না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারা যায় না। Alchohals হইতে aldehydes প্রস্তুত করিবার যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে বা বিজ্ঞানবিৎ ভল্টার প্রক্রিয়ানুসারে তাড়িত প্রবাহের সৃষ্টি করিবার যে সকল পদ্ধতি আধুনিক ইউরোপীয় রসায়নশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ভিন্ন-ভিন্ন ঋকে ঋগ্বেদের অঙ্গীভূত হইয়া অনুসৃত আছে। বলিতে ইচ্ছা হয়—"বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলম্"—"The Vedas contain a clear knowledge of the exact sciences."

নিতান্ত অজ্ঞ হইয়াও প্রাজ্ঞগণের মতানুসারে 'বেদ' সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলাম। ইহার সারবত্তা সুধিবৃন্দ বিবেচনা করিবেন। হিন্দুর চক্ষে 'বেদ'—যে কি পরম পবিত্র বস্তু, তাহা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বরং বুঝাইতে পারা যায়, কিন্তু কাগজে কলমে লিখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে হইলে মাদৃশ ক্ষীণশক্তি ব্যক্তির সামর্থ্যে কুলায় না। যাহা মনে ভাবি বলিব, তাহার প্রকৃষ্ট ভাষা খুঁজিয়া পাই না, তথাপি ধৃষ্টতাপরিহার-

পূর্ব্বক যে কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিলাম, তাহাতে কাহারও যদি কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তবেই আমি ধন্য হইব। ধর্ম্মশাস্ত্র একদিকে যেমন সহজ, অন্য দিকে তেমনি জটিল; ধার্ম্মিকের চক্ষে ধর্ম্মময়প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় হিন্দুর অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ অতি প্রাঞ্জল; আবার কুটিলকটাক্ষপরায়ণ বিদ্বেষভাবাপন্ন অধার্ম্মিকের বুদ্ধিতে বেদের কুটিলতার উদ্ভেদ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গের আধুনিক বেদানুশীলনের সূত্রপাতের প্রারম্ভেই হাওড়া ও শান্তিপুরে যে দুইটী বৈদিক-সাহিত্য-সম্মিলন কিছুকাল পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীতেই আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই। অর্থাভাব ও শারীরিক অসুস্থতাই তাহার কারণ। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৌত্রেয় মহোদয়ের সাদর আহ্বান রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত ও প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছি। তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই প্রবন্ধে আমার স্বমত ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। জানি না, পবিত্রদপি পবিত্রতর বেদগ্রন্থ—"ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশন্ত ইব পাপ্মনা" হইবে কিনা! সুযোগ হইলে বারান্তরে বেদবিষয়ে আবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।

[শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বিরচিত।]

হৃদয়লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছে,
আঁধার নিয়েছে আলোক হরি;
ধরা-সুষমায় হৃদয় আমার
আর ত হরষে যায় না ভরি।
প্রাণের পিয়াসা মিটাই কেমনে
মরুভূমে এই ধরণীতল,
চারিদিকে তার উল্কা ছুটিছে—
সারা বসুধায় নাহি যে জল!

লহরীর পর লহরী তুলিয়া
নিখিল ধরার মর্ম্মশ্বাস,
করুণার লাগি উঠিল ফুটিয়া
বিশ্বরাজের চরণ পাশ।
তাঁরি করুণায় নির্ঝরের মত
ঝরিল জ্যোৎস্না বিশ্বমাঝ,
শতেক কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল
এসেছে লক্ষ্মী এসেছে আজ।

ওরে রে অবোধ জেগে দেখ্ আজি
ধরায় এসেছে সে কোন্ জ্যোতিঃ,
বিশ্বরাজের করুণা এসেছে—
নিতে হবে তারে বুকপাতি।
খুলিয়া গিয়াছে প্রেমের উৎস,
টুটিয়া গিয়াছে মর্ম্ম-দ্বার;
ঝর ঝর ঝর অঝোরে ঝরিছে—
সে মধু—সে প্রেম ঝরিছে তাঁর।

পথভুলে আজ অতিথি এসেছে,
সুধা ঝরে তাঁরি চরণ ছায়,
ওরে ও নিঃস্ব ভখেনে সে সুধা,
এ রজনী যেন বিফলে না যায়।
জ্যোছনা-সুরায় ভরি,
প্রাণ ভ'রে পেরে রূপ-ছায়ায়;
রূপ-সাগরের পিরীতির বানে
হিয়া যে গো আজ ভাসিয়া যায়।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ।

[শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের লিখিত।]

সন ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ, কাল—বিকাল, আকাশ নির্ম্মল। এই সময়ে এক দিন আমরা দার্জিলিং এর উপকণ্ঠে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম। সমান-বয়সী সঙ্গী পাই নাই; সুতরাং পাঁচ সাতটি কুমারের সহিত বেড়াইতেছিলাম। আমার পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রমোহন ব্যতীত আর সকলে দার্জিলিং-প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তান। অনেকে দার্জিলিং স্কুলের পড়ুয়া। লিবং যাইবার পথে পথিপার্শ্বে একটি গাছ দেখিয়া সঙ্গিগণ বলিয়া উঠিল,—"আসালু"। আসালুকে ইংরাজিতে Gooseberry বলে। সকলেই ঐ গাছ হইতে আসালু ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল দেখিয়া, আমিও তাহাদের কার্য্যের অনুসরণ করিলাম। এমন সময় এক জন পাহাড়ী, পথ দিয়া যাইতে যাইতে, আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"লছমনজী উস্‌কো বন্ধন কিয়া"! আমি তো তাহার বাক্যটি বেদবাক্যের মত মানিয়া লইলাম; চিন্তা করিতে লাগিলাম,—'ও কথার মানে কি'? চিন্তা করিতে করিতে উহার অর্থ যাহা বুঝিয়াছিলাম,—তাহা বলিতেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত বন-বাসে গমন করিতে দক্ষিণাপথে যান নাই;—তাঁহারা উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। রাম ও সীতা কোনও স্থলে বসিয়া থাকিতেন, আর লক্ষ্মণ তাঁহাদের ও নিজের নিমিত্ত ফল অন্বেষণ করিতে করিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে লক্ষ্মণ এই আসালু গাছটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন গাছটি ছোট ছিল; লক্ষ্মণ ঠাকুর উহার গোড়া খুঁড়িয়া দিতেন এবং নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল আনিয়া উহার গোড়ায় ঢালিতেন। এইরূপে গাছটি বড় হইয়াছে এবং আমাদিগকে ফল দিতেছে। তবে এই গাছ যে ঠিক সেই গাছ, তাহা না হইতে পারে। ইহার পিতামহ বা প্রপিতামহ সেই গাছ ছিল বা এই গাছটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত গাছের বংশধর হইবে। তা যেন হইল। কিন্তু বাল্মীকি বলেন,—লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার সহিত, গঙ্গা পার হইয়া ও বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করেন। আর এই পাহাড়ী বলিতেছে যে, লক্ষ্মণ ঐ গাছটী বন্ধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের হিমাচলে আসার কথা বাল্মীকি বলেন নাই; কিন্তু এই পাহাড়ী বলিতেছে,—'আসিয়াছিলেন।' এখন কাহার কথা বিশ্বাস করিব? বাল্মীকি কবি; তিনি অনেক অনেক আজগুবি কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা বিশ্বাস হয় না। আর পাহাড়ীর কথা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। তার পর পালিভাষায় লিখিত "দসরথজাতকং" দেখিতে পাইলাম। তাহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা বাংলা ক'রে সংক্ষেপে এই স্থানে বলিতেছি; যথা,—

বারাণসী নগরে মহারাজা দশরথ রাজ্য করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর মধ্যে, বড় রাণী দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাম পণ্ডিত, দ্বিতীয় পুত্র;

লক্ষ্মণ কুমার ও কন্যা সীতাদেবী। কালান্তরে বড় রাণীর কাল হইলে, রাজা আর একটী বড় রাণী করিলেন। ইনি কালক্রমে ভরত কুমার নামক এক পুত্র প্রসব করেন। রাজা, পুত্র-স্নেহ-বশতঃ বর দিতে চাহিলে রাণী বলিলেন—'পরে লইব' এবং ভরতের বয়স যখন ছয় বৎসর হইল, তখন রাণী বলিলেন—'দেব, আমার পুত্রকে রাজ্য দেও' রাজা, প্রথমে খুব চটিয়া বলিলেন—'বৃষলি! আমার দুই পুত্র আগুনের মত জ্বলিতেছে। তাহাদিগকে মারিয়া তোর পুত্রের নিমিত্ত রাজ্য চাহিতেছিস্।' রাণী ভয় পাইয়া শয়ন-গৃহে গমন করিলেন এবং অন্য দিন পুনঃপুনঃ রাজ্য চাহিলেন। রাজা বর না দিয়া চিন্তা করিলেন—'স্ত্রীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহিণী। এ কূট পত্র কূটোৎকচ করিয়া আমার ছেলে দুটীকে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—'তুমি এখানে থাকিলে এ শত্রুতা করিবে। অতএব তুমি সামন্তরাজ্যে বা অরণ্যে যাও এবং আমার মৃত্যুকালে আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।' অনন্তর রাজা গণৎকার ডাকাইয়া, আপনার আয়ু আর বার বৎসর আছে জানিয়া, রামকে বলিলেন—'তাত। এখন থেকে বার বৎসর পরে এসে ছত্র উচ্ছ্রিত করিবে।' 'ভাল কথা'—এই বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণ পিতাকে বন্দনা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাসাদ হইতে নামিলেন। 'আমিও ভাইদের সঙ্গে যাইব' বলিয়া সীতাদেবী পিতাকে বন্দনা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলেন। বিস্তর লোক তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া চলিল। তাঁহারা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া হিমবৎ-পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন, এবং যেখানে খুব জল ও ফল-মূল পাওয়া যায়, সেই স্থানে আশ্রয় করিয়া ফলমূল খাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ পণ্ডিত। সীতা ও রামকে পণ্ডিত বলিলেন—'তোমরা আমার মা বাপের মত। সেই হেতু আশ্রমে থাক। আমি ফল মূল আহরণ করিয়া তোমাদিগকে পোষণ করিব'—এই প্রতিজ্ঞা ক'রলাম।

মন্তব্য—তবেই দেখা গেল, পাহাড়ীর কথাটা সত্য বটে। রাম ও লক্ষ্মণ, হিমালয়ে আসিয়াছিলেন—দণ্ডকারণ্যে যান নাই। আর বানরদের সঙ্গে রামের মিত্রতা ইত্যাদি ব্যাপার, বাল্মীকির কল্পনা মাত্র। সুগ্রীব, বালী প্রভৃতি তথাকথিত বানরগণ, বানর ছিলেন না। রাবণাদি কল্পিত ব্যক্তি নহেন, ইঁহারা বিদ্যাবান্ ধনবান্ জিনধর্ম্মপরায়ণ শুচি মানব ছিলেন। ধর্ম্ম-পরীক্ষা * নামক জৈনগ্রন্থে—

"শাখামৃগাভবন্ত্যেতে ন সুগ্রীবপুরঃসরাঃ। ন লোককল্পিতা মিত্র রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ॥
বিদ্যাবিভবসম্পন্না জিনধর্ম্মপরায়ণাঃ। শুচয়ো মানবাঃ সর্ব্বে সদাচারা মহৌজসঃ॥
ততঃ শাখা মৃগাঃ প্রোক্তা যতঃ শাখামৃগধ্বজাঃ। সিদ্ধানেকমহাবিদ্যা রাক্ষসা রাক্ষসধ্বজাঃ॥
গৌতমেন যথা প্রোক্তাঃ শ্রেণিকায় গণেশিনা। শ্রদ্ধাতব্যাস্তথা ভব্যৈঃ শশাঙ্কাঽজ্জ্বলদৃষ্টিভিঃ॥

* * * *

জগাম যঃ সিদ্ধিবধূবরত্বং বালিমর্হাত্মা হৃতকর্ম্মবন্ধঃ।
নীতঃ স রামেণ নিহত্য মৃত্যুং বাল্মীক ইত্থং বিতথং বভাষে॥"

অর্থ—হে মিত্র। সুগ্রীবাদি বানর ছিলেন না। রাবণাদি রাক্ষসগণ, কল্পিত ব্যক্তি নহেন।

---

* Bhandarkar's Report, 1884. এই গ্রন্থের রচনাকাল—সংবৎ ১০৭০

ইঁহারা বিদ্যাবিভবযুক্ত ও জিনধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন—শুচি, সদাচারবান্ ও মহাতেজস্বী ছিলেন। যাঁহাদের চিহ্ন ছিল—বানর, তাঁহাদিগকে বানর ও যাঁহাদের রাক্ষস চিহ্ন ছিল, তাঁহাদিগকে রাক্ষস বলা হয়। এই তথাকথিত রাক্ষসেরা অনেক মহাবিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন। গণেশি গৌতম, রাজা শ্রেণিককে যেরূপ বলিয়াছেন, চন্দ্রের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি-যোগ্য লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা বালী, কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাম, তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন—বাল্মীকি এ কথাটি মিথ্যা বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—উপরে ধৃত চতুর্থ শ্লোকের "শ্রেণিক"—শ্রেণিক বিম্বিসার। ইনি, মগধের রাজা ছিলেন। গণেশি—গণধর। শ্রমণভগবান্ মহাবীরস্বামীর নবগণ ছিল। প্রথম গণের গণধর গৌতম-গোত্র স্থবীর ইন্দ্রভূতি। এই ইন্দ্রভূতিকে, উদ্ধৃত শ্লোকে, গৌতম বলা হইয়াছে। ইনি মহাবীরের প্রথম শিষ্য। ইন্দ্রভূতির পিতা ব্রাহ্মণ বসুভূতি ও মাতা—পৃথ্বী। ইন্দ্রভূতি, মগধের গোবর গ্রামে জন্মিয়াছিলেন এবং মহাবীরের নির্ব্বাণের দ্বাদশ বৎসর পরে (খৃঃ পূর্ব্ব ৫১৫ অব্দে), ৯২ বৎসর বয়সে, রাজগৃহ নগরে দেহত্যাগ করেন।

গণধর গৌতম, মহাবীরের নিকট রামচরিত শুনিয়াছিলেন। অতএব শ্রীপউমচরিয়ং (পদ্মচরিত্র) কর্ত্তা বিমলসূরি নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন—

"এবং বীরজিণেণ রামচরিঅং সিদ্ধং মহত্থং পুরা
পচ্ছাথংডলভূতিণা উকহিঅং সিস্সাণ ধম্মাসযং।
ভূযো সাহুপরং পরাই সযলং লোএ ঠিঅং পাযডং
এত্তাহে বিমলেন সুত্তসহিঅং গাহা নিবদ্ধং কযং॥"

অর্থ—পঞ্চকল্যাণ মহেশ্বর বীর জিন, পুরাকালে শিষ্যদিগকে সিদ্ধ মহার্থ ধর্ম্মাশ্রয় রামচরিত কহিয়াছিলেন। আবার সকল রামচরিত সাধু পরম্পরাক্রমে লোকে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব বিমল সূত্র সহিত গাথা নিবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত 'দশরথ জাতক' মতে নবম বৎসর গত হইলে, রাজা দশরথ পুত্রশোকে মরিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর-সৎকারের পর, ভরত বনে গমন করিয়া, রামকে আনিতে চেষ্টা করেন ও বারাণসী রাজ্য দিতে চাহেন। পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া রাম কাঁদিলেন না। তিনি বলিলেন—'পিতা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য করিবে। নয় বৎসর গিয়াছে, তিন বৎসর বাকি আছে। এখন আমি যাইব না।' ভরত বলিলেন,—'তবে কে রাজ্য করিবে?' রাম বলিলেন—'তুমি।' ভরত বলিলেন,—'আমি রাজ্য করিব না।' তখন রাম বলিলেন—'আমি যত দিন না যাই, আমার এই পাদুকা রাজ্য করিবে।' এই কথা বলিয়া, রাম, আপনার তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত, পাদুকা গ্রহণ করিয়া, বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অমাত্যেরা তৃণ-পাদুকা রাজপালঙ্কে স্থাপিত করিয়া, অর্থবিনিশ্চয় করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর পরে রাম, বারাণসী নগরে গিয়া, উদ্যান প্রবেশ করিলেন। কুমারগণ, তাঁহার আগমন হইয়াছে জানিয়া, অমাত্যদিগের সহিত, উদ্যানে গিয়া সীতাকে অগ্রমহিষী করিয়া রাম ও সীতাকে অভিষেক করিলেন।

জৈনদিগের 'পুর্ণচন্দ্রোদয়' পুরাণোক্ত রাবণাদির কথা অনেকটা বাল্মীকির রামায়ণের অনুরূপ। বিশেষ এই—সীতা, মন্দোদরীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, জনক, ভূমি-খনন-কালে মঞ্জুষাস্থিত কন্যা পাইয়াছিলেন, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বারাণসী-গমন-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করেন। দশরথ, রামের রাজ্যাভিষেক করেন। সীতার গর্ভে রামের অষ্টপুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে লঘু নামক পুত্রকে যৌবরাজ্য দিয়া, জিনদেবের নিকট গমন করিয়া, রাম 'কেবল' দীক্ষা গ্রহণ করেন।

রাম যে রাক্ষসদিগকে বধ করেন, তাহার একটা মস্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণাপথে, নাসিক নগরে, এক ব্রাহ্মণ-গৃহে, কাত্যায়নকৃত 'চরণব্যূহ' নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—

"যে রামেণ হতাঃ পূর্ব্বং রাক্ষসা গৌতমী-তটে।
তে সর্ব্বে ব্রহ্মণাজাতাঃ কোংকণে বেদপারগাঃ॥"

অর্থ—গোদাবরী-তটে, যে সকল রাক্ষস, রাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই কোংকণ-দেশে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

মন্তব্য।—দেখিতে পাই, কোঙ্কণদেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ বলেন। যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন—রাম, রাক্ষস-বধ করেন নাই; তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, কোংকণস্থ ব্রাহ্মণগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কাত্যায়নের কথা সত্য নহে, তাহাও তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। নতুবা, তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করিব না।

রাবণ।—বরাহ-পুরাণ হইতে পাইতেছি, রাবণের আশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে ছিল। যেখানে শালগ্রাম * গিরি হইতে গণ্ডকী নদী বাহির হইয়াছে, সেখানে সোমেশ্বর শিব আছেন। এই সোমেশ্বর শিবের দক্ষিণ-ভাগে রাবণ, পর্ব্বত কাটিয়া জলধারা বাহির করেন। ইহার নাম হয়—রাবণ-গঙ্গা। সোমেশ্বরের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে রাবণের তপোবন। এখানে রাবণ নৃত্য করিতে থাকিলে, মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করেন। রাবণ, এখানে নৃত্য করেন বলিয়া, এখানকার পর্ব্বতের নাম হয়—"নর্ত্তনাচল"। তিব্বতদেশের "রাবণ হ্রদ" রাবণের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস, তিব্বতের যর্লুঙ্গ নামক স্থানে রাক্ষস রাবণের এক ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। † কালান্তরে রাবণ, কি জানি কোন কারণে হিমালয়ের উপর চটিয়া, লঙ্কায় গমন করেন। বোধ হয়, "ন চিরং পর্ব্বতে বসেৎ",—এই মনুবচন স্মরণ করিয়া পর্ব্বত-বাস ত্যাগ করেন। 'লঙ্কাবতার-সূত্রে' কথিত আছে—ভগবান্ বুদ্ধ, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রার্থনা অনুসারে লঙ্কায় গিয়া রাক্ষসদিগকে সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে—লঙ্কেশ্বর রাবণ, মলয়-গিরিতে গিয়া, তথায় শাক্যসিংহের নিকট অতীত বুদ্ধদিগের ইতিহাস শুনিয়াছিলেন।

* Salagrama—A place situated near the source of the river Gandak, where Bharata and Rishi Pulaha performed asceticism. (Nundalal De, "Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India")

† Monier William's Buddhism, p 492.

কাপ্তেন কর্বেসের প্রবন্ধে কথিত সিংহলীয় গ্রন্থ 'রাজাবলিঅ' মতে রাবণের সময় হইতে গৌতম-বুদ্ধের অব্দ পর্য্যন্ত ১৮৪৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। সিংহলীয় গ্রন্থ রাজাবলিঅ, কদৈমপোত ও লঙ্কারিস্তুঅ গ্রন্থে রাবণের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সিংহলের আংশিক জলমগ্নতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সিংহলের পরিধি ১৩৩ যোজন ছিল, ঐ ঘটনা দ্বারা উহার পরিধির হ্রাস ও ঐ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশস্থিত শ্রীলঙ্কাপুর নষ্ট হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। *

সেমুএল বীল বলেন—সিংহলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে লঙ্কা নামক এক পাহাড় আছে, রামায়ণে ইহার শৃঙ্গ বর্ণিত আছে। এই স্থানে রাবণের বাস ছিল। 'ইউরোপে তিন বৎসর' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—সিংহলের নিকটস্থ সমুদ্রে 'রাবণ কোট' নামক এক পাহাড় আছে। রত্নশাস্ত্রে লিখিত আছে—সিংহলের রাবণ-গঙ্গা হইতে পদ্মরাগমণির উৎপত্তি হয়। Baddhist Text Society's জর্ণালে লিখিত হইয়াছে—কলম্বোর ৪০ মাইল অন্তরে নিকুম্ভিলা নামক এক স্থান আছে। এই স্থানে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। Hardy's Manual of Buddhism (P. 210) পুস্তকে লেখা আছে, কলম্বোর পাঁচ মাইল অন্তরে কেল্লনীর বা কল্যাণ নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামে রামের সখা, রাবণের বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা, দেবত্বপ্রাপ্ত পুলস্ত্যপুত্র 'বিবিসনের' পূজার প্রধান স্থান। সহদেব যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, বিভীষণ তখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাভারতে লেখা আছে,—সমুদ্রের কচ্ছগত সহদেব, পৌলস্ত্য বিভীষণের নিকটে দূতদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। †

সেন্ট্রেল প্রভিন্সে ছিন্দবা জেলায় এক রাজা আছেন। তিনি আপনাকে রাবণের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। সকলেই জানেন, রাবণের মাতা—নিকষা। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত 'পুঁথিতালিকা' (1898 No.80) হইতে জানিতে পারি, নৈচাটি-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-গৃহে নিকষা রাক্ষসী কৃত 'কেরলশাস্ত্রোক্তসূত্রম্' নামক একখানি স্মৃতি-শাস্ত্রের পুঁথি আছে। আহা! নিকষা রাক্ষসীর হৃদয় কি সুন্দর। তিনি ব্রাহ্মণের হিতার্থ, দয়া করিয়া, মাথা ঘামাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা হইতেছে—রাক্ষসী-ভাষা। তিনি সে ভাষায় গ্রন্থ লেখেন নাই—সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। তিনি নানা-ভাষা-বিশারদা পণ্ডিতা। এক কথায়, তিনি Linguist ছিলেন। আলোয়ারের মহারাজার পুঁথিখানায় শ্রীলংকানাথ রাবণকৃত 'অর্ক প্রকাশ' পুঁথি আছে। 'বাঙ্গাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে' ঐ পুঁথি আর একখানি বিরাজ করিতেছে। উহার আর এক নাম—রাজমর্ত্তণ্ড। উহাতে 'ধাতুশুদ্ধিশতকং' আছে। ধাতু-দ্রব্যের জারণ মারণ কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আরম্ভ হয় নাই।

---

* Journal of the Asiatic Society Bengal v. p. 325.

† কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী (৩।৭৩—৭৪) হইতে আমরা আর এক বিভীষণের অস্তিত্বের সংবাদ পাই। কাশ্মীর-রাজ মেঘবাহন (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে) প্রাণিহিংসা-নিবারণের নিমিত্ত যখন লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন সেখানে লঙ্কাধিরাজ রাক্ষসরাজ বিভীষণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

আরও অনেক রাবণ ছিলেন। ঋগ্বেদের এক ভাষ্যকার রাবণ, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের এক টীকাকার রাবণ, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত কাশ্মীরের এক রাজা রাবণ। লঙ্কেশ্বর রাবণ, ব্রাহ্মণ ছিলেন। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সুবজীবপু তাহার "লঘুটীকা" পুস্তকে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—"রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্রাবণো ব্রাহ্মণোমতঃ।"

রাবণ—নিকষার পুত্র। নিকষার উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে নৈকষ্য হয়। অতএব রাবণ নৈকষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, জানা যাইতেছে। কিন্তু তিনি নৈকষা কুলীন ছিলেন কি না, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ময়দানব—রাবণের শ্বশুর—ময়দানব বা ময় অসুর। তাঁহার বাড়ী ইন্দ্রপ্রস্থের বিশ ক্রোশ অন্তরে "ময়রাষ্ট্র" * ছিল। সকলেই জানেন,—ময়, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে—

"অস্তি ত্রিজগতি খ্যাতো ময়নামা মহাসুরঃ। আসুরং ভাবমুৎসৃজ্য শৌরীংস শরণং গত॥

অর্থ—মহাসুর ময় তিন জগতে খ্যাত আছেন। তিনি আসুর-ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে "যন্ত্রসূত্রঞ্চ নাগরম্"। এই নাগর-যন্ত্রসূত্র লুপ্ত হইয়াছে। ময় নাকি যন্ত্র-শিল্পের বড় ওস্তাদ ছিলেন। কথাসরিৎসাগরে জলযন্ত্র, তেজোময়যন্ত্র, বাতযন্ত্র, আকাশযন্ত্র, চক্রযন্ত্র, বাতযন্ত্রবিমান,—এই সকলের বর্ণনা আছে। বাতযন্ত্র হইতেছে—"হাওয়া গাড়ী"! কি আশ্চর্য্য অনুবাদ! অনুবাদক যেই হউন্, তিনি হাওয়া-গাড়ীর সংস্কৃত নাম বাতযন্ত্র না জানিয়াও মটোরের কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন!

বাল্মীকি।—মহাভারতে (বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়ে ও উদ্যোগপর্ব্ব, ৮২ অধ্যায়ে) বাল্মীকিকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক-রূপে পাওয়া যায়। তাঁহার দুইটী আশ্রমের সন্ধান পাইয়াছি। একটী কাণপুরের কিয়দ্দূরস্থিত বিঠুর, আর একটী গাড়বাল-দেশে অলকানন্দা নদীর তীরে টিরিরি রাজার রাজ্যে অবস্থিত।

—*—

সারস্বত স্তোত্রম্।

[শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ মহাশয়ের রচিত।]

জয়তু জয়তু বাণী, কল্যাণী শ্রীনন্দিতে,
জয়তু জয়তু দেব মনুজৈর্হি বন্দিতে।
জয়তু জয়তু বিদ্যা বিপুলজ্ঞানদাত্রি,
জয়তু জয়তু চতুঃষষ্টি কলাবিধাত্রি!
জয়তু জয়তু বাচা, বাক্যপ্রমাদহন্ত্রি,
জয়তু জয়তু বীণা নামকদিব্যযন্ত্রি।
জয়তু জয়তু নানা বাদ্যাভিমোদিতে,
জয়তু জয়তু নৃত্যগীতাদিভি র্হর্ষিতে।
জয়তু জয়তু মাতঃ শ্বেত পদ্মোব বর্ণে,
জয়তু জয়তু ভাষা, হীরালঙ্কৃতকর্ণে!
জয়তু জয়তু গিরা, ধীরা স্থিরা পণ্ডিতে,
জয়তু জয়তু রত্নহারাভিবিমণ্ডিতে,
জয়তু জয়তু বিম্বাধরেষৎহাস্যযুক্তে,
জয়তু জয়তু জ্যোতিশ্চর্চ্চিত শুভ্র বক্ত্রে,
জয়তু জয়তু হংসশতপর্ণাধিষ্ঠিতে,
জয়তু জয়তু ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাদিভির্ণমিতে।
জয়তু জয়তু বেদ বেদ্যাচশুদ্ধসত্ত্বে,
জয়তু জয়তু বর্ণিমাতৃকেঽহং নমস্তে!

* Nunda Lal De's Geographical Dictionary.

কবি কালিদাসের বঙ্গে অবস্থিতি।

[রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল মহাশয়ের লিখিত।]

(১)

কবি-শিরোমণি কালিদাস বহুকাল বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন,—এই কথা এখন কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ই প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, কবি কালিদাস বঙ্গে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ পরাজয় করিলে, তন্নামানুসারে 'সমুদ্রগড়' নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ ঐ নগরের সংলগ্ন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কালিদাস তৎপ্রতিষ্ঠিত সমুদ্রগড়ে আসিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অসবর্ণা স্ত্রী বিদ্যাকে লইয়া তিনি বহুকাল নবদ্বীপে গার্হস্থ্য-সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবদ্বীপেই তিনি সরস্বতীদেবীকে কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট করিয়া অনুপমা কবিত্ব-শক্তি-লাভে লব্ধকাম হইয়াছিলেন। যে স্থানে কালিদাস সরস্বতীদেবীর বর লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান নাকি এখনও বর্ত্তমান—ব্রহ্মাণীতলা' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চারি কি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে "গৃহস্থ" পত্রিকায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত একটী প্রবন্ধে এই সব কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। পত্রিকাখানি এখন আমার নিকট নাই। সামান্য টিপ্পনী ও স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যুক্তি সম্ভার স্মরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। অল্প-স্বল্প ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারে; তজ্জন্য সুধিকুল ক্ষমা করিবেন। কোনও মূলকথার অপহ্নুতি বা বিপর্য্যয় ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বলিতে পারি না—স্মৃতি-ভ্রংশের বা চিত্তবৈক্লব্যের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

"ভারতের কালিদাস" বঙ্গে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার অমর-কাব্যের দুই একটি বঙ্গভূমিতে বিরচিত হইয়াছিল, ভাবিতে পারিলে, বঙ্গবাসী মাত্রের হৃদয়কন্দরে যে অপার আনন্দভব হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়, আত্মগরিমা ও আত্মশ্লাঘার খরস্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গভূমি আপ্লুত করিবে, তাহাও অনুভাব্য। কাব্যতীর্থ মহাশয়ও এই মহোল্লাসে বিভোর। কিন্তু আনন্দ-হিল্লোলে ভাসমান হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গসন্তানমাত্রেরই ভাবা উচিত,—এই আনন্দের সত্য সত্য সুষ্ঠু কারণ আছে কি না? প্রকৃতপ্রস্তাবে কালিদাসের বঙ্গাবস্থান—যুক্তিমূলে, ইতিবৃত্তাশ্রয়ে—প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না, সকলেরই ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের স্থির বিশ্বাস এই,—তিনি স্বীয় উক্তির অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইয়াছেন, সেই জন্য তিনি হর্ষোন্মত্ত। কিন্তু প্রমাণমূলে বিচারমুখে যদি ঈদৃশী প্রতীতি ভিত্তিহীন ও হেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অকারণ কলনাদে জগন্মুখরিত করিবার আবশ্যক কি? মহাকবির বঙ্গাধিষ্ঠান সম্বন্ধে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই আপাততঃ অন্বেষ্টব্য। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, বাস্তবিক কোন্ নগরীতে

কবি অবস্থিতি করিতেন, কোন্ স্থানে তাঁহার মর্ত্ত্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাও পরিচিন্তনীয়। এই দুইটি কথার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক।

কাব্যতীর্থের যুক্তিজাল।

সমুদ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে বঙ্গ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি "হুন" কি "পারসীক" জাতিকে সমরাঙ্গণে পরাজিত করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু কখনও যে বঙ্গ-পরাজয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। "আসমুদ্রক্ষিতীশ" বলিলেই যে তাঁহার সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা যুক্তিমূলে স্থির করা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সাগর দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিমে সিন্ধুনদের সন্তেদে মহোদধি বর্ত্তমান। সমুদ্রগুপ্ত "হুন"-নির্য্যাতনে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সাম্রাজ্য "রেবার"-মুখ হইতে "সিন্ধু"-সন্তেদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্যবিস্তৃতি যে "হিমবৎপ্রতিম "পূর্ব্বাপরৌতোয়নিধীবগাহ্য", তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখন স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানবলীলা-সম্বরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের পর পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই মতই ক্রমশঃ পণ্ডিতসমাজে লব্ধপদ হইতেছে। কিন্তু এ কথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই; তর্কানল এখন উচ্ছিখ, প্রজ্বলিত। বাস্তবিক "আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ" (রঘুবংশ) বলিয়াই যে কবি অপ্রত্যক্ষভাবে কুমারগুপ্তের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। তবে অন্যান্য প্রকৃষ্ট প্রমাণের সহিত ইহার গূঢ়ার্থ বুঝিবার চেষ্টা নিতান্ত অসমীচীন না হইতে পারে। কবির আবির্ভাব-নিরূপণ করা, এ সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, কুমারগুপ্তের একছত্রত্বের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখন পণ্ডিত-সমাজের ইহাই বিশ্বাস। আপাততঃ এই কথা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গপরাজয় না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তন্নামানুসরণে সমুদ্রগড়ের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কালিদাস যদি সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী নৃপকুমারগুপ্তের রাজত্বকালে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সমুদ্রগুপ্তের সমভিব্যাহারে বা অব্যবহিত পরে বঙ্গে আগমন ও সমুদ্রগড়ের সন্নিহিত নবদ্বীপে বাসস্থাপন নিতান্ত অসঙ্গত, সর্ব্বসমক্ষে সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ধ্রুবধারণা যে, কবি কলিদাস ও কাশ্মীরাধিপতি মাতৃগুপ্ত একই ব্যক্তি। যতদূর মনে পড়ে, ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রামদাস সেন মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে' এই মত সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই মত কেহ কুত্রাপি প্রত্যাপিত করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। এই মত যে নিতান্ত সন্দেহাস্পদ, তাহাই আমি অল্প কথায় প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইব। কহ্লণ-পণ্ডিতকৃত "রাজতরঙ্গিণীতেই" মাতৃগুপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীর অধীশ্বর শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভায় এক বৎসর ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিলেন। অতীব সুপণ্ডিত হইলেও এতদিনে

তিনি কোনও রাজপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনোভাব সবিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্য, রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রসন্নতা দেখাইতে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে নৃপতি এক দিন রাত্রিকালে প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, মাতৃগুপ্ত উন্নিদ্র, জাগ্রত। কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, মাতৃগুপ্ত নিম্নোদ্ধৃত [illegible]রস শ্লোকে নৃপ-প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন,—

"শীতেনোদ্ধৃষিতস্য মাষশিমিবচ্চিন্তার্ণবে মজ্জতঃ শান্তাগ্নিং স্ফুটিতাধরস্য ধমতঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্য মে।
নিদ্রা কাপ্যবমানিতেব দয়িতা সন্তজ্য দূরং গতা সৎপাত্রপ্রতিপাদিতেব বসুধা নক্ষীয়তে শর্ব্বরী॥"

রাজতরঙ্গিণী, তৃতীয়স্তরঙ্গঃ

"আমি এখন শীতপ্রপীড়িত, মাষশিম্বির ন্যায় চিন্তাসাগরে মগ্ন, নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ফুৎকার দিতে দিতে প্রভিন্নাধর, ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ। আমার নিদ্রা অবমানিতা স্ত্রীর ন্যায় কোথায় দূরে চলিয়া গিয়াছে। সৎপাত্রদত্তা পৃথিবীর মত, রাত্রি আর ক্ষয় হইতেছে না।"

এই সুন্দর উত্তর শুনিয়া ভূপতি শ্রীহর্ষের মনে যুগপৎ অনুকম্পা ও অনুতাপের উদয় হইল। কিরূপে মাতৃগুপ্তকে সবিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে পারেন, তিনি ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে হইল,—কাশ্মীররাজ হিরণ্য নিঃসন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কাশ্মীর এখন রাজশূন্য। মাতৃগুপ্তই শূন্য-সিংহাসন অধিকার করিবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত পাত্র। এই প্রতীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে তল্লিখিত রাজশাসন লইয়া মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরে যাইতে আদেশ করিলেন। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরে উপস্থিত হইল; অমাত্য কুন তাঁহাকে অভিষেকান্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মাতৃগুপ্তের কাশ্মীর-রাজ্য-লাভ এই প্রকারে ঘটিয়াছিল,—"রাজতরঙ্গিণীতে" এই কথাই পাওয়া যায়।

কালিদাসের কাব্যাদি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে, তিনি হিমালয়ের সানুদেশে বা অধিত্যকায় দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। হিমবৎ-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অত্যল্প, ইহাই প্রকাশ পায়। কুমারসম্ভবে কালিদাস হিমালয় বর্ণন করিয়াছেন। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে উত্তরদিকে পার্ব্বত্যভূমির পূর্ব্বভাগে কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের বর্ণনেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার মেঘদূতে জলধরকে অলকায় প্রেরণ করিবার সময়, গঙ্গোত্রী ও উদীচ্য শৈলমালারও অল্প-স্বল্প বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যাউক, ঐ সব কাব্যাদি হইতে কবির হিমালয়-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। "অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্"—"হিমালয়ের তুষারসঙ্ঘতি সৌভাগ্য-লোপ করিতে পারে নাই, কারণ, অসংখ্য রত্ন তদভ্যন্তরে নিহিত। অনেক ধাতুজ পদার্থ হিমালয়ে পাওয়া যায়, কবি এইমাত্র বলিলেন। "পদং তুষারশ্রুতিধৌতরক্তম্ যস্মিন্নদৃষ্টাপি হতদ্বিপানাম্। বিদন্তি মার্গং নখরপ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ।" কুমারসম্ভবম্, প্রথমঃ সর্গঃ।

'হিমালয়ে তুষার-দ্রবে বিধৌত কেশরীগণের পদ-চিহ্ন না দেখিয়াও, নখরস্খলিত গজমুক্তা দেখিয়া কিরাতেরা করিহন্তা সিংহ কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছে।'

হিমালয়ে তুষার সঙ্ঘাত আছে, গজ এবং সিংহও আছে,—এই শ্লোকে তাহারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ে যে তুষারসম্পাত হয়, তাহা সকলেই জানেন। অসূর্য্যম্পশ্যা

স্পৃশ্যরূপারও অবিদিত নহে। শৈলশিখরে হিমক্লিষ্ট হইয়া গজবৃন্দ ও সিংহগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে। এ কথা হয় তো প্রাণিতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করিবেন না। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান-দেশেই উহাদের আবাসভূমি নির্ণীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, গজকুম্ভে যে মুক্তাফল পাওয়া যায়, ইহা একটি প্রসিদ্ধ কবিকল্পনা মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিমাচলে দীর্ঘকাল বাস করিলে, কবি কেবল কল্পনায় উপর নির্ভর করিয়া গজমুক্তার উল্লেখ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত 'কুমারসম্ভবে' আর কি পাওয়া যায়? কীচকরন্ধ্রে মরুত-হিল্লোলোদ্ভূত শব্দজাতের "তানপ্রদায়িত্ব" উৎপ্রেক্ষা করিয়া, কবি উদ্দাম কল্পনার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। হিমালয় দেবযোনীর প্রিয় আবাসভূমি, কবি এ কথাও বলিয়াছেন। স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে, ইহা কেবল জনশ্রুতির পুনরুল্লেখ মাত্র। ফলতঃ, "কুমারসম্ভব" হইতে কালিদাসের হিমালয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। "রঘুবংশে" হিমালয় বর্ণন করিতে গিয়া কবি যে কোনও নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না।

"ততো গৌরীগুরুং শৈলম্ আকরোহাশ্বসাধনঃ। বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকূটান উদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ॥"
রঘুবংশম্, চতুর্থঃ সর্গঃ। "রঘু অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া গৌরীর জনক হিমাচলে আরোহণ করিলেন। তাহার অত্যুচ্চ শিখর সব উৎক্ষিপ্ত ধাতুরেণুর দ্বারা যেন বর্দ্ধিত হইল।"

এখানেও হিমালয় যে অনেক ধাতুর আকর, এই কথাই উল্লিখিত হইল। তৎপরেই কবি বলিতেছেন যে, মরুৎবৃন্দ "ভূর্জ্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ", "কীচকধ্বনিহেতবঃ"। পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কীচকাখ্য বেণুবিশেষে মরুৎসংস্পর্শে শব্দ উত্থিত হয়; এখন নূতন কথার মধ্যে জানিলাম, যে শুষ্কভূর্জ্জপত্রে সমীরণসঙ্ঘর্ষে মর্ম্মর শব্দ জন্মিতেছে। বায়ুর সংস্পর্শে যে শুষ্কপত্রে মর্ম্মর শব্দ জন্মে, এই জ্ঞানের জন্য হিমালয়ের অধিত্যকায় দীর্ঘকাল বাস আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। সমতলভূমে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাও শরৎকালে শুষ্কপর্ণমধ্যে বায়ু সঞ্চারিত হইলে বহুশঃ মর্ম্মরধ্বনি শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং, এই কথার কিছু বিশেষত্ব নাই। গুহালীন সিংহ, মদস্রাবী হস্তী, নমেরু, দেবদারু (নামান্তর সরল) কস্তূরীমৃগ প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্যপ্রদেশ সম্বন্ধে এই সামান্য জ্ঞান লোকমুখে শুনিয়াও জন্মিতে পারে—দীর্ঘকালব্যাপী শৈলবাসেই ঈদৃশ জ্ঞান সম্ভব, এমন নহে। লৌহিত্যা নদী পার হইয়া রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কবিবাক্যে এই কথা জানিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন,—লৌহিত্যা-নদীই ব্রহ্মপুত্র নদ। এ সিদ্ধান্তের কারণ কি, অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। গণ্ডকী ও ত্রিস্রোতার অনুল্লেখ দেখিয়া মন সংশয়াকুল হইয়া উঠে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ অতিক্রম করিয়া রঘু কামরূপে সৈন্য-সন্নিবেশ করেন। কি প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ কি কামরূপের রাজা, কেহই রঘুর সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন না—তাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রঘুর দিগ্বিজয় এবং তৎসঙ্গে হিমাচল-বর্ণনও এই স্থানে সমাপ্ত হইয়াছে। "মেঘদূতেও" হিমালয় সম্বন্ধে স্মর্ত্তব্য বা উল্লেখযোগ্য কোনও কথা দেখা যায় না।

"আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্॥"

—মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘঃ।

"যে পর্ব্বতের শিলাতল আসীন কস্তূরী মৃগযূথের দ্বারা সুরভিত হইয়াছে, যে শৈলশ্রেণী হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার শিখরদেশ তুষারমণ্ডিত হইয়া গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, সেই হিমাচলের শৃঙ্গে তুমি পথশ্রমাপনোদনার্থ উপবিষ্ট হইয়া ত্রিলোচনের শ্বেতবর্ণ বৃষ কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত পঙ্কের অনুরূপ শোভা ধারণ করিবে (কবি-কল্পনায় মেঘ কৃষ্ণকায়)।"

এই শ্লোক হইতে হিমালয়ের শিখরাবলি তুষারমণ্ডিত, সানুদেশ কস্তূরীমৃগকুলের নিবাস-ভূমি ও পুণ্যতোয়া জাহ্নবী এই শৈলাভোগ হইতে উদ্ভূত,—ইহাই জানিতে পারা যায়। ইহার অল্প পরেই কবি লিখিতেছেন,—"মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্"। কোষকার বিশ্ব "শরভ" এক প্রকার অষ্টাপদ মৃগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাপদ মৃগ কবি-কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। অষ্টাপদ মৃগ এখন নাই; পূর্ব্বে যে ছিল, তাহারও কোনও বিশ্বসনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার সেই "শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ।" বায়ুসংযোগে শব্দায়মান কীচকের কথা তো অনেকবার শুনিয়াছি। কবি "ক্রৌঞ্চরন্ধ্র" দিয়া জলদকে উত্তরদিকে—অলকার পথে—যাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

বাস্তবিক "হংসদ্বারং ভৃগুপতি-যশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্", এই উক্তিতে কালিদাসের পৌরাণিকী কথা বা ঐতিহ্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ, মেঘদূত হইতে গিরিতটে বাস বা গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া বহুশঃ যাতায়াতের কোনও অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারা যায় যে—মাতৃগুপ্ত শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের কি কুমারগুপ্তের সময় কালিদাস আবির্ভূত হন নাই। ঐ গ্রন্থ হইতে আরও প্রকাশ পায় যে, মাতৃগুপ্ত শেষ-দশায় স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যতিবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বারাণসীতে বাস করেন।

"অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বং সংন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্‌যতিঃ॥"

"সুকৃতী মাতৃগুপ্ত বারাণসীতে গিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যতি হইয়াছিলেন।"

কালিদাস যে কখনও যতিবেশে কাশীবাস করিয়াছিলেন, কুত্রাপি তাহার কোনও আভাষ পাওয়া যায় না।

কালিদাসের কাব্যাদি হইতে দেখাইয়াছি যে, তাঁহার পার্ব্বত্য-প্রদেশের সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। এস্থলে কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি বলিয়া স্থির করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "রাজতরঙ্গিণী" হইতে কাশ্মীরের রাজধানীর নাম শ্রীনগর জানিতে পারা যায় না। এই সর্ব্ব অবিদিত ও অনিশ্চিত বিষয় সত্ত্বেও, কালিদাস ও মাতৃগুপ্তের এক স্থির করিয়া, তিনি জীবনে কেবল শ্রীনগর হইতে নবদ্বীপ ও নবদ্বীপ হইতে শ্রীনগর যাতায়াত করিয়াছেন সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অযৌক্তিক। নবদ্বীপ হইতে

শ্রীনগর ৭৫০ ক্রোশ বা তদূর্দ্ধ হইবে। কালিদাসের সময় বাষ্পরথ ছিল না, তখন তিনি নিরন্তর এই নিরর্থক অধ্বশ্রম ভোগ করিয়াছেন, মনে করাও দুষ্কর। কিন্তু কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসকে এই অকারণ পথশ্রম ভোগ করাইতে সবিশেষ উৎসুক। স্থূল-কথা, কালিদাস কাশ্মীরের রাজা ছিলেন এবং নবদ্বীপ ও কাশ্মীর উভয়ত্র বাস করিতেন মনে করা বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে সহজ নহে। মাতৃগুপ্তের উপাখ্যান এই স্থানেই পরিসমাপ্ত করিলাম।

ব্রহ্মাণীতলা লইয়া আপাততঃ একটু আলোচনা করিব। সত্যসত্যই নবদ্বীপে "ব্রহ্মাণী-তলা" বলিয়া একটি দেবালয় বা দেবায়তন এখনও বর্ত্তমান আছে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ধারণা যে, কবি কালিদাস ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণার মূলে কিম্বদন্তী। প্রথম বয়সে কালিদাস অতীব মূর্খ ছিলেন। পরিভব-দুঃখে মর্ম্মাহত কতিপয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া মূর্খ কালিদাসকে বিদগ্ধাগ্রগণ্য মৌনী বলিয়া জৈত্রী বিদূষীর নিকটে লইয়া আসেন। কালিদাস তদীয় প্রশ্নের অর্থ অবধারণ না করিয়া উত্তরচ্ছলে দুই একটি সঙ্কেত মাত্র করেন। বিদূষী সারবোধানুসারে অর্থারোপ করিয়া মৌনী পণ্ডিতের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহারই সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অচিরেই কালিদাস যে নিতান্ত মূর্খ, তাহা প্রকাশ পাইল—অমর্ষাভিভূত পণ্ডিতকুলেরও শাঠ্য অবিদিত রহিল না। "উষ্ট্রো লুম্পতি যদ্বা রম্বা তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা" ইত্যাদি বিদ্রূপোক্তি চতুর্দ্দিকে প্রোদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। কালিদাস স্বীয় মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য আপনাকে নিতান্ত লাঞ্ছিত মনে করিলেন। আত্মাবসাদ দূর করিবার জন্য মূর্খতার অপবাদ অপসৃত করিবার জন্য বাগ্‌দেবীর কৃপাভিক্ষু হইয়া কালিদাস ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কালপরিণতিতে সরস্বতী দেবী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কালিদাসকে বর দিলেন। কালিদাস অচিরে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সুকবি হইলেন। তাঁহার যশোরাশি দিগ্দিগন্তে প্রসৃত হইয়া পড়িল। এই তো জনশ্রুতি। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিশ্বাস যে, এই জনশ্রুতি বর্ণে বর্ণে সত্য, অধিকন্তু নবদ্বীপে ব্রহ্মাণীতলায় কালিদাস সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি একেবারে উপেক্ষণীয়, এ কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। তবে উহার সকল কথাই সত্য মনে করাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কিংবদন্তী বা ঐতিহ্যে প্রায়শঃ কল্পনার ঘনাবলেপ পরিদৃশ্য হয়, মূল তথ্য নিরূপণ করা অতীব দুরূহ হইয়া উঠে। ঐতিহাসিকেরা বিশেষ যত্নসহকারে কালোপচিত কল্পনাকর্পর ভেদ করিয়া ঐতিহ্য মধ্যে যে সত্যকণা নিহিত আছে, তাহারই আবিষ্কারে সতত বদ্ধপরিকর। কালিদাস সম্বন্ধে ঐ জনশ্রুতির মধ্যে যদি কোনও সত্য থাকে, তাহা এই। কালিদাস প্রথম বয়সে শাস্ত্রাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন নাই; পরে নিজের অজ্ঞতার জন্য অবমানিত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে মনঃসংযোগ করেন এবং অচিরে সুপণ্ডিত ও সুকবি হইয়া উঠেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতির মধ্যে আর কোনও সত্য নিহিত আছে মনে করা অসঙ্গত ইতিবৃত্তাঙ্কিত রীতির প্রতিকূল। কিংবদন্তীমূলে কালিদাস সরস্বতী দেবীর উপাসক ছিলেন—তাঁহারই বরপুত্র স্থির করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কালিদাস প্রকৃতপক্ষে

শৈব ছিলেন—বিরচিত কাব্যাদিতে ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতির নান্দীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এই কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। বাস্তবিক কবির যদি বাগ্‌দেবীই আরাধ্য দেবতা হইতেন, তাহা হইলে কবি কুমারসম্ভব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না,—

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তফলমেতদন্বভূৎ॥"—কুমারসম্ভবম্ চতুর্থঃ সর্গঃ।

কালিদাস যখন স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিতে পারিয়াছেন, তখন বাগ্‌দেবীই তাঁহার উপাস্য দেবতা, ঈদৃশী ধারণা আদৌ হয় না। ব্রহ্মাণী শব্দের অর্থ—ব্রহ্মার শক্তি এবং জনশ্রুতিমূলে কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র—এই সামান্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কালিদাস নবদ্বীপের ব্রহ্মাণীতলায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, স্থির করা নিতান্ত অসঙ্গত।

যতদূর অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ব্রহ্মাণীতলায় কস্মিন্‌কালে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ঘটস্থাপনা আছে মাত্র। কোনও অনার্য্যজুষ্টা দেবীর উদ্দেশেই ঘটস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। জরৎকারু মুনিপত্নী মনসাদেবী, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেও হইতে পারেন। ব্রহ্মাণীতলায় প্রায়ই আহিতুণ্ডিকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর পূজার্থ শূকরবলির কথাও অশ্রুত নহে। এস্থলে ব্রহ্মাণীতলা সরস্বতীর মন্দির সিদ্ধান্ত করা, নিতান্ত অসমসাহসের পরিচয় দেওয়া মাত্র। গঙ্গাগর্ভ হইতে নবদ্বীপের উন্মজ্জন যে আধুনিক ব্যাপার, তাহা নামেই প্রকাশ। "নবদ্বীপ" পদ উর্দ্দু "নও দিয়ার" শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে যে কি লাভ হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। মুসলমানেরা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গপরাজয় করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাব। সংক্ষেপে বলিলে, "ব্রহ্মাণীতলার" অস্তিত্ব কালিদাসের নবদ্বীপাবস্থানের কোনও প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

যে দুইটি সরস্বতীর স্তব কালিদাসকৃত বলিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক উহা যে কালিদাসের রচনা, তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। সম্ভবতঃ উদ্ভট কবিতাকেই কাব্যতীর্থ মহাশয় কবিকৃত মনে করিয়াছেন। কালিদাস সরস্বতী দেবীর উপাসক, অতএব যিনিই স্তোত্রদ্বয়ের রচয়িতা,—ঈদৃশী ধারণা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চিত্তাধিকার করিয়া থাকিবে। আমি পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, সরস্বতীদেবী কবি-কালিদাসের উপাস্য দেবতা নহেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ দুইটি স্তোত্রে কবিত্বের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য স্তোত্রদ্বয় মহাকবি বিরচিত বলিয়া মনে করিতে স্বতঃই অনিচ্ছা হয়। প্রথম স্তবটি সরস্বতীর প্রণামের মধ্যে ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায়,—কালিদাস-রচিত বলিয়া এ যাবৎ বিবেচিত হয় নাই। এই স্তোত্রে "কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে বীণারঞ্জিতপুস্তকহস্তে" বলিয়া বাগ্‌দেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ঈদৃশী বর্ণনায় কবিত্ব ও পদলালিত্য উভয়েরই অভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ, কালিদাস উপাস্যদেবীর স্তব করিতে গিয়া প্রথমেই কুচযুগ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা একবারেই অবিশ্বসনীয়। পার্ব্বতীর রূপবর্ণনার প্রারম্ভেই কবি পদনখের উল্লেখ করিয়াছেন—"অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-

নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ" (কুমারসম্ভবম)। চিবন্তনা রীতিও ঈদৃশী। দ্বিতীয় স্তবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নমো বিশদকুসুমতুষ্টা পুণ্ডরীকোপবিষ্টা, ধ[illegible]চরণবেশা মালতাবদ্ধকেশা"...

ইহাও কাব্যাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। নট নটীর বেশে কবি বাগ্‌দেবীকে কেন সজ্জিত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে আদৌ ভক্তি প্রকাশ পায় নাই। স্তোত্রটী সুপণ্ডিতের লেখা বলিয়াও বোধ হয় না। "নমো" শব্দ যখন প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগই প্রশস্ত, কিন্তু তৎস্থলে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহার দেখিতেছি। সম্বুদ্ধিতে প্রয়োগ করিলেও চলিত, কিন্তু তাহাও ঘটে নাই। "মালতা" বা "মালতী" ব্যাকরণদুষ্ট পদ বলিয়া মনে হয়। "গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তন্" এই সূত্রে ঐ পদ সিদ্ধ হয় না। এ স্থলে উক্ত স্তবটি কালিদাসের-বিরচিত, কেহই সহজে মনে করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যতীর্থ মহাশয় অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রহ্মাণীতন্ত্র বা স্বরস্বতীর স্তোত্র লইয়া আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা হয় যে, প্রচলিত সরস্বতীর ধ্যানাবলি প্রাগুক্ত স্তোত্রদ্বয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রুতিমধুর ও সরস। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রপদ্মাসনা, যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, "কালিদাস"—এই অভিধেয়, বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতে আর কুত্রাপি প্রচলিত নাই। এই বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। আমি নিজেই পশ্চিমাঞ্চলে "কালীচরণ" "কালীসহায়" প্রভৃতি নাম শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। সে যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার কালিদাসাখ্য স্বীয় পুস্তকে কি লিখিয়াছেন, একবার পাঠ করিয়া দেখিলে হয় তো কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ভ্রম দূর হইতে পারে।

"প্রবর্ত্তী সময়ে অনেক কবি আপনাদিগকে "কালিদাস" উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, দেখিতে পাই। জৈনকবি রাজশেখর এইরূপ তিন জন কালিদাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন নবসাহসাঙ্ক-চরিত প্রণেতা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কালিদাস নাম লইয়াছিলেন; এবং উহার অল্প কয়েক বৎসর পরেই মালবের পরমার-বংশের ভোজ-দেবের রাজত্ব সময়ে আর এক-জন কবি কালিদাস নাম পাইয়াছিলেন।"

বাস্তবিক "কালিদাস" নাম বঙ্গের নিজস্ব নহে—সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। অতএব এই নামের উপর নির্ভর করিয়া "কালিদাস" বঙ্গে আসিয়া পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন স্থির করা, নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য। কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন,—

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

মল্লিনাথ শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া কালিদাসের বিদ্বেষী ও দোষদর্শী দিঙ্‌নাগাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সুকবি, সতীর্থ ও পৃষ্ঠপোষক নিচুলের নামও কালিদাস প্রচ্ছন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—এ কথাও টীকাকার বলিয়াছেন। এই উক্তি অবলম্বন করিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিঙনাগাচার্য্য নবদ্বীপের সন্নিকট দিঙনগরে বা দিক্‌নগরে বাস করিতেন;

বস্তুতঃ দিঙনাগাচার্য্য কে, কোথায় বাস করিতেন, এ সব কথা সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাকে বঙ্গবাসী বলিয়া স্থির করা অনুচিত। "মোক্ষমূলর" ও "উইবার" সাহেব উভয়েই স্থির করিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগাচার্য্য এক জন বৌদ্ধ দার্শনিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে নিম্নোল্লিখিত কথাগুলি দেখিতে পাইয়াছি,—

ডাক্তার "টাকাকুশু' বসুবন্ধুর জীবনচরিত সম্বন্ধে যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, বসুবন্ধু যখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি বাদবিচারের জন্য স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায়, অতিবৃদ্ধ বসুবন্ধুর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য দিঙ্‌নাগাচার্য্য স্কন্দগুপ্তের পিতা কুমারগুপ্তের সময়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন"।

ইহাই যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের নবদ্বীপের সান্নিধ্যে দিঙ্‌নগরে বা দিক্‌নগরে বাস কিরূপে সম্ভব? বসুবন্ধু কাশ্মীরে বাস করিতেন। কালিদাসের বর্ণনায় যতদূর বুঝিতে পারা যায়, দিঙ্‌নাগাচার্য্য চিত্রকূটের সমীপে, কিঞ্চিদুত্তরে কোনও গ্রামে বাস করিতেন। কবি বলিয়াছেন,—"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিৎ"। মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"পবনোবায়ুরদ্রেশ্চিত্রকূটস্য শৃঙ্গং হরতি কিংস্বিৎ?" দিঙ্‌নাগাচার্য্য যদি বসুবন্ধুর শিষ্য হন, যদি তাঁহার নিবাস চিত্রকূট পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ উত্তরে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বঙ্গাবস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। *

কাব্যতীর্থ মহাশয় কতকগুলি গ্রাম্য কবিতা বা গ্রাম্যছন্দঃ কালিদাসের বঙ্গাবস্থানের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি জন্য ঐ সব গ্রাম্য কবিতা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। "কমলাপুলির টিয়েটা"—ঈদৃশী একটি কবিতায় কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন যে, "কমলাপুলি" ও "কমলাপুর" একই কথা। "কমলাপুরির" দ্বারা কাশ্মীরের রাজধানী "শ্রীনগর" দ্যোতিত হইতেছে। "কি বামুন? ভাট বামুন"—এই ছন্দে কালিদাস ভাট বা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। এবম্বিধ অনেক কথা আছে। ঈদৃশী অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা না করিলেই বিবেকবুদ্ধির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিত। উদ্ধৃত গ্রাম্যকবিতাগুলির দ্বারা কবি কালিদাসের বঙ্গাবস্থান আদৌ প্রতিপন্ন হয় নাই। ঐ সব গ্রাম্য-কবিতা বঙ্গভাষায় রচিত, কালিদাসের আবির্ভাবের কত দিন পরে ঐ সব কবিতা ছন্দোবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। কালিদাস পঞ্চম খৃষ্টাব্দে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। "ডাকের বচন," "খনার বচন" "গোপীচাঁদের গান" প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে

* কবি কালিদাসের বঙ্গাবস্থান বিষয়ক আলোচনা এই নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বে বহু বার বহু আলোচনা হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে", চতুর্থ খণ্ডে, 'ভারতের সাহিত্য' প্রসঙ্গে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কালিদাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে কবির জন্মস্থান, কবির আবির্ভাব কাল, বঙ্গের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী বক্তব্য আছে। প্রবন্ধ-শেষে আমরা তদ্বিষয় উল্লেখ করিব।—সম্পাদক।

রচিত হয় নাই, বলিয়াই কোবিদগণের বিশ্বাস। পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য-কবিতাগুলি উহাদেরই অনেক কাল পরেই লিখিত হওয়া সম্ভব। কালিদাস সম্বন্ধে ঐ সব কবিতাবলি ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তী বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে না। উহাদের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহাতে ঐগুলিকে কালিদাস সংসৃষ্ট মনে করা যাইতে পারে। উদ্দাম কল্পনার কথা উত্থাপন না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা সর্ব্বদাই অঘটনঘটনপটীয়সী। কাব্যতীর্থ-যুক্তি-কাননে নিরর্থক ভ্রমণ এখন শেষ করাই বিধেয়। কালিদাস-রাজ্যে বিশেষ কিছু ফলোদয় হইবে না।

সত্য ও মিথ্যা।

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম-এ মহাশয় বিরচিত।]

সত্য-মিথ্যার মোহ-যবনিকা কর কর প্রভু উদ্‌ঘাটন।
ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মীমাংসা-বন্যায় হ'য়ে যাক্ দ্বিধাহীন মন॥
আজি যাহা সত্য বলিয়া বেছে নেই দয়াময়।
কা'ল দেখি তাহা নূতন আলোকে সকলি মিথ্যা হয়॥
তাপস কৌশিক বলিল সত্য দস্যুরে দেখাতে পথ।
ব্যর্থ হইল যুগান্ত সাধনা না পূরিল মনোরথ॥
গুরু-জ্ঞাতি-বধি রাজ্যের তরে বলে যুধিষ্ঠির অনৃত-বাণী।
তবুও ত্রিদিব টানি লয় তাঁরে আপন পুণ্য-বক্ষ দানি॥
সুরথ বধিল লক্ষ প্রাণী তুষিতে পূজায় অম্বিকায়।
মরণের দ্বারে নষ্ট-প্রাণী তাহারও স্কন্ধ রক্ত চায়॥
শর শরাসনে বিনাশি শ্বাপদ পাইল মুক্তি নিষাদ বীর।
পতঙ্গ প্রদানি ক্ষণিক বেদনা শূলেতে মরিল মাণ্ডব্য ধীর॥
সত্যের মান রাখিতে কিরীটি আপন ভ্রাতায় বধিতে চায়।
আপনি অচ্যুত বিমুখিতে তায় নবীন সাম্যতত্ত্ব গায়॥
আবার কেশব ধর্ম্মক্ষেত্রে ধ্বংসনীতি ঘোষণা করে।
তাঁরি কণ্ঠ পুনঃ "অহিংসা অদ্রোহ" ধ্বনিল বিশ্বে তারস্বরে॥
কোথায় সত্য কোথায় মিথ্যা বুঝি না ত কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদানি সংযত কর জীবন কর্ম্ম॥
মিথ্যা যাহা সত্যের আলোকে, জ্বলিয়া উঠুক বিশ্বময়।
তোমারি হাতের উজ্জ্বল আলোকে জীবন যেন পুলকে বয়॥

শঙ্কর-মঠে বেদ-সভা।

গত ১২ই মাঘ, মঙ্গলবার, শ্রীপঞ্চমীর দিন, অপরাহ্নে সাঁত্রাগাছি বামরাজাতলা 'শঙ্করমঠে' বেদ-সভার অধিবেশন হয়। মঠাধিপতি স্বামী পরমানন্দ পুরী মহোদয় ঐ সভা আহ্বান করেন। বেদ-ব্যাখ্যা-উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বেদের যে সকল প্রচলিত অপব্যাখ্যার বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন এবং বঙ্গদেশে বেদবিদ্যা প্রচার জন্য যে চেষ্টা পাইতেছেন, তৎপ্রচেষ্টা সাধন-পক্ষে কি উপায় পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা প্রভৃতিই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভায় বহু পণ্ডিতের এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক বেদ-গানে সভার উদ্বোধন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীমাংসা-দর্শনের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে স্বামীজী মহারাজ কর্ত্তৃক রচিত বন্দনা-গীতি গীত এবং শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত একটী কবিতা পঠিত হয়। তৎপরে বেদের অপব্যাখ্যা-বিষয়ে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের অভিমত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর, যথাক্রমে নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও সুধিগণ বেদ-বিষয়ে বক্তৃতা করেন,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যানন্দ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর অগ্নিহোত্রী (বারাণসীর), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী (মহারাষ্ট্রদেশীয়), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ (নবদ্বীপের), শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি-এল (কৃষ্ণনগরের উকীল), সভাপতি মহাশয় এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি। একমাত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভিন্ন, সকল পণ্ডিতই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতি স্বীকারে প্রকারান্তরে লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যারই পোষকতা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বেদবিদ্যা-প্রচারের আবশ্যকতাও নির্দ্ধারিত হয়। তখন, সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহশীল রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ বি-এল মহাশয়ের উপদেশক্রমে প্রস্তাব হয়,—ঐ শঙ্কর-মঠের সঙ্গে কি প্রকারে বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয় স্থিরীকরণ-জন্য একটী পরামর্শ-সমিতি গঠিত হউক; সেই সমিতি বিদ্যালয়-পরিচালনার উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারিত করিয়া পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় তাহা জ্ঞাপন করিবেন। পরামর্শসমিতি গঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদানান্তর সন্ধ্যার সময় সভা ভঙ্গ হয়। মঠে বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, দুই জন সহৃদয় ব্যক্তি দুইটী ছাত্রের ব্যয়-ভার গ্রহণ করিবেন—স্বীকার পাইলেন। মঠাধিপতি স্বামী পরমানন্দ পুরী মহোদয়ের উদ্যোগ—শুভ-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

কৃষ্ণনগরে কালিদাস-সভা।

গত ১৪ই মাঘ বুধবার কৃষ্ণনগর 'টাউনহলে' মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধে একটী সভার অধিবেশন হয়। কৃষ্ণনগরের বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত

ছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল, বি-এ, এম-বি, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় 'মহাকবি কালিদাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মহাশয় যথাসম্ভব যুক্তি ও গবেষণা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। সভাস্থলে সেই তত্ত্বই বিবৃত হয়। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতায় সকলেই পরিতৃপ্ত হন। বক্তার পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদপ্রদান করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

—*—

উদ্বোধন-সঙ্গীত।

[শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী মহোদয়ের বিরচিত।*]

(২)

বেদ-প্রসূতি তুমি গো জননী, ধন্য তোমারি কর্ম্ম।
ফুটায়ে রেখেছ হৃদয়-মাঝারে সকল বেদের মর্ম্ম॥
সপ্ত লোকের সার ধরম, প্রকাশে তোমার মূর্ত্তি,
আদি কবির কাব্য, কবিতা, পেতেছে তোমাতে স্ফূর্ত্তি;
প্রণবে তুমি মা হ'য়েছ ব্যক্ত, ক'রেছ সাধকে তাহার ভক্ত,
চিত্ত সে ভাবে এমনি রক্ত, তা'তেই চরম শয্যা;
যেনরে প্রণব চিরঅভিনব তোমার মহিমা-সজ্জা॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সকলি, মগন তোমার ধ্যানে,
চৌদ্দ ভুবন ব্যস্ত সতত, সজিতে তোমারি জ্ঞানে;
তোমারি দিব্য বিমল জ্যোতিঃ, শুদ্ধ করিয়া বুদ্ধি, মতি
সঙ্গত রাখে স্বরূপে রতি, সমতা-বিরতি জন্য;
কেন তবে মোরা সেবিয়া তোমায়, না হ'ব জগতে ধন্য?

শোকহারিণী, লোকতারিণী শ্রুতি ত তোমারি কন্যা,
কবেরে তাহারে করিবে ধন্যা, ফিরায়ে ভাবের বন্যা;
শুনি তব গানে যেজন মত্ত, জাগে তা'র হৃদে এরূপ সত্ত্ব,
হয় আয়ত্ত সর্ব্ব তত্ত্ব, স্বভাবে করে সে নৃত্য;
কর গায়ত্রী, শক্তিদাত্রী আনন্দে সু-কৃতকৃত্য॥

* এটি দ্বিতীয় সঙ্গীত, বেদ সভার অধিবেশন উপলক্ষে রচিত ও শঙ্কর-মঠে গীত হইয়াছিল।

শ্রী হরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।] [ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

উত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।

অবাধমানি জীবসে।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ (অথবা জন্মগত) দুঃখপাশ আপনি মোচন করুন, আমাদের আধিদৈবিক দুঃখরূপ (অথবা জন্মমূলক) বন্ধন আপনি বিচ্ছিন্ন করুন; এবং আমাদের জীবনরক্ষার জন্য আধিভৌতিক দুঃখরূপ (অথবা মরণত্রাসকারী) পাশকে আপনি নাশ করুন; (আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ঘটুক)।

প্রার্থনা-বিষয়ে উপাখ্যান।

পুরাণে একটী উপাখ্যান আছে। ঋষি অজিগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপকে বলি-প্রদানের জন্য বন্ধন করা হয়। তাঁহার দেহের উত্তম-প্রদেশ মস্তকে, মধ্যম-প্রদেশ কটিদেশে এবং অধম-প্রদেশ পদদ্বয়ে বন্ধন-রজ্জু ছিল। সেই বন্ধন-রজ্জু মোচনের জন্য তিনি দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কাতর-কণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—"হে দেব! আপনি আমার শিরস্থিত পাশকে উর্দ্ধে আকর্ষণ-পূর্ব্বক মোচন করুন; আমার উদরস্থিত পাশবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আমার জীবন-নির্ব্বাহ জন্য আমার পাদস্থিত পাশবন্ধনকে অধোভাগে আকর্ষণপূর্ব্বক নষ্ট করুন।" ভাষ্যকারগণের মতে, ইহাই শীর্ষোক্ত ঋগ্মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বলিয়া গৃহীত হয়।

বন্ধন কোথায় নাই।

বন্ধনের যন্ত্রণাতেই জীব অস্থির বটে! বন্ধনের এবং বন্ধন-মোচনের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকটিত রহিয়াছে সত্য। কিন্তু সে বন্ধন কি প্রকার বন্ধন? রজ্জুর বন্ধনই কি বিষম বন্ধন! মস্তকে উদরে বা হস্তপদের বন্ধনই কি অশেষ-ক্লেশকর বন্ধন? আবার, কেবল কি সেই ঋষিকুমারই বন্ধনযন্ত্রণায় কাতর হইয়া

মুক্তিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অথবা, তুমি-আমি সকলেই সেই বন্ধন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আছি। আবার, বন্ধন কি কেবল আমাদের হস্তপদে উদরে ও মস্তকে? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি—বন্ধন কাহার কোন্ অঙ্গে কোথায় নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা মাত্রেরই যে নিগূঢ় লক্ষ্য, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এ বন্ধনের ভীষণতা বোধগম্য হইতে পারে।

বন্ধনের স্বরূপ।

ত্রিবিধ দুঃখের নাশই—নিঃশ্রেয়স্ মুক্তি। অথবা, জন্ম-জরা-মরণ-গতি-রোধের নামই—মুক্তি। 'আধ্যাত্মিক' দুঃখকেই উত্তম বা দুঃখ-পক্ষে চরম-দুঃখ বলিয়া মনে করা যায়। আধিদৈবিক দুঃখ সে হিসাবে মধ্যম এবং আধিভৌতিক দুঃখ অধম নামে অভিহিত হইতে পারে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখরূপ বন্ধনকেই যথাক্রমে অধম মধ্যম উত্তম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। তাহার কারণ, একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হয়। আধিভৌতিক দুঃখ দূর করা যে প্রকার আয়াস-সাপেক্ষ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দূর করার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর ও অধিকতম আয়াস আবশ্যক করে। তাই অধম মধ্যম উত্তম পর্য্যায়ে উহাদিগকে ন্যস্ত করা হইয়াছে। জন্ম-জরা-মরণ-পক্ষেও এইরূপ ভাব মনে আসিতে পারে। জন্মই উত্তম বন্ধন; কেন-না, জন্ম না হইলে তো আর জরা-মরণের কবলগত হইতে হয় না। জরা যে মধ্যম বন্ধন এবং মরণ যে অধম বন্ধন, এই দৃষ্টিতে তাহাও প্রতীত হয়। মানুষ বরং জরা সহিতে পারে, কিন্তু মরণের চিন্তাও—তাহার পক্ষে অসহ্য। কত মমতা—কত বন্ধন আসিয়া তখন তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়। জন্মে যে বন্ধন হয়, সে বন্ধন বরং কর্ম্ম দ্বারা ছিন্ন করা যায়; সে হিসাবেও সে বন্ধনকে উত্তম বন্ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু মরণের যে বন্ধন—যে কামনা যে আকাঙ্ক্ষা মরণ-সহচর হইয়া বিদ্যমান—তাহা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন,—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম-সাপেক্ষ সুতরাং অধম পদবাচ্য। এইরূপে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্য দিয়া এবং জন্ম-জরা-মরণ-রূপ ত্রিবিধ বন্ধনের মধ্য দিয়া, মানুষের জীবন অতিবাহিত হইতেছে। মন্ত্রে সেই বন্ধন-মোচনেরই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রার্থনার প্রকৃত মর্ম্ম।

'হে ভগবন্! পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতির ফলে, জন্ম-জরা-মরণের মধ্যে পড়িয়া, ত্রিতাপে প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। একবার করুণনেত্রে চাহিয়া দেখুন। এ অধম অভাজনকে পরিত্রাণ করুন। বন্ধন অষ্টে-পৃষ্ঠে চারিদিকে। পাপের পাশ মস্তক বেড়িয়া আছে,—কুচিন্তায় অসদ্ভাবে মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে বন্ধন ছেদন করুন, আমার মস্তিষ্ক হইতে কলুষচিন্তা বিদূরিত হউক।' এই প্রার্থনাই—মস্তকের বন্ধন-মুক্তির প্রার্থনা। 'আমার মধ্যদেহও বন্ধনদশা-গ্রস্ত, আমার মধ্য দেহ—উদরাদি-কটিদেশ, কি অপকর্ম্মই না করিতেছে। আপনি আমার সে বন্ধন মোচন করুন, আমি যেন আর পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই।' এই প্রার্থনাই—মধ্যদেহের বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা। 'আমার দেহের অধমাংশ (পাদাদি) নিয়ত অসৎপথে

প্রধাবিত থাকিয়া, নিত্যই পাপকর্ম্ম রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। আপনি তাহাদের সে বন্ধন নাশ করুন। পদদ্বয় যেন আর পাপ-পথে অগ্রসর হইয়া পাপসংলিপ্ত না হয়। হস্তদ্বয় যেন আর পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে কলুষিত না করে।' এই প্রার্থনাই হস্ত পদের বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা। 'সর্ব্বপ্রকারে আমি যেন বন্ধন মুক্ত হইতে পারি,—আমার চিন্তা যেন বন্ধনহেতুভূত পাপকর্ম্মে লিপ্ত না হয়,—আমার দেহ যেন বন্ধনমূল পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়,—আমার পদদ্বয় যেন বন্ধন-কারণ পাপ-পথে অগ্রসর হইতে না পারে। আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারি।' প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। এ পক্ষেও আবার ত্রিবিধ বন্ধনের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। মানসিক বন্ধনকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিতে পারি। মনই তো সর্ব্ববিধ বন্ধনের সর্ব্বপ্রধান মূল। কায় ও বাক্য এই ভাবে অধম ও মধ্যম বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সূত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণত্রয়কেও উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ-বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, গুণই বন্ধন, গুণাতীত না হইতে পারিলে, বন্ধন বিমুক্তি ঘটে না। তাই গীতায় মুখামন্ত্রে শ্রীভগবান কহিয়াছেন,—"ত্রৈগুণ্যা বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ফলতঃ, 'হে ভগবন্! আপনি আমায় কামনাশূন্য সত্ত্বভাবাপন্ন সদ্‌গুণান্বিত করুন' ইহাই তো বন্ধন-মোচন।

'বেদ' ও তাহার ব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

সপ্তম প্রবন্ধ।

যজ্ঞ-কর্ম্মে মন্ত্র যে ভাবে প্রযুক্ত হইবার পদ্ধতি আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। আজ যজুর্ব্বেদের একটী কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্র, তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিমত ও ব্যাখ্যা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সামান্য অনুধাবন করিলে, সকলেই আমাদের ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(১) মা ভের্ম্মা সংবিক্থাঃ। (২) ভূতমেরুর্যজ্ঞোঽভূতমেরুর্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ। (৩) ত্রিতায় ত্বা। (৪) দ্বিতায় ত্বা। (৫) একতায় ত্বা।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ,—মহীধর ভাষ্যং,—

(কা০ ২৫২৪) কা ভেরিত্যালভত ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং মা ভেঃ। ভয়ং মা কার্ষীঃ। মা সংবিক্থাঃ। চালনং মা কার্ষীঃ। ত্রিতী ভয়ে। ওবিজীভয়চলনয়োরিত্যনয়োঃ প্রয়োগো॥ কা০ ২।৫।২৫) অত মেকরিতি শৃতাবভিবাসয়তি ভস্মনা বেদেনোপাবেষেন বেতি। যজ্ঞো যাগহেতুঃ পুরোডাশ অত মেকভূয়াৎ। তমু গ্লানৌ॥ তাম্যতীতি তমেরুঃ। ঔণাদিক এরুপ্রত্যয়ঃ। ন তমেরুঃ অতমেরুঃ। ভস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু। যজমানস্য প্রজা পুত্রপৌত্রাদিঃ অতমেরুঃ গ্লানিরহিতা ভূয়াৎ যজমানস্য প্রজায়াঃ কদাপি দুঃখং মাস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৫।২৬) পাত্রাঙ্গুলি প্রক্ষালনমাপ্ত্যেভ্যো নিনয়ত্যভিতপ্য প্রত্যগ্-সংস্যন্দমানং ত্রিতায় ত্বেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে পাত্র্যঙ্গুলিপ্রক্ষালনোদক ত্রিতায় ত্রিতনাম্নে দেবায় ত্বাং নিনয়ামীতি শেষঃ। তথা দ্বিতায় ত্বা নিনয়ামি তথা একতায় ত্বা নিনয়ামি। পূর্ব্বং কুতশ্চিদ্ধেতোঃ ভীতোঽগ্নিরপঃ প্রাবিশত্ততো দেবাস্তং জ্ঞাত্বা জগৃহুস্তদাগ্নিনা বীর্য্যমপ্সু ভুক্তং ততঃ আপ্ত্যা উৎপন্নাস্ত্রিতদ্বিতৈকত সংজ্ঞাস্তে দেবৈঃ সহ চরন্তো যজ্ঞে পাত্রী প্রক্ষালন জললক্ষণং ভাগং লেভিরে ইতি শ্রুতিকথানুসন্ধাতব্যা (১।২।৩১)॥

* * *

ভাষ্যানুসরণে অর্থ।

ভাষ্যানুসরণে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর যে অর্থ হয়, তাহাতে বুঝা যায়, অগ্নি হইতে পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) নামাইবার সময়, পুরোডাশকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়, এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র-কয়েকটীও যথাক্রমে পুরোডাশকে ও তৎসংশ্লিষ্ট জলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। পুরোডাশকে তিনটী পাত্রে রাখিতে হইবে; তৎপরে প্রথম-মন্ত্রে বলিতে হইবে,—'হে পুরোডাশ! তুমি ভীত ও চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া থাক' অর্থাৎ, পাত্র হইতে পুরোডাশ যেন না পড়িয়া যায়,—এই উদ্দেশে ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে পুরোডাশকে ভস্ম বা উপবেষ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণে বলিতে হইবে,—'পুরোডাশ এবং যজমানের সন্তান-সন্ততি গ্লানিরহিত হউক।' তৃতীয় হইতে পঞ্চম মন্ত্রে পাত্রধৌত জলকে সম্বোধনপূর্ব্বক যথাক্রমে বলা হইয়াছে,—হে পাত্রধৌত জল! 'ত্রিত'-নামক দেবতার, 'দ্বিত' নামক দেবতার এবং 'একত'-নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি।' এই বলিয়া, জলকে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পাত্র-ধৌত জল, পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণবিষয়ে পুরাণের একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানটী এই:—অগ্নি এক সময়ে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া জলের মধ্যে লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময় তাঁহার বীর্য্যে জলের মধ্যে ত্রিত, দ্বিত ও একত নামক দেবত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্নিদেব, অন্যান্য দেবগণের অনুকম্পায়, জল হইতে উদ্ধার পাইলে, তদুৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। এই ভাবের উপাখ্যান-সংশ্লিষ্ট হইয়া মন্ত্র কয়টী পল্লবিত রহিয়াছে।

* * *

আমাদের ব্যাখ্যা।

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করি, আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়', বঙ্গানুবাদে ও মন্ত্রার্থ আলোচনায় তাহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করুন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'মা ভেঃ' (ভীতং মা ভব), 'মা সংবিকৃথাঃ' (উদ্বিগ্নং মা ভব)। ভয়োদ্বেগরহিতং সৎ ত্বং পরমাত্মানমারাধয় ইতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ। 'যজমানস্য' (দেবার্চ্চকস্য, মমেতি শেষঃ) 'যজ্ঞঃ' (আত্মপ্রসাদার্থঃ অনুষ্ঠিতো যাগঃ) 'অতমেরু' (দোষবর্জ্জিতঃ) 'ভূয়াৎ' (ভবতু, তবানুদ্বেগ বশাদিতিভাবঃ), অপিচ, মম 'প্রজা' (প্রজননং, প্রকৃষ্টং জন্ম, মনুষ্যজন্ম) 'অতমেরুঃ' (গ্লানিরহিতা—তৎজন্ম, নিন্দাশূন্যং ভগবদারাধনয়া সফলমিত্যর্থঃ) ভূয়াদিতি ক্রিয়াপদং পূর্ব্বং আকৃষ্য ইহ যোজনীয়ং। হে মনঃ! ভগবতি পরমাত্মনি তব অত্যন্তমাসক্তিবশাৎ মম যাগাদিকং কর্ম্ম ইদং মানুষং জন্ম চ নিন্দাদোষরহিততয়া সার্থকোঽপি ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা।

অথবা

২। হে ভগবন্। 'যজ্ঞঃ' (অস্মাকং যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অতমেরুঃ' (দোষশূন্যং) 'ভূয়াৎ' (ভবতু), অপিচ, 'যজমানস্য' (দেবার্চ্চকস্য প্রার্থনাকারিণো জনস্য) 'প্রজা' (সন্ততিঃ, আত্মসম্পর্কীয়ঃ) অতমেরু (দোষরহিতঃ) তবানুগ্রহেণ ভূয়াদিতি শেষঃ।

৩। হে মনঃ। 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রিতায়' (ত্রিতং ত্রিলোকব্যাপিনং, বিশ্বব্যাপকং অথবা গুণত্রয়াত্মকং ত্রিদেবং উদ্দিশ্য) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৪। হে মনঃ! দ্বিতায়' (দ্বিতং প্রকৃতিপুরুষরূপং অথবা জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপং দেবদ্বয়ং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রেরয়ামি ইতি শেষঃ। যো দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞান-ক্রিয়ারূপেণ বা দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ, ত্বং তং পরমাত্মনং অনুসন্ধেহি ইতি মম ত্বয়ি নিয়োগ ইতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'একতায়' (একতং, একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেন ব্রহ্মস্বরূপেণ তনোতি নিখিলং জগৎ ব্যাপ্নোতি যঃ স তথোক্তং, পরমাত্ম ব্রহ্মরূপং দেবং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতিঃ শেষঃ। হে মনঃ। ত্বাং অদ্বিতীয়ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটী অর্থান্তরে ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছেও বলিতে পারি।]

১। হে মন! তুমি ভীত হইও না, উদ্বিগ্ন হইও না। অর্থাৎ, ভয়োদ্বেগরহিত হইয়া তুমি পরমাত্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

২। হে মন! দেবার্চ্চনাকারী আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্ম দোষবর্জ্জিত হউক; আর, আমার এই মনুষ্যজন্ম, দোষশূন্য হইয়া ভগবদারাধনায় সাফল্য লাভ করুক (ভগবদারাধনাই আমার জীবনের লক্ষ্য হউক।)

অথবা

২। হে দেব। আমাদের যাগাদি সৎকর্ম্ম দোষশূন্য হউক, আর, দেবার্চ্চনাকারী ভগবৎ-করুণাপ্রার্থী জনের সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কিত-জন আপনার অনুগ্রহে দোষশূন্য নিষ্কলঙ্ক হউক।

৩। হে মন। তোমাকে সেই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবের উদ্দেশে নিয়োগ করিতেছি।

৪। হে মন। তোমাকে প্রকৃতিপুরুষরূপ দেবদ্বয়ের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি।

৫। হে মন। তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এক্ষণে মন্ত্রসম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করা যাইতেছে। পুরোডাশকে ভীত বা চঞ্চল না হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সিদ্ধান্ত করি, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—পুরোডাশ নহে, ঐ মন্ত্রে যাজ্ঞিক আপনার মনকে ভগবৎ-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন. বলিতেছেন,—'মন। ভগবানের কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পথে অনেক বিভীষিকা ও বিঘ্ন আছে। তুমি দৃঢ় হও, ভয় পাইও না, উদ্বিগ্ন হইও না।' আমরা মনে করি, প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রও, পুরোডাশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ঐ মন্ত্রও—মনঃসম্বন্ধসূচক। উহার মর্ম্মার্থ এই যে,—'মন। পরমাত্মায় তোমার ঐকান্তিকী আসক্তি আসুক, তাহার ফলে তোমার যাগাদি সৎকর্ম্ম এবং মনুষ্যজন্ম গ্লানিশূন্য কলঙ্কবর্জ্জিত হউক।' অথবা, ঐ মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছেও মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার অনুগ্রহে যাগাদিকর্ম্ম দোষশূন্য হউক, প্রার্থনা-কারীর সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেই নিষ্কলঙ্ক হউক,—ইহাই ঐ প্রার্থনার ও মন্ত্রের লক্ষীভূত। মনকে সম্বোধন করিয়াই হউক আর ভগবানকে সম্বোধন করিয়াই হউক, দুই দিকের অর্থ—সমান সদ্ভাবপ্রকাশক। সুতরাং মন্ত্রের ঐ দ্বিবিধ অর্থই আমরা গ্রহণ করিলাম।

তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মন্ত্রের 'ত্রিতায়' 'দ্বিতায়' ও 'একতায়' পদত্রয় সাধকের উচ্চাবচ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থার বিষয়ই প্রকাশ করিতেছে। প্রথমে মনে হয়, ভগবান্ সত্ত্বরজস্তমোময়, তিনি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদবস্থায়, মনকে সম্বোধন করিয়া বলাই স্বাভাবিক,—'মন। তোমায় সেই 'ত্রিতায়' অর্থাৎ তিনস্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি। রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি-সংহার—এই তিন কার্য্যে তিনি তিন অবস্থায় প্রকাশমান। তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি।' মন্ত্রের 'ত্রিতায় ত্বা' বাক্য সেই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে। পরবর্ত্তী মন্ত্র—পরবর্ত্তী স্তরেরই উপযোগী। এ অবস্থায়, ক্রমশঃ সেই তিন, দুইয়ে পর্য্যবসিত হইলেন। প্রকৃতি-পুরুষ রূপে অথবা ক্রিয়া-জ্ঞান-রূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া, তখন তাঁহার প্রতি লক্ষ্য পড়িল। সাধক তখন কহিলেন,—'মন। তুমি সেই 'দ্বিতায়'—প্রকৃতিপুরুষরূপে বিদ্যমান—পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি বিনিবিষ্ট হও।' "দ্বিতায় ত্বা"—এই মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য। তার পরের স্তর—"একতায় ত্বা"। সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,—'মন!

আর কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর? 'একতায়'—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা-ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।' তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। আমরা মনে করি, ইহাই শেষ মন্ত্র-ত্রিতয়ের মর্ম্মার্থ।

জলমধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানেও, অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে দ্বিত দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ-রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা হইতে পারে।

বৈষ্ণব-কবি নরহরি।

[শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত।]

নরহরি সরকার বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণদাস সরকার। তিনি ১৪০০ শকে (১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। প্রচণ্ড আতপ-তাপিত পথিকবৃন্দ যে প্রকার বিশাল মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পথশ্রান্তি দূর করে, সেই প্রকার, পূতাত্মা ভক্ত সাধুগণ সংসার-সন্তাপ-দূরী-করণার্থ নানা দিগ্দেশ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। যে সময়ে মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্ম-প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সেই সময়ে ভক্তসাধুবৃন্দের মধ্যে—বৈষ্ণব নরহরি সরকার অন্যতম। ভক্ত নরহরি চৈতন্য প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। তাঁহার আত্মা চৈতন্যময় হইয়া গিয়াছিল। তিনি শয়নে, স্বপনে, অন্তরে, বাহিরে, শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তাঁহার পদসেবা-প্রার্থী হইয়া, ভক্ত নরহরি তথায় গমন করিয়াছিলেন। চির-কৌমার ব্রত প্রতিপালন-পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর নরহরি অতি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া, বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে, এমন কি সমগ্র জগতে, বৈরাগ্যের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে তিনি মহাপ্রভুর নিত্য-সহচর ছিলেন। একটি সংস্কৃত শ্লোকে দেখা যায়, তিনি পূর্ণিমার শশধরসদৃশ বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ ছিলেন। তিনি কবি লোচন দাসের গুরু ছিলেন। "চৈতন্য-মঙ্গল" রচনা করিবার জন্য তিনিই লোচনদাসকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি গৌর-লীলার পদরচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ও বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পদরচনার পন্থা অবলম্বন করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছিলেন। নরহরি সর্ব্বদা সখীভাবে মহাপ্রভুর ধ্যান করিতেন। তিনি অনেক সময়ে সখীভাবাবিষ্ট হইয়া সখীবেশে বাহির হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নামোচ্চারণ মাত্রেই দরবিগলিত ধারায় বাষ্পবারি তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া ফেলিত। শ্রীগৌরাঙ্গ নাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ দর্শন, শ্রীগৌরপদসেবা, শ্রীগৌর-প্রসাদ সেবন,

শ্রীগৌর-মহিমা ও গুণগান, শ্রীগৌর-স্তব পাঠ তাঁহার ভজনের প্রধান অঙ্গ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে মত্ত হইয়া সুললিত স্বরে তিনি গাহিয়াছিলেন:—

"সজনি, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে, দিগ নেহারিতে
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥

হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল
সকলি গৌরাঙ্গ ময়।
এ দুটী নয়নে কত বা হেরিব
লাখ আঁখি যদি হয়।

জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমেতে গৌরাঙ্গ
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ শয়নে গৌরাঙ্গ
একি মোর হৈল সখি॥

গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ
গৌরাঙ্গ হেরি যে সদা
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ-চরণ
হিয়ায় রহিল বাঁধা।"

তিনি মাত্র দুটী চক্ষু দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই তিনি অতিশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—তাঁহার যদি একলক্ষ চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সাহায্যে গৌরাঙ্গ-রূপ দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তির প্রত্যেকটিতেই নরহরি সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় অমৃতস্রাবিনী ভক্তির আকর হইয়া পড়িয়াছিল। অমৃত খাইতে মিষ্ট, কিন্তু একবার খাইলে আর অন্য সুধা থাকে না; ভক্তিও সেইরূপ মধুর হইতে মধুর—অতি মধুর। ভক্তির উদয় হইলে, সকল বাসনা দূর হয়, এমন কি, ভক্তের নিকট মুক্তিও অতি তুচ্ছপদার্থ রূপে পরিগণিত হয়। ভক্তকবি নরহরি এবম্বিধ ভক্তির সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অভিনিবেশ ও ভক্তি সহকারে, শ্রীগৌর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ, প্রেম-মুগ্ধ গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা কীর্ত্তন, হৃদয়-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি সংস্থাপন-পূর্ব্বক ধ্যান ও নেত্রবারিদ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে পূজা, শান্তানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গৌরস্তুতি পাঠ গৌরপদপ্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক তদীয় পদসেবা, সেবা দ্বারা তদীয় সুখবিধান, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার শ্রীপদতলে আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক যুক্তিকেও অতিতুচ্ছ জ্ঞানে সদানন্দে দাস্যভাবে জীবন চরিতার্থ করিয়াছিলেন। রাগভক্তির সাহায্যে গৌর-প্রেম-মুগ্ধ আত্মারাম নরহরি দিব্যোন্মাদের ন্যায় কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন; কখনও বা নৃত্য করিতেন, কখনও কখনও রোমাঞ্চশরীরে শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুকীর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইয়া অবিরামধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

ভক্তকবি নরহরি সরকারের ন্যায় অহৈতুকী সেবানুরক্ত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত অতি বিরল। গৌরলীলার পদরচনায় কবিত্বে বৈষ্ণবসমাজকে প্রেমের বন্যায় প্লাবন করিয়া গৌরপ্রেম-সুধা-পানে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর ১৪৬২ শকে (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে গুপ্ত হন।

—*—

কবি কালিদাসের বঙ্গে অবস্থিতি।

[রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ বি-এল মহাশয়ের লিখিত।]

(২)

জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাপুষ্পাদি।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় একটি আপাতমনোরমা যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে "কালিদাসের রচনায় অনেক এমন গাছ, লতা, পাতা, পাখী প্রভৃতির নাম আছে যাহা বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন অন্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।" বাস্তবিক এই কথাটি প্রকৃত হইলে কালিদাসের বঙ্গাবস্থান সম্বন্ধে একটি সুযুক্তি সমুদ্ভাবিত হইবে। এই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রথমেই একটি মূল কথা স্মরণ রাখা উচিত। বঙ্গদেশ ও অবন্তী-রাজ্য প্রায় এক অক্ষরেখায় (latitude) অবস্থিত। এই দুই প্রদেশেই জীবজন্তু বৃক্ষলতা পুষ্পাদি সব অনেকটা একপ্রকার হওয়াই সম্ভব। নৈসর্গিক নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, একরূপতাই অনুমেয়। এ স্থলে যদি ঐ দুই প্রদেশের প্রাণিজাত ও দ্রুমগুল্মাদি একপ্রকার হয়, তাহা হইলে কবির বঙ্গে নিবাস প্রমাণ হয় না। কারণ, অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীতে থাকিয়া কবি বঙ্গে সুপরিচিত জীবজন্তু দ্রুমলতাদি দেখিয়া থাকিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিকুল, কতকগুলি তরু লতা গুল্ম ও জীবজন্তুর নিরতিশয় পক্ষপাতী। এমন কি, সেই সব দ্রুমলতা গুল্ম ও প্রাণিবৃন্দ কবিপ্রিয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তাহাদের উল্লেখ না করিয়া কোনও কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এরূপ দেখা যায় না। উদাহরণার্থ কতকগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, যথা, তরুপুষ্পের মধ্যে পদ্ম, কুমুদ্বতী, কিংশুক (পলাস), শিরীষ, কর্ণিকার, কুরুবক, নীপ, চূতমঞ্জরী, মালতী, যূথিকা, অশোক, সহকার ইত্যাদি, এবং প্রাণিজাত মধ্যে গজ, সিংহ, মৃগ, অলি, ময়ূর, হংস, সারস, শুক, সারিকা, কোকিল, চাতক, চকোর প্রভৃতি। কবিদের গ্রন্থাদিতে প্রায়ই এই সব পুষ্পবৃক্ষাদির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। তৎসমুদায়ের বর্ণনা দেখিয়া কবির বাসভূমির চতুর্দ্দিকে সেই সব তরুলতা ও কুসুমরাজি সদাই প্রবর্দ্ধিত ও প্রস্ফুটিত হইত স্থির করা অসঙ্গত ও অযৌক্তিকও কবিপ্রিয়-বস্তুজাত পূর্ব্বসূরিদের পদাঙ্কানুসরণে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

এখন, কালিদাস বাস্তবিক নিজ কাব্যাদিতে কি কি পুষ্প, বৃক্ষ, জীবজন্তুর উল্লেখ বা বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই প্রশস্ত। প্রাচীন কালে ভারতললনা কুসুমাভরণের নিতান্ত অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"

মেঘদূতম্, উত্তরমেঘঃ।

এই শ্লোকে অনেকগুলি পুষ্পের নাম অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যোষিৎকুল কোথায় কি কুসুম সংন্যস্ত করিয়া দেহশোভা প্রবৃদ্ধ করিতেন তাহারও পূর্ণাভাস পাওয়া যায়। লীলাকমল, বালকুন্দ, লোধ্র-পুষ্প, নবকুরুবক, শিরীষ এবং নীপের (কদম্বের) উল্লেখ দেখা যায়। আবার বর্ষাকালে কামিনীকুল কি পুষ্পে অঙ্গ শোভা পরিবৃদ্ধি করিতেন তাহার বিবরণ কবি দিয়াছেন।

"শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতবনপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ।"

ঋতুসংহারঃ, বর্ষাবর্ণনম্।

এই শ্লোকপাঠে জানা যায় যে, প্রস্ফুটিত বনপুষ্প, যূথিকা-কোরক ও মালতীর সংমিশ্রণে বকুলমালা গ্রথিত হইয়া শিরোভূষণের কার্য্য করিত। বিকসিত নবকদম্ব, কর্ণাবতংস স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। শরদ্বর্ণন করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন,—"বন্ধূকপুষ্পরচিতাকণতা চ ভূমিঃ" এবং "বপ্রাশ্চ চারুকমলাবৃতভূমিভাগাঃ"। বন্ধূক ও কমল পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। রক্তবর্ণ বন্ধূক-পুষ্প বঙ্গে আছে বলিয়া জানি না, অন্ততঃ সচরাচর নবদ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শুনি নাই। নবদ্বীপে ক্ষেত্র বা নদীতট কমলাবৃত ইহাও অশ্রুত। শরদ্বর্ণন করিতে গিয়া কবি আরও লিখিয়াছেন :—

"নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুর-প্রগীতান্।
মুক্তা কদম্বকুটজার্জ্জুনসর্জনীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ॥" ঋতুসংহারঃ শরদ্বর্ণনম্।

কবির কথায় বুঝিতেছি যে, শরৎকালে কদম্ব, কুটজ (কুরচি) অর্জ্জুন ও সর্জবৃক্ষে (শালদ্রুমে) পুষ্পোদ্গম হয় না। সপ্তচ্ছদবৃক্ষ (সপ্তপর্ণবৃক্ষ) কিন্তু কুসুমসম্ভারে নয়নতর্পণ হইয়া উঠে। নবদ্বীপে কুটজ ও শালবৃক্ষ বহুল পরিমাণে জন্মায় বলিয়া শুনি নাই। শালবৃক্ষ পার্ব্বত্য বা মালভূমিতে স্বভাবতঃ জন্মায় ইহাই শুনিয়া আসিয়াছি। নবদ্বীপে যে কলহংস ও ময়ূর বহুশঃ পরিদৃষ্ট হইত বা হয়, তাহাও জানি না। হেমন্তবর্ণন করিতে করিতে কবি বলিয়াছেন :—

"পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ।
প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীনাম্।" ঋতুসংহারঃ, হেমন্তবর্ণনম্।

"শৈত্যসম্ভূত সমীরণে কম্পিতকলেবরা প্রিয়ঙ্গুলতা প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বিরহকাতরা কামিনীদের মত পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছে।"

প্রিয়ঙ্গুলতা যদি বঙ্গে জন্মিত তাহা হইলে উহার কথা অশ্রুত থাকিত না। কিন্তু ঐ লতার নাম যে, কখনও শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন—'প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমানি স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ"। বোধ হয়, প্রিয়ঙ্গু-লতা হইতে সুগন্ধ প্রলেপ প্রস্তুত হইত। যাহা হউক প্রিয়ঙ্গু বা প্রিয়ঙ্গু-লতার সহিত বঙ্গবাসীর সবিশেষ পরিচয় নাই। বসন্তবর্ণন আরম্ভ করিয়া কবি লিখিয়াছেন :—

"কর্ণেষু যোগাং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকঃ।
পুষ্পং চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রযাতি কান্তিং প্রমদাজনস্য॥"

"কর্ণে নবকর্ণিকার, কেশদামে অশোকপুষ্প, নবমল্লিকার নবোদ্গত কুসুমাবলি কামিনী-গণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।" অন্যত্র আবার দেখিতে পাই, কবি লিখিয়াছেন :—

"কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্ত্তকূলৈঃ, নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
তদংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈরলঙ্ক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি॥" ঋতুসংহারঃ, বসন্তবর্ণনম্।

এই শ্লোক হইতে কুসুম্ভ ও কঙ্কুম যে বিভিন্ন পুষ্প তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। একটি অরুণবর্ণ, অপরটী গৌর অর্থাৎ পীতবর্ণ। কুসুম্ভ বা কুসুম-পুষ্পের ক্ষেত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কুঙ্কুমের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এখনও হট্টে বা বিপণিতে বিক্রয় হয়। কুঙ্কুম-পুষ্প কেবল কাশ্মীরে জন্মায়, অন্যত্র কুত্রাপি উহার উদ্ভব অবিদিত। অমরকোষে কুঙ্কুমের এই কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায় :—

"কাশ্মীরজন্মাগ্নিশিখং বরং বাহ্লীকপীতনে। রক্তসঙ্কোচপিশুনং ধীরং লোহিতচন্দনম্॥"

কুঙ্কুম যে বঙ্গদেশের মধ্যে কুত্রাপি জন্মায় এ কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। কালিদাস কাশ্মীরে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন, সেই জন্য কুঙ্কুমের উল্লেখ করিয়াছেন, ঈদৃশী যুক্তির উদ্ভাবনচেষ্টাও বৃথা, কবি সুগন্ধিদ্রব্য, চন্দন ও অগুরুর বহুশঃ উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দন বৃক্ষ দক্ষিণে মলয়পর্ব্বতে জন্মে, কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে কবি দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন বলা যেরূপ সঙ্গত, কালিদাসের কাশ্মীরে অবস্থিতিও তদ্রূপ। কাব্যতীর্থ মহাশয় মলয়পর্ব্বতের শিরোদেশে কালিদাসের বাসনির্দ্দেশ করেন নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কবি শিশিরবর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, শিশির বা শীতকাল "প্রচুরগুড়াবকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ", আর এক স্থানে হেমন্তবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন যে, হেমন্তকাল "পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমঃ" এই দুইটি বর্ণনা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্য কোনও প্রদেশ সম্বন্ধে উহা একেবারে অপ্রযোজ্য, এ কথা বলাও অসঙ্গত। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই শালি বা ধান্য জন্মে; এমন কি পর্ব্বতময় "পেশওয়ার" খণ্ডে ধান্য জন্মিয়া থাকে শুনিতে পাই। ইক্ষু সম্বন্ধেও ঐ রূপ উক্তি সঙ্গত। এ স্থলে শালি, ইক্ষু ও গুড়ের উল্লেখ শুনিয়া কালিদাস নবদ্বীপে বাস করিতেন স্থির করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে যে, তাম্বুল ও পূগ (গুবাক) কেবল বঙ্গেই উদ্ভূত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও গুবাক ও তাম্বুল বা তাম্বুলী যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবি ভবভূতি, নিজমুখে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিবাস বিদর্ভদেশের অন্তর্গত পদ্মনগরে। কিন্তু কবি মালতীমাধবের বিবাহস্থলী বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

"গাঢোৎকণ্ঠকঠোরকেরলবধূগণ্ডাবপাণ্ডুচ্ছদৈ-
স্তাম্বুলীপটলৈঃ পিনদ্ধফলিনব্যানম্রপূগদ্রুমাঃ।
কঙ্কোলীফলজগ্ধিমুগ্ধবিকিরব্যাহারিণস্তন্তুবো
ভাগাঃ প্রেঙ্খিতমাতুলুঙ্গবৃতয়ঃ প্রেয়ো বিধাস্যন্তি বাম্॥" ষষ্ঠোঽঙ্কঃ, মালতীমাধবম্।

"গাঢোৎকণ্ঠিত কেরল বধূর পূর্ণগণ্ডের ন্যায় অল্প পাণ্ডুবর্ণপত্রসংযুক্ত তাম্বুলতায় আবৃত, ফলবান্ নম্র আনম্র পূগদ্রুমে যে ভূভাগ উপশোভিত, যে স্থান কঙ্কোলীফল (সম্ভবতঃ অশোক ফল) ভক্ষণ করিয়া সুন্দর বিহঙ্গকুল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, যে স্থানে কম্পিতজম্বীরবেষ্টন-রাজি বিদ্যমান, সেই স্থান তোমাদের উভয়ের মঙ্গল সাধন করিবে। পূগ তাম্বূলের ন্যায়, ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্যান্য স্থানেও শালি (ধান্য) ও ইক্ষু জন্মে এবং ইক্ষুবিকার গুড়ও প্রস্তুত হয়।

এক্ষণে কালিদাসের কাব্যাদিতে কি কি জীবজন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুধাবন আবশ্যক। কুমার সম্ভবের প্রারম্ভেই এই শ্লোক পাওয়া যায়ঃ—

'পদং তুষারশ্রুতিধৌতপক্তং যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।

বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্ম্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ॥" কুমারসম্ভবম্ প্রথমঃ সর্গঃ।

এই শ্লোকে গজ ও কেশরী উভয় প্রাণীরই উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সিংহ যে বিশালকায় করি সংহার করিতে সদা প্রবৃত্ত, ইহাও উপলব্ধি হয়।

"লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ।

যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥" কুমারসম্ভবম্, প্রথমঃ সর্গঃ।

এই শ্লোকে চমরী-মৃগের শুভ্রকান্তি চপলপুচ্ছের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

তুষারসঙ্ঘাতশিলাঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ সমুল্লিখন্ দর্পফলঃ ককুদ্মান্।

দৃপ্তঃ কথঞ্চিৎ গবয়ৈর্বিবিগ্নৈরসৃচসিংহধ্বনিরুন্ননাদ॥" কুমারসম্ভবম্, প্রথমঃ সর্গঃ।

এই শ্লোকে তিনটী জীবের বিবরণ পাওয়া যায়—বৃষ, গবয় ও সিংহ। গবয় গোসদৃশ জন্তুবিশেষ, বঙ্গদেশে গবয় পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া শুনি নাই। বৃষভের বর্ণনাটী কি সুন্দর; সুকবি ভিন্ন ঈদৃশী চিত্তহারিণী রচনা অন্য কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। এই সঙ্গে কবি কৃত একটি গাভীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"নিবর্ত্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ।

পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্॥" রঘুবংশম্, দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

"যশোমণ্ডিত রাজা মহিষীকে প্রতিগমন করিতে বলিয়া, চতুঃসমুদ্র যাহার পয়োধররূপ ধারণ করিয়াছে ঈদৃশী সুরভিতনয়া নন্দিনীকে, গোরূপধরা পৃথিবীর মত, রক্ষা করিতে লাগিলেন।"

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।

পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং কচ্চিদ্ ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥

মেঘদূতম্, উত্তরমেঘঃ।

এই শ্লোকে পূর্ব্ব গৃহস্থেরা বাটীতে সারিকা পুষিত ইহাই জানিতে পারা যায়। ভারতে এই প্রথা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—বদ্ধমূল রীতিনীতির কি দীর্ঘায়ুঃ। কবি জলচর পক্ষী সারসেরও উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ।"

মালবিকাগ্নিমিত্রম্, তৃতীয়োঽঙ্কঃ

এখন "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" হইতে দুই একটী উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি :—

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ,
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথমোঽঙ্কঃ।

প্রাণভয়ে বিদ্রুত মৃগের ঈদৃশী সুন্দর বর্ণনা নিতান্ত বিরল। কবি স্বচক্ষে এইরূপ-পলায়নপর মৃগ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। রাজসমভিব্যাহারে কবি কখনও বা কখনও গহনকাননে প্রবেশ করিয়া বিদ্রুত মৃগ দেখিয়া থাকিতে পারেন। রথবাহী অশ্বেরই বা কি চিত্তহারী চিত্র।

"মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া ধাবন্তমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথমোঽঙ্কঃ।

নৃপতির রথ দেখিয়া ভীত, অমিতবলশালী গজেরই বা বর্ণনা কি মনোহর।

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুস্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথমোঽঙ্কঃ।

গুঞ্জৎ ভ্রমরের বর্ণনাই বা কি মনোরম।

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশোবেপথুমতীম্ রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরম্ বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথমোঽঙ্কঃ।

এখন কবি অন্যান্য বনচর কি কি প্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিলে মন্দ হইবে না। আশ্রমসমীপে আগত রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়েচ্ছা মন্দীভূত হইলে কোন্ কোন্ জন্তু নিঃশঙ্ক হইল তদ্বর্ণনে কি সুন্দর শ্লোকই কবির অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনীর মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।—

"গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহপতিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে, বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

এই শ্লোকে মহিষ, মৃগ ও বরাহ, তিনটী বন্য জন্তুর সলীল, স্বাভাবিক ও বিশ্রব্ধ ভাবের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের দৃষ্টি কি অন্তর্ভেদিনী সর্ব্বব্যাপিনী! অন্যত্র তৃষ্ণার্ত্ত মহিষীকুলের এক হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"সফেণলালাবৃতবক্ত্রসম্পুটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বমুন্মুখম্।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদ্ গবেষমাণং মহিষীকুলং জলম্॥" ঋতুসংহারঃ, গ্রীষ্মবর্ণনম্।

উন্মত্ত পুরুরবা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কি কি পশুপক্ষী দেখিয়াছিলেন, কবি তাহাও একটি মধুর শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"ঘোরাপরহুয়হংসরচঙ্গং অলিগঅপব্বঅসরিয়কুরঙ্গং।
তুজ্ঝহ কারণ রণ্ণ ভমান্তে কো নহ পুচ্ছিঅ মঝ্ঝি বোঅন্তে॥" বিক্রমোর্ব্বশী, চতুর্থোঽঙ্কঃ।

ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, অলি, গজ, কুরঙ্গ সবই বনমধ্যে উন্মত্ত রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। অন্যান্য শ্বাপদ-বিহঙ্গ-সরীসৃপ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি কি বলিয়াছেন তাহা সামান্যতঃ ঋতুসংহার হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্ত্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্॥
সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্কপঙ্কমং সরঃ খনন্নায়তপোথমণ্ডলৈঃ।
রবের্মযূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্॥"

ঋতুসংহারঃ, গ্রীষ্মবর্ণনম্।

গ্রীষ্মাতিশয্যে অহিভুক্ ময়ূরকুলের সর্পহননে আর প্রবৃত্তি নাই, মুস্তাপ্রিয় বরাহকুল রৌদ্রকরে অভিতপ্ত হইয়া মুস্তাবৃত শুষ্কদীর্ঘিকাগর্ভ খনন করিয়া ক্ষিত্যভ্যন্তরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নাই, উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে এই কথাই প্রকাশ পাইতেছে। আর এক স্থলে, কবি লিখিয়াছেন :—

"শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণক্রমস্থঃ কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্ব্বতস্তোয়মিচ্ছন্ শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বুকূপাৎ॥"

ঋতুসংহারঃ, গ্রীষ্মবর্ণনম্।

বিহগবৃন্দ, কপিকুল, গবয় ও শরভের উল্লেখ এই শ্লোকে পাওয়া যায়। গবয় ও শরভ মৃগজাতীয়। নবদ্বীপের সান্নিধ্যে এই দুই জীব কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে বলিয়া শুনি নাই। জলচরপক্ষী সম্বন্ধে এইবার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি কবি কি কি জলবিহারী পক্ষী সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। ইহা হইতে আভাস পাওয়া যাইবে।

"কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য প্রীতিং পরং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ॥"

ঋতুসংহারঃ, শরদ্বর্ণনম্।

এই শ্লোকে কারণ্ডব, কাদম্ব, সারস, হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। "কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ" যতদূর জানি, বঙ্গে বিরল, বিশেষতঃ স্রোতস্বতী গঙ্গার পক্ষে এই বিশেষণ একবারেই অপ্রযোজ্য। প্রক্ষিপ্তনির্ম্মাল্যের রেণুতে গঙ্গা আবৃত হইয়া যাইবে ইহাও অসম্ভব।

"মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥"

মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘঃ।

এই শ্লোকে চাতক ও বলাকা (ক্ষুদ্রবক) এই দুটি পক্ষীর পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যে কাকের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহাও নহে, "নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজামাকুল-গ্রামচৈত্যাঃ" (মেঘদূতম্)। নয়নাভিরাম পারাবতকুলেরও উল্লেখ আছে, "ত্বাং

কস্যাঞ্চিদ্ভবন-বড়ভৌ সুপ্তপারাবতায়াম্" (মেঘদূতম্)। লোকে যে গৃহে ময়ূর পুষিত, তাহাও কালিদাস জানিতেন, "বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ" (মেঘদূতম্)। আবার "জাব নরনাসিকালোলুবস্স জিন্নরিচ্ছসসি কস্সবি মুহে পডিস্সসি" (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্) একথাও দেখিতে পাই। কবির ধারণা—বৃদ্ধভল্লূকেরা নরনাসিকাভেদে সদাই উৎসুক।

কালিদাসের কাব্যাদিতে যে সব লতা, পুষ্প, দ্রুম, পশুপক্ষী ও প্রাণিজাতের প্রায়শঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। কেবল বঙ্গদেশেই দ্রষ্টব্য বা প্রাপ্য ভারতের অন্যান্য ভূভাগে অদ্রষ্টব্য বা দুষ্প্রাপ্য এমত ত কোনও লতা-পুষ্প বা জীবজন্তুর বিবরণ কুত্রাপি দেখিলাম না। অতএব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বন্ধুবর যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

কবির বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা।

কবির রচিত কাব্যাদিতে বঙ্গদেশ সংস্পৃষ্ট যে সামান্য বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার তদ্দেশসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। প্রথমতঃ রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই শ্রেয়ঃ মনে করি, ঐ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। রঘুর বঙ্গবিজয়েরও বর্ণনা কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়।

রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বসাগরগামিনী সেনা লইয়া তিনি "তালীবনশ্যামম্ উপকণ্ঠং মহোদধেঃ" উপস্থিত হইবার পর "সুহ্ম" দেশ জয় করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলেন।

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ ফলমা ইব তে রঘুম্। ফলৈঃ সম্বর্দ্ধয়ামাসুঃ উৎখাত-প্রতিরোপিতঃ॥"

রঘুবংশম্, চতুর্থঃ সর্গঃ।

"নৌকারাজিই যাহাদের যুদ্ধোপকরণ ঈদৃশ বঙ্গসন্তানগণকে, অধিনায়ক রঘু বল-প্রয়োগে নির্জ্জিত করিয়া গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সকলে জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বঙ্গবাসীরা বিজেতা রঘুর পদানত হইয়া, ফলগর্ভ ধান্যশীর্ষের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিলে, রঘু বিজিত বঙ্গবাসীদের স্বপদে পুনরায় স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাহারও বহু ধন দিয়া রঘুর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।" এই শ্লোকদ্বয় হইতে ইহাই বিদিত হয় যে, বঙ্গবাসীরা নৌসঞ্চালন-কুশল কিন্তু রণপরাঙ্মুখ। তাহারা সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া এবং জেতৃপ্রীতি-সম্পাদন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। মহোদধির উপকণ্ঠে বঙ্গদেশ এবং গঙ্গার মুখে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ; এই সব দ্বীপ মধ্যে রঘু জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই মাত্র কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায়। সমুদ্রগড়, নবদ্বীপ—কি সরস্বতীর মন্দিরের ঘুনাক্ষরে উল্লেখ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কালিদাস যদি নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এই সব বিষয়ে এত উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। প্রিয়বস্তু সম্বন্ধে কবির বিস্মৃতি অসম্ভব। এই উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিতে কবি কত উদ্গ্রীব, তাহা পরে দেখাইব। নবদ্বীপে কি সমুদ্রগড়ে, নারিকেল-বৃক্ষের কি তাম্বূলের অভাব নাই।

তথাপি রঘুসৈন্য কলিঙ্গ জয় করিয়া সেই দেশে নারিকেলাসব পান করিতেছে, কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতা পানভূময়ঃ। নরিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ॥"

রঘুবংশম্, চতুর্থঃ সর্গঃ।

পরিশেষে অমিতজেতা রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপের অধিপতিকে পরাজয় করিয়া স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ বঙ্গদেশের উত্তরে, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। রঘুসৈন্য বঙ্গদেশের উত্তরে আসিলেও বঙ্গদেশের নাম-মাত্র উল্লেখ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। বঙ্গদেশ আদৌ স্মৃতিপথে আসিল না। যদি কবি বাস্তবিক বঙ্গে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে ঈদৃশ ঔদাসীন্য অসম্ভব।

এখন একবার ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে কবি কোন্ কোন নৃপতির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ব্যর্থোদ্যম হইবে না। প্রথমেই মগধাধিপ পরন্তপের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহার রাজধানীর নাম পুষ্পপুর, ইহাতে জানিতে পারা যায়। পুষ্পপুর ও কুসুমপুর একই নগর কি না, তাহার অনুসন্ধান এখন অনাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গনাথের বর্ণনা দেখিতে পাই। তৃতীয়তঃ সুনন্দা ইন্দুমতীকে লইয়া অবন্তিনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে অন্যান্য রাজার প্রশস্তি পরিদৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কলিঙ্গনাথ হেমাঙ্গদেরেরও নাম পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ এই তিন প্রদেশের নাম প্রায়ই একত্রে উদ্ঘোষিত হইয়া থাকে।

কবি অঙ্গ ও কলিঙ্গের নাম করিলেন, বঙ্গের নাম তাঁহার মনে আসিল না। যদি কালিদাস সত্যসত্যই বঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে স্বয়ম্বরক্ষেত্রে বঙ্গাধিপের উপস্থিতি বর্ণন করিতে বিস্মৃত হইতেন না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বঙ্গাধিপ নিতান্ত নির্বীর্য্য ও নগণ্য রাজা, তাঁহার স্বয়ম্বরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়; ভোজ্যলাভের জন্য প্রবলপ্রতাপান্বিত নরেন্দ্রবর্গেরই উপস্থিতি অনুমেয়। বাস্তবিক কবির বঙ্গানুরাগ প্রবল হইলে কি সম্ভব কি অসম্ভব—ইহা ভাবিয়া, বঙ্গরাজের উল্লেখ করিতে তিনি নিরস্ত থাকিতেন না। সুনন্দার মুখে বঙ্গাধিপকে নানাগুণে বিভূষিত করিয়া দিতেন। যদি কেহ বলেন, বাল্মীকির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া কবি বঙ্গাধিপের উল্লেখ করেন নাই। কথাটা যদি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেও সুযুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। স্বনপরাজয় বর্ণন করিতে গিয়া কবি বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করেন নাই।

মেঘদূতে কালিদাস চিত্রকূট হইতে অলকার পথনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সুদূরে, পূর্ব্বদিকে, বঙ্গদেশ অবস্থিত, মেঘের পথে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। লঙ্কা হইতে যখন রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখনও তাহার বঙ্গদেশ অতিক্রম করিবার আবশ্যক হয় নাই। রঘুবংশপাঠে ইহাই জানা যায়।

ফলতঃ কালিদাসের কাব্যাদিতে বঙ্গদেশের যে সামান্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার বঙ্গে দীর্ঘাবস্থিতি প্রকাশ পায় না। বঙ্গসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞান নিতান্ত অল্প বলিয়াই বোধ হয়। এ স্থলে তাঁহার বঙ্গে দীর্ঘনিবাস আদ্যন্ত কাল্পনিক ব্যাপার বলিয়া ধারণা হয়।

কালিদাসের নিবাস-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা।

কালিদাসের রচিত কাব্যাদিতে তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান সম্বন্ধে যে আভাষ পাওয়া যায়, তদনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইব। ঐ সব কাব্যাদির বহির্ভূত কোনও প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিব না। প্রথমতঃ কবিকৃত "ঋতুসংহারের" প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করি। কি প্রকার দেশে কবি বাস করিতেন, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুবর্ণনায় অনেকটা সূচিত হইতে পারে। প্রথমতঃ নিদাঘবর্ণনার কথা উত্থাপন করিব। কবি লিখিয়াছেন—"অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড-সূর্য্যাতপ-তাপিতা মহী"। পর্য্যটকমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, এই বর্ণনা ভারতের বায়ুতাড়িতধূলিসমাকীর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে প্রযোজ্য, বঙ্গদেশে কদাপি নহে। কবি যে দেশে থাকিতেন, সে দেশে গ্রীষ্মাগমে দাবানল, বনজঙ্গল ভস্মীভূত করিত; প্রাণিকুল ইতস্ততঃ প্রাণ-ভয়ে প্রধাবিত হইত, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়;—

"জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ব্বতানান্দরীষু স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ॥"

"গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ সুহৃদ ইব সমস্তাৎ দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি॥"

ঋতুসংহারঃ, গ্রীষ্মবর্ণনম্।

ঈদৃশ প্রচণ্ড দাবানল নবদ্বীপের সন্নিধানে কখনও কেহ অবলোকন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। নবদ্বীপ সমতল ভূমি—জাঙ্গল দেশ নহে। যতদূর নাম দেখিয়া ধারণা হয় নবদ্বীপ প্রথমে গঙ্গার বক্ষে দ্বীপাকারে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কালবশে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন হইলে তীরলগ্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কালিদাস যে নগরীর নিকট বাস করিতেন, তাহার অনতিদূরে নিবিড় কানন ও শৈলমালা ছিল, ইহা সহজেই অনুভাব্য। নতুবা তাঁহার বিরচিত কাব্যে দাবানলের ঈদৃশ ভীষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হইত না। বিন্ধ্যগিরি যে কবির অধ্যুষিত নগরী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"তৃণোৎকরৈরুদ্গতকোমলাঙ্কুরৈঃ বিচিত্রনীলৈর্হরিণীমুখক্ষতৈঃ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং বিভূষিতান্যুদ্গতপল্লবদ্রুমৈঃ॥"

"জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈঃ, বয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যাম্॥"

ঋতুসংহারঃ, বর্ষাবর্ণনম্।

"বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোণীবিম্বাদপ্যপেক্ষাচ্যুতেন।
চণ্ডী চণ্ডং হস্তমুদ্যতী মাং বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যাম্॥"

মালবিকাগ্নিমিত্রম্, তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

"রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্ ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য"

মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘঃ।

"তস্যাপতন্ মূর্দ্ধ্নি জলানি জিষ্ণোঃ বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ"।—রঘুবংশম্, চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

এই সব শ্লোকাদি পাঠ করিলে, স্বতঃ মনে হয়, কবির বিন্ধ্যগিরি সুপরিচিত; তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটেই বাস করিতেন। নতুবা তাঁহার কাব্যে বিন্ধ্যগিরির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কেন? বর্ণনার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বিন্ধ্যশিরে বৃষ্টিপাত চপলার লীলা; বিন্ধ্যপাদে উপলবিষমা নর্ম্মদা নদীর বিস্তৃতি—এই সব বিবরণ চাক্ষুষ-দৃষ্টিসম্ভূত বলিয়া মনে হয়।

কবি যে সকল উপমা স্বীয় কাব্যাদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে তিনি গিরিসঙ্কুল পার্ব্বত্য-দেশে বাস করিতেন, এইরূপ প্রতীতি সহজে জন্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥"

কুমারসম্ভবম্, পঞ্চমঃ সর্গঃ।

"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব।" রঘুবংশম্, ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

"আভাতি বালাতপরক্তসানুঃ সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ।" রঘুবংশম্, ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ঈদৃশী উপমারাজি পার্ব্বতীয়ের পক্ষেই সম্ভব। নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে পুরাকালে লোকে গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া থাকিতে পারে, অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী বা পার্ব্বত্য-নদীর লীলা দেখা অসম্ভব। সমতলক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপের সান্নিধ্যে শৈলমালার অস্তিত্ব অদ্যাবধি কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। অথচ, উজ্জয়িনীর অনতিদূরে বিন্ধ্যগিরি অবস্থিত, এ কথা সকলে জানে।

উজ্জয়িনী অবন্তিরাজের রাজধানী। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে কালিদাস কি বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। বলা বাহুল্য, তাঁহারই বিরচিত কাব্যের উপর নির্ভর করিব। রামগিরি হইতে অলকার পথ নির্দ্দেশ করিতে করিতে, কবি দেখিলেন যে, উজ্জয়িনী সন্দেশবহ মেঘের মার্গে পড়িতেছে না। তখন তিনি ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সহকারে কি বলিতেছেন, সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা বিধেয় মনে করিতেছি:—

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।

মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘঃ।

পথ বক্র হইলেও, একবার উজ্জয়িনী দেখিয়া যাইও—কবি যক্ষমুখে এই কথা বলিতেছেন। ইহাতে কবির উজ্জয়িনীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে না কি? অবশ্যই পাইতেছে। এই সস্নেহ অনুরাগের কারণ অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উজ্জয়িনী কবির সুপরিচিত সম্ভবতঃ অধ্যুষিত। টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন,—"বিন্ধ্যাদুত্তরবাহিন্যা নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ প্রাগ্‌ভাগে কিয়ত্যপি দূরে স্থিতা উজ্জয়িনী উত্তরপথস্তু নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পশ্চিম ইতি বক্রত্বম্"। নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে উজ্জয়িনী। কিন্তু উত্তরদিগ্‌গামী মেঘের পথ, নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর ঈষৎ পশ্চিমে এই জন্য পথের বক্রত্ব। কিন্তু কবি নির্ব্বন্ধ সহকারে মেঘকে উজ্জয়িনী সন্দর্শন করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। ঐ প্রখ্যাত নগরীতে কি কি দ্রষ্টব্য তাহাও উল্লেখ করিতে কবি নিরস্ত হন নাই। "প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ" শিপ্রাবাত,

জলোদ্গীর্ণ ফেনসংস্কারধূপ, বলিনবনিতাপাদরাগাঙ্কিতসৌধরাজি প্রভৃতি নানা কথা বলিলেন। মল্লিনাথ বলেন,—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গতা নির্ব্বিন্ধ্যা নদী—"নিষ্ক্রান্তা বিন্ধ্যান্নির্ব্বিন্ধ্যা নাম নদী"। শিপ্রানদী, চর্ম্মণ্বতী (আধুনিক চম্বল) নদীর শাখা, অদ্যাপি বর্ত্তমান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিদাস শৈব। উজ্জয়িনী নগরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী বা উপকণ্ঠে মহাকাল নামক স্থানে চণ্ডীশ্বর বা চণ্ডেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই শিব-মন্দিরের বর্ণনা করিতে কবি কত উৎসুক, তাহারও আভাষ মেঘদূত ও রঘুবংশে পাওয়া যায়ঃ—

"অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্যকালে স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥
পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরসনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্ আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্॥"

মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘঃ।

"যক্ষ, মহাকালে উপস্থিত হইয়া, মেঘকে সান্ধ্যপূজা-পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া পটহনিনাদানুকারী মৃদুমন্দ গর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলেন, মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যশীলা বারাঙ্গনাদের নখাগ্রে জলবিন্দু বর্ষণ করিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবারও ইচ্ছা জানাইলেন। ঈদৃশ বিবরণ কালিদাস স্বচক্ষে মহাকালে চণ্ডীশ্বরের সান্ধ্যপূজা না দেখিলে শ্লোকবদ্ধ করা সম্ভব হইত না। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অবন্তিনাথের বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি মহাকালে চণ্ডীশ্বরের মন্দিরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভক্তের হৃদয়পটে উপাস্য-দেবতার চিত্র সদাই প্রোজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত। যে দেবায়তনে কবি সতত্তই পূজার্থ উপস্থিত হইতেন, সেই বিগ্রহের মূর্ত্তি যে সর্ব্বদা তাঁহার মনে উদয় হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ জ্যোৎস্নাবতো নির্ব্বিশতি প্রদোষান্॥" রঘুবংশম্, ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

মহাকালে চণ্ডীশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে অবন্তিনাথ বাস করিতেন, ইহা কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের বাসও যে চণ্ডীশ্বরের সান্নিধ্যে, ইহাও কি সহজে অনুভাব্য নহে? নতুবা কবির মহাকালস্থিত শিবালয়ের বর্ণনায় এত ঔৎসুক্য কিরূপে সম্ভব? অবন্তিপতি বিক্রমাদিত্যোপাধিভূষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তৎকালে বিক্রান্ত নৃপমাত্রেই বিক্রমাদিত্যোপাধিস্পর্দ্ধী, নৃপমণ্ডলে ঐ উপাধিগ্রহণের লালসা অত্যধিক—ইতিহাসানুসন্ধানে জানা যায়। এইজন্য বোধ হয়, অবন্তিরাজও ঐ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বপ্রতাপ-প্রোদ্যোষিত করিয়াছিলেন। কালিদাস, অবন্তিরাজের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারমুখে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আর্য্য রসভাবদীক্ষাগুরোর্ব্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অস্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনো অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ।" এই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে উজ্জয়িনীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, সকল দিক্ রক্ষা পায় না। এইজন্য কালিদাস অবন্তিনাথের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া দৃঢ়-প্রতীতি জন্মিয়াছে। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে যে কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। সিপ্রানদীতটে উজ্জয়িনী নগরী বিরাজিত। কবি তাহা

একাধিক বার বলিয়াছেন। নদীতীরে যে সুন্দর উদ্যানমালা বিদ্যমান, কবি তাহা বলিতেও বিস্মৃত হন নাই :—

"অনেন যূনা সহ পার্থিবেন রম্যাণি! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে।
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু বিহর্তুমুদ্যানপরম্পরাসু॥" রঘুবংশম্, ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

কালিদাসের কাব্যাদিতে তাঁহার উজ্জয়িনীসম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। সুযোগ পাইলেই কবি উজ্জয়িনীর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বার্ত্তাবহ মেঘকে কবি বক্রগতি হইয়া একবার উজ্জয়িনী নগরী পরিদর্শন করিয়া যাইতে বলিলেন। বিশেষ আনুরক্তি না থাকিলে এরূপ আগ্রহ দুরনুমেয়। কিন্তু রঘুসৈন্য বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপ কি সরস্বতীর মন্দিরের উল্লেখ তাঁহার কাব্যমধ্যে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। বাস্তবিক কবি যদি নবদ্বীপে বাস করিতেন বা ব্রহ্মাণীতলায় সিদ্ধিলাভ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নবদ্বীপ ও ব্রহ্মাণীতলার বর্ণনা স্বীয় কাব্য-মধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন। এই কারণে মনে হয়, তিনি বঙ্গে কখনও আসেন নাই—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

কালিদাস যে যে স্থান বা নগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার যথোচিত বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ গঙ্গাযমুনার সঙ্গম সম্বন্ধে কবির চিত্তোন্মাদিকা বিবৃতির উল্লেখ করিতেছি :—

"ক্বচিৎপ্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ, মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাং ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গিরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ।" রঘুবংশম্, ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

সরযূ ও অযোধ্যার যেরূপ বর্ণনা রঘুবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সরযূ ও অযোধ্যা স্বচক্ষে দেখিয়া কবি তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন :—
"জলানি যা (সরযূঃ) তীরনিখাতযূপা রুণদ্ধ্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।" রঘুবংশম্ ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

"স মৌলরক্ষোহরিভিঃ সসৈন্যঃ তূর্য্যস্বনানন্দিতপৌরবর্গঃ।
বিবেশ সৌধাদ্গতলাজবর্ষাং উত্তোরণামন্বয়রাজধানীম্॥"

"ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্ বিগাহ্যমানাং সরযূঞ্চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে॥" রঘুবংশম্, চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্ লবণস্য বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোহস্তাস্তগৌরবম্॥"
রঘুবংশম্, পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

নিখাতযূপা নৌপূর্ণা সরযূ, উত্তোরণা পথসংস্কারশোভিনী অযোধ্যা, উপকণ্ঠে রম্য উপবন, ঋদ্ধাপণ রাজপথ—এই সব বর্ণনা কেবল কল্পনা বলে অসম্ভব—স্বচক্ষে দেখিলেই সম্ভব

হইতে পারে। এই কারণে বলিতেছি যে, কবি গঙ্গা, সরযূ ও অযোধ্যা পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি কালিদাসের অনুপমেয়, অতুল্য। কবি যাহা দেখিয়াছেন, স্বকৃত কাব্যে তাহার বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিভ্রমণোপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিলে বা নবদ্বীপে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিলে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গম বা অযোধ্যার অনুরূপ বর্ণনা শ্লোকসম্বদ্ধ হইয়া থাকিত। উজ্জয়িনীর কথা আর উত্থাপন করিলাম না—ঐ নগরীর প্রতি কবির অনুরাগ প্রস্ফুট।

পরিশেষে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা যে, কালিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গে পদার্পণ বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয় না। নিরর্থক কল্পনার লূতাতন্তু-বিস্তারের চেষ্টা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

এক্কার ঘোড়া।

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ মহাশয়ের লিখিত]

কোন কার্য্য উপলক্ষে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। সেখানে একদিন পেটের মধ্যে একটা অসহ্য রকম বেদনা হওয়াতে ডাক্তার যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অহিফেন-ঘটিত কোনও ঔষধ ছিল। তাহা সেবন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধুবরের বাহিরের ঘরের তক্তপোষে শুইয়া আছি। সম্মুখের জানালা খোলা আছে। রাস্তার ধারেই বাসা। লোকজন গাড়ীঘোড়া যাতায়াত করিতেছে, আমি শুইয়া শুইয়া দেখিতেছি। এমন সময় একখানি এক্কা গাড়ী আমার জানালার সম্মুখে হঠাৎ থামিয়া গেল। চালকের সুতীব্র কষাঘাত সত্ত্বেও অশ্বিনীকুমার একপদও অগ্রসর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। এক্কাচালক তখন চাবুকের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটির উপর এরূপ গালি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, তাহা সত্যসত্যই কার্য্যে পরিণত করিলে ফৌজদারী আদালতে কার্য্যবিধির ধারা অনুসারে সে অভিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল ফলিল না। এক্কার আরোহী তিন জন হিন্দুস্থানী। তাহাদের ট্রেনের সময় চলিয়া যাইবে বলিয়া, তাহারাও এক্কাবানের প্রতি নানারূপ তম্বিতাগাদা এবং গালাগালি আরম্ভ করিল। অশ্বটি কাতরভাবে আমার জানালার দিকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে সজোরে মাথা নাড়া দিয়া মাছি মশাই তাড়াইতে লাগিল, অথবা আর অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রবল অনিচ্ছাই প্রকাশ করিতে লাগিল—তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিব না। বেচারার দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তাহার দেহখানি পশুচিকিৎসালয়ের ছাত্রগণের অশ্বের শারীর-বিদ্যা আলোচনার পক্ষে আদর্শ হইতে পারে। তিন জন আরোহী সমন্বিত এক্কা-বহনের সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কঙ্কালখানি চর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইলেও তাহা ভেদ করিয়া দেহের অস্থিসমূহ স্বীয় স্বীয় অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ যখন এরূপ অশ্বকেও নির্ব্বিবাদে এক্কা বহন করিবার ছাড়পত্র দিতে

পারেন, তখন তাঁহারা যে স্বীয় কর্ত্তব্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিলে তাঁহাকে অর্ব্বাচীন ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, আমি অশ্বটির প্রতি সমবেদনাসম্পন্ন হইয়া এক্কার চালককে দৃঢ়ভাবে গোটাকয়েক শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া বলিলাম যে, সে পুনরায় অশ্বকে নির্দ্দয়ভাবে চাবুক দিলে, তাহারও পৃষ্ঠদেশ আমি ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিব। আমি যাঁহার অতিথি, তিনি সহরের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি, সুতরাং সেই খাতিরেই বোধ হয় আমার তিরস্কারে সে কিছু ভীত হইল এবং 'জো হুকুম সরকার' এই বলিয়া অন্য একখানি এক্কা ধরিয়া আরোহীগণকে তাহাতে উঠাইয়া দিল, এবং আমাকে পুনরায় সেলাম করিয়া অশ্বের কঙ্কালপৃষ্ঠে হস্তবিমর্ষণ পূর্ব্বক, "চল্ বেটী, আচ্ছা কবুকে দানা খিলাইয়েঙ্গে" বলিয়া, তাহাকে উৎসাহ দিয়া স্বীয় আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইল। অশ্বটি আমার দিকে আর একবার তাকাইয়া আচ্ছা করিয়া দানা খাওয়ার লুব্ধ আশ্বাসে গা ঝাড়িয়া মাথা নিচু করিয়া রাশ শিথিল করিয়া লইয়া 'মকানের' উদ্দেশ্যে নাতিধীর-বেগে অভিযান আরম্ভ করিল।

আমারও ঔষধের গুণে 'ঝিমুনির' ভাব আসিতে লাগিল, এবং অশ্বটির অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে নেশার ঘোরে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। অঘটন-ঘটন-পটিয়ান্ অভিফেন, কৃষ্ণকান্ত-কমলাকান্তকে অনেক নূতন জিনিস দেখাইয়াছেন, আমাকেই বা বঞ্চিত করিবেন কেন? তবে আমি তাঁহার ভক্ত লোক নহি। আমি আজন্ম গুড়ুকের একনিষ্ঠ উপাসক হইলেও কালচাঁদের প্রেমে কখন পড়ি নাই। তবে দায়ে পড়িয়া দায়গ্রস্তের মত ঔষধার্থে তাঁহার অধিকারের আমলে আসিয়া পড়িয়াছি, এজন্য বোধ হয় তিনি আমাকে শিবলোক বিষ্ণু-লোকের চিত্র দেখান সঙ্গত বোধ করেন নাই—অশ্বলোকে পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক, তন্দ্রাবস্থাতে আমার মনে হইল, কেহ যেন আমার জানালার কাছে খট্ খট্ শব্দ করিতেছে। ভাবিলাম, চোর টোর বুঝি বা হইবে। আমি বলিলাম—"কোন্ হ্যায়?" উত্তরে চিঁহি চিঁহি গোছ আওয়াজে শুনা গেল—"May I come in, Sir?" (আমি কি ভিতরে আসতে পারি, মশায়)? প্রতিদিন স্বীয় চাকরীর প্রসাদে এই কথাটা আমাকে বহুবার শুনিতে হয়। সুতরাং অভ্যাস মতে উত্তর দিলাম, "Oh yes, come in," (হাঁ, ভিতরে এস)। তার পর আগন্তুকের আগমন-প্রত্যাশায় দ্বারের দিকে তাকাইলাম। দরজা ভেজান ছিল, কিন্তু জানালার দিকে পুনরায় খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া সেই দিকে তাকাইয়া দেখি—ও হরি! এতো মানুষ নয়—সেই এক্কার কঙ্কালসার ঘোড়াটা, জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া দিব্যি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পূর্ব্বার্দ্ধ-ভাগ ঘরের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। আমি তাকাইতে না তাকাইতেই একেবারে গৃহের মধ্যে চারপায়ে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখের দক্ষিণ পদখানি কপালে ঠেকাইয়া সেই স্বরে 'Good Evening, Sir' বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিল। আমি তো একেবারে অবাক্!—চিত্রার্পিতারম্ভইবাবতস্থৌ। প্রথম বিস্ময়ের অবসানে আমার বড় রাগ হইল।

কোথাকার একটা এক্কার ঘোড়া—ভূতের মত কঙ্কাল-শেষ চেহারা—অপরিষ্কার মলিন, গায়ে সেই ঘোড়ার গায়ের বট্‌কা গন্ধ—বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানার মধ্যে উপস্থিত। কি যে বলিব—ভাবিয়া পাইতেছি না, অথবা রাগের প্রাবল্যে মুখে কথা বাহির হইতেছে না। এমন সময়,

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সে বলিয়া উঠিল,—"বসিতে পারি কি?" আরে মোলো যাঃ। বেটা তুই বস্‌বি কোথায়? ঐ সব চেয়ারে, না কৌচে, না আমার দুগ্ধফেন নিভ কোমল শয্যাসমন্বিত তক্তপোষের উপর। অশ্ব যেন সর্ব্বজ্ঞ। সে আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"ভয় নাই। আমাদিগকে তোমরা যত বর্ব্বর অসভ্য বলিয়া মনে কর, আমরা তাহা নহি। তোমার কোনও জিনিষ নষ্ট হবে না। তোমার বাড়ী এসেছি, আমি যত ছোট যত নীচই হই না কেন, তোমরা তো সুসভ্য। তা বস্‌তে বলা কি ভদ্রতা নয়?" আমি তো অবাকের উপর আরও দুই পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছি। শেষ কালে, একটা একার ঘোড়া আমাকে ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছে।' কৌতুহলবশে বলিলাম,—"হাঁ, বোসো, তবে দেখো বাবু, সব ফার্ণিচারগুলো খারাপ কোরো না। ঘোড়ার মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসাটা তো সংসারে বড় একটা দেখা যায় না কিনা, তাই একটু বড় কেমন বোধ হচ্ছে—বুঝ্‌লে?" অশ্বপ্রবর ধীরভাবে নিকটস্থ একখানি চেয়ারে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় জানুর উপর স্থাপন পূর্ব্বক কোদালির মত দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত করিয়া বলিল 'Thanks' (ধন্যবাদ—ভদ্রতার কায়দাগুলোও জানা আছে দেখ্‌ছি।) হাঁ, দেখা সাক্ষাতের সুযোগ বড় হয় না, তা ঠিক্, তবে সে দোষটা কার বল দেখি? তোমরা কি আমাদের ভাষা বুঝিতে চেষ্টা কর—কি আমাদের দুঃখ দরদের প্রতি তোমাদের কোনও সহানুভূতি কি সমবেদনা আছে? আজ তুমি আমার হইয়া দুটি কথা বলিয়াছ, আমার দুঃখে বেদনা প্রকাশ করিয়াছ, অমনি দেখ, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তোমার কাছে আসিয়াছি। মনে করিয়াছি, এত কাল পর যখন একজন ব্যথার ব্যথা পেয়েছি, তখন দুঃখের কথা কিছু তোমাকে বলিয়া, মনের বোঝাটা কতকটা হাল্কা করিয়া লইব। আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া দু'কথা বলেছিলে, তাই তোমাকে আপন জন মনে করে মনখুলে দুটো কথা বল্‌তে এসেছি। জানই তো—"স্বজনস্যতি দুঃখ ম গ্রতো বিবৃত দ্বার মিবোপ জায়তে।" (বাপ্‌রে। এ যে আবার সংস্কৃতও জানে দেখ্‌ছি।) কিন্তু এখন তোমার ভাব দেখে আমি হতাশ হয়েছি। বুঝেছি যে সে সময় যে একটু কৃপা-কটাক্ষপাত করেছ, সেটা একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। সেটা চলে গেছে, সুতরাং আমি এখন বিদায় লইতেছি।" অশ্বপ্রবর, এই বলিয়া চি হিঁ হি করিয়া গলা ঝাড়িয়া, উঠিবার উদ্যোগ করিল।

আমি বলিলাম,—"অত জোরে শব্দ কোরোনা। তোমার গলাটা বড় মোলায়েম নয় কিনা—আর বৈঠকখানাতে তোমার ডাক শুন্‌লে বাড়ীর মধ্যে সকলে কি মনে কোরবেন্। তা তোমার কি বলবার আছে, আস্তে আস্তে বলনা কেন, আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।"

অশ্বিনীকুমার এতচ্ছ্রবণে চেয়ারটির উপরে একটু নড়িয়া চড়িয়া ভালভাবে বসিল। চেয়ারখানা অনভ্যস্ত উপবেষ্টাকে বোধ হয় তেমন সহ্য করিতে পারিতেছিল না,—সে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ করিয়া নিজ বিরক্তি জ্ঞাপন করিল। অশ্বপ্রবর সেটা গ্রাহ্য না করিয়া আবার একটু দন্তরুচিকৌমুদী প্রকাশ করিয়া বলিল,—বেশ, বেশ, তুমি শুনিতে রাজি হয়েছ, সে বড় সুখের কথা। আমিও তবে যা বল্‌বার তা বল্‌ছি, শোন।

"দেখ, তোমাদের মধ্যে কেহই আমার দিকে এ পর্য্যন্ত কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই। বহু পূর্ব্বে "কূপে জলধরের কৃপাধারা বর্ষিত হইয়াছে, রাজপথ রবিকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে।"

ত্রৈলোক্যনাথ ঢেঁকিবাহনের প্রতিই কিঞ্চিৎ দয়া করিয়াছেন; কিন্তু আমি এক্কার ঘোড়া, তোমাদের বঙ্গ-সাহিত্য হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত। তোমরা কেহ কেহ "বেঘোরে বেহারে এক্কাতে চড়িয়াছ বটে, কিন্তু সে এক্কার আসল প্রাণ বস্তু যে আমি—যাহার রক্ত জল করিয়া অস্থি পেষণ করিয়া সেই এক্কা প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার কথা কি কেউ মনে করেছ বল্‌তে পার? বল, উত্তর দাও।"

আমি একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলাম,—"তা, তা—বোধ হয় কেউ তেমন করে বলে নাই—কি বল্‌তেও পারে আমি জানি না। তুমি কি কারো কাছে নিজের কথা বল্‌তে গিয়েছ?"

অশ্ব-প্রবর একটু ক্ষুব্ধভাবে হুঁ, হুঁ হুঁ করিয়া বলিল,—যাই নি? কতবার গিয়েছি। হিন্দুস্থানীদের কাছে তো লক্ষ লক্ষ বার গিয়েছি। তার যা ফল, তাতো কালই দেখেছ। তোমাদের অনেকের সঙ্গে তো আমার পরিচয়ের সুযোগই ঘটে না, কেন-না, তাঁরা এক্কাতেই চড়েন না। যাঁরা সময় সময় চড়েন, তাঁদের কাছে বল্‌তে যাই বৈ কি—সময় সময় বলেও থাকি। কিন্তু তোমরা কি তা বুঝ্‌তে চেষ্টা কর? আমাদের ভাষা বোঝার জন্য কখনও চেষ্টা করেছ কি? বিলাত দেশের নিন্দা কর কিছুই নয়—রাগ কোরোনা—তোমাকে তুচ্ছ করছি না—বোল্‌তা মৌমাছি, প্রভৃতির পর্য্যন্ত ভাষা বুঝ্‌তে সারা জীবন ব্যয় করেছে। আর তোমরা? তোমাদের নিজেদের ভাষাই বুঝ্‌তে চাও না, তার কোথায় আমরা। নগণ্য, তুচ্ছ, পশু আমরা।"

আমি একটু কড়াভাবে বলিলাম,—"তুমি বড় বেশী বেশী সাহস দেখাচ্ছ দেখ্‌ছি, হে বাপু। আমরা আমাদের ভাষাই বুঝি না? কি যে বল, তার ঠিক নাই।"

অশ্বপ্রবর হি হি করিয়া খিন্‌খিনি হাসি হাসিয়া বলিল,—"অত চটে গেলে কেন? বোঝ নাই ত। সে ত সত্য কথা। দেখ, মুখের কথাটাই বুঝি বড় ভাষা,—না? একজন বিলাতি পণ্ডিত এক সময় বলিতেছেন যে,—'কথিত ভাষাটা মানুষ প্রকৃত মনের ভাব গোপন করবার জন্যই আবিষ্কার করেছে।' সুতরাং মুখের কথায় ভাষার মূল্য কি? চোখের ভাষা, মুখের ভাষা তা কি তোমরা বোঝ? তাহলে ঐ যে, তোমার পাখা-কুলি, ছটো ভুজ্যা খাইয়া সারারাত্রি তোমায় পাখা টান্‌ছে, সে একটু ঘুমাইয়া পড়িলে লাথি দিয়া তাকে জাগাতে না। ঐ যে প্রজা নিরন্ন হইয়াও তোমার বিলাসব্যসনের জন্য অর্থ জোগাইয়া—"হুজুর মাবাপ, রাজা কর্ত্তা, বিধাতা, এমন দয়াল হয় না" বলিয়া সেলাম করিয়া যাইতেছে, তাহাতেই তুমি ভুলিয়া থাকিতে না। ঐ যে কৃষক শত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার জীবনোপায় যোগাইতেছে,—তাহার স্বাস্থ্যের জন্য, তাহার একটু স্বচ্ছন্দতার জন্য একটুও চেষ্টা করিতে। বল দেখি, তোমরা তোমাদের ভাষা বোঝ কি? আমাদের কথা তো পড়িয়াই আছে। তোমাকে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমি প্রাণপণে ছুটিয়াছি। তবুও তুমি 'চালাও, তেজ চালাও', বলিয়া চালককে আমাদের উপর চাবুক কসিয়া দিতে উৎসাহিত করিতে না। আমরা একটু অক্ষম হইলে আমাদিগের প্রতি শত প্রকার যন্ত্রণা হাসিমুখে দিতে পারিতে না। যাক্, সে কথা আর কত বলিব। যা বল্‌ছিলাম, তাই বলি। হাঁ তোমরা আমার বিষয় কেহই কখনও একটুও কিছু কর নাই! ছ্যাকরা গাড়ীর

আমার স্বজাতিকে তোমরা অনেক স্থলে তোমাদের কেরাণীগণের সঙ্গে উপমিত করিয়া, তাহাকে অমর করিয়া দিয়াছ। কিন্তু, আমি তোমাদের বঙ্গদেশে নাই বলিয়াই কি আমাকে তোমরা একেবারে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিবে? ঠিক এক্কাবাহকরূপে না থাকিলেও আমি রূপান্তরে টমটম বাহকরূপে তোমাদের কোনও কোনও জেলায় নাই কি? সে ও যে, আমিও তাই। তার পর, তা না হলেও তোমরা যখন বেহার এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দলে দলে রহিয়াছ, তখন, সেই সব দেশের আমাকে—একজন প্রধান সর্ব্বপরিচিত আমাকে—বাদ দিলে চলিবে কেন? ভাগলপুর বল, মুঙ্গের বল, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মিরাট, কানপুর, কোথায় তোমরা নাই? আমার রাজত্বে বাস করিয়া আমাকে এত উপেক্ষা করা কি ভাল? তার পর, তোমাদের কেরাণী কুলের উপমা আমার সঙ্গেই ভাল খাটে। ছ্যাকরা গাড়ীতে তবু আমার দুইজন জাতভাই থাকে, আর আমি যে,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' দুই অশ্ব যুক্ত এক্কা কখন দেখেছ কি? আমি যেমন উদ্ভ্রান্ত প্রাণপণে খাটিয়াও ছুটি পাই না, রাত্রিতে কতক্ষণ পর্য্যন্ত খাটিতে বাধ্য হই—তোমাদের কেরাণীকুলেরও সেই দশা। অনশন এবং অর্দ্ধাশন উভয়ের পক্ষেই সমতুল্য। সামান্য একটু কার্য্যের ত্রুটিতে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার, নানারূপ অসম্ভব যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা এবং কশাঘাত উভয়েরই তুল্যভাবে দৈবনির্দ্দিষ্ট। কাজ উদ্ধারের সময় পিঠ চাপড়াইয়া দুটো মিষ্ট কথা পাওয়াও আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য। তবে একটা বিষয়ে আমি যেন তোমাদের কেরাণীগণের চেয়ে একটু ভাল। কারণ, রাত্রিতে খাটুনি শেষ হইলে আমাকে ঘরে লইয়া গিয়া এক্কা হইতে খুলিয়া লইয়া খাদ্যাখাদ্য যাহা কিছু দিক বা না দিক, অবশিষ্ট সময় আমাকে বিশ্রাম করিতে ছাড়িয়া দেয়,—আর কাজও করিতে হয় না, গালাগালিও শুনতে হয় না। কিন্তু তোমাদের কেরাণীগণ, রাত্রি পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া, আমারই এক্কাতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখনও বগলে করিয়া আফিসের কাগজের তাড়া লইয়া আসেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, রাত্রিতে বাড়ীতে গিয়াও নিষ্কৃতি নাই, আবার কাজে বসিতে হইবে। তার পর, ঘরে গিয়া অভাব অনটন, সংসারে খুটি নাটী ঝগড়া ঝাঁটি, মন কসাকসি, এ সবও অধিকাংশকেই ভোগ করিতে হয়। ও বালাইটা আমাদের আদৌ নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমাদের সমাজে বিবাহ করিয়া ঘরকন্না পাতিবার প্রবৃত্তি দেন নাই,—সুতরাং দাম্পত্য কলহের সুখভোগটা আমাদের ভাগ্যে আদৌই নাই। অতএব তুলনায় সমালোচনাতে দেখা যায়, আমরাই তোমাদের কেরাণীদের চেয়ে একটু উচ্চ পদে আছি। অথচ, তোমরা আমাদের একেবারে আমলেই আনিতে চাও না। এটা কি ভাল?"

আমি বলিলাম,—"তা বটে, তুমি বল্‌ছো মন্দ নয়। তবে আর কতক্ষণ তোমার কাহিনী চল্‌বে?"

অশ্ববর আবার জোরে হুঁহুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"আঃ। কি বারে বারে ওই কর্কশ কণ্ঠ।"

বাধা দিয়া অশ্ববর বলিল—"কর্কশ কণ্ঠ কি রকম? বাবুত, তোমাদের স্বর্গ-সঙ্গীতাচার্য্য কিন্নরেরা যে অশ্বমুখ, সেটা কি ভুলে গেলে? গ্রীক্ পুরাণের সঙ্গীতাচার্য্যগণও

কেহ অশ্বদেহ নরমুখ; আবার কেহ নরদেহ অশ্বমুখ। সেটা জানা নাই কি? কণ্ঠের মাধুর্য্য-সম্বন্ধে আমাদের classical সার্টিফিকেট আছে।"

"একটু গান শুনবে।"

এই বলিয়াই অশ্ববর হেঁ হেঁ হেঁ করিয়া ঘাড়-মাথা এবং সম্মুখ পদদ্বয় নাড়িয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বাধা দিয়া তেই আমি জোড় হাতে বলিলাম,—"বাপুহে, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আর সুরে কাজ নাই; যা বল্‌ছিলে, তাই শেষ করে ফেল।"

বাধা পাইয়া অশ্বপুঙ্গব একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল,—"তোমার রসবোধই নাই। যাক্, কেরাণীর কথা বল্‌ছিলাম, তাই বা কেন? তোমরা সকলেই যে আমারই মত দশায় পড়ে আছ, তা ভেবেছ কি? একবার নিবিষ্টচিত্তে ভেবে দেখ দেখি!

"দেখ, আমিও কম সনাতন নহি। মনে কর দেখি—সেই উচ্চৈঃশ্রবা হয়ের কথা। তার থেকেই তো আমরা সব। চেহারাতে অনেক পার্থক্য হয়েছে বটে, তা তোমার এই বার্ণসকুরা চেহারা দেখ্‌লে কে অনুমান করতে পারে যে, তুমিও সেই সনাতন আর্য্যবর্ণ? নিজের দিকে তাকিয়ে কথা বোলো।

"এই যে সব রাজরাজড়ার ঘরে, বড় বড় লোকদের মন্দুরাতে, বড় বড় ওয়েলার দেখ্‌ছ ওদের ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই, তবে, তারা আদরে যত্নে আছে, তাদের উন্নতির দিকে সকলেরই দৃষ্টি আছে, তারা মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিয়া বাবু সাজিয়া বেড়ায়, আর উত্তম উত্তম খাদ্য পানীয়াদি ভোগ করে;—আমরা তাদের ঘৃণ্য উচ্ছিষ্ট শুক্‌নো পচা ঘাস দানা খাই—দুর্গন্ধ- হুঙ্কারজনক খড়ের বা খোলার আস্তাবলে নিজমলমূত্রে ডুবিয়া থাকি; যত্নের মধ্যে—খাদ্য অপেক্ষা দলন মার্জ্জন উপসর্গই বেশী। তারা দু-এক মাইল পথ ঘুরিয়া আসিলেই পরিশ্রান্ত এবং সেবকগণ-কর্ত্তৃক নানারূপে গতক্লম, আর আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টাই অনবরত রৌদ্র বৃষ্টি হিম সব মাথায় করিয়া ক্রমাগত খাটিতেছি—পায়ের ধূলি মাথায়—মাথার ঘাম পায়। সুতরাং আমাদের দশা এ রকম হবে না তো কি? কিন্তু ভেবে দেখ—সকলেই কর্ত্তার অধীন।

"তারা রেশম, পশম, শাল বনাতে সজ্জিত হইয়া সোণারূপা দিয়া বাঁধা গাড়ী টানে, কি রাজা কি রাজপ্রতিনিধিকে পৃষ্ঠে বহন করে—আর আমরা না হয় লোহা-কাট-দিয়া-গড়া, ভাঙ্গা-চুরা এক্কা টানি। টানাটানিটার থেকে নিষ্কৃতি কিন্তু কাহারও নাই। তাদের যে আদর দেখান হয়, সেটা তাদের জন্য—কি? তাদের কিন্‌তে যে হাজার হাজার টাকা লাগে, তার মায়ায়? তাদের যে আদর, সেও আমাদেরই লইয়া। দেখ দেখি হিসাব করিয়া, এ সহরে ঐ সব দামী ঘোড়াই বা কত আছে, আর দীনহীন আমরাই বা কত আছি? আমরা যদি একেবারে লুপ্ত হইয়া যাই, তবে উহাদের দ্বারা কি তোমাদের সকলের কাজ চলিবে? না, উহাদেরই এ আদর থাকিবে? তখন দেখিবে—উহাদিগেরই আবার আমাদের কাজে লাগিতে হইতেছে। তাই বলি যে, আমাদের দিকে একবার তাকান তোমাদের উচিত। আমরা নানারূপে তোমাদের অনেক কাজ করিতেছি। তোমাদের লাঙ্গল টানিতেছি, বোঝা টানিতেছি, গাড়ী টানিতেছি, এক্কা টানিতেছি, পিঠে করিয়া

বহিয়া লইতেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছি, ঘোড়দৌড়ে প্রাণপণ করিয়া ছুটিয়া তোমাদিগকে টাকা আনিয়া দিতেছি—এ সকলই আমরা আমাদের জাতভাইয়েরা করিতেছি। আর আমরা অকৃতজ্ঞ নহি—মনে প্রাণে তোমাদের সন্তোষ-বিধান করিতেছি। তবু তোমরা আমাদের দিকে চাহিবে না? আমাদের দু দশজনকে তোমরা আদর করিতেছ, সমৃদ্ধ করিতেছ, সোণার শিকলি পরাইয়া সাজাইয়া বাহির করিতেছ, দশজনকে দেখাইতেছ—তাহাদিগকে কত সুখেই রাখিয়াছ; কিন্তু আমরা এই সব এক্কার ঘোড়াগুলি, যদি সর্ব্বদা তোমাদের গালাগালি এবং কষাঘাতের তাড়নে জর্জ্জরিত হই, যদি ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল না পাই, হুঙ্কারজনক স্থান ভিন্ন যদি আমাদের বিশ্রামের স্থল না থাকে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তোমরা আমাদের দুঃখ বোঝ? আমাদের মঙ্গল, ইচ্ছা তোমরা কর। এই দেখিলে তো সন্ধ্যাকালেই আমার দশাটা। বরদাস্ত করিতে পার বা না পার, যে ভার চাপাইবে, তাহা বহিতেই হইবে নাকে দড়ি দিয়া যে পথে চালাইবে, চলিতেই হইবে, কথা না শুন—চাবুকে পিঠ ফাটাইয়া দিব, গালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দিব। অথচ, আমাদের না হলেও তোমাদের চলবে না—সুতরাং নিজের গরজে আবার আসিয়া পিঠে একটু হাত বুলাইয়া দুটো ঘাস দানার লোভ দেখাইয়া বশ করিয়া লইবে। তোমাদের বিরুদ্ধে চলিতে চাহিলেই বা তা পারি কৈ। আহারে কাটতি করিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া, সর্ব্বদা হুকুমের জোরে চাবুকের চোটে চালাইয়া, আমাদিগকে এমনই হীন নির্জ্জীব ক'রে তুলেছ যে, আমরা কিছু কর্ত্তে পারি না। সময় সময় বাঁকিয়া দাঁড়াই বটে, কিন্তু ভিতরে তো কিছু আর রাখ নাই—কিসের জোরে দাঁড়াই। মধ্যে মধ্যে তোমার মত দুই একজন, একটু সমবেদনা যদি দেখান, অমনি আনন্দে আমরা গলিয়া যাই—আর তাহাদিগকে বড় আপনার লোক বলিয়া মনে করি, আর তার কাছে মনের কবাট খুলে দিতে চাই—তাই এসেছিলাম। দেখ দেখি একবার ভেবে—যে, আমি তোমার এতই ঘৃণার যোগ্য না করুণার পাত্র? আমাদের যত অর্ব্বাচীন বলে মনে কর—প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই, তবে তোমরা যদি আমাদের ভুল বুঝিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে চাও, বেশ তাই থাক, আমাদের আর উপায় কি?

"ওকি। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। আমার যে এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে। যাক্, আর একদিন না হয় অবসর পেলে আস্‌বো—তাই কি পারি? ছাড়া পেলেও পায়ে দড়ি টেনে বেঁধে রাখে। তবে আসি, কিছু মনে ক'রো না। good night।"

খুট্ খুট্, খুট্, খুট্ শব্দ হলো,—আর একটা কি শব্দ কাণে গেল। তাকাইয়া দেখি, বন্ধুবর জুতার শব্দ করিতে করিতে পদচারি কচ্ছেন, আর আমায় ডাকছেন—"খুব ঘুমাচ্ছো যে হে।"

আমি ঔষধের কথা মনে করিয়া আর কোনও উত্তর দিলাম না।

এক্কার ঘোড়ায় সম্ভাষণ যে আহফেন-ঘটিত ঔষধেরই ক্রিয়ার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম—কথাগুলি কি নিছক আফিমখোরী?

ভারতীয় আর্য্য জ্যোতিষ ও জ্যোতিষিগণের বিবরণ।

[শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিরচিত।]

(১)

যে শাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, তাহার নাম জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ। বেদসকল—যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে, কালজ্ঞান আবশ্যক। কাল জানিতে হইলে, জ্যোতিষই প্রধান উপায়—এইজন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ।

অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এই শাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান্। ইহার সাহায্যে, আমরা বিশ্বপতির অনন্ত রাজ্যে অনন্ত কৌশলময়ী লীলার স্থূলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ ও উপগ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া, অনন্ত শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট্ আকৃতি, ভীষণ অননুভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়ি। অসীম নভোমণ্ডলের তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—ছন্দঃ বেদের পাদ, কল্প ইহার হস্ত, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ব্যাকরণ ইহার মুখ। ষড়ঙ্গাত্মক বেদের এই ষড়ঙ্গের মধ্যে আবার জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গণিত ও ফলিতভেদে জ্যোতিষশাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
তৎর্কাৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্তাতে সংহিতা।
স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন বা গ্রহগতিস্তত্রাভিধানস্তসৌ
হোরান্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরম্॥ বৃহৎসংহিতা ১।৯।

নানাবিষয়ভেদে জ্যোতিঃশাস্ত্র তিনস্কন্ধে বিভক্ত,—সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতাস্কন্ধ, যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গ নির্ণয় অর্থাৎ যাত্রা বিবাহাদি নিরূপিত হয়, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা বলে।

গণিত জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থের সাধারণ নাম তন্ত্র হইলেও উহা সিদ্ধান্ত ও করণ ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার উপপত্তি থাকে, কিন্তু করণে তাহা থাকে না। গণকের গণনার সুবিধার জন্য কেবল গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আশ্রয় না করিয়া করণগ্রন্থ হয় না। সিদ্ধান্তই করণের মুখ্য অবলম্বন। সিদ্ধান্ত আবার বিষয় ভেদে দুইভাগে বিভক্ত—একভাগে গণনাক্রম ও অপর ভাগে গণনার উপপত্তি। প্রথম ভাগের নাম গ্রহগণিত ও দ্বিতীয় ভাগের নাম গোলগণিত।

গণিতে যেমন তিনটী ভাগ আছে, ফলিত ও তেমনই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা— জাতক-গণনা (Geni thiology); প্রশ্নগণনা (Horany); রাষ্ট্রবিপ্লবগণনা (Mundane) ঝড়-বৃষ্টিগণনা (At mospherical), এবং রোগ মৃত্যু গণনা (Medical Astrology)।

ফলিত জ্যোতিষে গ্রহদিগের অবস্থানুসারে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফল স্থির করিবার উপায় নির্দ্ধারিত থাকে। বরাহ মিহির, বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন—পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চ সিদ্ধান্ত বর্ণিত বিষয় ও 'জ্যামিতিক ক্ষেত্র' বিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে, ফলিত জ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য, সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক গ্রন্থের গণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন ঃ—"আদি মূহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদি সমূহের সঞ্চার নিরূপণরূপ দুই প্রকার গণনা এবং যন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জোতিঃশাস্ত্রের এক দেশ জাতক-সংহিতা মাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে চিত্রময় রাজা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহের ন্যায় কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত বিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র, অভিনব প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।" (সি. শি. গণিতাধ্যায় ৯।১০।১১ শ্লোক) আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—গণিত দুই প্রকার, ব্যক্ত—অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত—অর্থাৎ বীজগণিত। এই দুই প্রকার গণিত শাস্ত্র যিনি জানেন এবং শব্দ শাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি জ্যোতিষের নানা শাখা পাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি নামমাত্র জ্যোতিষী। বস্তুতঃ জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিত জ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

য়ুরোপীয় মতে জ্যোতিষ (গণিত জ্যোতিষ) প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical or Mathematical Astronomy), প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical Astronomy) ও নাক্ষত্র জ্যোতিষ (Sidereal Astronomy) ভিন্ন ব্যবহারিক জ্যোতিষ (Practical Astronomy) নামে একটি বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে বাসন্ত বিষুবদ্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকায় সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণে (২।১৩।১৩) লিখিত আছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নবীন-উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশাপাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকাপুঞ্জসংক্রামিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ-বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারম্ভ হইত, কিন্তু অয়ন, মাঘ মাস হইতে গণনা করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ঋগ্বেদসংহিতা প্রচার কা, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক

বহুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের রচনাকাল অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জ সংক্রামিত ছিল। কেহ কেহ বলেন,—৪০০০ পূঃ, খৃঃ অব্দে মৃগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদ্দিনের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফাল্গুন এবং পুনর্ব্বসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্বৃত্ত ও অয়নসম্বন্ধীয় বর্ষসূচক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা সংক্রমিত হইবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক পর্য্যালোচনা করিতেন। ইহারা প্রথমতঃ বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে, এবং পরে শীতায়ন হইতে, নব বর্ষারম্ভ গণনা করিয়াছেন। জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটী গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক গণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ১৪।১৫ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়ন-নির্দ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক গ্রন্থে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্রমানানুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ণীত হইয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি বলেন—"নক্ষত্রের গতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধ্রুব নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারাই সহজে অনুমিত হইতেছে যে, খৃষ্টজন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে:—

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ। কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনোযবনোভৃগুঃ। শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥

সূর্য্য, পিতামহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, পৌলিশ চ্যবন, যবন, ভৃগু ও শৌনক এই অষ্টাদশ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। এতদ্ভিন্ন কেহ পুলস্ত্যকে অন্যতম আচার্য্য মনে করেন এবং কেহ বা, লোমশ ও রোমককে অভিন্ন মনে করেন। ইহাদের প্রণীত গ্রন্থের কোনটী সিদ্ধান্ত বা তন্ত্র, কোনটী বা সংহিতা নামে অভিহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের নাম মাত্র আছে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ বিলুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কোন কোনটীর সংশোধিত নূতন সংস্করণ রচিত হইয়াছে। তাহা হইতেই আমরা উক্ত শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মহাজনগণের নাম শুনিতে পাইয়া থাকি।

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মা নারদকে, চন্দ্র শৌনককে, বশিষ্ঠ মাণ্ডব্যকে এবং সূর্য্যদেব ময়নামক অসুরকে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অথচ যুক্তিযুক্ত জ্যোতিঃ শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। সূর্য্যের উপদেশমূলক গ্রন্থই 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে অভিহিত।

সূর্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে সূর্য্যদেবাংশ ব্যক্তিগণের দ্বারা 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থ লিখিত বলিয়া কথিত। এই জন্যই হউক বা ইহার গণনা-প্রণালী অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়াই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর প্রাচীন ও আধুনিক সকল জ্যোতির্ব্বিদেরই সমধিক আস্থা। গ্রন্থোল্লিখিত প্রমাণানুসারে জানিতে পারা যায়, সত্যযুগের অল্পমাত্র সময় অবশিষ্ট থাকিতে, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে। তদনুসারে ন্যূনাধিক ২১৬৫০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে অনুমিত হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের ন্যায় ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সোমসিদ্ধান্ত, প্রভৃতি কয়েকখানি দেবপ্রণীত এবং বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, শৌনকসিদ্ধান্ত, পৌলিশসিদ্ধান্ত ও পরাশরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকখানি ঋষি প্রণীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে। অনেকে বলেন,—যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ একই সময়ে লিখিত। একথা কতদূর সত্যমূলক, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। কারণ, এ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত সত্যযুগের শেষভাগে ও পরাশর সিদ্ধান্ত কলিযুগে রচিত হয়। দেব-প্রণীত সিদ্ধান্তগুলি যে সময়েই লিখিত হউক, সেই সময় যে, জ্যোতিষ সিদ্ধান্তশাস্ত্রের আদিম বা শৈশবকাল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেবতারা জ্যোতিষশাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া যান। ঋষিগণ, তাহাকে অঙ্কুরিত এবং নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আর্য্যসময় কৌমারাবস্থা। দৈব বা আর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, শতানন্দ আচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য, কেশব দৈবজ্ঞ তৎপুত্র গণেশ দৈবজ্ঞ, নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ, কমলাকর প্রভৃতি বহু জ্যোতিষী, কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সময়কে (১১শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত) গণিত জ্যোতিষের যৌবনাবস্থা বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত জ্যোতিষের যাহা কিছু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই সময়েই হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই জ্যোতিষের ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উপযুক্ত সাহায্য অভাবে ক্রমশঃ উদ্যমহীন হইতে থাকেন। সুতরাং, তাঁহারা সিদ্ধান্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া, পূর্ব্বাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া, সহজ করণ গ্রন্থ ও সারিণী প্রস্তুত করিতে যৎপরোনাস্তি যত্নবান্ হন। সকলেই সরল করণ ও সারিণীর উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যাঁহারা করণ গ্রন্থ সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন, তাঁহারাই অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই সময়ে ও তাহার পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা করণ ও সারিণী গ্রন্থের সৃষ্টি হইল।

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

আর্য্যভট—আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্য্যভট বা আর্য্যভট্টই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ আচার্য্য। আর্য্যভট্ট ৩৯৮ শকে (৪৭৫ খৃঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুসুমপুরে (পাটলীপুর, বর্ত্তমান পাটনা) আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ব্রহ্মকৃশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভানায়মস্কৃতা।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরে হ্যভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥ (গণিতপাদ ১)

আচার্য্য আর্য্যভট সে সময়ে একমাত্র সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি একখানি ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার নাম আর্য্যভটীয়। তৎকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দা স্তদিহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥ (কালক্রিয়াপাদ ১০)

তিনযুগ অতীত হইবার পর ৬০×৬০=৩৬০০ বর্ষ হইলে, আমার জন্মের ২৩ বৎসর অতীত হয়। উক্ত বচনানুসারে (৩৬০০—২৩) বা কলির ৩৫৭৭ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের জন্ম হয়। তাহা হইলে, তাঁহার জন্মকাল খৃষ্টের ৪৭৫ অব্দ হইতেছে। আর্য্যভটের লিখিত 'আর্য্যভটীয়' নামক গ্রন্থে দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। সমগ্র গ্রন্থখানি চারিপাদে বিভক্ত; তাহার প্রথম পাদে 'দশগীতিকা' নামে ১৩টী শ্লোকে গ্রথিত একখানির গ্রন্থ এবং শেষ তিনপাদে ১০৮টী আর্য্যা শ্লোক আছে। এই কারণে গ্রন্থ দুইখানির যথাক্রমে "দশগীতিকা" ও আর্য্যাষ্টশতিকা নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ এই দুই গ্রন্থযুক্ত সমগ্র গ্রন্থকে 'আর্য্যসিদ্ধান্ত' বলিয়া থাকেন। দশগীতিকায় জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের শ্লোকে গ্রথিত সূত্র দেওয়া আছে এবং আর্য্যাষ্ট শতিকায় গণিতকাল ক্রিয়া ও ভূগোলের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন অল্পকথায় জ্যোতিষের সমগ্র সত্য বিবৃত করিতে কোন জ্যোতিষীই সমর্থ হন নাই।

উপরোক্ত আর্য্যভট্ট ভিন্ন অন্য একজন আর্য্যভট্টের নাম পাওয়া যায়। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ঈশ্বরদাস—জ্যোতিষ রায়ের পুত্র। 'মুহূর্ত্ত-রত্নাকর' নামক গ্রন্থকার।

কমলাকর—'জাতক তিলক' গ্রন্থ রচয়িতা।

কমলাকরভট্ট—'সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার বংশ-পরম্পরায় পণ্ডিত ও গ্রন্থকার কমলাকরের পিতামহ কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ 'বীজকল্পলতা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। কমলাকরের পিতা নৃসিংহ দৈবজ্ঞ 'বামনা কর্তৃক' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতৃব্য মুনীশ্বর, সিদ্ধান্তশিরোমণির 'মরীচি' নাম্নী টীকা রচনা করেন। কমলাকরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দিবাকরও একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন।

কল্যাণ বর্ম্মা—একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি 'সারাবলী' নামক একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করেন।

কামদেব—জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কালিদাসগণক—'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' রচয়িতা। এতদ্ভিন্ন 'রত্নকোষ', 'শুদ্ধিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাস বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশীরাজ—বীরসিংহের পিতা 'খেটপ্রব' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থকার।

কৃপারাম—'বীজগণিতোদাহরণ', 'পঞ্চপক্ষী টীকা', 'মকরন্দোদাহরণ', 'মুহূর্ত্ততত্ত্ব টীকা', 'যন্ত্রচিন্তামন্ত্রোদাহরণ' ও 'সর্ব্বার্থচিন্তামণি' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা।

কৃষ্ণদাসকর—'জ্যোতিষ কেদার' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

কৃষ্ণ—এতাদবাত্মজ কাশ্যপগোত্রীয় কৃষ্ণ ১৫৭৫ শকে 'করণ কৌস্তুভ' রচনা করেন।

কৃষ্ণচক্রবর্ত্তী—'জ্যোতিঃসূত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা। এই গ্রন্থে রাশি, লগ্ন, নক্ষত্র-বিভাগ, গ্রহদৃষ্টি গোচরশুদ্ধি, যাত্রিক লগ্ন ও ভূমিকম্পনাদি নিরূপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণজ্যোতির্ব্বিদ্—'তাজকতিলক' নামক জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা।

ন্যায়-রহস্য।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ শিরোমণি মহাশয়ের লিখিত।]

(১)

প্রোক্তমেষাং তত্ত্বতো জ্ঞানান্মুক্তিরিতি মুক্তিরজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি যাবৎ। সা কথং পদার্থজ্ঞানাৎ সম্ভবেদিতি যদা প্রমাণৈরর্থোজ্ঞায়তে তদৈব মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্ততে অপ্রমাণং প্রমাণমন্তমানানামজ্ঞাননিবৃত্তির্ন ভবতি পরং বর্দ্ধতে অতঃ প্রমাণতত্ত্বজ্ঞানং বিনা মুক্তির্ন সম্ভবতীতি। অস্তু তর্হি প্রমাণজ্ঞানাদেব মুক্তিঃ কিং পুনঃ প্রমেয়াদীনামিতি নহি কেবলং প্রমাণজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সং ভবতি যতো জ্ঞাতার এব বিজ্ঞেয়মানমর্থং নিরূপয়িতুং সমর্থাস্তস্মাৎ প্রমাণনিরূপকাণাং গ্রন্থকারাণাং তত্তদ্গ্রন্থরচনাৎ প্রাগেব তেষাং মুক্তিঃ স্যাৎ তথা ন ভূয়তে যথা পাকক্রিয়া জ্ঞানেন পক্কান্নং ন ভবতি তৎ পরং তদর্থং তৎ সাধনবস্তু সংযোগাদ্যন্তক্রিয়াপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যমিতি তথা প্রমাণৈঃ প্রমেয়জ্ঞানমাবশ্যকমিতি। ন চ ততঃ প্রমেয়বিজ্ঞানানন্তরমেবাস্তু মুক্তিরিতি। কিঞ্চ সংশয়াদীনামিতি নহি সংশয়বতাং প্রমাজ্ঞানং জায়তে অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমেব সরহস্যং সংশয়ং জ্ঞাতব্যমিতি। প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য নমন্দোপিপ্রবর্ত্ততে। অত্রাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ প্রয়োজনং মুখ্যন্তু কৈবল্যমিতি। দৃষ্টান্তেন বিনা লৌকিকপরীক্ষকানাং ন বুদ্ধিঃ সমর্থামেতি প্রায়ঃ সর্ব্বত্র দুর্বোধঃ স্যাত্ততো দৃষ্টান্তজ্ঞানমাবশ্যকমিতি।

সিদ্ধান্তেন বিনা ধীর তত্ত্ব জ্ঞানং ন জায়তে। যথেচ্ছাচারবার্ত্তা স্যাৎ সিদ্ধান্তানবধারণে॥ অতঃ সিদ্ধান্ত ইষ্টঃ স্যাৎ সর্ব্বত্র তত্ত্বনির্ণয়ে।

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, ইহা বলা হইয়াছে। মুক্তি বলিতে এখানে অজ্ঞান নিবৃত্তিকেই বুঝিতে হইবে। ঐ মুক্তি, পদার্থজ্ঞানে কিরূপে হইতে পারে? যখন প্রমাণ দ্বারা পদার্থ জানা যায়; তখনই ঐ বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহারা অপ্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগের অজ্ঞান নিবৃত্তি কোনকালেও হইতে পারে না। পরন্তু, উহাদিগের অজ্ঞান দিন দিন বাড়িতে থাকে। অতএব প্রমাণের তত্ত্ব না জানিলে, কিছুতেই মুক্তি সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্তই ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম, প্রথমেই প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রমাণের তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। তাহা হইলে, প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান বলা সঙ্গত। কিন্তু সূত্রকার প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞানের কথা কেন বলিলেন? কেবলমাত্র প্রমাণের যথার্থরূপে জ্ঞান হইলেই যে মুক্তি হয়, এইরূপ বলা যায় না। যাঁহারা যে বিষয় জানেন, তাঁহারাই সেই বিষয় নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব যদি কেবলমাত্র প্রমাণ জানিলেই মুক্তি হইত, তাহা হইলে প্রমাণতত্ত্বনিরূপণকারী পণ্ডিতগণের ঐ প্রমাণ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বেই মুক্তি হইতে পারিত। পরন্তু উহা ঘটে না। যেমন পাকক্রিয়া শিক্ষা করিলেই পক্কান্ন প্রস্তুত হয় না। পরন্তু, যে অন্ন প্রস্তুত করিতে হইবে, সম্পাদনকারী তত্তদ্বস্তুর যথাক্রমে সংযোগেও উহার শেষক্রিয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে ঐ

পক্কান্ন প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু জানিতে হয়। অতএব প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় জানা আবশ্যক। পরন্তু ইহাও বলা যাইতে পারা যায় না যে, কেবলমাত্র প্রমাণ ও প্রমেয় বস্তু জানা হইলেই মুক্তি হয় যদি এইরূপই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে সংশয়াদির তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যক কি? পরন্তু মহর্ষি উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির প্রতিসাধন বলিয়াছেন। এক্ষণে বলিতে হইবে, যদি কোনও কারণবশতঃ কাহারও কোনও বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাবৎকাল ঐ বিষয়ক সংশয় দূরীভূত না হয়, তাবৎকাল উহার ঐ বিষয়ক প্রমাজ্ঞান (নিশ্চয়রূপে যথার্থ জ্ঞান) হয় না। এখানে অজ্ঞানই বন্ধন; অতএব সংশয় নিবৃত্তির জন্যই সরহস্য অর্থাৎ কারণের সহিত সংশয়কে জানিতে হয়। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরাও প্রয়োজন-ব্যতিরেকে, কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। তখন পণ্ডিতগণ, এই গ্রন্থ অধ্যয়নে কেন প্রবৃত্ত হইবেন? এখানে অজ্ঞান-নিবৃত্তিই প্রথম প্রয়োজন, দ্বিতীয় মুখ্য প্রয়োজন, জীবের কৈবল্য-মুক্তি।

দৃষ্টান্ত-ব্যতিরেকে লৌকিক পরীক্ষকদিগের বুদ্ধি সমতা (তুল্যতা) কে প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ভিন্ন কেহই কোনও বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না; অতএব দৃষ্টান্ত-জ্ঞান আবশ্যক। হে সুধীবর, সিদ্ধান্ত-ব্যতিরেকে তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয় না; অর্থাৎ কোনও বিষয়ই মীমাংসিত হইতে পারে না; এবং সিদ্ধান্তার্থের অনবধারণে যথেচ্ছাচার বার্ত্তা—অর্থাৎ যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই বলিতে পারে। কারণ যখন কোনও সিদ্ধান্তই নাই, তখন কোনও বাক্যের সহিত কোনও বাক্যেরই বিরোধ ঘটিতে পারে না। তজ্জন্য লোকদিগের যথেচ্ছা-প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে। অতএব তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে ইষ্ট বলিয়া জানিতে হয়। সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে বিফল বলিতে হয়—এই নিমিত্তই গ্রন্থকার সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন।

কিঞ্চ প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং প্রত্যেকব্যক্তীনাং বস্তুতো জ্ঞানং বাক্যতো বা বিজ্ঞানং মুক্তেঃ সাধনমসঙ্খ্যকানাং বস্তূনামসঙ্খ্যকালেপি প্রত্যেকবস্তুভেদতো জ্ঞানসম্ভবাদ্ বাচা তত্তদ্ধর্ম্ম-পুরস্কারেণ তেষাং বিজ্ঞানং বক্তব্যমিতি নহি কেবলং নামতো বস্তুজ্ঞানং মুক্তিসাধনং ভবেৎ। ধর্ম্মতস্তু জ্ঞানং বিজ্ঞানমিতি। ন চ বাগ্ব্যবহারং বিনা ধর্ম্মতঃ সর্ব্বত্র জ্ঞানং ভবতীতি।

বাক্যতো বস্তুনির্ণয়ে সতি সংশয়ে স চ বাগ্ব্যবহারঃ পঞ্চাবয়বসম্পন্নঃ কার্য্যস্তস্মাদবয়ববিজ্ঞান মাবশ্যকং তত্রাপি চ সংশয়ে তত্ত্বজ্ঞানার্থং তর্কঃ কার্য্যস্ততো নিবৃত্ত এক পক্ষে নির্ণয়োভবে-দনির্ণীতার্থে স্থানোপাদানাদিবুদ্ধির্ন স্যাত্ততো দুঃখনিবৃত্তিশ্চরমশান্তিশ্চ ন সম্ভবেদিতি তস্মাচ্ছাস্ত্রজ্ঞানং নিরর্থকং স্যাৎ অতো নির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইতি।

অনির্ণীতার্থে বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্ত্তন্তে ব্যক্তিভেদাৎ। বাদেন নির্ণয়ো ভবতি স্ব-মতপ্রকাশনায়ৈব জল্পবিতণ্ডে ভবতঃ। ততঃ স্বমতরক্ষণার্থং তে জ্ঞাতব্যে ইতি। বস্তুতত্ত্ব-নির্ণীতার্থে জল্পবিতণ্ডে ভবতঃ তাভ্যাং বিপক্ষনির্দ্দিষ্টজল্পবিতণ্ডাভ্যাং স্বমতমেব ব্যাহন্যেত কচিচ্চ পরিজ্ঞাতে জল্পে বিতণ্ডায়াঞ্চ স্বমতে সংশয়ো ভবেৎ কিং তথ্যমিতি। অতস্তত্ত্ববিজ্ঞানার্থমেব-জল্পবিতণ্ডাবিজ্ঞানমাবশ্যকমিতি।

বস্তু নির্ণয়ে যে হেতবঃ কল্প্যন্তে তেষাং মধ্যে অহেতবো হেত্বাভাসাঃ প্রকৃতহেতুজ্ঞানার্থং তেষাং জ্ঞানং সফলং হেত্বাভাসবিজ্ঞানাদেব তদিতরপ্রকৃতহেতুরিতি।

ছলজাতিনিগ্রহস্থানানামপি বিজ্ঞানং পূর্ব্ববৎ স্বমতরক্ষণার্থমেব জ্ঞেয়মিতি। দোষবিজ্ঞানন্তু তত আত্মরক্ষার্থমেবান্যথা তেনৈব দোষেণ স্বমতমপি দুষ্টং স্যাৎ তন্নপরিহর্ত্তুং শক্যতে তস্মাৎ তৎ পরিহারা ঽমব জল্পবিতণ্ডাদিবিজ্ঞানমাবশ্যকমিতি।

এবং জাতিপদার্থ বিজ্ঞানন্তু তজ্জাতীয়বহুজ্ঞানার্থমেব তত্তজ্জাতিবিজ্ঞানাৎ কথঞ্চিদ্ ভেদেপ্যভেদপ্রত্যয়ো ভবতীতি যাবৎ॥

এক্ষণে মুক্তিসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেকটী ব্যক্তিভেদে সকল বস্তুর জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কিম্বা উহাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বস্তুবিজ্ঞান, অথবা উহাদের লক্ষণাদি দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিংবা উহাদের প্রমাণাদি পরিভাষা দ্বারা যে ষোড়শপদার্থের বিজ্ঞান তাহাই মুক্তির কারণ? অসংখ্য কালেও প্রত্যেক বস্তুভেদে অসংখ্য বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। যদি যৎকিঞ্চিদ্বস্তুর জ্ঞানে মুক্তি বলা যায়, তাহা হইলে সকলেই মুক্ত হইতে পারিতেন, শাস্ত্রজ্ঞান নিরর্থক বলিতে হয়। অতএব শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা তত্তৎ পদার্থের তত্তদ্-ধর্ম্মপুরস্কারে বিজ্ঞানই পরম্পরায় মুক্তির কারণ বলিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রমাণাদি পরিভাষা জন্য জ্ঞান, মুক্তির সাধন নহে, বস্তু ধর্ম্ম দ্বারা যে বস্তু জ্ঞান তাহারই নাম—বস্তু-বিজ্ঞান।

পরন্তু উপদেশ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঘটাদি বস্তুর ধর্ম্ম দেখিয়া ঐ বস্তুর জ্ঞান সর্ব্বথা হয় না (অর্থাৎ যে ঘট শব্দ বা ঘট কাহাকে বলে জানে না, উহার সম্বন্ধে ঘটের উপদেশ ভিন্ন ঘটজ্ঞান হয় না) শব্দ ব্যবহার ভিন্ন উপদেশও হইতে পারে না। ফলতঃ, নামরূপাদি শব্দ ব্যবহার ভিন্ন কোথায়ও কোনও বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব বস্তুমাত্রেরই পরিভাষা জ্ঞান আবশ্যক। উপদেশকালে সর্ব্বত্র বস্তু উপস্থিত থাকে না, পরন্তু তত্তদর্থ বোধক বাক্য দ্বারাই উপদেশ হইয়া থাকে ও উহাদের জ্ঞানও হইয়া থাকে। অতএব বাক্য দ্বারা বস্তু-নির্ণয়-কালে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব সম্পন্ন করিয়া বুঝিতে হয়। সুতরাং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বের জ্ঞান আবশ্যক। উহাতে (অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব-সম্পন্ন বাক্যে) ও যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, উহা তর্ক করিয়া বুঝিতে হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের নিমিত্ত যে উহবাক্য তাহাকে তর্ক কহে। 'উহ' অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত যে প্রতিপক্ষ স্থাপন, তাহাকেই তর্ক বলে। তর্কে একপক্ষ বিচারে নিরস্ত হইলেই নির্ণয় হয়।

অনির্ণীত-বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগ ও গ্রহণ বা উপেক্ষা বুদ্ধি হয় না (অর্থাৎ যাহা দ্বারা সংসারে ত্যাজ্য বস্তুর অর্থাৎ দুঃখপ্রদ বস্তুর ত্যাগ ও গ্রাহ্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বস্তুর গ্রহণ এবং উপেক্ষণীয় বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, ঐরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ ঐরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় না)। উহাদের (অর্থাৎ হানাদির) অভাবে দুঃখের নিবৃত্তিও চরমশান্তি হইতে পারে না। কারণ, দুঃখের হেতু থাকিতে কিরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে? অতএব যে শাস্ত্র অধ্যয়নে ঐরূপে হানোপাদনাদি বুদ্ধি (অর্থাৎ ত্যাজ্য বিষয়ের ত্যাগ ও গ্রহণ যোগ্য বিষয়ের গ্রহণ এবং উপেক্ষণীয় বিষয়) উপেক্ষিত হয় না, ঐরূপ শাস্ত্রের জ্ঞান নিরর্থক বলিতে হয়। অতএব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য-বোধেই নির্ণয় পদার্থ বলা হইয়াছে। অনির্ণীত বিষয়েই বাদ, জল্প, ও বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। উহাদের বক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বাদ বাক্য দ্বারা কোনও বিষয় নির্ণয় করিতে গেলে উহার প্রতিপক্ষ স্বমত প্রকাশের নিমিত্ত জল্প-বাক্য প্রয়োগ করেন।

অর্থাৎ জল্প বাক্য দ্বারা উহার প্রতিপক্ষকে জয় করিতে ইচ্ছা করে। বিতণ্ডাকারী ব্যক্তি প্রতিবাদীকে পরাজয়ের জন্যই বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই অর্থাৎ স্বমত-রক্ষার জন্যই বাদীকেও জল্প ও বিতণ্ডা শিক্ষা করিতে হয়। উহা না জানা থাকিলে, প্রতিপক্ষ নির্দ্দিষ্ট জল্প ও বিতণ্ডা বাক্য দ্বারা বাদীর মত খণ্ডিত হইয়া পারে; এবং অনির্ণীত বিষয়ে জল্প ও বিতণ্ডা প্রবর্ত্তিত হয়। জল্প ও বিতণ্ডার স্বরূপ না জানা থাকিলে, উহা দ্বারা কোনও সময় স্বমতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; অর্থাৎ—ঐরূপ বাক্যের ভেদ ঘটিলে উহাদের মধ্যে কোনটি প্রশস্ত, এইরূপ সংশয় হইতে পারে। অতএব তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য জল্প ও বিতণ্ডার জ্ঞান আবশ্যক। বস্তু নিশ্চয়ের জন্য যে সব হেতু প্রয়োগ করা হয়, উহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত হেতু নহে, তাহাদিগকেই হেত্বাভাস কহে। প্রকৃত হেতুজ্ঞানের নিমিত্তই হেত্বাভাসের লক্ষণ জানিতে হয়। বস্তুতঃ হেত্বাভাসকে জানিতে পারিলেই উহার ইতরকে হেতু বলিয়া জানিতে পারা যায়। এইরূপে হেত্বাভাস জ্ঞানকে সফল বলিতে হয়। ঐরূপে হেত্বাভাস জ্ঞানও প্রকৃত হেতুজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে।

ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানের বিজ্ঞানও জল্পবাক্যজ্ঞানের নিমিত্ত বলিতে হয়। ইহাদের জ্ঞান পূর্ব্ববৎ স্বমত রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবে। দোষ বিজ্ঞান আত্মরক্ষার নিমিত্তই হইয়া থাকে। অন্যথা ঐ দোষেই স্বমত দূষিত হইয়া পড়ে। উহার পরিহারের অন্য কোনও উপায় নাই। অতএব দোষ পরিহারের নিমিত্তই জল্প বিতণ্ডাদি দোষ জানা আবশ্যক।

জাতি পদার্থকে জানিতে পারিলেই, তজ্জাতীয় বহু পদার্থকে জানা যায়। ফলতঃ, উহারা (একজাতীয় বস্তুসকল) আকৃতি, অবসবাদি দ্বারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও অভেদে প্রত্যয় (অর্থাৎ এক বস্তু বলিয়া বোধ) হইয়া থাকে।

* * *

প্রিয়া।

(Sucklingএর অনুকরণে লিখিত।)

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম-এ বিরচিত।

কেমন ক'রে ঘুরে ফিরে উড়ে সিমুল তুলা
ফাগুন মাসের পাগলা বায়ের পাকে?
দেখছ কিহে পদ্মাবুকে ছোট্ট তরীগুলা
কেমন করে তুমুল ঝড়ে ঝাঁকে?

বুক চড়া'তে, কেমন ছাঁচে কুমীর শুয়ে কাঁদে,
দেখছ কিহে গরবে কেমন শিখী নাচায় পাখা।
ঘুমের ভাণে কেমনে শেয়াল শিকার ফেলে ফাঁদে,
কেমন করে বায় মিশিয়ে জলে দা'য়ের রেখা!

এম্নি উড়ো, এম্নি খেলো, এম্নি হাল্কা—প্রিয়াটি আমার!
এম্নি চপল, এমনি তরল, আমার প্রিয়ার প্রেমের ব্যবহার!

রস-সাহিত্য।

(বিদ্যাদিত্য পণ্ডিত শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত।)

কোনও কোনও মহাত্মারা আজকাল রস-সাহিত্যের উপর কিছু বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, এই রস-সাহিত্যের মধ্যে যে ভাবুকতা বা ভাবপ্রবণতা আছে, তাহা বড় রুচিকর নহে; সুতরাং সাধারণের অগ্রাহ্য। রস সাহিত্য দ্বারা তাঁহারা কি বুঝিয়া থাকেন, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। 'রস' ও 'সাহিত্য' এই কথা দুইটী যেখান হইতে পাওয়া যায়, সেই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র ইহাদের যে অর্থে প্রয়োগ, সেই অর্থে বুঝিলে বর্ত্তমান লেখকদিগের উক্তি নিতান্ত অমূলক ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। বোধ হয়, তাঁহারা রস-সাহিত্য দ্বারা "Light literature" বা "artificial poetry" মনে করেন; হয়ত গদ্য পদ্য উভয়ই ইহার অন্তর্গত। এই অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি সকলেই ইহার মধ্যে পড়িল বলিয়া, তাঁহারা মনে করেন; এবং বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি সকলই ইহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত, যে হিসাবে 'Epic' বা মহাকাব্য, হোমরের ইলীয়ড, ডান্টির 'ইনফারনো', মিলটনের Paradise Lost, কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাত, শ্রীহর্ষের নৈষধ প্রভৃতি কিংবা হেমবাবুর বৃত্রাসুরবধ, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও অমিতাভ এবং যোগীন্দ্র বাবুর 'পৃথ্বীরাজ' 'শিবাজী' ঠিক সেই হিসাবের মহাকাব্য নহে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, তুলসীদাসের রামায়ণ বা উৎকলের 'ভাগবত' প্রভৃতিও অন্য ধরণের মহাকাব্য। বোধ হয় আধুনিক সমালোচকগণ এই সকলগুলিকেই রস-সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদিগের চক্ষে এইগুলির কি অপরাধ বুঝিয়া উঠা কঠিন। কাব্য ও মহাকাব্যের লক্ষণাদি সাহিত্যিকগণের সুবিদিত; সুতরাং সে কথার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। তবে 'রস-সাহিত্য' বা 'কাব্যকলা'র অভ্যন্তরে যে রস আছে, তাহা মনোমদ হইলেও বোধ-সাপেক্ষ। কেহ কেহ বলেন, যদি দুর্ব্বোধ্যই হইল, তবে আর উহা সুকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইল কৈ? নিতান্ত জড়বুদ্ধি বা হীনমতির সকল সময়ে যে সকলই সুখবোধ্য হইবে, আশা করা যায় না। অনুশীলন ও পুনঃপুনঃ চর্চ্চা দ্বারা নিশ্চয়ই দুর্ব্বোধও সুবোধ হইয়া যায়। পাতা উল্টাইলেই পড়া হয় না বা আজকালকার প্রণালী অনুসারে মূলগ্রন্থের মলাটও নয়নগোচর না করিয়া কেবল কোনও ব্যক্তি-বিশেষের কৃত সেই গ্রন্থের সমালোচনা পড়িলেই পড়া হইল না। মনে হয় যে, ধীরভাবে বসিয়া কোনও পুস্তকের প্রত্যেক অক্ষর ও পঙ্‌ক্তিতে তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, যদি কেহ চিত্তে আনন্দানুভব করিতে পারেন, তবে তাহাই তাহার প্রকৃত পড়া। নাটক, নভেল, কাব্য, মহাকাব্য, গল্প, ইতিহাস, পুরাণ বা ভ্রমণবৃত্তান্ত,

সাময়িক সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকা—যাহাই কেন হউক না, তাহা আমাদিগকে দৈনিক নিয়মিত কর্ম্মের কঠোরতার হাত হইতে কিছু নিষ্কৃতি দিয়া থাকে, এবং আমাদের মন বা মেজাজটাকে কিছু বদলাইয়া দেয়। হয়ত তদ্দ্বারা আমরা সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকি। কখনও হয়ত বা আমাদিগের অভ্যস্ত বিদ্যার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, আমাদিগের পরিপোষিত মত ও যুক্তিতর্কের খণ্ডন করিয়া, তাহা আমাদিগের ক্রোধের উদ্দীপনাও করিয়া থাকে। যাহাই হউক কোনও অধীত পুস্তক যদি ক্ষণকালের জন্যও আমাদিগকে ভাবে আত্মহারা করিয়া তন্ময় করিতে পারে, তবেই সেই পুস্তক-পাঠের সার্থকতা অনেক পরিমাণে লাভ হয় এবং আমাদিগেরও কিছু উপকার হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের দেশের রস-সাহিত্যগুলি যে উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহা সরলভাবে ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণের হৃদয়ে যে খাঁটী ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিয়া প্রসঙ্গতঃ ব্যক্ত ও সঞ্চারিভাবে নানা বিভাগানুভাবের অবতারণা করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা—সুপ্রণালীসঙ্গত ব্যবস্থা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুমোদিত চূড়ান্ত আদর্শ। ঐহিক স্বার্থ ও পারত্রিক পরমার্থ নিষ্ঠাবান্ এ দেশের আর্য্যগণের চক্ষে ভিন্ন নহে—তাঁহারা সকলেই True to the kindred points of heaven and home বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রস-সাহিত্যের ক্ষুদ্র গ্রন্থটী পর্য্যন্ত সেই আদর্শই আমাদিগের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়া দেয় এবং আমরা সেই আদর্শের প্রতিবিম্ব দর্শনেই ধন্য লইয়া স্বতঃপরতঃ পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। সেই আদর্শই মানব জীবনের প্রকৃষ্টতম আদর্শ, তাহারই ফলে মানব বলিতে শিখিয়াছে—

সর্ব্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মাকশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এ দেশের সাহিত্যসেবীরা বুঝিয়াছেন যে, এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যই সাহিত্যচর্চ্চার নিদান। সুতরাং রস-সাহিত্য যে কাহারও কাহারও নিতান্ত "light" বা "artificial" বলিয়া অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, তাহা মোটেই যুক্তিপূত নহে। যে ভাবে ঐ রস-সাহিত্যের অনুশীলন হয়, তাহাতে গলদ না থাকিলে কিছুতেই উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে বাকি থাকে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে (প্রায় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ইয়ুরোপের কোনও বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি প্রত্যুত্তরে সেই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, পরিশেষে লেখেন যে, আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও কোনও কোনও কারণবশতঃ (for want of further information and light) এ দেশের বৈজ্ঞানিক পত্রাদিতে ইহার সমালোচনা করিতে পারিলাম না। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহিত পুনরপি ঐ সংক্রান্ত পত্র ব্যবহার হইবার পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তরিত হয়েন এবং ঐ কাব্যখানি একখানি "Hindoo Pilgrim's Progress" এই মন্তব্য মাত্রই প্রকাশ করিয়া যান। এ দেশের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্তও করেন নাই; অনেকে আবার নিজে পাঠও করেন নাই বা অন্যে পড়িয়া

শুনাইলেও, সময় এবং সুযোগের অভাবে শুনিতেও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। সাহিত্যামোদী ইয়ুরোপীয় মনীষী ঐ কাব্যের যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বরং মন্দ নহে; তবে তাহাদিগের 'true poetry' বা 'Scientific poetry" অপেক্ষাও যে আমাদিগের কাব্যের আদর্শ উচ্চ ও ব্যাপক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রস-সাহিত্যকার সরসভাবে উচ্চ আদর্শের কোন্ অঙ্গের অবতারণা করেন, তাহা না বুঝিয়া, সহসা একটা অযথা কথা বলা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ইহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই কবি লিখিয়াছেন;—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্যনিবেদনম্ শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ॥"

বড় বড় কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, নিম্নে সামান্য একটী কাব্যকথার গূঢ়ার্থ-প্রকাশক স্থলবিশেষের আলোচনা করা গেল। ইহা দ্বারা পাঠকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্রও রসাবোধ হইলে, রস-সাহিত্যের সার্থকতা বোধ করিব। যদি সময় ও সুযোগ হয়, বারান্তরে আরও কিছু আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

১। শুক-সারীর কথা।

"শুক বলেন—আমার কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধরেছিল;
সারী বলেন—আমার রাধা সহায় হয়েছিল;
নৈলে পারবে কেনে?"

রস-সাহিত্যের অঙ্গীভূত উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি দুইটির তাৎপর্য্য কেবল যে লোকমুখে বীণযন্ত্র সহকারে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে গীত হইয়া থাকে, তাহাই নহে। ইহার মধ্যে যে সাংসারিকের সার কথা আছে, তাহা কয় জনে লক্ষ্য করিয়া থাকেন? দীক্ষায় সমাজের প্রতিষ্ঠা। সিদ্ধপুরুষের দীক্ষা, সংসারক্ষেত্রে মানবের নিয়তই অমোঘ ফলদায়ক ও দীক্ষিতের অদ্বিতীয় বল। সেই বল যাঁহার পশ্চাতে নাই, তিনি ভীমের মত শক্তিশালী বীর হইলেও কাপুরুষ দুর্য্যোধনের মত রণে ভঙ্গ দিয়া থাকেন, দিতে বাধ্য। শত সহস্র পুরুষের বল ধারণ করিলেও মানব যদি সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্ না হন, তবে তাহার সংসারের বীর্য্য-বিক্রম বৃথা। কৃষ্ণ ও রাধার বলাবল বিচারচ্ছলে শুক ও সারী ক্রমান্বয়ে উভয়ের পক্ষাশ্রিত হইয়া বলিতেছেন। উভয়ের কথাই ঠিক, অথচ সারীর উক্তিতে রাধার যে শক্তি অতি সূক্ষ্ম ও সংশ্লিষ্ট ভাবে কৃষ্ণেতে সংক্রমিত আছে, তাহা ভিন্ন কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণশক্তি সম্ভবেই না। সদ্‌গুরুর দীক্ষা ভিন্ন অপার সংসার-সমুদ্রে মজ্জনোন্মুখ মানবের উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় নৌকা নাই। গুরুর বল পশ্চাতে থাকিলে, মানবের চলচ্ছক্তি কখনও নিস্পন্দভাব প্রাপ্ত হয় নাই। একাকীর বড় বালাই। একে ত চিত্তই স্থির হয় না; তাহাতে কর্ম্মপদ্ধতি বা সোয়াস্তি কিরূপে সম্ভবিবে? সোজা কথায় বলিলে বলা যায় যে, অন্ধকার রজনীতে হয় ত কেহ একাকী কোন ঘরে শয়ন করিয়া থাকিতে রাজি হইবেন না। কিন্তু যদি তাঁহাকে বলা যায় যে, বারেন্দায় বা পাশের ঘরে অন্য লোক

থাকিবে, তবে তিনি সেই ঘরের ভিতরই অন্ননিরপেক্ষ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে শিক্ষা এ দেশের আর্য্যগণের সমস্ত লৌকিক শিক্ষার সারভূত, নিষ্কর্ষ, শুকসারীর ক্ষুদ্রগল্পেও সেই পরমরমণীয় দীক্ষাশক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে। অতএব, প্রাগুক্ত গল্প-রস-সাহিত্যের এক পঙ্‌ক্তি কি লোকধর্ম্ম ব্যাখ্যানের প্রথম ও প্রধান অধ্যায়, সুধিবর্গই তাহার বিচার করিবেন। যে কৃতিপুরুষ অতবড় একটা কঠিন তত্ত্বকে শুকসারীর পক্ষে সরস করিয়া লোকের কাছে ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি নর হইলেও দেব, মর হইলেই অমর, এইখানেই কবির কবিত্ব এবং অমরত্ব!

প্রার্থনা।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস বিদ্যারত্ন বি-এ মহাশয়ের বিরচিত।]

আমার মরণ-শয়নের পরে, ক'রো না তোমরা কোলাহল!
ফেলিও না বৃথা বিলাপের শ্বাস, ঢালিও না বৃথা আঁখিজল।
এনো না এনো না বৈদ্যেরে ডাকি, শুনাতে সদাঃ মরণ কথা!
এনো না ডাকিয়ে গুরু-পুরোহিতে, শুনাতে পুরাণ গীতার গাথা।
তখন শমন শিখায় অধিক, অন্তরে ফুটে আলোক-ভাতি,
অধীর পরাণ—কি ফল বচনে, কি কাজ জ্বালিয়া দিবসে বাতি?
তার চেয়ে মোরে আনিও বাহিরে, উদার অসীম আকাশ তলে!
আনিও যেথায় পুণ্যা তটিনী কলকল্লোলে নাচিয়া চলে।
দেখাইও মোরে প্রকৃতির শোভা, লালিত পালিত যাঁহার ক্রোড়ে,—
যাঁর রবি শশী সবে দেয় আলো, যাঁর নদী বহে সবার তরে।
দেখিতে দেখিতে বিশ্বসুষমা, এক হ'য়ে যাব বিশ্বসনে,
ভুলে যাব তাহা। মরণ যাতনা, ডুবে যাব এক গভীর ধ্যানে।
বিষয়-বাসনা ত্যজিবে আমায়, উদিবে শান্তি—জাগিবে আশা,
হাসিতে হাসিতে যাইব ছুটিয়া, নূতন জগতে বাঁধিতে বাসা॥ *

---

* মুমূর্ষুকে প্রাঙ্গণে অথবা তুলসী-তলায় আনিবার প্রথা হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকে ইহাকে নির্দ্দয়-প্রথা বিবেচনা করেন। উপরের কবিতা হইতে উহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যাইবে। একজন ইংরাজ-কবির লিখিত উক্তির মর্ম্মানুসরণে এই কবিতা রচিত হইল।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, নবম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৬ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতং।
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতং॥

দেহের ব্যাধি ও অন্তরের ব্যাধি—উভয়বিধ ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (যুগ্মভগবদ্বিভূতি)! আপনারা সেই সপ্তলোক-পালয়িত্রী মাতৃদেবীর স্নেহধারা দ্বারা সদাকাল সাম্যভাব (গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য) রক্ষা করেন, (আপনাদের কৃপাতেই) সত্ত্বরজস্তমোরূপ তিনটী হবনীয়াধার বিহিত হয়, আপনারা ত্রিগুণসাম্য দ্বারা (আমাদের মধ্য হইতে) ভগবদুদ্দেশ্যে অর্পণযোগ্য হবনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করেন; ত্রিগুণসাম্য-সাধনভূতা মাতৃস্থানীয়া এই পৃথিবীকে ব্যাপিয়া, সাম্য-বিতরণশীল আপনারা, দ্যুলোকে সূর্য্যকে রক্ষা করেন, দিবা এবং রাত্রি বিহিত করেন; (অর্থাৎ, আপনাদের কর্ত্তৃক সাম্যভাব সংরক্ষিত হওয়ায়, এই সংসারে সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং দিবা ও রাত্রি বিহিত হয়)।

সাম্যে—রক্ষা।

সাম্যসাধনই সকল দিকের সকল অবস্থার সকল প্রকার মঙ্গলের মূলীভূত। দেহ পক্ষে দেখ,—তোমার বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিধাতুর একটীর যদি ন্যূনাধিক্য ঘটে, একটীতে যদি বৈষম্য উপস্থিত হয়, তোমাতে বৈকল্য আনিবে, তোমার দেহকে পীড়াগ্রস্ত করিবে; তাহার কারণ তোমাকে হয় তো বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। অন্যপক্ষে আবার দেখ,—সে বৈষম্যের নিরসন-কল্পে—সে পীড়ার উপসম-পক্ষে, তোমায় কি করিতে হইবে? এমন কর্ম্মের তখন প্রয়োজন হইবে না কি—যাহাতে ত্রিধাতুর সাম্য সাধিত হয়? অন্তর-পক্ষেও—মনঃসম্বন্ধেও এই ভাব। তোমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের একটীতে যদি বৈষম্য ঘটে, একটীতে যদি তারতম্য আসে, হৃদয়ে দারুণ উৎক্ষেপ উপস্থিত হইবে না কি? আর, তাহার দরুণ অশান্তিতে তুমি জ্বলিয়া মরিবে না কি? সে অবস্থায়, গুণসাম্য সাধন ভিন্ন, কোথাও তোমার শান্তি নাই। সংসারের সর্ব্বত্র এই অবস্থা।

কোথাও একটু অসাম্যের ভাব উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ বিক্ষোভ-বিপত্তিতে সংসার ঘেরিয়া ফেলিবে। গুণসাম্যসাধন দ্বারাই সংসার কক্ষভ্রষ্ট নহে,—সূর্য্য যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—দিবারাত্রি যথারীতি বিহিত হইতেছে। ত্রিগুণের ও ত্রিভাবের সাম্যসাধনহেতুই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে,—সূর্য্যচন্দ্রাদি কেহই বিক্ষিপ্ত নহেন,—আমরা মনুষ্যজাতি এই ঘূর্ণ্যমান্ সংসারেও বিচরণ করিতে পারিতেছি। তাই প্রার্থনা,—'হে অন্তরের ও বাহিরের সাম্যপ্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম ভগবদ্বিভূতি-দ্বয়!—আপনারা জননীর ন্যায় স্নেহ-করুণায় আমাদিগের মধ্যে গুণসাম্য বিধান করুন।'

'বেদ' ও তাহার ব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

নবম প্রবন্ধ।

আমাদের পরম-পূজ্য বেদ, অধুনা বিকৃতভাবে, বিকৃত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া, প্রচারিত আছে। কলিতে যাহা ঘটিবে বলিয়া, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে। অপব্যাখ্যা-কুব্যাখ্যার জন্য অধুনা বেদ-মন্ত্রের প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে।

বেদের ব্যাখ্যা ও সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী হইয়া, আমায় সর্ব্বদাই বিষম সঙ্কট-সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইতেছে। কি বস্তু কি ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহা দেখিলে, ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, আজ পুনরায় একটী ঋঙ্মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছি। সহৃদয় পাঠকগণ, নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিয়া, আমাদের ব্যাখ্যার ঔচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি করিবেন।

একটী মন্ত্র, যথা,—

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ।

ওমানং শংযোর্ম্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী॥

ঐ মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য, যথা,—

"হে অশ্বিনা অস্মভ্যং দিব্যানি দ্যুলোকবর্ত্তীনি ভেষজা ঔষধানি ত্রির্দ্দত্তং। তথা পার্থিবানি। পৃথিব্যামুৎপন্নান্যৌষধানি ত্রির্দ্দত্তং। অদ্ভ্য উ। অন্তরিক্ষসকাশাদপ্যৌষধানি ত্রির্দ্দত্তং। আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম॥ আপঃ পৃথিবী ভূরিতি তন্নামসুপাঠাৎ। শংযোবেতন্নামকস্য বৃহস্পতিপুত্রস্য। তে শংযুং বার্হস্পত্যমবৃধন্নিতি ব্রাহ্মণান্তরাৎ। তস্য সম্বন্ধিনমোমানং সুখবিশেষং মমকায় সূনবে মদীয়ায় পুত্রায় দত্তং। হে শুভস্পতী শোভনস্যৌষধজাতস্য পালিকৌ যুবাং ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শময়বিষয়ং সুখং বহতং। প্রাপয়তং॥"

প্রচলিত অর্থ।

এ ঋকের প্রচলিত সাধারণ অর্থ এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দ্যুলোকের ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন, পৃথিবীলোকের ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন, এবং অন্তরিক্ষ হইতে আমাদিগকে ঔষধ প্রদান করুন; শংযুকে (বৃহস্পতির পুত্রকে) আপনি যে আনন্দ দিয়াছিলেন, আমার পুত্রকেও সেই আনন্দ প্রদান করুন! হে শুভস্পতী (শুভসাধক ঔষধের পালক)! আমাকে ত্রি-ধাতুর সুখ প্রদান করুন।"

আমাদের বক্তব্য।

এক্ষণে ঐ মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিতেছি। আমাদের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায়, বঙ্গানুবাদে এবং বিশদার্থে তাহা উপলব্ধি করুন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দিব্যানি' (দ্যুলোকস্থিতানি, সত্ত্বভাবযুতানি, পিত্তকার্য্যরূপাণি বা) 'ভেষজা' (ভেষজানি, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিরূপদ্বিবিধব্যাধিনাশকানি ঔষধানি) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) 'দত্তং' (প্রযচ্ছতং), 'পার্থিবানি' (পৃথ্বীলোকসম্বন্ধীনি রজোভাবযুতানি, বায়ুকার্য্যরূপাণি) ভেষজানি 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) দত্তং, 'উ' (অপিচ) 'অদ্ভ্যঃ' (অন্তরিক্ষসকাশাৎ উৎপন্নানি, তমোভাবযুতানি, কফকর্ম্মরূপাণি বা) ভেষজানি 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) দত্তং, 'শংযোঃ' (কল্যাণযুতস্য, ধর্ম্মসম্বন্ধযুক্তস্য,) 'ওমানং' (আনন্দং) 'মমকায় সূনবে' (মদীয়ায় কর্ম্মরূপপুত্রায়) দত্তং; 'শুভস্পতী' (মঙ্গলবিধায়কৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিধাতু' (ত্রিগুণসাম্যরূপং বা ত্রিধাতু-সাম্যরূপং) 'শর্ম্ম' (সুখং) 'বহতং' (প্রাপয়তং)। অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ, ত্রিগুণসাম্যধনরূপং বা ত্রিভাবসাম্যসাধনোপায়যুতং ভেষজং বয়ং যাচামহে। তেন অস্মাকং পরমসুখসাধনং কুরুতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয় (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়)। আপনারা আমাদিগকে দ্যুলোকের ভেষজ (সত্ত্বভাব বা পিত্তকার্য্যপ্রকাশক ঔষধ) ত্রিকাল (সদাকাল) প্রদান করুন, (ঐরূপ) পৃথ্বীলোকের ভেষজ (রজোভাব বা বায়ুকর্ম্মপ্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন, আর অন্তরিক্ষসকাশে উৎপন্ন ভেষজ (তমোভাব বা কফকর্ম্ম-প্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন, কল্যাণযুত আনন্দ আমার কর্ম্মরূপ পুত্রের জন্য দান করুন, (অর্থাৎ, আমার কর্ম্মমাত্রই যুগপৎ কল্যাণপ্রদ ও আনন্দদায়ক হউক); হে মঙ্গল-বিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে ত্রিগুণসাম্যরূপ এবং ত্রিধাতুসাম্যরূপ সুখ (মানসিক ও দৈহিক সমতাসাধক সুখ) প্রদান করুন।

বিশদার্থ।

প্রথমে আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করিতেছি। ঋকের একটী শব্দ—'দিব্যানি'। শব্দার্থ—'দ্যুলোকস্থিতানি'। ভাব আসে—দ্যুলোকে (স্বর্গে) যাহা থাকে। সে কি প্রকার? এ পক্ষে, সত্ত্বভাবকে স্বর্গের বস্তু বলা যাইতে পারে। অন্য পক্ষে, তেজের ভাবকেও স্বর্গের বস্তু বলিতে পারি; আর, তাহা হইতেই দেহরক্ষার পক্ষে পিত্তের কার্য্য অর্থ গ্রহণ করা যায়। এইরূপ 'পার্থিবানি' পদে রজোভাব বা বায়ুর কার্য্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে। রজোভাবই সৃষ্টির কার্য্য। পৃথিবী—সৃষ্টির অভিব্যক্তি। বায়ুও পৃথিবীর সহিত প্রাণরূপে সম্বন্ধযুত। সুতরাং 'পার্থিবানি' পদে 'রজোভাবযুতানি বা বায়ুকার্য্যরূপাণি' অর্থ গ্রহণ করিলাম। আলোচ্য তৃতীয় পদ—'অন্তাঃ'। উহার অর্থ—জল হইতে, অন্তরিক্ষ হইতে। জল (মেঘ)—আবরক। এই হইতে আমরা ঐ পদের অর্থ 'তমোভাবযুতানিঃ বা কফকার্য্যরূপাণি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'ভেষজ' শব্দের সাধারণ অর্থ—ঔষধ। এখানে ঐ শব্দে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি দ্বিবিধ ব্যাধি-নাশক ঔষধের বিষয় খ্যাপনা করিতেছে। ঋকের আলোচ্য পঞ্চম পদ—'শংযোঃ'। ঐ পদে সায়ণ 'শংযু' নামক 'বৃহস্পতির পুত্র' অর্থ করিয়াছেন। তদনুসারে 'শংযোঃ ওমানং' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'বৃহস্পতির পুত্র শংযুর সম্বন্ধীয় যে সুখ।' আমরা 'শংযু' শব্দে 'কল্যাণযুক্ত বা ধর্ম্মসম্বন্ধযুত' অর্থ গ্রহণ করি। অভিধানসমূহে এবং ধাতু-অনুসারে উহার ঐ অর্থই সঙ্গত হয়। তাহাতে ঐ দুই পদের ভাব হয় এই যে,—'ধর্ম্মপালনজনিত যে সুখ, কল্যাণপ্রদ যে সুখ' ইত্যাদি। অনেক ঐহিক সুখ বা আনন্দ—কল্যাণপ্রদ না হইয়া অনিষ্টকারক হয়। এখানে সেই আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে। কল্যাণপ্রদ মঙ্গল-জনক যে আনন্দ বা সুখ, তাহারই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম আলোচ্য পদ—"মমকায় সূনবে।" ইহার প্রচলিত অর্থ—'আমার পুত্রকে।' আমাদের অর্থ—'আমার কর্ম্মকে।' 'সূন' শব্দের অর্থ—'উৎপন্ন বা জাত।' পুত্র যেরূপ মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হয়, কর্ম্মও সেইরূপ মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন বা জাত হয়। এখানে 'সূনবে' পদের 'কর্ম্ম' অর্থই আমরা অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। তাহাতে পূর্ব্বাপর সুন্দর ভাবসঙ্গতি রক্ষা হয়। এইরূপ 'শুভস্পতী', 'ত্রিধাতু' ও 'শর্ম্ম' পদত্রয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করুন। 'শুভস্পতী' পদে 'শুভকার্য্যের পালক বা মঙ্গলবিধায়ক' বুঝায়; 'শর্ম্ম' শব্দে 'সুখ বা আনন্দ' অর্থ আসে। 'ত্রিধাতু' পদটী একটু বিচারমূলক। উহাতে প্রধানতঃ 'বায়ু-পিত্তকফ'—এই তিন ধাতুর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়। আমরা কিন্তু তিন ধাতু এবং তিন গুণ দুই ভাবই গ্রহণ করিলাম। যুগ্ম দুই দেবতার দ্বিবিধ ব্যাধিনাশক শক্তির বিষয় স্মরণ করিলে, ঐ অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপলক্ষে, 'ত্রি-ধাতুর সুখ' কি, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সুখ—সাম্যে। ত্রিগুণের বা ত্রিধাতুর সাম্যই—মানসিক শান্তি ও দৈহিক স্বাস্থ্য। 'ত্রিধাতু শর্ম্ম' পদদ্বয় সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

এখন, সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ অনুধ্যান করুন। বুঝিয়া দেখুন—অশ্বিদেবদ্বয় কি প্রকার গুণসম্পন্ন! বুঝিয়া দেখুন—ভগবানের কোন্ দুই বিভূতি ঐ দুই যুগ্ম দেবরূপে পরিকল্পিত!

আর বুঝিয়া দেখুন—কোন্‌রূপ প্রার্থনা তাঁহাদের নিকট সঙ্গত প্রার্থনা! ঔষধ—ব্যাধি-নাশক—সাম্যভাবস্থাপক। প্রার্থনা করা হইয়াছে—'আমায় ঔষধ দেন।' কিরূপ ঔষধ? প্রথম—আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব যাহাতে সঞ্চারিত হয়, সেই ঔষধ;—আমার দেহে পিত্তের (তেজের) যাহাতে সমাবেশ হয়, সেই ঔষধ। দ্বিতীয়—আমার হৃদয়ে যাহাতে রজোভাব-সঞ্চার হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ, আমার দেহে যাহাতে বায়ুর সঞ্চার হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ। তৃতীয়—আমার হৃদয়ে যাহাতে তমোভাবের উদয় হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ; আমার দেহে যাহাতে কফের সঞ্চার হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ। মনঃস্থৈর্য্য-সাধনে সত্ত্বরজ-স্তমঃ ঐ তিন গুণেরই প্রয়োজন, দেহরক্ষায় বায়ুপিত্ত-কফ তিন ধাতুরই প্রয়োজন। ঐ তিনের একটীর ন্যূনাধিক্য বা একটীর অভাব হইলে, মনও বিকল হয়,—দেহও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাই ত্রিবিধ ঔষধের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশের (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "অশ্বিনা" হইতে শেষে 'ত্রিঃ' পর্য্যন্ত অংশের) ইহাই মর্ম্মার্থ। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ("শংযোঃ" ইত্যাদি অংশের) ভাব এই যে,—'আমার কর্ম্ম ধর্ম্মসহযুত হউক,—আমায় কল্যাণ-প্রদ আনন্দ দান করুক।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ("শুভস্পতী" হইতে "বহতং" পর্য্যন্ত অংশের) প্রার্থনা—'আমাদিগের মধ্যে ত্রিগুণের ও ত্রিভাবের সাম্য সাধিত হউক।' সাম্যসাধনাকাঙ্ক্ষাই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষা। এক এক প্রকার ঔষধ প্রার্থনা করিয়া, পরিশেষে সকল ঔষধে সকল অবস্থার সাম্যভাব কামনা করা হইয়াছে। গুণসাম্য ও ধাতুসাম্যই মানসিক ও দৈহিক পরম সুখ। ঋকে সেই পরম সুখের প্রার্থনাই পরিব্যক্ত। এক শ্রেণীর আধুনিক লোকের বিশ্বাস, ঋগ্বেদের সময় বায়ুপিত্তকফ ত্রিধাতুর বিষয় আর্য্যদের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সে তাঁহাদের ভ্রমবিশ্বাস। প্রাচীন ভারতে ভেষজ-বিদ্যার যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, আমরা বলি এ মন্ত্র বরং তাহার প্রমাণ-মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তৎকালে দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয়বিধ ব্যাধি নাশ করিবার উপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

লক্ষ্য।

[পণ্ডিত শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ বিরচিত।]

আমি রেখেছি নয়ন তোমা পানে
তুমি কোথা আছ কেবা জানে?
যথা আছ থাকো, আছ বলে' রাখো
বিশ্বাস জাগা'য়ে প্রাণে!

প্রথম প্রভাতে জগতের লোক
দেখেছিল চে'য়ে যে পুণ্য আলোক
আজো নহে তাহা ম্লান একটুক
তেমতি পুলক দানে!

জলদে পবনে হ'তেছে ধ্বনিত
তোমারি রচিত সে আদি-সঙ্গীত
হতেছে তোমার সত্তা প্রকাশিত
ছায়া ও আলোকে গানে॥

আমি রেখেছি নয়ন তোমা-পানে
তুমি জাগিতেছ ধ্যানে জ্ঞানে
পল্লবের কোলে, জাগ ফলে ফুলে,
জাগ সে লতাবিতানে॥

পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণ।

[পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ শিরোমণি মহাশয়ের লিখিত।]

[এই প্রবন্ধ ও 'ভারতবর্ষের' প্রবন্ধ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, এই প্রবন্ধ শেষ হইলে, তাহা স্বতন্ত্রভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।—"সাহিত্য-সংবাদ"—সম্পাদক।]

(১)

'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রে 'ঋগ্বেদে পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণ' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময়াপন্ন ও উৎসাহিত হইলাম। বিস্ময়ের কারণ, ঐ প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছেন,—"সূর্য্যপ্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধে ও তাহার প্রমাণ খৃঃ ১৫শ শতাব্দের পূর্ব্বে নাই।" * তার পর বলিয়াছেন,—'প্রাচীনতম সূর্য্যসিদ্ধান্ত আদি গ্রন্থে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহাদির গমনের কথা আছে ও পৃথিবীকে স্থিরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরেরও যে পূর্ব্বের, সম্ভবতঃ এ বিষয়ে এখন কাহারও সন্দেহ নাই। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক কালেও, আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকৃত হইত। এমন কি, পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-ব্যাপারও তখন অজ্ঞাত ছিল না।" প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধের শেষ ভাগে বলিয়াছেন,—"ঋগ্বেদের অন্যান্য জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। আমাদের দিক হইতেও এ সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যক।"

এ বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য, 'আমাদিগের দিক হইতেও আলোচনার' চেষ্টাই আমাদিগের উৎসাহের কারণ। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে এখনও আমাদের হৃদয় একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাই ভরসার কথা। তার পর বক্তব্য এই যে,—ঐ প্রাচীন কালেও যে কাহারও ভুলভ্রান্তি ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ ঐ বার্ত্তা (পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রদক্ষিণের কথা) থাকিলেই বা কি?—না থাকিলেই বা কি? যাহা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহাই স্বীকার্য্য। প্রমার (যথার্থজ্ঞানের) কারণকে প্রমাণ কহে। যদি ঐ কারণ ব্যভিচারি হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রমাণ বলিতে পারা যায় না, অর্থাৎ, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ ও অপ্রমাণ (ভ্রমের) কারণ হয় বলিয়া, প্রমাণ নহে। এই নিমিত্ত সন্দিগ্ধ বাক্য ও সামান্যাকারে অনুমান (অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমান) অর্থাৎ, অনু—পশ্চাৎ, মান—কেবলমাত্র পরবর্ত্তী জ্ঞান—এই যে আনুমানিক জ্ঞান, উহা প্রমাণ নহে, কারণ, ঐ জ্ঞান প্রমা-মাত্রের করণ নহে;

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। সকলকেই তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—সম্পাদক।

কখনও কখনও উহা অপ্রমারও করণ হইয়া থাকে। অতএব, উহা দ্বারা কোন বিষয়ই যথার্থরূপে নিশ্চয় করা যায় না। পৃথিবী স্থিরা বা গমনশীলা এই বিষয় আর একটু বিস্তারিত রূপে জানিতে হইলে, এই "সাহিত্য-সংবাদ" পত্রিকার (১৩২৫ সালের কার্ত্তিক মাসের) "ন্যায়রহস্য" প্রবন্ধের মধ্যভাগ (অর্থাৎ ৭১ পৃষ্ঠায় ৭ পংক্তি হইতে) পাঠ করুন। তাঁহার একটু উদ্ধৃতও করিতেছি; যথা,—"ঋগ্বেদ-সংহিতায় এইরূপ বহু ঋক্ পাওয়া যায়, যেগুলিকে এই উক্তির (পৃথিবী সূর্য্যকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন) সমর্থক বলিয়া বোধ হয়।" বর্ত্তমান প্রবন্ধেও ঐরূপ কয়েকটী ঋকের আলোচনা করা হইবে। সেগুলির প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে সমস্ত মন্ত্র লইয়া প্রবন্ধলেখক স্বমত খ্যাপন করিয়াছেন, ঐ সমস্ত ঋগ্মন্ত্রের অর্থ ঠিক করা হইয়াছে কিনা! একটী মন্ত্র;—

"যে অর্ব্বাঞ্চঃ তান্ উপরাচঃ আহুঃ যে পরাঞ্চঃ তান্ উ অর্ব্বাচঃ আহুঃ।
ইন্দ্রঃ চ যা চক্রথুঃ সোমতানি ধুরানযুক্তাঃ রজসঃ বহন্তি॥ ১।১৬৪।১৯।"

এই ঋক্‌টী বাম নামক সূক্তের অন্তর্গত। ঐ সূক্ত পাপনাশাদি ক্রিয়াতে বিনিযুক্ত। আরণ্যকাদিতে ইহার বিধান আছে; যথা,—"কৃৎস্ন সূক্তস্য বিনিযোগং শৌনক আহ। স্তেয়ং কৃত্বা দ্বিজোমোহাৎ ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ। সূক্তং জপ্ত্বাস্য বামীয়ং কিল্বিষাৎ মুচ্যতে কিল্বিষাদিতি। মহাব্রতে বৈশ্বদেব শস্ত্রে বৈশ্বদেবং নিবিদ্ধানং দ্বিপ্রতীকং তত্রাস্য বামদেবস্যেত্যাদিকমেকচত্বারিংশত্যৃচং প্রথমং প্রতীকং পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিতং।" এই সমস্ত সূক্তের বিনিয়োগে শৌনক বলিয়াছেন,—'দ্বিজগণ মোহবশতঃ চৌর্য্যকর্ম্ম (চুরি) করিয়া (উহা হইতে নিষ্কৃতির জন্য) তিন দিবস উপবাস করিয়া, শুচি-পবিত্রভাবে এই ঋগ্বেদের বাম নামক সূক্ত জপ (পাঠ) করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, মহাব্রতে বৈশ্বদেবশস্ত্রেতে বৈশ্বদেবক নিবিদ্ধানটী দ্বিতীয় প্রতীক ও ঐস্থলে এই ঋগ্বেদের বামদেবস্য ইত্যাদি একচল্লিশটী ঋক প্রথম প্রতীক,—ইহা পঞ্চম আরণ্যকে কথিত হইয়াছে।' ঐ সূক্তের প্রকৃত মুখ্যার্থ—'পাপনাশাদি ক্রিয়ার সম্পাদকত্ব, দ্বিতীয় তত্তৎ-সাধন-দ্রব্য ও দেবতাদির স্মরণ দ্বারা তত্তৎ কর্ম্মের সাধন।' ইহার অতিরিক্ত অর্থকে উহার গৌণার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহারা তপস্যাদির দ্বারা যে যে মন্ত্রের মুখ্যার্থের দ্রষ্টা অর্থাৎ পরিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সব মন্ত্রের ঋষি হইয়াছিলেন। ফলতঃ যিনি যে মন্ত্রের প্রকৃত তত্তৎকর্ম্মসাধনত্বরূপ অর্থ জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই তত্তন্মন্ত্রের ঋষি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই তত্তন্মন্ত্রও তত্তৎকর্ম্মে বিনিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ ঋষির অভাবেই বেদ-মন্ত্রের অর্থ লইয়া এত গোলযোগ চলিতেছে। ফল কথা, বহুদিন হইতেই বেদ-মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ-দ্রষ্টা ঋষির অভাব ঘটিয়াছে। পরে আচার্য্যগণ গুরুপরম্পরায় উপদেশ-ক্রমে ও স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে তত্তচ্ছব্দের তত্তৎ অর্থ কল্পনা করিয়া নানারূপ ভাষ্য ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহাকে (বেদকে) হজমিগুলি-স্থানাপন্ন করিয়া অর্থাৎ যাহার যাহা হজম করিবার ইচ্ছা জন্মে (অর্থাৎ স্বমত প্রমাণিত করিবার ইচ্ছা), তিনি তদ্রূপেই বেদের অর্থ কল্পনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ বেদের দোহাই দিয়া স্বমত সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কেহ বলেন,—বেদ চাষার গান অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন কৃষকদিগের গান;

কেহ বা উহাকে ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ বলেন; কেহ বলেন,—বেদের কর্ত্তা তিন জন,—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর; অপর কেহ বলেন,—বৈদিককালে ঐরূপ অসংস্কৃত ও অসম্পূর্ণ ভাষাই ছিল; এই নিমিত্তই উহার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই; কতকগুলি তাৎকালীক ব্যবহারিক কথাই উহাতে আছে।

প্রবন্ধ-লেখক তাই বলিতে পারিয়াছেন,—"সেই সুপ্রাচীন বৈদিককালেও, আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকৃত হইত। এমন কি, পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-ব্যাপারও বোধ হয় তখন অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদসংহিতায় এরূপ বহু ঋক্ পাওয়া যায়, যেগুলিকে এই উক্তির সমর্থক বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদেরই কয়েকটীর আলোচনা করা হইবে।" প্রবন্ধ-লেখক, যে কয়েকটী ঋক আপন মতের সমর্থক বলিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের বিবেচনায়, তাহার একটীও ঐ অর্থের সমর্থক নহে। কারণ, যে ঋকগুলি ঐ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, উহাদের মধ্যে এমন কোন শব্দই দেখা যায় না যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ উহাদের পদপাঠ ও উহাদের সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়া দেখাইতেছি। পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহার তথ্য কি? প্রমাণ-স্বরূপ পরিগৃহীত তাঁহার একটী ঋক্ পুনরুদ্ধৃত হইল;—

"যে অর্ব্বাঞ্চঃ তান্ উপরাচঃ আহুঃ যে পরাঞ্চঃ তান্ উ অর্ব্বাচঃ আহুঃ।
ইন্দ্রঃ চ যা চক্রথুঃ সোমতানি ধুরানযুক্তাঃ রজসঃ বহন্তি॥" ১।১৬৪।১৯।

উহার পদপাঠ,—"যে। অর্ব্বাঞ্চঃ। তান্। উম ইতি। পরাচঃ। আহুঃ। যে। পরাঞ্চঃ। তান্। উম্ ইতি। অর্ব্বাচঃ। আহুঃ। ইন্দ্রঃ। চ। যা। চক্রথুঃ। সোম। তানি। ধুরা। ন। যুক্তাঃ। রজসঃ। বহন্তি॥"

ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের উক্তি;—"এই ঋকে সায়ণ ইন্দ্র অর্থে সূর্য্য ধরিয়াছেন। 'ধুরা ন যুক্তঃ' ইহার সায়ণ-প্রদত্ত অর্থ এইরূপ—'ধুরাযুক্তাঃ ধুরিস্থিত চক্রং অপি ধুর শব্দেন উচ্যতে (উচ্যতে) তত্রযুক্তা সমর্পিতাঃ তৎপরিভ্রমণবশেন অর্ব্বাঞ্চঃ পরাঞ্চ ভবতি তদ্বৎ।' এইরূপে প্রবন্ধকার সায়ণের ভাষ্যের অসম্পূর্ণাংশ দেখাইয়া, শব্দের স্বেচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঋকের অর্থ:—"(কালবিৎগণ) যাহা নীচ, তাহাকেই উপর, যাহা উপর, তাহাকেই নীচ বলেন। বস্তুতঃ নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণের উপর-নীচ বলিয়া কিছুই নাই।" রাশিচক্র সূর্য্য ও সোমচক্রের গতিতে ঐ চক্রের নীচ-ভাগে বা নীচ-ভাগস্থ বস্তু উর্দ্ধে গমন করে এবং ঐ চক্রের গতিতেই ঐ উর্দ্ধভাগ নীচ হয়। এইরূপে অবিশ্রান্ত গতিতে, নীচ উপর ও উপর নীচ হইতেছে। প্রবন্ধলেখকের মতে,—ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্যোতিষ্কগণের নীচ ও উপর নাই—এরূপ অর্থ কোথা হইতে পাইলেন? ঐ ঋকে এমন কোনও শব্দ দেখা যায় না যে, 'নাই' এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে। পরন্তু কোন্ গ্রহ কাহা হইতে কত উর্দ্ধে অবস্থিতি করেন ও কে কাহা হইতে কত নীচ, ইহা শাস্ত্রে দেখা যায় ও গ্রহাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও উহাদের নীচ ও উপর বুঝা যায়। অপিচ, এই ঋকে পৃথিবীর গতির কথা কিছুই নাই।

রাজা গোপীচাঁদ।

[শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের বিরচিত।]

তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধক হাড়ি সিদ্ধা অলৌকিক তপোবল-প্রভাবে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় ময়নামতি যেরূপ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; হাড়িসিদ্ধাও তদনুরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হাড়িসিদ্ধার আদেশে সদলবলে যমরাজ হাড়ি সিদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া "যখন রাস্তা বান্দার হুকুম পাইল, থর থর করি চেঙ্গড়া যম গুলা কাঁপিতে লাগিল। হাড়ি সিদ্ধা বলেরে যম বেটা তোমরা কাঁপ কি কারণ? সকাল সকাল মাল্লি বাঁধার কর আয়োজন।" দূতগণ সহ যমরাজ রাস্তা বাঁধার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাড়ি সিদ্ধাকে কহিতে লাগিলেন,—

"দেও দেও গুরু বাপ কোদাল আনিয়া,
তোমার সোণার মাল্লি দেইছি বাঁধিয়া।"

হাড়ি সিদ্ধা তখনই—"মহামন্ত্র গিয়ান লইলে-হৃদয়ে জপিয়া।
নওশত হাজার কোদাল আসিল চলিয়া॥"

কোদালগুলি যমগুলীকে অর্পণ করিয়া হাড়ি সিদ্ধা আদেশ করিলেন,—"সোয়া হাত প্রশস্ত ও এক বুক উচ্চ করিয়া রাস্তা বাঁধিতে হইবে। এবং মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে গভীর দীর্ঘিকা খনন করিয়া প্রস্তর দ্বারা চারিদিকের ঘাট বাঁধিয়া দিতে হইবে। অমনি কাজ আরম্ভ হইল।

"যুয়ান যুয়ান যমগুলা চাপা কাটিতে লাগিল।
চেংরা চেংরা যমগুলা চাপা উঠাইতে লাগিল॥
বিদ্যমান যমগুলা যায় চাপা বসেয়া।
গোদা যম যায়ছে মাল্লি সমান করিয়া॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হইল।
চারি দণ্ড অন্তর সোনার মাল্লি বাধিয়া ফেলিল॥
নেও নেও গুরুবাপ তোমার মাল্লি দেখিয়া।
আমরা তোমায় সোনার মাল্লি দিলাম বাঁধিয়া॥
বৃক্ষের তলে থাকি হাড়ি সিদ্ধা মাল্লি দেখিল।
ভবে শুবে যম বেটাক বিদায় করি দিল॥"

হাড়িসিদ্ধা পুনরায় মহামন্ত্র গিয়ান হৃদয়ে জপ করিয়া লইয়া হনুমানকে স্মরণ করিলেন। হনুমান কদলীবনে রামরূপ ধ্যানে মগ্ন ছিল। হাড়ি সিদ্ধার আকর্ষণ বলে ধ্যানভঙ্গ হইয়া দুই চার লম্ফে হাড়িসিদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া "হেটমুণ্ড হইয়া প্রণাম জানাইল।" হনুমানকে দেখিয়া হাড়ি সিদ্ধা কহিলেন,—

"ওরে বেটা হনুমান কি কর নিচন্তে বসিয়া।
সোনার মাল্লিত পুষ্পের বাগান দেও নাগাইয়া॥

এক রাজ্ঞা নাপেয়া দোন রাজ্ঞা পাইল।
পর্ব্বতক নাগিয়া হনুমান পণ্ড মেলা দিল॥
চৌদ্দ যোজন পর্ব্বত ভাঙ্গি মস্তকে নিল।
হাড়িসিদ্ধার নিকট লাগি পুস্ত মেলা দিল॥
একে একে সোনার মাল্লীত পুষ্পের বাগান গুড়িয়া দিল।
হাড়ি সিদ্ধা বিক্ষতলে থাকি দেখিতে লাগিল॥
সোনার মাল্লি যখন হনুর বাঁধা হয়া গেল।
শুবে শুবে হনুমানকে বিদায় করি দিল॥

অতঃপর কুর্ম্মগুলীকে স্মরণ করিলে যেথানকার যত কুর্ম্ম আসিয়া বুক দিয়া সোনার মাল্লিতে রোলারের কাজ করিয়া দিল। বাইম ও কুচিয়া প্রভৃতিকে স্মরণ করিলে তাহারা আসিয়া রাস্তা লেপিয়া পুছিয়া দিয়া গেল। এইরূপে মাল্লি বাঁধা হইতে আট দিন লাগিল। গোপীচাঁদের নিদ্রাভঙ্গের সময় হইয়া আসিলে হাড়ি সিদ্ধা মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"যদ্যপি রাজার ছাইলা উঠে গুরু গুরু বলিয়া।
সুখে নিগাম বেটাক পন্থত হাটেয়া॥
চাপড় মারতে যদি উঠে মাও মাও বলিয়া।
দুক্কতে নিগাম বেটাক সন্ন্যাসক নাগিয়া॥
হস্ত তুলি ব্রহ্মচারী চাপড় মারিল।
গুরু গুরু বলি রাজার ছাইলা কান্দিয়া উঠিল॥
নিদ্রা হইতে উঠি মহারাজ আরলি দেখিল।
আরলি দেখি মহারাজ আনন্দিত হইল॥
নিগির ভালা নিগামেন যেমন এইকিনা মাল্লি দিয়া।
আনবার ভালা আনেন মোক এই কিনা পণ দিয়া।
গোটাকতক পুষ্প নিগান অদুনী রাণীর মহলক নাগিয়া।"

রাজা গোপীচাঁদ হাড়ি সিদ্ধার সম্মুখে অদুনা রাণীর কথা বলায় ক্রোধ্যমান হয় হাড়িসিদ্ধা ক্রোধ্য বলে গেল।" হাড়ি সিদ্ধা রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওরে বেটা অহঙ্কারী এলাও আহুতোর বধুর কথা মনের মাঝারে,
কেমন করি সন্ন্যাসী হইয়া যাইস্ বৈদেশ সহরে।
বেটা একটা পুষ্প নাই দেঁও মুই ঈশ্বরকে বারেয়া।
এইটে কার পুষ্পনিগির চালু তুই রাণীর মহলক নাগিয়া।
থাউক থাউক এই কি না দুক্ক মোর পাঞ্জারের ভিতর।
ইহার চাইতে অধিক দুক্ক দেইম মুই বৈদেশ সহর॥"

হাড়িসিদ্ধা ক্রোধ-সম্বরণ করিয়া, গোপীচাঁদ সহ গোদা যমের প্রস্তুত রাস্তা দিয়া গমন করিতে করিতে আদেশ করিলেন,—'তুমি আমাকে ১২ কড়া কড়ি প্রদান কর। আমার দুগ্ধপান করার প্রবল বাসনা হইয়াছে।' রাজা গোপীচাঁদ জানেন, তাঁহার মাতৃদত্ত বহুধনরত্ন

ঝোলায় আছে; সেই সাহসে প্রকাশ করিলেন,—১২ কড়ার পরিবর্ত্তে আমি ১২ কাহন কড়ি প্রদান করিতেছি। আপনি ইচ্ছামত মদ ভাং খাইয়া আনন্দ করুন। এই বলিয়া ঝোলায় হাত দিয়া দেখে—ঝোলা শূন্য। ঝোলায় হাত দেওয়ার পূর্ব্বেই হাড়িসিদ্ধা ঝোলার সমস্ত ধনরত্ন হরণ করিয়াছেন। শূন্য-ঝোলা দেখিয়া গোপীচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে রাজা গোপীচাঁদ লাগিলেন,—

"গুরু বাপ উপরে আছে গির গাইট তলে নাই ভাঙ্গা,
ঝোলার কড়ি ঝোলায় নাই ইঁয়াঞ কেমন কথা।
বাড়ি ঝোলা আনিলাম নও মন ওজন।
এখন কেনে বোলা হইল সর্ব্বাঙ্গে পাতল।
বার কড়া কড়ির বদল মোক নিয়া থো বন্দক,
গুরু বাপ তাঁও তোর আকিঞ্চন পুরণ হউক।"

রাজা গোপীচাঁদ নিজ মুখেই যখন বন্দক রাখার কথা বলিলেন, হাড়ি সিদ্ধা চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া গোপীচাঁদের হস্তদ্বয় বন্দন করিয়া কলিঙ্গার বন্দরে যাইয়া বাঁধা খুইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, খোলাহাটীর বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হইয়া বন্ধক লও বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাড়িসিদ্ধার চীৎকারে বৈষ্ণবী, তৈলনী, খিলিবেচি, হলদিবেচি কলাইবেচি প্রভৃতি অনেকেই বন্ধক লওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করিল; কিন্তু কাহারও সহিত বনিবনাও হইল না। অতঃপর—

"হীরা নটীর মহলক বলি পন্থ মেলা দিল,
হীরা নটীর দরজায় যাইয়া খাড়া হইল।
এক দুই করি নও ডাঙ্গ ডঙ্কায় মারিল।
হীরা নটীর দাসী বান্দিগণ চমকিয়া উঠিল।

দাসী বলে,—'মা জননী কোন্ বৈকার রাজা বাদনা আসিল। সাজিয়া এক দুই করি নওডাং দিলে দাম্যাত কশিয়া।'

হীরা নটী দাসীদিগকে আদেশ করিল, সুবর্ণের ডালী কক্ষে লইয়া শীঘ্র যাইয়া ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া লইয়া সম্মানের সহিত অন্দরে লইয়া আইস।

"এক আজ্ঞা না পায়া বান্দি দোন আজ্ঞা পাইল।
সুবর্ণের ডালি নিয়া বান্দি চাতরার বাহির হইল।
যখন যায়া বান্দি বৈষ্ণবক দেখিল।
হাতে মাথে বান্দি চমকিয়া উঠিল।
পাচ পাকে পাছিয়া বান্দি অন্দরক গেল।
হীরা নটীর কাছত যায়া কহিতে লাগিল।
রাজা বাদনা কাঁহয় নাই আইসে সাজিয়া,
কোঠেকার বৈষ্টম আইল মহলে ছলিয়া।"

বালীগ্রামের প্রাচীন সমাজ।

[শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মিশ্র বি-এ মহাশয়ের বিরচিত।]

(১)

বালী বলিলে এখন যতটা স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে বৃহত্তর স্থানকে বুঝাইত। উত্তরে বালীখাল, পশ্চিমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইন, দক্ষিণে হাওড়া মিউনিসিপালিটির এলাকা, পূর্ব্বে ভাগীরথী—এই চৌহদ্দী মধ্যস্থিত নকসা'নালুয়া-ঘুশুড়ির খানিকটা, পূরা বেলুড়-বারাকপুর, আর হীলবালী লইয়া বর্ত্তমান মিউনিসিপাল বালী হইলেও, বাহিরের লোকে বালীখালের উত্তরস্থ হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত উত্তরপাড়াকে বালীর সহিত অভিন্নবোধে "বালী-উত্তরপাড়া ডাকনামে ডাকিয়া ও জানিয়া থাকে। কিন্তু সাবেক ডাকনাম কোতরঙ্গ-বালী", আর রেল-লাইনের পশ্চিম হইতে বালীখালের দক্ষিণশাখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় স্থানের এখনও পর্য্যন্ত "বালীর-জলা" ডাকনাম, বালীগ্রাম এককালে যে কত বড় ছিল জানাইয়া দিতেছে।

"কোতরঙ্গ-বালী" ডাক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত এক স্থানীয় কুলগ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান-কোতরঙ্গ ও বালীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভদ্রকালী ও উত্তরপাড়া বালীর সামিল ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে রচিত এক সত্যনারায়ণ-পুঁথিতে ও কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত কাপ্তেন ক্লড মার্টিন অঙ্কিত এক মানচিত্রে বালী ও ভদ্রকালী-গ্রামের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে, আর উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমীদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভ্যুদয়ের সহিত উত্তর-পাড়া স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়া উক্ত হইতে থাকে, পরিশেষে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ম্যাজিষ্ট্রেসী সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরপাড়া প্রকৃতই পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতএব ভদ্রকালী ও উত্তরপাড়া বালী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত বালীগ্রামের সমাজেতিহাসের অন্তর্গত ছিল বুঝিতে হইবে।

কোনও স্থানের সমাজপত্তনসূচনা তথাকার প্রাকৃতিক সংগঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। বালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ঘটনাক্রমে নৌকার ভগ্ন অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ বহু বিবরণ পাওয়ায়, স্বতঃই মনে হয় যে, "গঙ্গামঙ্গল" কাব্যোক্ত নবদ্বীপের উদ্ভব বর্ণনায়—

"তখনে আসিল দ্বীপ গঙ্গাজলমাঝে।
এবে সে প্রকাশ হৈল সংসারের মাঝে॥"

এই উক্তি বালীর সম্বন্ধেও খাটে, আর সংস্কৃত ভৌগোলিক-গ্রন্থ দিগ্বিজয়প্রকাশোক্ত "শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ" এই শ্লোকার্দ্ধে বালীগ্রামের সংস্কৃত নাম বালুকঃ বা বালুকা, বাঙ্গালা "বালী" নামের সহিত, চরের বালি এই অনুমান সমর্থন করিতেছে। এখন কথা হইতেছে—কতদিনে এই স্থানে মনুষ্যের বাসযোগ্য হইল? এবং কাহারাই বা প্রথমে আসিয়া বাস করিল?

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতার আদমসুমারি বিবরণী রচয়িতা মিঃ এ, কে, রায় ফারগুসন প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিৎগণের গবেষণা ও যুক্তির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী নাগাইদ বাসোপযোগী হইয়াছে। মেডলিকট্ ব্ল্যানফোর্ডের ভূ-তত্ত্ব পুস্তকে কলিকাতা-কেল্লার ১৮৩৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাটী-ফুঁড়িবার বৃত্তান্তে যে স্তর-পর্য্যায়ের কথা লিখিত আছে, কেল্লার ৫ মাইল উত্তরস্থ পরপারে বালী-মিউনিসিপালিটির এক স্থানে "সব-আর্টেসিয়ান ওয়েল" নামক কূপ-খননকালে মাটি ফুঁড়িয়া সমান গভীরতায় সমস্তর পাওয়া গিয়াছিল। অতএব কলিকাতার অদূরস্থ সমস্তর বালী ভূভাগ কলিকাতার সমকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য—এখানে প্রথমাগত কাহারা? প্রোফেসর কার্ণের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বরাহমিহির-কৃত বৃহৎ সংহিতার ভাষ্যকার উৎপল পণ্ডিত কেতুচার-প্রবন্ধোক্ত "জত্রজাজীব"—অর্থাৎ মাছুয়াদিগকে পূর্ব্বদেশবাসী অর্থাৎ তাৎকালিক সূক্ষ্ম তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশবাসী বলিয়াছেন। কানিংহাম সাহেব প্রাচীন ভারতীয় ভূগোল পুস্তকে সপ্তম শতাব্দের তাম্রলিপ্ত দেশের যে ভাগীরথী কালনা-কাঁসাই সীমা দিয়াছেন, তদনুসারে তৎকালে উক্ত সীমাভুক্ত নদীকূলস্থ বালীগ্রাম মাছুয়া প্রধান ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বালীর বহুকালের লোক নৌকাবাহী মাছুয়া মালা জাতি। ইহাদিগের নিকট অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে বালী এ জাতির একটি প্রাচীন সমাজ। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার শাস্ত্রানুসারে উচ্চজাতির প্রাপ্য গঙ্গাতীরস্থ সমুদয় স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল, পরে বংশহীন হইয়া হটিতে হটিতে এখন মাত্র "মালাপাড়া" নামক একটা পাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখানেও শ্রীবৃদ্ধি নাই, ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। দুইটা আদম আদমসুমারির বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায় যে—

মালাজাতির লোকসংখ্যা।

সাল।	পুরুষ।	স্ত্রী।	মোট।
	হুগলী জেলা।		
১৯০১	১৭৩৪	+ ৫৫০	= ২২৮৪
১৯১১	১১৭৮	+ ৬৭৬	= ১৮৫৪
	হাবড়া জেলা।		
১৯০১	১৯৬৩	+ ৭৮৮	= ২৭৫১
১৯১১	১০০২	+ ৪০০	= ১৪০২
	বালী থানা।		
১৯০১	৪৫০	+ ১১	= ৫১৬
১৯১১	আলাহিদা হিসাব পাওয়া যায় নাই।		
	এখন মোট ৩০০ আছে কিনা সন্দেহ।		

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ১৯১১ সালে ১২৭০৬ জন পুরুষ, ও ৭৪৩৬ জন স্ত্রী মালাজাতীয় মোট

২৭,১৪২ জন লোক ছিল, সরকারী প্রকাশ। হায়ঃ—স্ত্রীজাতির অত্যল্পতা হেতু এই জাতি হ্রাস পাইতে বসিয়াছে সম্ভবতঃ এই মাছুয়া মালাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বালীর আদিম অধিবাসী। চরভূমিতে নৌকাবাহী ইহাদের বাসই প্রথম-সম্ভবপর। পরে দুলে কেওরা প্রভৃতি বন-জঙ্গলবাসকারী শিকারী-কাঠুরিয়া জাতির আগমন অনুমান করা যাইতে পারে।

বালীর ভদ্রজাতির মধ্যে বাস পর্য্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের। "বালীর দত্ত" ও "বালীর ঘোষ" এই দুই সমাজ এই স্থানে উৎপন্ন বলিয়া লোক প্রসিদ্ধি॥ ইঁহাদিগের ইতিহাস যথাক্রমে উক্ত হইতেছে।

"বালীর-দত্ত"।

দত্তবংশের ঢাকুরী নামক প্রাচীন কায়স্থকুল গ্রন্থে আছে ঃ—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদাশিব অনুরক্ত, কাঞ্চী হ'তে এল গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ, কুলাভাব হইল নিজদোষে॥"

ইহাতে দত্তবংশের বীজী পুরুষোত্তম দত্তকে মহারাজ বিজয়সেনের (১০৭৯—১১১৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক বলা হইয়াছে। আধুনিক কুলগ্রন্থ "দত্তবংশ মালায়" কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তকে বহুপূর্ব্বতর—৮০৪ শকাব্দের (৮৮২ খ্রীঃ) করা হইয়াছে।

দত্তবংশের এখন ২৮শ পর্য্যায় হইয়াছে। ৩০ বৎসর অন্তর একপুরুষ গড়ে ধরিলে ২৮×৩০=৮৪০ বৎসর হয়। বর্ত্তমান ১৯১৯ খ্রীঃ অঃ হইতে ৮৫০ বাদ দিলে ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম দত্তের অস্তিত্ব কাল হয়, আর তিনি বিজয়সেনের সম-সাময়িক হয়েন। অতএব একাদশ শতাব্দে পুরুষোত্তম আগমন করিয়াছিলেন। ইনি যে বালী গ্রামে আসিয়াছিলেন, "দত্তবংশমালার" নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রমাণিত হইতেছে ঃ—

"তেষাং কুলপতির্দ্দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ। বালীগ্রামে বসন্ সোঽপি গৃহস্থাচারপালকঃ॥"

বালীতে বাস করিয়া পুরুষোত্তম পরে "বালীর দত্ত" আখ্যা পাইয়াছিলেন, কেননা, ১০০৮ সনে রচিত দ্বিজ ঘটক চূড়ামণির "কায়স্থকারিকায়" দেখা যায় ঃ—

"ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী। অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন। সম্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম॥"

রাজসভায় ব্রাহ্মণের "ভৃত্য নহি" বলায় পুরুষোত্তম দত্তের অকুলীন হওয়া প্রসঙ্গে তাঁহাকে "বালীর দত্ত" বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তমের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ তেকড়ি বালী ছাড়িয়া আন্দুল গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই শাখার সপ্তদশ পর্য্যায়ী গোবিন্দশরণ কলিকাতা গোবিন্দপুরে আসেন। তাঁহার পৌত্র রামজীবন (১৯শ পর্য্যায়) হাটখোলায় উঠিয়া আসেন। ইঁহা হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি। বালীর পুরুষোত্তমবংশীয় অন্য এক শাখা হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মদনগোপাল দত্ত বালী ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে দিল্লির বাদসাহ প্রদত্ত বহু ভূ-সম্পত্তি জমীদারী-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক যশোহর নড়াইল গ্রামে বাস করেন। ইঁহা হইতেই নড়াইলের রায়-বংশের উৎপত্তি। খাস "বালীর দত্ত" একঘর এখনও বালীতে আছেন।

"বালীর ঘোষ"।

আদিশূর সভায় ভট্টনারায়ণের সহিত আগত মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি বালীতে আসিয়া বাস করেন। ইঁহা হইতেই "বালীর ঘোষ" সামাজিকদিগের উৎপত্তি। নিশাপতি-বংশীয় একশাখা বালীগ্রামে একদিক্রমে অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পারিবারিক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই বংশীয় রামচন্দ্র খানের বালীর বাটীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নাকি পুরুষোত্তম যাত্রাকালে ঘটনাক্রমে সশিষ্যে অতিথি হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বাটীর চণ্ডীমণ্ডপটি "বিষ্ণুমণ্ডপ বলিয়া অভিহিত করিলে গোঁড়া শাক্ত রামচন্দ্র প্রতিবাদ-প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে মহাপ্রভু নাকি রামখাঁকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন "তুমি বাসচ্যুত হইবে।" রামখাঁও চৈতন্যদেবকে শাপ দিয়া বলিলেন "তুমি যে অভিপ্রায়ে পুরুষোত্তম যাইতেছ সিদ্ধ হইবে না।" চৈতন্যদেব উঠিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্রের এক দুঃখী জ্ঞাতি তাঁহাকে ভক্তিভরে গৃহে লইয়া যান। সেখানে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু এই ভক্ত পরিবারকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হেথায় সাতদিন রিয়া কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু সশিষ্যে পুরুষোত্তম চলিয়া যান। রামচন্দ্রের অভিশাপে নাকি হাপ্রভু জগন্নাথধামে রাজার নিষেধ-আজ্ঞায় খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে পান নাই। ার মহাপ্রভুর অভিশাপে শীঘ্রই এমত এক ঘটনা ঘটিল যে, রামচন্দ্রকে বাসভূমি ত্যাগ করিতে হইল। রামচন্দ্র প্রবল প্রতাপ ভূ-স্বামী ছিলেন। এখনকার বালীর চৈতলপাড়র মোড়ের নিকট গ্রাণ্ডট্র্যাঙ্করোড সন্নিধানে তাঁহার গড়বন্দীকরা বাড়ী ছিল। তাঁহার বংশীয়েরা এখন উড়িষ্যা-বালেশ্বর-দোড়দহ-লক্ষ্মণনাথ গ্রামে "রায়" উপাধিভূষিত হইয়া বিশিষ্ট ভূমধ্যিকারী-রূপে বাস করিতেন। বালী-খালধারে "গড়খানা"—নামক এক পুরাতন জলাশয়ের অংশ রামচন্দ্রখাঁর পরিখার চিহ্নবিশেষ—এমন কথা তদ্বংশীয় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শুনা যায়।

চৈতন্য রামচন্দ্র সংঘর্ষপ্রবাদ কতদূর সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমেই প্রতীয়মান হইবে যে "নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগপথে" অর্থাৎ চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনা মত মহাপ্রভু গঙ্গার পূর্ব্বপার দিয়া পুরীযাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একবার তিনি তিনদিন "রাঢ়-দেশ ভ্রমণ" করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, তিনি যে কখনও বালিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এমন কোন উক্তি কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই প্রবাদে নিত্যানন্দের নাম জড়িত থাকায়, এবং চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত নিত্যানন্দ-রামচন্দ্র সংঘর্ষবর্ণনা মর্ম্মে অদ্ভুতভাবে মিলিয়া যাওয়ায় মনে হয় যে হয়তো রামচন্দ্রবংশীয়দিগের কোনও গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য চৈতন্যসহচরের স্থানে চৈতন্যের নাম সন্নিবেশিত করিয়া প্রসঙ্গ রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"সেই দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খান। বৈষ্ণব-দ্বেষী সেই পাণ্ডব প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে। তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রুইল। সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা প্রেম প্রতারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥

প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন। দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে। আসিয়া বসিল দুর্গা-মণ্ডপ ভিতরে॥
অনেক লোক সঙ্গে অঙ্গন ভরিল। ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান। গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার। ইহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মনুষ্য অপার॥"
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনিয়া বাহির হৈলা। অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
"সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়। ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥
এতবলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা। তাঁরে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞাদিল। গোঁসাঞি যাহা বসিলা তার মাটী খোদাইল॥
গোময়জলে লেপিল সব মন্দির-প্রাঙ্গণ। তবু রামচন্দ্রের মন না হইল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর। ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইলা তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গা-মণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য-বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল॥
স্ত্রীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া। তার ঘর গ্রাম লুট তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন। আর দিন সবা লইয়া করিল গমন॥
জ্ঞাতি ধন জন খানের সকল লইল। বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥"

উপরে কথিত "গ্রাম উজাড়" ব্যাপারের সত্যতা অন্য এক দিক দিয়া প্রমাণ-সম্ভাবিত হইয়াছে। স্থানীয় গ্রহবিপ্রদিগের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত এক কুলকারিকায়—

"তারপর দেশভঙ্গ পলায়ন হয়।
কুলানন্দের কুলের কথা এইখানেই রয়॥"

বলিয়া বংশ-বিস্তার-বর্ণনা সমাপ্ত করা আছে। বর্ণিত "দেশভঙ্গ পলায়ন" ঘটনা "গ্রাম উজাড়" কাণ্ডটাকে সন্দেহের বাহিরে লইয়া যাইতেছে। বিশেষ কারণ এই যে, "চৈতন্য-চরিতামৃত" উক্ত কারিকার বেশী পূর্ব্বের লেখা নয়। হাল বালীর উত্তরদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিলে চৈতলপাড়া, ঘোষালপাড়া, মুখুয্যেপাড়া, গাঙ্গুলীপাড়া, ভিংসাইপাড়া, গোঁসাই পাড়া, সরখেলপাড়া, বাঁড়ুয্যেপাড়া, সাবেক ঘটকপাড়া, পাঠকপাড়া, চক্রবর্ত্তীপাড়া, আচার্য্যপাড়া, বারেন্দ্রপাড়া—কেবল ব্রাহ্মণপল্লী। তবে এতক্ষণ, রামহীন রামায়ণ কথার মত, ব্রাহ্মণপ্রধান বালীর অব্রাহ্মণ জাতিদিগের কথা আলোচিত হইল কেন? ইহা ব্রাহ্মণের অসম্মান নয়, সত্যের সম্মানরক্ষা। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণপল্লীগুলির এমন একটিও নাই যাহার সাবেক পরিচয় একটা না একটা অ-ব্রাহ্মণ নাম ছিল না। সুতরাং এখানকার অন্যজাতির—বিশেষতঃ, চলিত কথায় যাঁহাদিগের নাম ব্রাহ্মণের পরেই হইয়া থাকে—সেই কায়স্থদিগের তুলনায় এখানকার ব্রাহ্মণেরা পরতর, কিন্তু নেহাৎ আধুনিকও নহেন। বাটীয় ব্রাহ্মণদিগের "বালী মেল" তাহার প্রমাণ।

কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, ১৪০২ শকে দেবীবর ঘটক বাটীয় ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন করেন। ৩৬ মেলার মধ্যে, ফুলিয়া, খড়দহ ইত্যাদির মত বালীমেলাও গ্রামের নামানুসারে হইয়াছিল। গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য হইলে, তন্নামে মেল হইত না, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সুতরাং বালীমেলও বালীর ব্রাহ্মণসম্পর্কে হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ বালীমেল যে কোথায় আছে, সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতরত্নীমেল কেহ কেহ "বালী-ভাবাপন্ন" আছেন। আর ইহাও জানা গিয়াছে যে, এই বালীভাবাপন্ন-গণ বালী-সমাজ হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও কুলজ্ঞ বলেন যে, "বাঙ্গাল" মেলের মত, "বালী"-মেল পণ্ডিত-রত্নী-মেলে অঙ্গীভূত হইয়া "ভাবাপন্ন" রূপে অপ্রকট অবস্থায় আছে। খাঁটি পণ্ডিতরত্নীরা কিন্তু এই "ভাবাপন্ন" দিগকে একটু খাটো করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, মেলবন্ধনকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বালীতে ব্রাহ্মণবাস ছিল, দেখা যাইতেছে।

বিশ্বাস।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মজুমদার বিদ্যারত্ন বি এ মহাশয় লিখিত।]

১

লিখিল বিশ্ব দিতেছে সাক্ষ্য
কে বলে গো 'তুমি নাই ?'
জীবের জীবন মরণের মাঝে
তব পরিচয় পাই—
প্রসূতিবক্ষে তব স্নেহ বহে—
রসরূপে ফলে তব দয়া রহে—
নিশ্বাস হ'য়ে আছ দেহে দেহে
তবুও খুঁজে বেড়াই
নিখিল বিশ্ব দিতেছে সাক্ষ্য—
কে বলে গো 'তুমি নাই' ?
কাজল নিশীথে বিজলী হইয়ে
তুমি যে দেখাও পথ
বাদলের দিনে গুড়্ গুড়্ রবে
বেগে ধায় তব রথ
মধুমাসরূপে তুমিই তো হাস
সাধুরূপে ভবে বারে বারে আস
মধুর বচনে বঁধু হ'য়ে তোষ—
যখন যাতনা পাই
নিখিল বিশ্ব দিতেছে সাক্ষ্য
কে বলে গো 'তুমি নাই' ?

উষার আলোকে পুলক পূরিত
নেহারি তোমার হাসি
কীচকের তানে বিহগের গানে
তুমি যে বাজাও বাঁশী
দিনমণি যায় শেষ হয় বেলা
প্রকৃতির সনে তব হোলি খেলা
নীলাকাশতটে তারকার মেলা
(যেন) রামের ছবিটি পাই
নিখিল বিশ্ব দিতেছে সাক্ষ্য
কে বলে গো 'তুমি নাই ?'
সরল পরাণ শিশুবেশ ধরি
কভু ধাও নেচে নেচে
হাটে মাঠে ঘাটে কখনও বেড়াও
প্রেমনিধি বেচে বেচে
পাপীরে নাশিতে কভু ধনুধারী
ভীষণ সমর কভু মহামারী
কোটি কোটি রূপে বিচরিছ হরি॥
সদা সন্ধান পাই
নিখিল বিশ্ব দিতেছে সাক্ষ্য
কে বলে গো "তুমি নাই ?"

গয়ার ইতিহাস।

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল মহাশয়ের লিখিত।]

এক এক করিয়া নদীগুলির বিষয় বর্ণন করিব। বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া-জেলার মধ্যে সোণ-নদই সর্ব্বাপেক্ষা বড। ইহা নর্ম্মদা ও মহানদীর উৎপত্তি-স্থল মধ্যে ভারতের অমরকণ্টক উপত্যকায় বরেণ্যদেবতা ৺অমরকণ্টকনাথের মন্দিরের সন্নিকটস্থ বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই তিনটি নদী ভারতের বড নদী বলিয়া খ্যাত এবং তিনটাই তীর্থ স্থান বলিয়া হিন্দুর শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মহানদী দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কটকের কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রে মিশিয়াছে। নর্ম্মদা এইখান হইতে উঠিয়া জব্বলপুরের সন্নিকট কঠিন মর্ম্মরের ফলক ভেদ করিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সোণও পার্ব্বত্য কঠিন মর্ম্মর-ফলক ভেদ করিয়া উত্তরবাহিনী হইয়া প্রায় ৩৩০ মাইল অতিক্রম করিয়া আকবরপুরের ২॥০ তিন ক্রোশ দক্ষিণে এবং মহম্মদ-গঞ্জের সন্নিকটে কোইলের সহিত মিলিত হইয়াছে। বারুণ, দাউদনগর এবং আরোয়াল নগর অতিক্রম করিয়া দানাপুরের কিছু পশ্চিমে ৺বিন্দ গাও বা হরদী ছাপরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল বিহারবাসীর একটি মহাতীর্থস্থল। বারুণে সোণ-নদের বিখ্যাত কুল্যা বিদ্যমান। এইখানকার সোণ একুইডে পূর্ত্ত এবং স্থপতি বিদ্যায় একটি বিশেষ দেখিবার জিনিষ বলিয়া বহু দূর-দেশ হইতে ইন্‌জীনিয়ার ও ছাত্রগণ তাহা দেখিতে আসেন। বাঁধের বিশাল জলের মধ্যে হংস, কারণ্ডব, বিগ্‌ড়ী হাঁস, রাজহাঁস, বক্, বন্যহাঁস, মুরগাব, সুরখাব, চাহা ইত্যাদি জলচর পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে। জলের মধ্যে চিংড়ী, রুই, কাৎলা, মির্গেল, কাল্‌বোশ, কৈ, শোল, লেটা, শাল এবং কচ্ছপ, কুমীর আদি জলচর জীব দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁধ হইতে এক মাইলের মধ্যে গয়া-মোগলসরাই রেল লাইনের জগৎ-বিখ্যাত সেতু। এই সেতু বারুণ এবং ডিহিরীর মধ্যে অবস্থিত। নদীগর্ভের মধ্যে ১০০ ফিট ব্যবধানে ৯৩টি পিলপার উপর এই সেতু ঝুলান আছে; পুলটি দুই মাইল লম্বা। এইরূপ বৃহৎ সেতু ভারতবর্ষে আর নাই। গঙ্গা, ঘোগরা, পদ্মা, সিন্ধু, মহানদী, কাবেরী, তাপ্তী, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীর বক্ষে বিশাল বিশাল সেতু আছে বটে, কিন্তু বারুণের সোণ সেতুর মত কোনটাই বৃহত্তর নহে। এই পোল ১৯০০ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারী সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রথম খোলা হয়। ছোটনাগপুর উপত্যকা হইতে প্রভূত জলরাশি বর্ষায় সময় আসিয়া এই বৃহৎ নদীর উভয় কূল প্লাবিত করিয়া তীর ও বেলাভূমি ভাসাইয়া দেয় এবং বর্ষান্তে এই সকল ভূমি ত্যক্তপলিতে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করিয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবনধারণের পথ উন্মুক্ত করে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহাকে

হিরণ্যগর্ভ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রধান শাখা—কোইল। কোইল ছোটনাগপুরের জঙ্গলভূমি হইতে উত্থিত হইয়া, প্রাচীন পালামু সহরের নিম্ন দিয়া, প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস বিস্মৃতির তামসীগর্ভে লীন করিয়াছে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ স্তূপাবলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ডালটনগঞ্জ নগরের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরে কাদল মহম্মদগঞ্জ এবং কধ্‌ওয়ান প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করিয়া সোনণদে প্রবেশ করিয়াছে। এই কোইল নদীর তীরভূমিতে প্রাচীন মোগল-রাজের সময়ে বিখ্যাত হীরক-খনি ছিল, তাহা জগৎ-বিখ্যাত পরিব্রাজক মিঃ বেরিণীয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি। তিনি বলেন যে, রোহিতাশ দুর্গ হইতে ২৬ লীগ্ অর্থাৎ ৮১ মাইলের মধ্যে এইখানি অবস্থিত। পান্না এবং গোলকুণ্ডার হীরক আকরের পরেই পালামুর হীরক খনির খ্যাতি সেকালের সভ্যজগৎকে সৌরভে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। এই নদগর্ভ বালুকাময়। ইহার মূল প্রদেশে বন্যজাতীরা অবিরমান বালুকারাশি ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণকণা সংগ্রহ করিত বলিয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহাকে হিরণ্য-গর্ভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোইলের অনেকগুলি উপশাখা আছে। তাহার মধ্যে আমানৎ, বাঁকী, খুরী, অমরাবতী, খুঁটিসোৎ, দুর্গাবতী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদী-সকল দ্বারা দেশের কৃষি ও শেচ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। মোগল বাদসাহের সময়ে এই সোণনদ ফতুয়ার সন্নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইত। কিন্তু বিগত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ইহার গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া দানাপুরের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বরুণ হইতে একটি কুল্যা বা নহর গয়া-জেলার মধ্য দিয়া এবং অপর আর একটি সাহাবাদ-জেলার মধ্যে নীত হইয়া কৃষি-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ইহা ইংরাজরাজের কীর্ত্তি। সোণের সহসা গতি পরিবর্ত্তনের বিবরণ আরকিয়লজিক্যাল সার্ভে, ইণ্ডিয়ার সপ্তম ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। বাঁকীপুর এবং দানাপুরের মধ্যস্থ ভূভাগে সোণের প্রাচীন পরিত্যক্ত সোতনার বহুল প্রমাণ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০১ হইতে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মিঃ টোয়ানিং (সাহাবাদের কালেক্টার) সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিলে এই নদীর বিষয় এবং প্লাবনের কথা আমরা সবিশেষ অবগত হই। পূর্ব্বে সোনভদ্র নামক স্থানটি সোণ-নদের উপর ছিল। এখন নদীর গতি তথা হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অপসারিত হইয়াছে। পুন্‌পুন্ এই জেলার দ্বিতীয় বিখ্যাত নদী। ইহা নবীনগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণ পালামু জেলার একটি পর্ব্বতগাত্রস্থিত কূয়ার নিম্ন হইতে উঠিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া আসিয়াছি। এই পাৎকুয়ার পার্শ্বেই ৺ শিবমন্দির আছে। এই শিবালয়ের নিম্ন হইতে পার্ব্বত্য-সোতসমূহ একত্রিত হইয়া এই নদীর উদ্ভবের কারণ হইয়াছে। এই নদীতে বার মাসই স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা সোণের তিন চারি ক্রোশ পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী সোণের প্রাচীন গতি অনুসরণ করিয়া সেই গর্ভ মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ফতুয়ার সন্নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সোণ এই গতি ত্যাগ করিয়া আরও পশ্চিমে

গিয়া, বর্ত্তমানে আরা এবং দানাপুরের মধ্যস্থিত হরদিছাপড়া গ্রামে গঙ্গার সহিত যোজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুরাকালে বৌদ্ধযুগে পাটলিপুত্র নগর সোণ-নদের উপর অবস্থিত ছিল। সহৃদয় ইংরাজরাজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান জন্য খনন করাইতেছেন। পুনপুন হইতে বহু কুল্যা বা পাইন শেচের জন্য জমীদারদের দ্বারায় নীত হইয়াছে। এইগুলি ব্যবহারের পালা নির্দ্দেশ আছে। তাহার ব্যতিক্রমে অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টির দিনে রাজায় রাজায়, প্রজায় প্রজায় অথবা জমীদারে জমীদারে বহু ফৌজদারী ও "মারপিট" হইয়া আদালতে পর্য্যন্ত নালিশ হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিক হইতে ধাওয়া, কেশার, বটানে, মাদাড় প্রভৃতি উপশাখা সকল আসিয়া পুনপুনে মিশিয়াছে। পুনপুনের মূলদেশে বৈহুনা, মহুয়াদোহর, কালাপাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল হইত কতকগুলি ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নবিনগর গ্রাম পুনপুনের উপর অবস্থিত। নবিনগরে অত্যুত্তম কম্বল, ঘটী আদি তৈজস সামগ্রী পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য-দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মোরহর নামক আর একটি প্রবল শাখানদী বিহারের প্রাচীন রাজধানী সহরঘাটীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ নদী গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড অতিক্রম করিয়া চিতাব নামক অপর আর একটি তাহার উপশাখাকে সংযোজিত করিয়াছে। অতঃপর উত্তর-বাহিনী হইয়া কাপাসিয়া গ্রামের নিকট মুক্তসঙ্গম হইয়া মোরহর এবং বুড়নদী নামে দুই বাহু পৃথক পৃথক প্রবাহিত হইয়াছে। পুনশ্চ পঞ্চানপুরের নিকট উভয়ে সম্মিলিত হইয়াছে। এইখান হইতে প্রায় ১॥০ বা এক ক্রোশ এক শাখায় প্রবাহিত হইয়া টিকারীর দুই বাহুতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক বাহু টিকারীর পাদদেশ ধৌত করিয়া উত্তর-বাহিনী হইয়া পাটনা জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অপর শাখাটি পূর্ব্ববাহিনী হইয়া ধার্ধা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং জাহানাবাদ নগরের পাদ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনপুনে গিয়া সংযোজিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী নদীর নাম—যমুনা। ইহা গয়া এবং টিকারীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী হাজারিবাগের জঙ্গলী দেশ হইতে উত্থিত হইয়া, গয়া-সহরঘাটী রাস্তার উপর চেরকী গ্রামের নিম্নদেশ ধৌত করিয়া বেলথুব সন্নিকট পরসাঁওয়া চপরদহ গ্রামে বাঁধে আবদ্ধ হইয়াছে। এই পাকা বাঁধ অতি পুরাকালে শেরসাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কত শত বৎসর তীব্র জলের প্রবাহে থাকিয়াও অদ্যাবধি তাহা অক্ষুণ্ণভাবে আছে। প্রাচীন হিন্দুস্থপতিগণ কি উপাদানে এবং মালমসলা সহযোগে এইরূপ গাঁথুনী করিতেন, তাহা বলা যায় না। ভারতী দশম ভাগের ১৭৪ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী লিখিত "বজ্রলেপ" প্রবন্ধ পাঠে আমরা কতকটা জানিতে পারি যে, কি উপায়ে হিন্দু যুগের সৌধাবলী-নির্ম্মাতাগণ প্রস্তর ও ইষ্টকাদি সংযোজিত করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের গাঁথুনীর উপাদানের সংযোগের অনুপাত অদ্যাবধি আমরা কোনও উপায়ে পাই নাই। এই বাঁধের দুই তীর হইয়া সেচের জন্য পাইন বা জলপথ খনিত আছে। এই জলপথগুলি ৮।১০ ক্রোশ বিস্তৃত এবং তাহা দ্বারা টিকারীরাজ এবং অপর শত শত

জমীদারগণের জমীদারী সেচের দ্বারায় উপকৃত হয়। এই বাঁধ এখন টিকারীর রাজার দখলে এবং তাঁহার বিশাল জমীদারীর মধ্যে ভুক্ত। এই বাঁধে বড় বড় সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। এই বাঁধে বেশ বড় বড় বা মাছ এবং জলচর পক্ষী পাওয়া যায়। পাটনা গয়া রেল লাইনের মুকুন্দমপুর ষ্টেশনের নিকট হইতে উত্তরবাহী হইয়া এবং টেহটা ষ্টেশনের স্বল্প দূর হইতে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া এই নদী পরে ক্রমে উত্তরবাহী হইয়া জাহানাবাদ গ্রামের স্বল্প নিম্নে গিয়া ধার্ধার সহিত মিলিত হইয়াছে। ধার্ধা পুনশ্চ কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্যে পুনপুন নদীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পুনপুন হিন্দুদিগের একটি মহাতীর্থ স্থান। গয়া-শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে পুনপুন নদে পিণ্ডদান দিবার প্রথা গয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থে ব্যবস্থিত আছে। গয়া পাটনা লাইনের পুনপুন পুলের নিম্নে এবং গয়া মোগলসরাইয়ে পুনপুন নদের যে সেতু আছে, তাহার সন্নিকটে মাড়োয়ারী দানবীর রাজা শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা বহু অর্থব্যয়ে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজা শিবপ্রসাদের দানের কথা পুনশ্চ গয়া নগরের বিবরণ উল্লেখ সময়ে আমরা বলিতে ত্রুটি করিব না। যমুনার পরবর্ত্তী পূর্ব্বস্থ নদীর নাম—ফল্গু একটি মহা তীর্থস্থান। গয়া মাহাত্ম্যে ফল্গুর মাহাত্ম্যে পতিত-পাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্যের অনুরূপ। ফল্গু গয়ানগরের পাদধৌত করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। গয়া সহর হইতে ১॥০ বা ২ ক্রোশ দক্ষিণে স্বরস্বতী নামক গ্রামের সান্নিধ্যে পশ্চিম হইতে লীলাজন (মহানা এবং রাজতরঙ্গিণী ও ললিতবিস্তরের "নিরঞ্জনা") এবং পূর্ব্ব হইতে মোহানে নামক পার্ব্বত্য নদীদ্বয় আসিয়া সংযোজিত হইয়া গঙ্গার নিম্নে আসিয়া ফল্গু নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে ফল্গুতে পিতৃলোকের পিণ্ডদান মহাপুণ্য কাজ। প্রতি বৎসর আশ্বিন ও চিত্র মাসে বহু সহস্র হিন্দুযাত্রী পিণ্ডদানোপলক্ষে এই পুণ্যময় ঐতিহাসিক নগরে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সমবেত হইয়া থাকে। মোহানা-মাথার উপর ডোভীতে ইংরাজ-শাসনের প্রথমাবস্থায় সুদৃঢ় পাকা সেতু ছিল; তাহারই উপর দিয়া ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় কালেক্টার মোনী সাহেব সামান্য-মাত্র রক্ষি-সাহায্যে বহু কোটি টাকা ও মোহর গোশকটে করিয়া হাঁটাপথে বিদ্রোহিগণের কবল হইতে রক্ষা করিয়া কলিকাতায় লর্ড কেনিংএর নিকট পাঠাইয়া শিরোপা পাইয়াছিলেন।

বিন্দুতে সিন্ধু।

[শ্রীমতী লীলাদেবী বিরচিত।]

এত দূরে এত দূরে তবু এত কাছে
কি অসীম ব্যবধান তবু মাঝে আছে
হে নিকটতম।
অন্তহীন নীলিমায় আঁখি যায় চ'লে
তবুও তোমার দেখা কেন নাহি মেলে
ওগো অনুপম।

এত দূরে এত দূরে তবু আছ বুকে
পলে পলে অনিমেষ চোখে চোখে চোখে
হে মোর সুদূর।
তুমি তবু কত বড় আমি ছোট প্রাণ
ছোট কথা ভ'রে আছে কত বড় গান
ওগো সুমধুর।

আশাতীত।

[শ্রীমতী কিরণবালা দেবী লিখিত।]

উপায়হীনা অমলা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া কক্ষতল অশ্রুজলে সিক্ত করিতে লাগিল। বিবাহের পরিবর্ত্তে আজ যদি পিতা তাহাকে মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে যে তাহার কোনও দুঃখ—কোনও ক্ষোভই থাকিত না! এ তাহার কি হইল। হিন্দুর মেয়ের কি কখনও দুই বার বিবাহ হয়? পিতার এই দুরভিসন্ধির বিন্দু-বিসর্গও যদি সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে হয় তো কোন-না-কোনও উপায় সে নিশ্চয়ই করিতে পারিত। শেষ সময়ে যখন স তাহার দুরদৃষ্টের পরিণাম বুঝিতে পারিল, তখন সে পিতার পা দুইখানি ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—'সে বিধবার মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আজীবন কুমারীই থাকিবে।' কিন্তু তাহার কাতর প্রার্থনায় এবং অনুনয়-বিনয়ে কোনও ফলই ফলিল না। 'অজ্ঞান বালিকার বাচালতা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়' বলিয়া, পিতা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

(২)

দশ মাস পূর্ব্বে সেই ফাল্গুনের বাসন্তী-সন্ধ্যায় চন্দন-চর্চ্চিতা, রত্নালঙ্কারভূষিতা অমলা যখন বাঞ্ছিতের আশায় বসিয়া ছিল, ষ্টেশনের দিকের গবাক্ষ-পথে বার বার দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছিল, যত বার ট্রেণের শব্দ হইতেছিল, ততবারই উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহার ঈপ্সীত জনের আগমন সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যখন লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বৃদ্ধ পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, মাতা দশদিক অন্ধকার দেখিলেন, সকল আনন্দ নিরানন্দে পর্য্যবসিত হইল, বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিতা অমলা তখন নিদাঘতপ্ত শুষ্ক ফুলের মত পড়িয়া রহিল,—তাহার পানে কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করিয়া জবাব না পাইয়া তাহার ভ্রাতা মোহিনী সেই "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রামে পঁহুছিয়া দেখিল,—সে গৃহ নিদারুণ হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই—সকলের উৎসুক নেত্র তাহার মুখের উপর পতিত হইল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর, সে রুদ্ধ-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—"হয়ে গেছে সব! মিটে গেছে সব। বর যাত্রা করে বেরুবার পর সেখানে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়; ঝড়ে নৌকা ডুবি হয়ে সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু শেষই বা বলি কেন? গাঁ-খানা শ্মশান হয়ে গেছে গো।"

এই নিদারুণ সংবাদ পলকমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কত জনে তামাসা দেখিবার জন্য এই অলক্ষণা অমলাকেই দেখিতে আসিল। সেই দশ মাস পূর্ব্বের ঘটনা আবার আজ তাহার

চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে নূতন করিয়া বিদ্ধ করিতেছে। সে যে এই দশ মাস নিজেকে নিজের কাছে বিধবা বলিয়াই পরিচিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার আরাধ্য-দেবতাকে এ জন্মে পাইল না বলিয়াও যে সে হতাশ হয় নাই। অনন্যপরায়ণা হইয়া সে তাঁহার ধ্যান করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের শেষে পরপারে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে বলিয়া যে আশায় ছিল, আজ কোনও এক নির্ম্মম দৈত্য সহসা সেই দেবতাকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিতে আসিয়াছে।

তার পর আরও দেড় বৎসর পূর্ব্বের একখানি চিত্র অমলার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ডাক্তার হইয়া লাহোরে আসিবার পর যখন তাহার পিতা ক্রমে ক্রমে সেইখানেই স্থায়ী হইলেন, তখন তাহারা ভাই বোন দুটি অতি শিশু। সে আজ কত দিনের কথা—বাঙ্গলা-দেশের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার পিতা কন্যার বিবাহ দিতে সক্ষম হন নাই; যখন তিনি ষোড়শ বর্ষীয়া অমলাকে লইয়া অতি বিপন্ন, সেই সময় একদিন বিধাতা তাঁহার হাতেই অনাহুতভাবে শচীন্দ্রকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। মোটর-গাড়ীর ধাক্কায় আহত মৃতপ্রায় শচীন্দ্রকে খাটিয়ায় তুলিয়া ডাক্তার শশিভূষণের গৃহদ্বারে যখন বাহকেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুপাংশুল মুখের প্রতি চাহিয়া করুণা ও বেদনায় অমলার বুকের ভিতর কেমন করিতেছিল। তাহার নয়নপল্লব অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেবা-যত্ন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য অমলার নারীহৃদয় কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে হাঁসপাতালে না পাঠাইয়া সেই অপরিচিত বাঙ্গালী যুবকের প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা কি প্রাণপাত যত্ন করিয়াছিল ও একান্ত ভক্তিভরে ভগবানের চরণে তাহার প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লইয়া সফলকাম হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে সে যখন সুস্থ সবল হইয়া উঠিল, তখন তাহার গৃহে যাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের মায়া কাটাইয়া সহসা যাইবার কথা উত্থাপন করিতে সে কত সঙ্কোচ বোধ করিত। এমনি করিয়া ছয় মাস সে তাহাদের আপনার জনের মত রহিল।

তার পর যেদিন তাহার পিতা আসিয়া পুত্রের জীবনদাতার উপযুক্ত পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে তাঁহার পুত্রের অঙ্কশায়ী করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে দিন তাঁহাদের গৃহে কি আনন্দ-কলরব পড়িয়া গিয়াছিল। তার পর শচীন্দ্র যেদিন পিতার সহিত গৃহে রওনা হইল, ভারাক্রান্ত বক্ষে সে দিনেও সে অন্যের অলক্ষ্যে দেখিতেছিল।

অমলা যেন কোনও সুখময় স্বপ্নতরঙ্গে উঠিতেছিল নামিতেছিল। মাতার কণ্ঠস্বরে নিজের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইতেছিল না, তাহার উদাস নেত্র যুগলের প্রতি চাহিয়া মাতা বলিলেন,—"কি-রে জল খাবি? তেষ্টা পেয়েছে?"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ৯টা বাজিয়া গেল, ১১টার পর লগ্ন। অমলার মা এতক্ষণ নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন কন্যার সন্ধান লইতে পারেন নাই। উৎসব সুখের হউক বা দুঃখের হউক, যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়, সে সকল যে তাঁহার একার হাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। দেশের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়, সকল পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতা এই বিদেশে শুধু কন্যার সুখ-সৌভাগ্য—অর্থের বিনিময়েই যে ক্রয়

করিতে আসিয়াছেন! দেশে এমন কে আছে যে, জানিয়া শুনিয়া অন্যের বাগ্দত্তা বধূকে অর্থলোভে গ্রহণ করিয়া আজীবন কলঙ্কের পশরা বহন করিবে?

গৃহিণী আবার ডাকিলেন,—"অমলা ওঠ মা, চুলটা বেঁধে দিই।"

অমলা কঠিন পাষাণের মেঝেয় আপনাকে মিশাইয়া কঠিনতর হইয়া রহিল, উত্তর করিল না। তাহার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহসিক্ত স্বরে গৃহিণী বলিলেন,—"কেন মা আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্?"

সৌর-করতাপে গলিত তুষারের মত অমলার বুকের উপরকার জমাট-বাঁধা তুষার মাতার স্নেহের উত্তাপে গলিয়া গলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া মুক্তাকারে ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল। মাতা নীরবে কন্যার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বার বার অঞ্চলে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে অমলা বলিয়া উঠিল—"মা, জেনে শুনে আমায় এ সর্ব্বনাশ তোমরা কেন করলে মা!"

মনের ভাব গোপন করিয়া ত্রাস্তভাবে গৃহিণী বলিলেন,—"ছিঃ। ও কি অলুক্ষণে কথা! সর্ব্বনাশ কিসের মা? ঘর বর দেখে তোমার যাতে সুখ হবে—মঙ্গল হবে—বাপ মায়ের যা কর্ত্তব্য, তাই কর্‌ছি।"

মায়ের কথায় বাধা দিয়া তাহার উদাস-নেত্র-যুগল মায়ের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া অমলা বলিল,—"যাকে এক জনের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়, তাকে আবার নূতন ক'রে কি অন্যকে দান করা চলে মা?"

বিস্মিতের মত মাতা বলিয়া উঠিলেন,—"কি পাগলের মত কথা তোর! দান কাকে বল্‌ছিস? এমন বিয়ের কথা হয়, আমার ভেঙ্গেও যায়। এমন কত জনের হয়। একে দান বলে না। এখন ওঠ্।"

অমলা যেন কেমন ক্ষিপ্তের মত মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃপ্ত-কণ্ঠে বলিল,—"দান নয় তো কি—দান নয় তো কি? দান আর কাকে বলে? থাক্ আমার যখন বাধা দিবার ক্ষমতা নেই, তখন তোমাদের যা ইচ্ছে কর্ত্তে পার! কিন্তু আমি নিশ্চয় বলে রাখ্‌ছি মা, এ বিয়ে কিছুতেই হবে না।"

কক্ষস্থিত ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। অদূরে বাদ্য-বোল বরের আগমন সূচনা করিল। কন্যার কথার আর কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহার চুলের রাশি তুলিয়া ধরিয়া মাতা কেশ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

(৪)

সহসা বাদ্যোদ্দম থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কোলাহল উত্থিত হইল। গৃহিণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া সন্ত্রস্ত মনে ভয়ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেতস-পত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বহিঃদরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন, স্বয়ং বরকর্ত্তা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া অত্যন্ত

চিত্তাস্থিরে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক গৃহস্বামীকে (তাঁহার পতিকে) উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"মশাই-সকল দেখ্‌লেন তো—কত বড় জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলাম। বাপ্‌রে! আর একটু হলেই জাতটা গিয়েছিল আর কি? উঃ! ভদ্রলোক সেজে ব্রাহ্মণের জাতিনাশের চেষ্টা। আরে পাষণ্ড, ব্রহ্মতেজ কি সোজা তেজ। তোর সাধ্য কি যে, তুই ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে বিনাশ কর্ত্তে পারিস্?" তার পর তিনি তর্জ্জনি হেলাইয়া শাসাইয়া বলিলেন,—"দেখে নেব—দেখে নেব—তোর জোচ্চোরীর স্পর্দ্ধা কতদূর। মামলা কর্‌ব—এর জন্যে আমি মামলা কর্‌ব। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি—কেষ্ট রায় কেমন লোক। বাছা, ঘু ঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখনি। এবারে দেখিয়ে দেব।"

বরের হাত ধরিয়া বরকর্ত্তা চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রী আদিও অন্তর্হিত হইল।

যেখানে বিবাহ মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল, তাহারই এক পাশে মোহিনী নীরবে নত-মস্তকে বসিয়া ছিল। পুরোহিত নিবারণ চক্রবর্ত্তী তাহার নিকটস্থ হইয়া সহানুভূতির স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ভাব্‌লে কি আর হবে? এক কাজ যদি কর্ত্তে পার, তাহলে দুই কুলই রক্ষা হয়। রাত্রি তিনটার পর একটা লগ্ন আছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও উপায় কর্ত্তে পার?" এই বলিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে মোহিনীর মুখের পানে চাহিলেন।

উদাসনেত্রযুগল তুলিয়া হতাশ-মিশ্রিত স্বরে মোহিনী বলিল,—"কি বল্‌ছেন আপনি? এর আর নূতন উপায় কি হতে পারে? এই এত রাত্রে বরের খোঁজ কোথায় কর্‌ব? কাকেই বা এখানে চিনি বলুন? আমরা তো এখানে পরিচিত নই।"

"বরের খোঁজ আমিই দিচ্ছি। এখানকার চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবের কুঠীতে একটি ছোক্‌রা প্রায় বছর খানেক হোল আছে। শুনেছি, তার আপনার বল্‌তে এখন আর কেউ নেই। যতদূর জানি, ছেলেটি বেশ ভাল, বড় শান্ত স্বভাব, তার অমায়িক ব্যবহারে আমরা সকলেই তাকে বড় ভালবাসি। আমার স্ত্রী-তো তাকে তাঁর নিজের ছেলের মতই স্নেহের চক্ষে দেখেন। আমার ছেলে নগুর সে বন্ধু কি-না। তা আমার বিশ্বাস—আমরা গিয়ে তাকে তেমন করে ধরে পড়লে হয় ত সে বিবাহে স্বীকার হ'তেও পারে।"

আঁধারে ক্ষণিক আলোক-রেখা পাতের মতন মোহিনীর মনে আশার আলোক দেখা দিল। সে বৃদ্ধ পুরোহিতের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল,—"আমাদের এমন বিপদের দিনে যদি আপনি আমাদের এমন উপকার করেন, তবে সারা জীবন আমরা আপনার কাছে বিক্রীত হইয়া থাকিব!"

মোহিনীর ঐরূপ আকুলতায় পুরোহিত কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পা হইতে তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শান্ত ধীর স্বরে বলিলেন,—"আহা! কি কর—কি কর বাছা! আমার সাধ্যই বা কতটুকু আছে বল। তবে একবার চেষ্টা করে দেখে, মনের উদ্বেগ দূর করা বৈ ত নয়। তা হ'লে চল। সময় গত হয়ে যাচ্ছে।"

"একবার জিজ্ঞাসা না করে"—

তাহার কথায় বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন,—"তাঁর কি এখন মাথার ঠিক আছে? কোনও কিছু সুবিধে কর্ত্তে পার্‌লে তখন তো তিনি সমস্তই জান্‌তে পার্‌বেন।"

মোহিনী তাঁহার বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কম্পিত পদদ্বয়কে কোনও মতে টানিয়া লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

(৫)

"অমলা চোখ চাও—দেখ। সত্যই তুমি এত অল্প দিনেই ভুলে গেলে?"

স্বামীর বক্ষ মধ্যে মুখ লুকাইয়া অমলা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ও গো সত্যই কি তুমি আমায় উদ্ধার কর্ত্তে, জীবনের পর-পার থেকে ফিরে এসেছ? এখনও যে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"হাঁ—পর-পার থেকে ফেরাই বটে। নৌকা-ডুবির পর আমার জীবনদাতা এই সাহেব, জলের উপর আমার মৃতপ্রায় দেহ দেখে, তাঁর ষ্টীমারে তুলে নেন। সাধ্যাতীত পরিশ্রমে ও যত্নে তিনিই আমার জীবনদান করেন। তাঁর কাছে মাস দুই থাকিবার পর যখন পূর্ব্বস্বাস্থ্য ও বল ফিরিয়া পাইলাম, তখন দেশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য মন বড় আকুল হইয়া উঠিল। বাড়ী গিয়া দেখিলাম, কোথায় আমার বাড়ী।—শুধু শ্মশানের বিভীষিকায় সে স্থান পূর্ণ। বাবা আমার বিবাহে তাঁর আত্মীয়-কুটুম্ব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বরযাত্রী, বাজনাওয়ালা ও অন্যান্য লোক-জনে প্রায় সাত আট শত লোক নৌকায় আমার সঙ্গে রওনা হইয়াছিল। কথা ছিল, গাড়ীতে আমাদিগকে তুলিয়া দিয়া অন্যান্য সকলেই বাড়ী ফিরিবে। আমরা বাহির হইবার ৩।৪ ঘণ্টা পরেই এই বিপদ। বোধ হয় আমি ছাড়া আর কেহই বাঁচিতে পারেন নাই। আমার যে মা নাই, তাহা তো জানই। বাবাও এই ভাবে অপঘাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। আপনার বলিতে যখন সংসারে আমার আর কেউ নাই, তখন এক রকম পাগলের মতনই এখানে আমার সেই প্রাণদাতা সাহেবের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইত—তোমাদের ওখানে যাই; কিন্তু সাহস পাই নাই। তুমি যে আমারই আছ, অমলা, তা ত বিশ্বাস হয়-নি? যাক্! এই নিরানন্দময় জীবন যাপন করিব বলিয়া, রাজার মত ঐশ্বর্য্য-বাড়ী ঘর সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কে জানিত তখন যে, এই আসামের জঙ্গলে আবার তোমায় ফিরিয়া পাব?"

আবেগ-কম্পিত স্বরে অমলা বলিয়া উঠিল,—"এ যে, আমাদের আশার অতীত! ভগবানের অশেষ করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।" দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ রক্তিম-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নবদম্পতি করযোড়ে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আবাহন।

[শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত।]

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
এখন তোমরা কোথা'?
মধুর মধুর আঘাত করগো আমার হৃদয়-দ্বারে।
আগল ঘুচায়ে পাগল করগো ডাকি তোমা বারেবারে।
সংজ্ঞাশূন্য ক্ষীণচিত্তে,
শান্তির সিত-সলিলে দিতে,
এসগো তোমরা এসগো বারেক এসগো পূজারিবৃন্দ।
আমি প্রেমের দর্ভে অর্ঘ্য সাজায়ে দিবগো সাধক ইন্দ্র।

দিব ত্যাগ-ধূপধূনা
প্রীতি-চন্দনচূয়া,
শঙ্খের ধ্বনি করুণ-আহ্বান লভিব অমিয়া হর্ষ,
দিব নৈবেদ্য—রূপ রস আর শব্দ গন্ধ স্পর্শ।
শত-ঝঞ্ঝার ঘায়,
পরাণ ভাঙ্গিয়া যায়,
এমন তুফান ঠিক রাখে হালে কে আছে এমন অন্য?
ওগো উপাসক তথাগতে জনে করগো আজিকে ধন্য॥

বিষাদিনী।

(কবিবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের রচিত।)

(১)

একি আজি দেখিতেছি সরসী সুন্দরী—
নিদারুণ তোমার এ বেশ অপরূপ!
কে ছিঁড়িল কুসুমিত হিরণ্যবল্লরী,
কে দলিল পদতলে এ কমল-স্তূপ।
পূর্ণশশী পরি ভালে,
এই যে হাসিতেছিল বসন্ত যামিনী,—
নয়ন না পালটিতে,
কে আনিল বল দেবি, অমা-তমস্বিনী!

(২)

নহে বহু দিন গত দেখেছিনু হায়,
পূর্ণচন্দ্রনিভ ফুল্ল বদনে তোমার,
কি স্বর্গ-লাবণ্য ঝরে স্নাত-চন্দ্রিমায়,
মৃদুস্মিতে উদ্ভাসিত মাধুরী-সম্ভার!
দেখেছিনু স্নেহমুখ,
লজ্জাকণে আরক্তিম অনিন্দ্য সুন্দর,
কমনীয় কলেবরে,
কি স্বর্গ-পবিত্র বিভা ঝরে নিরন্তর!

(৩)

দেখেছিনু কমনীয় কণ্ঠ সুকুমার,
সুললিত ভুজবল্লী হিরণ্যে উজ্জ্বল,
ফুলহারে বদ্ধ কাল-কুন্তলের ভার,
অলকান্তে সিন্দূরের রেখা নিরমল।
অলক্ত অমল-রাশি,
করিয়াছে রক্তিমাভ চরণযুগল,
বিচিত্র বরণ বাসে
আবরিত মনোহর তনু সুকোমল।

(৪)

আজি কোন্ নিদারুণ পাষাণ নির্ম্মম,
সে অমরী ফুল্লরূপ করিল সংহার?
দেহ হ'তে হেমরাশি করি উন্মোচন,
কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নিল সুবর্ণের হার!
কে নির্ম্মম করে আজি
ফুলহারে বদ্ধবেণী নির্দ্দয়ে খুলিয়া,
জনমের মত তব,
অদমিত কেশভার দিল এলাইয়া!

(৫)

কে মুছিয়া দিল আজি
সে সিন্দূর বর রেখা ললাটে তোমার।
আয়তির নিদর্শন, শত খণ্ড করি,
মুছিল চরণতলে অনন্তের ধার।
বিচিত্র রঞ্জিত বাস
ও অনিন্দ্য দেহ হতে বলদর্পে হরি,
কে দিল গো জড়াইয়া
এ কঠিন শুভ্রবাস তব দেহ'পরি।

(৬)

হে বিধাতা! জগতে যে তুমি দয়াময়,
কি করিলে আজি দেব হইয়া নির্ম্মম?
সরলা বালিকা অই সারল্য নিলয়,
মানসের সুপবিত্র সরোজিনীসম।
কি ইষ্ট সাধিলে আজি
রূপে গুণে সুগন্ধিনী সে ফুল্লকমলে,
কি নিয়তি-নির্য্যাতনে,
ফেলিলে করিতে ভস্ম জলন্ত অনলে?

(৭)

চিতানলে পুড়ে নারী হয় ছারখার;
অনলে সে চারু দেহ ভস্মীভূত হয়;
নাহি থাকে নিদর্শন, অস্তিত্ব তাহার,
পুড়ে যায় সে অনিন্দ্য ছবি মনোময়।
কিন্তু আজি যে অনলে,
নিক্ষেপ ফেলিলে বিধি অই বালিকায়;
অভাগীর দুরদৃষ্টে,
থামিবে কি জ্বালা তার এ জীবনে হায়।

(৮)

সে অনল হ'তে কভু হবে কি নিস্তার?
সে যে বহ্নি নিদারুণ প্রচণ্ড প্রবল,
কাল-ফণী-জিহ্বা-সম শত শিখা তার;
মাথা তায় কাল-ফণী তীব্র হলাহল।
সেই কাল-ফণী-বিষ,
প্রবেশিয়া দেহান্তরে শিরায় শিরায়,
করিবে কালিমাময়
নবদুর্গা জিনি অই হেম প্রতিমায়।

(৯)

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী অই অভাগিনী,
নিদাঘের তারা সম পবিত্র নির্ম্মল,
জগতের পাপ-স্পর্শে নহে কলঙ্কিনী,
বালিকা-হৃদয় তার কত সুকোমল!
কিন্তু হায় কোন্ পাপে,
জন্মশোধ সুখ-সাধ ঘুচিল তাহার,
এ ফুল্ল যৌবনে হায়,
ক'রে দিলে জন্মশোধ আঁখিজল সার।

(১০)

হায়, অই অভাগীর জনমের তরে,
জগতের সুখসাধ সব অবসান;
আশাপূর্ণ বুক তার ভাঙ্গি স্তরে স্তরে,
মরমে জ্বলিল তার অনন্ত শ্মশান।
অই বঙ্গবিধবার,
যত দিন চিতা-ভূমে না পুড়িবে কায়,
ততদিন জ্বলিবে সে—
এই চির বৈধব্যের যম-যাতনায়।

(১১)

হায় অভাগিনী তার ও চাঁচর চুলে,
কাল-ফণী-পুচ্ছ বেণী বাঁধিবে না আর,
শোভিবে না সে কবরী দীপ্ত হেম-ফুলে,
খসিয়া পড়িবে পৃষ্ঠ করি অন্ধকার।
সুবাসিত গন্ধদ্রব্যে,
সিক্ত হয়ে যে চিকুর ছিল সুকোমল,
আজি সেই কেশদাম,
রুক্ষ শুষ্ক আলুথালু সমীরে চঞ্চল।

(১২)

বধিবারে পুরাকালে অসুর দুর্ব্বার,
দধীচি আপন অস্থি করিল প্রদান,
আহরিয়া দেবশিল্পী সে অস্থিসম্ভার,
নিদারুণ বজ্র তায় করিল নির্ম্মাণ।
যে বজ্রসম্পাতে হায়,
কঠিন পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ হয়ে যায়,
যেই বজ্রে পুরন্দর,
ভাঙ্গিল বৃত্রের শির শত খণ্ডে হায়।

(১৩)

হায় বিধি!—সেই বজ্র করিতে সম্পাত,
ছিলনা কি মেরুশৃঙ্গ অবনী-ভিতরে?
নাহি কি দানব বিশ্বে করিয়া আঘাত,
যে শির পারিতে তুমি চূর্ণ করিবারে।
সেই বজ্রসম্পাতের
উপযুক্ত পাত্র বুঝি অই অভাগিনী!
কঠিন ভূধরাধিক
পাইলে না দ্রব্য বুঝি খুঁজিয়া মেদিনী।

(১৪)

পোড়াইল বিধি যদি অদৃষ্ট তোমার,
কে রোধিবে বল দেবি, নিয়তির গতি!
খণ্ডিবারে নারে কেহ লিপি বিধাতার,
অদৃষ্ট-বন্ধনে জীব চিরবদ্ধ সতি!

পূর্ব্বজন্ম-মহাপাপে
জনমিলে নারীরূপে বঙ্গের মন্দিরে,
বৈধব্যের কত জ্বালা
জানে শুধু বঙ্গনারী—ভাসি অশ্রুনীরে।

(১৫)

পুণ্যবতী বঙ্গবালা বিদিত ভুবন,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী শান্তিস্বরূপিণী,
দয়া স্নেহ-করুণার সৃষ্টি অতুলন,
অন্নপূর্ণা দেবীরূপে গৃহ উজ্জ্বলিনী।
সেই বঙ্গবালা তুমি,
পুণ্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিধির সৃজনে,
সহিষ্ণুতাস্বরূপিণী,
চির সহ্য করিবারে এসেছ ভুবনে।

(১৬)

রমণী-হৃদয় স্নেহমমতার খনি ;
মাতৃস্তন্য মুখে ঝরে স্নেহ প্রস্রবণ,
সেই স্তন্য-সুধা-নীরে তুমি সুবদনী,
দয়া মায়া পুণ্য স্নেহ করেছ চয়ন।
সেই পুণ্যবতীরূপে,
ধৈর্য্যস্বরূপিণী হয়ে সিক্ত করুণায়,
ধরিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি
থাক তুমি বঙ্গগৃহে দেবী প্রতিভায়!

(১৭)

সাজিয়া ধবল বাসে ফুল্লযূথিসম,
খুলিয়া ও দেহ হ'তে হিরণ্য উজ্জ্বল,
পবিত্রতা চিরগন্ধ করি বিতরণ,
চিরপুণ্যময় কর বঙ্গগৃহতল।
ভক্তি-স্রোতে নিভাইয়া
অভিলাষ-কামনার জলন্ত অনল,
একাগ্র অনন্যমনে
পবিত্রতাময় কর পুণ্য হৃদিতল।

(১৮)

বঙ্গের বিধবা তুমি দেবী অমরার,
তোমার নয়নে ঝরে করুণা নির্ম্মল,
তোমার ও করতলে ঝরে সুধাধার,
পুণ্যস্পর্শে সঞ্জীবনী ঝরে অনিবার।
সেই পুণ্যস্পর্শে তব
রোগতপ্ত মৃতপ্রায় হবে নিরাময়,
রোগে শোকে পরিতাপে,
ঢালিবে সে ক্লিষ্ট প্রাণে অমৃতনিচয়।

(১৯)

বঙ্গগৃহে তুমি স্নেহ-করুণার রাণী ;
পালয়িত্রী রূপ তব বঙ্গগৃহান্তরে ;
ক্ষুধার্ত্তে আহার্য্য দাও করি মুক্ত পাণি,
সংসারে সৌষ্ঠব হাসে তব পুণ্য করে।
ধর্ম্মকর্ম্মে বঙ্গগৃহে
তুমি দেবী চিরদিন ধর্ম্মসহায়িনী;
তোমাদের পুণ্যস্পর্শে,
আজি দেখ বঙ্গভূমি পুণ্যগরবিনী।

(২০)

পুণ্যস্নাত পট্টবস্ত্রে কি রূপ তোমার—
দাও যবে পুষ্পাঞ্জলি দেবতার পায়!
তোমার সে দেবীরূপ পবিত্রতাধার,
তেজোদৃপ্ত পুণ্য-দেহ হাসে মহিমায়।
সে পবিত্র অর্চ্চনায়,
আপনি দেবতা আসি লন অর্ঘ্য তায় ;
বাসনা-কামনা-হীন,
একাগ্র যে উপাসনা বঙ্গ-বিধবার!

(২১)

সে বঙ্গবিধবা তুমি এক মনে হায়,
উপাসনা কর নিত্য পতি দেবতায়,
নিয়োজিত কর মন সেই শুশ্রূষায়,
ছায়ারূপে পতি সঙ্গে থাকিবে তোমার।
এ জনমে পারিলে না
পূজিতে সাকারে সেই দেবতা-চরণ,
পরজন্মে কিন্তু দেবী
পতিপ্রেম-ব্রত তব হবে উদযাপন।

(২২)

পরিয়া ধবল বাস শুভ্র সেফালিকা সম,
বৈধব্যের পুণ্য-শোভা কর আজি উন্মেষণ।
ছিলে তুমি মণি-মুক্তা-হিরণ্যে খচিত হয়ে,
শুভ্র পুণ্যরূপে আজি দাঁড়াও এ বঙ্গালয়ে।
পুণ্য-স্রোতে চারিদিক কর দেবী বিপ্লাবন,
দুঃখী দীন পীড়িতার্ত্তে কর স্নেহ বিতরণ।
কমল কেসর সম অমল ধবল রূপে,
জিনিয়া ধবল ভাতি হিমকুন্দ যূথিস্তূপে,
ব'স দেবি, বঙ্গগৃহে স্নেহ-দয়া মূর্ত্তিমতী,
ত্রিদিবে হইবে তৃপ্ত তব প্রেমময় পতি।

বেদ-চতুষ্পাঠী।

বঙ্গদেশে বেদ বিদ্যার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা এককপ লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষৎ' (বোর্ড) বেদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও অধুনা বেদের পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাবে বেদবিদ্যার প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য তাহাতে সাধিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ বেদের কদর্থই তাহাতে বিস্তৃত ও প্রচারিত হইয়া পড়িতেছে।

নবদ্বীপ—অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যা-পীঠ বলিয়া পরিচিত। এমন একদিন ছিল—যখন নবদ্বীপ-সমাজের দ্বারা বঙ্গদেশে পরিচালিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন নবদ্বীপে বেদের একটী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত নাই,—কোনও চতুষ্পাঠীতে যথারীতি বেদ পড়ান হয় কি না—তাহাও সন্দেহ। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণও, ন্যায়-শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থান বলিয়া, ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই নবদ্বীপের গৌরব-বর্দ্ধনের প্রয়াস পান। তাই বেদ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠার প্রতি এতদিন তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই।

এক্ষণে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের চেষ্টায়, নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে যেন একটা জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে। নবদ্বীপকে কেন্দ্রমধ্যে গণ্য করিয়া যাহাতে নবদ্বীপে বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় তাহার জন্য স্বতঃ-পরতঃ চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার সেই চেষ্টার ফলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী অনেকেই তাঁহার সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষণে সম্মত হইয়াছেন। নবদ্বীপের মহারাজ বাহাদুর তাঁহাদের সহায় হইবেন—স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, শীঘ্রই নবদ্বীপে বেদ-চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় এবং 'সাহিত্য-সংবাদের' সম্পাদক মহাশয়, এতদুদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। ভরসা হয়, এক শুভ-দিন পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছে,—যেদিন নবদ্বীপে বেদ-চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়া বঙ্গে বেদ-বিদ্যা-আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। বেদপুরুষ আশীর্ব্বাদ করুন,—সঙ্কল্প জয়যুক্ত হউক। নবদ্বীপের যে সকল পণ্ডিত ও সহৃদয় ব্যক্তি এ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পূর্ব্বেই 'সাহিত্য-সংবাদে' প্রকাশিত হইয়াছে। এখন হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ সহায়তার বিষয় প্রতি মাসের 'সাহিত্য-সংবাদে' প্রকাশিত হইবে।

তোমার দান।

[শ্রীযুক্ত দীনেনাথ মজুমদার এম-এ বিরচিত।]

তুমি মোরে সাজায়েছ কবি।
হে কিশোরি। চাহনি-পরশে খুলি ভাবের ভাণ্ডার
ফুটায়েছ কত কোকনদ, কল্পনার কাঞ্চি পঞ্চনদ
পরায়েছ, শীতলিতে হৃদি মরু, তৃষা সাহারার।
ওগো প্রেম-অলকার ছবি, তুমি মোরে করিয়াছ কবি।
তুমি মোর কণ্ঠ-শতদল,
তব ক্ষীণা কটির পরশ-ফুল্ল চূর্ণিত-কুন্তল,
লীলায়িত বক্ষবেদী'পরে রচিয়াছে হৃদয়-কন্দরে,
ভাষা-উৎস, অমল তরল ধারা সুধা সুবিমল ;—
সঞ্জীবনী-প্রেম-ভৃঙ্গ-জলে, শোভিয়াছ কাব্যশতদলে।
সাজাইলে তুমি কবি সাজে,
হে কিশোরি। চঞ্চল-চরণ-গতি কঙ্কণ-নিক্কণে
শিখায়েছ ছন্দঃ যতি তান, রাগ কলা তাল লয় মান,
ওগো তব নগ্ন-দেহ—সুষমার নিত্য আভরণে,
ভাষা মোর গরবিয়া রাজে, (মোরে) সাজাইলে তুমি কবি সাজে।

দেহ।

[শ্রীগণপতি সরকার মহাশয়ের রচিত।]

ফুরাইল খেলা-ধূলা, ঘুচে গেল ভব-জ্বালা,
নশ্বর শরীর সুধু রহিল রে পড়িয়া,
প্রাণ-পাখী উড়ে গেছে, খাঁচাটি পড়িয়া আছে,
সাধের এ বাসা গেল কেমনে সে ভুলিয়া।
ছিল যে যতন কত, কত মতে সাজাইত,
কত ভীত হইত গো পাছে কেহ পরশে,
এখন কি দশা তার, কেহ ত না রোধে আর,
সেই ত সকলি আছে—কে রোধিবে সারোষে।
সেই নাসা সে নয়ন, সে ললাট সে আনন,
সকলি তেমন আছে—নাহি সুধু চেতনা,
সকলি সমান আছে, সুধু জ্যোতিঃ ভেসে গেছে,
কালিমা মাখিয়া দেছে স্বর্ণকায়ে দেখনা।

হায়রে সকলি ফাঁকি, যাহা লয়ে মাখামাখি,
সেই দেহে হায় হায় নাহি কিছু গরিমা,
উড়িলে পরাণ-পাখী, কেহ না ফিরায় আঁখি,
জ্বালায়ে করয়ে ছাই এই সুধু মহিমা।
চেতনে এ দেহ লয়ে, রঙ্গরসে মত্ত হ'য়ে,
সৌন্দর্য্যের জাঁক ভবে কেন করে সকলে।
রূপেতে তুলনা নাই, কত দেহ হায় হায়,
শ্মশানে আনিত হের—ছাই হবে অনলে।
শেষ দশা এই যার, গুমোর খাটে না তার,
গরব করিতে পারে সুধু দেখি চেতনা;
যার জোরে জারিজুরি, তার প্রেম কোথা করি,
লালসা ত দেহ'পরি—মরি শুধু যাতনা॥

'গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজ।'

হাওড়া-শালকিয়ার "গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত সমাজ" নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন। বিশুদ্ধ-সঙ্গীতাদির চর্চ্চায় তাঁহারা স্থানীয় যুবকবৃন্দের চিত্তকে বিশুদ্ধ আনন্দের দিকে আকৃষ্ট রাখেন; সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির স্পৃহা পরিবর্দ্ধিত করেন, অধিকন্তু প্রতিমাসে পূর্ণিমার দিন বাঙ্গালার বিশিষ্ট-সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করিয়া সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার ও উপদেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদিকে আবার, দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্যও এই সমাজের প্রচেষ্টার অবধি নাই। তাঁহারা সময় সময় সঙ্গীতাভিনয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া নানা সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সমাজের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের মধ্যে কয়েক জন কর্ম্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—এই সমাজের প্রাণস্থানীয়। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস (সাহিত্য-বিভাগের সহকারী সভাপতি) মহাশয়—এই সমাজের সাহিত্যালোচনার পথে উদ্দীপনার বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রবাহিত করিবার চেষ্টায় আছেন। সমাজের সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজকে শৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য স্বতপরতঃ যত্নবান রহিয়াছেন। এদিকে প্রবীণ বিজ্ঞ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সমাজের সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি-রূপে এবং হাওড়ার সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহশীল শ্রীযুক্ত দেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় সাধারণ-বিভাগের সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমাজের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। গত মাসে এই সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। বঙ্গমাতার সুসন্তান অনারেবল জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী কে-টি মহোদয় সেদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেদিন সমাজের সদস্যগণের কর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এ সমাজের আদর্শ যে অনুসরণীয়, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এরূপ সমাজের সেবায় যাঁহারা মুক্তপ্রাণ, তাঁহাদের কার্য্যের বিষয় আমাদিগকে জানাইলে, অন্যের অনুকরণের জন্য, আমরা তাঁহাদিগের সেই সকল সুকার্য্যের বিষয় 'সাহিত্য-সংবাদে' প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক আছি।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, দশম ও একাদশ সংখ্যা।] [বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।

শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বে ৩ মম॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমার শ্রেষ্ঠ-অঙ্গে সূক্ষ্ম-দেহে মঙ্গল হউক, আমার নিকৃষ্ট-অঙ্গে অর্থাৎ মেদমাংসবিশিষ্ট এই দেহে মঙ্গল হউক, আমার চতুরঙ্গে অর্থাৎ কর্ম্মাকর্ম্মহেতুভূত চতুর্ব্বিধ দেহ-ধারণে মঙ্গল হউক, আমার স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সকল প্রকার শরীরে মঙ্গল (সুখ) হউক।

কর্ম্মের বন্ধন।

বন্ধনই দুঃখ। বন্ধন-মোচনেই সুখ। বিবিধ কর্ম্মে বিভিন্ন অঙ্গকে বিবিধ প্রকারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কর্ম্মের দ্বারা যেমন শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ মস্তক আবদ্ধ হয়, কর্ম্মের দ্বারা সেইরূপ নিম্ন-অঙ্গ হস্ত-পদাদিও আবদ্ধ হইয়া থাকে। স্থূল-শরীর সম্বন্ধে যে ভাব, সূক্ষ্ম-শরীর সম্বন্ধেও সেই ভাব। কর্ম্মের দ্বারা স্থূল-শরীর যেমন আবদ্ধ হয়, কর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীরও সেইরূপ আবদ্ধ হইয়া থাকে।

বন্ধন ছেদনে।

কর্ম্ম যেমন বন্ধনের মূল হয়, কর্ম্ম আবার সেইরূপ বন্ধন-ছেদনেরও কারণ হইতে পারে। দেহের মঙ্গল বা সুখ হয় কখন? যখন জরার বন্ধন হইতে দেহ বিমুক্ত হইতে পারে! মস্তকের মঙ্গল বা সুখ হয় হয় কখন? মস্তক যখন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত না হয়। স্থূল দেহের সকল অঙ্গ-সম্পর্কেই এই ভাব গ্রহণ করা যায়। সূক্ষ্ম-দেহও ঐরূপ বন্ধনের বা ব্যাধির অধীন। কিন্তু কর্ম্মই আবার ঐরূপ ব্যাধি-নাশের ও বন্ধন-ছেদনের কারণ হইতে পারে।

কর্ম্মে—করুণা।

ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্ম্মই, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মই বল—আর অন্য যে নামেই অভিহিত কর, বন্ধন-ছেদনের অস্ত্রস্থানীয় হয়। তবে সে পক্ষে ভগবানের করুণা চাই, পরন্তু সে পক্ষে আত্মোদ্বোধনাও আবশ্যক। যদি ভগবান করুণা করেন, মঙ্গল সাধিত হয়। যদি হৃদয়ে উদ্বোধনা আসে, সে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ভগবৎ-কর্ম্মে আমি যদি দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা করি, আর সেই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ কর্ম্ম যদি করিতে পারি, তাহাতেই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন-না, সেই কর্ম্মই তখন ভগবানের করুণা মূলক হইয়া আসে। করুণার প্রার্থী হইয়া তাঁহার কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহাই মঙ্গলহেতুভূত। তাঁহার কর্ম্মই তাঁহার করুণা-লাভ।

শ্রেয়ঃসাধক প্রার্থনা।

স্থূল-শরীর ও সূক্ষ্ম-শরীর দুই দেহে জীবাত্মা কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ করে। কর্ম্মাকর্ম্ম-হেতুই জীবকে চতুর্ব্বিধ দেহ (চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ) ধারণ করিতে হয়। সেই চতুর্ব্বিধ দেহের জরায়ুজ ও অণ্ডজ—এই দুই দেহ, যোনিজের অন্তর্ভূত; এবং স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই দুই দেহ, অযোনিজের অন্তর্ভূত। তাই ঐ প্রার্থনানুরূপ কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয়,—'কর্ম্মফলে যদি ঐ চতুর্ব্বিধ দেহের মধ্য দিয়া গতাগতি করিতে বাধ্য হই, সে অবস্থায়ও যেন শান্তি পাই। কিবা আমার স্থূল-শরীর কিবা আমার সূক্ষ্ম-শরীর উভয় শরীর যেন শান্তি পায়।' এইরূপ প্রার্থনা—এইরূপ কর্ম্মই মানুষের শ্রেয়ঃসাধক। শীর্ষোক্ত মন্ত্র সেই প্রার্থনায়ই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

হোরি।

[শ্রীমতী লীলা দেবী বিরচিত।

সুন্দর সুন্দর শ্যামল সুন্দর
নীল-বরণ কলেবর।
চন্দন-চর্চ্চিত কুঙ্কুম-রঞ্জিত
হোরি খেলত নটবর॥
ফাগুন আগুন লাগল দারুণ
লাল ভইল উপবন।
অন্তরে অন্তরে রক্তিম রক্তিম
প্রেম উথলে অনুখণ॥
বল্লভ দুর্ল্লভ মাধব মুরারী
কেলি করত নীর তীর।
ফুকারত বংশী মৃদু মৃদু হাসি
নারী রাহতে নারে ধীর॥
বিহ্বল কুন্তল বসন অঞ্চল
ভূমে লুটতি, দেহ সারি—
আনন্দ-কম্পিত শোভন-নন্দিত
হোরি খেলন অভিসারী॥
কুরঙ্গ-নয়নে রঙ্গন-ভঙ্গে
মৃদুমধুর হাসিরাশি।
ছিপত মুঠীমে আবীর যতনে
চুঁড়ি শ্যামকো দশি দিশি॥
শ্যামল তৃণদল শ্যাম যমুনা-জল
লাল আবীর ভই অঙ্গে।
সুনীল অম্বর কৃষ্ণকো কলেবর
সব ভইল লাল সঙ্গে॥
হোরি হোরি হোরি খেলে বংশীধারী
ফাগে ছাইল ত্রিভুবন।
আগুন ফাগুন লাগল দারুণ
লাল ভইল উপবন॥

"বেদ" ও তাহার ব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

নবম প্রবন্ধ।

বেদ—দর্পণস্বরূপ। যাঁহার যেমন গঠন—যেমন প্রকৃতি, বেদ-রূপ দর্পণে তাহাই প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণের গবেষণার ফলে বেদের যে বিভিন্নরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে, তাহারও কারণ আর অন্য কিছুই নহে। সে কারণ এই যে, যাঁহার যেমন চিন্তা, যাঁহার যেমন ভাবপ্রবাহ, যেমন অবস্থার ও সংসর্গের মধ্যে যিনি কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার সেই চিন্তা, সেই ভাব, সেই সকল পরিপার্শ্বিক প্রভাব, তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। তাই, মানুষের যেমন বিভিন্ন রীতি-প্রকৃতি, বেদের ব্যাখ্যাও সেইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। শব্দপ্রাণ বেদ—সকল ভাবই প্রকাশ করে।

তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ভ্রম বা অসত্য কখনও অব্যাহত থাকে না। যিনি যেরূপ রীতি-প্রকৃতি লইয়া যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, ভ্রম-প্রমাদ ঘটিলে বা অসত্য হইলে, কখনই তিনি তাঁহার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিতে পারিবেন না। প্রমাদ বা অসত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। যাঁহারা অহিন্দু যাঁহারা বিধর্ম্মী, অথবা যাঁহারা বেদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা তো আপনাদের অসত্য মতকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন,—বেদকেই অসত্য বলিয়া বাহাদুরী লইবেন। কিন্তু যাঁহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা বেদ মান্য করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যদি একটু ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

মনুষ্য-মাত্রই প্রমাদের অধীন। অতএব, আমরা যে বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাও যে সর্ব্বথা প্রমাদ-পরিশূন্য হইবে—স্পর্দ্ধা করিয়া তাহা বলিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যাঁহারা বেদকে বেদ-জ্ঞানে বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষণার জন্য যাঁহারা বেদমার্গ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই এই ব্যাখ্যার মধ্যে সত্যতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন।

সত্যই বা কি, আর অসত্যই বা কি, তাহা জানিতে বা বুঝিতে বিশেষ আয়াস-স্বীকার করিতে হয় না। সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, ত্রুটিসন্ধিৎসু না হইয়া, যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, সত্য নিশ্চয়ই তাঁহাদের অধিগত হইবে। সেইরূপ বুদ্ধিতে যাঁহারা আমাদের ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের ব্যাখ্যা—সঙ্গত কি অসঙ্গত?

নিম্নে একটী ঋক্ এবং তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রকাশ করিতেছি। ধীরস্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখুন,—উহার কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত?

ঋক্‌টী এই :—

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।

প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা॥

ঋক্‌টীর সায়ণভাষ্য, প্রচলিত বঙ্গানুবাদ, এবং ব্যাখ্যাকারগণের মন্তব্য; যথা,—

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যেন নৃতেন রহিতাবশ্বিনা। অশ্বিদেবৌ। যুবাং ত্রিভিরেকাদশৈঃ। যে দেবাসো দিবৈকাদশ স্থেত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতৈস্ত্রিসংখ্যাকৈরেকাদশাত্মকবর্গত্রয়গতৈর্দ্দেবৈঃ সহ মধুপেয়ং সোমাত্মকং মধুরদ্রব্যপানমভিলক্ষ্যেহাস্মিন্ দেবযজনদেশ আয়াতং আগচ্ছতং। আয়ুরস্মদীয়মায়ুষ্ট্বং প্রতারিষ্টং। প্রবর্দ্ধয়তং। অপাংস্যস্মদীয়ানি পাপানি নির্ম্মৃক্ষতং। নিঃশেষেণ শোধয়তং। দ্বেষো দ্বেষকর্ত্তৄন সেধতং। প্রতিসেধতং। সচাভুবা। অস্মাভিঃ সহাবস্থিতৌ ভবতং॥

প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

এই ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা,—

(১) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতার সহিত মধুর সোমপান করিতে এই যজ্ঞস্থানে আগমন করুন, আমাদিগের আয়ু বৃদ্ধি করুন, আমাদিগের পাপ শোধন করুন, এবং দ্বেষকারক রিপুগণকে নিবারণ করুন ও আমাদিগের সহিত সহায়রূপে স্থিতি করুন।" (২) "হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়। ত্রিগুণ একাদশ দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস, আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধন কর, পাপ খণ্ডন কর, বিদ্বেষীদিগকে প্রতিষেধ কর, আমাদিগের সঙ্গে অবস্থান কর।"

ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত।

এই ঋকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণ পদ—'ত্রিভিরেকাদশৈঃ'। ব্যাখ্যাকারগণ নানাদিক হইতে নানাভাবে ঐ পদের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মত এই যে, 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের অর্থ— ত্রিগুণিতৈঃ একাদশসংখ্যাকৈঃ' অর্থাৎ তেত্রিশ। সায়ণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, ঐ পদে যে ত্রেত্রিশ সংখ্যক দেবতার বিষয় বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের একাদশ দেবতা ভূলোকে, একাদশ দেবতা দ্যুলোকে এবং একাদশ দেবতা অন্তরীক্ষলোকে অবস্থিতি করেন। ত্রিলোকের সেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাই ঐ মন্ত্রাংশের প্রতিপাদ্য। ফলতঃ 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদে তেত্রিশ দেবতার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং সোমরস পানের জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই সাধারণ মত।

এই উপলক্ষ্যে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে,—'আগে হিন্দুর দেবতা এক ছিল, তার পর তিন হয়, ক্রমশঃ তেত্রিশ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে এখন আবার তেত্রিশ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে, শেষে তাহাতেও কুলাইতেছে না।'

আমাদের অর্থ।

এক্ষণে ঐ ঋগ্মন্ত্রে আমরা কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করি, আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রথমে সে পরিচয় গ্রহণ করুন। পরে বিশদার্থ আলোচনায় "আমাদের বক্তব্য" মধ্যে অপর সকল প্রকার তত্ত্বই অবগত হইতে পারিবেন।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংশ্রবরহিতৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিভিঃ' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতৈঃ) 'একাদশৈঃ' (অভিন্নভাবাপন্নৈঃ) 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ, দেবভাবৈঃ সহ) 'মধুপেয়ং' (মধুরভাবগ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং হৃদয়রূপযজ্ঞক্ষেত্রে) 'আ যাতং' (আগচ্ছতং); 'আয়ুঃ' (অস্মদীয়ং আয়ুষ্যং), 'প্রতারিষ্টং' (প্রবর্দ্ধয়তং); 'অপাংসি' (অস্মদীয়ানি পাপানি) 'নিঃ মৃক্ষতং' (নিঃশেষেণ মোচয়তং, নাশয়তং), 'দ্বেষঃ' (দ্বেষকর্ত্তৄন্, শত্রূন রিপূন্) 'সেধতং' (প্রতিষেধতং, নিবারয়তং, দময়তং); 'সচাভুবা' (সচাভুবৌ, অস্মাভিঃ সহ চিরাবস্থিতৌ) 'ভবতং' (স্তং)। হে দেবৌ! গুণসাম্যবিধায়কৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবভাবৈঃ সহ অস্মাকং হৃদয়ং অধিতিষ্ঠিতং, সর্ব্ববিধং কল্যাণং সাধয়তং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অসৎসংশ্রবরহিত, অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিগুণসাম্য-সাধনভূত অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণের (দেবভাবের) সহিত আমাদের এই হৃদয়-রূপ-যজ্ঞ-ক্ষেত্রে ভক্তিসুধাপানের জন্য আগমন করুন, আমাদিগের আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করুন; আমাদিগের পাপক্লেদসমূহকে সর্ব্বতোভাবে নাশ করুন, আমাদিগের প্রতি হিংসাকারী রিপু-শত্রুগণকে দমন করুন, এবং আপনারা আমাদিগের সহিত চির-অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হইয়া থাকুন। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)॥

আমাদের বক্তব্য।

এইখানে প্রথমে একটা রহস্যের কথা বলি। হিন্দুরা যে বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক—ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হয়; বলা হয়,—'হিন্দুরা এখন এক ঈশ্বর মানেন না। বেদের আদি-অংশে তাঁহারা এক ঈশ্বরই জানিতেন। ক্রমে তিন হয়,

তেত্রিশ হয়, শেষে তেত্রিশ কোটীতে দাঁড়ায়।' ঐ শ্রেণীর লোকেরাই আবার বলেন,—'বেদ অসভ্য আদিম অবস্থার চিত্র, তখন মানবজাতির পূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই।' এই যে দুইটী বিপরীত বিসদৃশ উক্তি, একটু চিন্তা করিলেই উহার অসারত্ব বুঝা যায়। বেদ-বিরোধিগণের ঐ দুই উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়,—'হিন্দুসমাজ প্রথমে জ্ঞানগুণে গরীয়ান্ ছিল, এখন ক্রমশঃ তাহাদের অধঃপতন হইতেছে। পরমেশ্বর এক অভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বে যে তাঁহাদের ধারণা ছিল, এখন অসংখ্য অগণ্য-রূপে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার লক্ষণ কোন্‌টী? একেশ্বর-বাদ—না বহু দেবদেবীর কল্পনা?' যিনি যে পক্ষ হইতেই বিতর্ক উপস্থিত করিবেন, এ প্রসঙ্গে তাঁহারই পরাজয় হইবে। যদি বলেন—'একেশ্বর-বাদ প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুর সেই সভ্য সমুন্নত অবস্থার নিদর্শন'; আর, তার পর যদি বলেন—'সমাজ দিন দিন উন্নত ও সভ্য হইতেছে'; তাহার উত্তর—'ক্রমশঃ এক হইতে তিন, তিন হইতে তেত্রিশ এবং পরিশেষে তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনাই সে যুক্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে।'

এ ক্ষেত্রে আর একটা সূক্ষ্ম কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সকল কালে সকল অবস্থাতেই সকল ভাব সংসারে বিদ্যমান্ আছে। কোনও সময় কোনও লোকসমাজে কোনও ভাব সুপ্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, আবার কোনও সময় কোনও লোকসমাজে সেই ভাব জাগ্রৎ বা প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারের ইহাই চিরন্তন বিধি। সৃষ্টির মধ্যে নূতন কিছুই নাই। সকলেই সেই পুরাতন—সনাতনের অভিব্যক্তি মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেই বৃক্ষই আবার ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া, পরিশেষে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া, কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। ভাব-সম্পদও সংসারে এইরূপে বিচরণ করিতেছে। কোথাও এক ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, কোথাও সে ভাব লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ভাবের অঙ্কুর উদ্গত দেখিতেছি; কোথাও তাহা ফুল-ফলে শোভমান পূর্ণস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্য-জীবনে বিবিধ অবস্থায় সেই ভাবের ক্রীড়া চলিয়াছে। যাঁহার যেমন কর্ম্ম, যদ্রূপ শিক্ষা, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইতেছেন। যাঁহাতে যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু উন্নতস্তরে উপনীত হইতে পারিতেছেন। সকল কালেই সকল মনুষ্যসমাজেই সকল ভাবেরই উন্মেষের ও বিকাশের অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাই, একেশ্বরবাদও যে কালে যে সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে দেখিতে পাই, সেই কালে সেই সমাজেই আবার বহু-ঈশ্বরের (অসংখ্য দেবতার) আরাধনা-উপাসনাও প্রবর্ত্তিত আছে দেখি। বেদও আমাদিগকে সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। কেবল তোমার বা আমার দুই এক জনের শিক্ষার উপযোগী সামগ্রীই যে বেদে আছে, তাহা মনে করিও না। নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীর গতিমুক্তির পথ—বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী, পরমজ্ঞানী সকলেই যাহাতে আকাঙ্ক্ষানুরূপ শুভফল প্রাপ্ত হন, বেদরূপ কল্পবৃক্ষে তেমন ফলই স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিতে সে বিভিন্ন ফল পরিলক্ষিত হয়। যিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি দেখিতে পান যে, সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সকল ফলই, স্তরে স্তরে বেদরূপ কল্প-বৃক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাউক। যাহা বলিতেছিলাম, সেই কথাই বলিতেছে। এক একটী বিষয়কে বা ভাবকে নানাদিক হইতে নানারূপে পরিচিত করা যায়। মনে করুন—দুগ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইবে। তাহাতে, বলা যায়—দুগ্ধ তরল; বলা যায়—দুগ্ধ পুষ্টিকারক; বলা যায়—দুগ্ধের পরিমাণ বা পরিমাপ। এইরূপ অল্প বা অধিক নানা ভাবে দুগ্ধের পরিচয় দেওয়া যায়। ভগবৎ-সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কখনও মনে করা যাইতে পারে—তনটী বিভূতিই তাঁহার অভিব্যক্তি; কখনও মনে করা যাইতে পারে—তেত্রিশটী বিভূতিতে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত আছে; আবার কখনও মনে হয়—তেত্রিশ কোটী অনন্ত অসংখ্য বিভূতি দ্বারা তিনি প্রকাশমান্ আছেন। সাধকের ধ্যান-ধারণার সামর্থ্যানুসারেই ভগবানের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের ব্যাখ্যাতেও সাধকের ধারণার অবস্থা মাত্রই ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে পারি; যাঁহারা দ্যুলোকের একাদশ, অন্তরিক্ষ-লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ—এই তেত্রিশ দেবতার বিষয় উহাতে সূচিত হইয়াছে মনে করিয়াছেন, সকল দেবতা বা ভগবদ্বিভূতি, তাঁহাদের মতে, ঐ তিন একাদশেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বিভাগ—কর্ত্তার ইচ্ছানুক্রমিক। বেদবাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সেই বেদপুরুষ ভিন্ন কে আর ব্যক্ত করিতে সমর্থ আছেন? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার যে বিভিন্ন প্রকারে উহার অর্থ অধ্যাহার করিতেছেন, সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার বা কর্ম্ম-বুদ্ধির ফল মাত্র। যেমন প্রতিকৃতি—দর্পণে প্রতিবিম্ব সেইরূপই তো প্রতিফলিত হইবে। এই সকল বিষয় বিচার করিলে মনে হয়, এককালে তিন লোকে তেত্রিশ দেবতা বা দেব-বিভূতি পরিকল্পিত হইত, আর, তদনুসারেই ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছিল। কিন্তু সার্ব্বকালিক সার্ব্বজনীন কোনও অর্থ ঐ পদদ্বয়ে আমনন করা যায় কি না?

আমরা ঐ "ত্রিভিরেকাদশৈঃ" পদের দ্বিবিধ অর্থ কল্পনা করি। তাহার মধ্যে একটী অর্থ যে সমধিক সুষ্ঠু ও সঙ্গত, তাহাতে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা সেই অর্থেরই আভাষ দিয়াছি। আমরা বলি, 'একাদশৈঃ' পদ এখানে একাদশ সংখ্যাবাচক নহে। ঐ পদ বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন। উহার সমাস-বাক্য—'একা অভিন্না দশা অবস্থা যস্য স একাদশঃ তৈঃ একাদশৈঃ' অর্থাৎ, 'এক (অভিন্ন) হইয়াছে দশা (অবস্থা) যাঁহার, সেই-ই একাদশ'; তাঁহাদের সহিত—'একাদশৈঃ সহ'। তাহাতে 'ত্রিভিঃ একাদশৈঃ' পদদ্বয়ের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'গুণসাম্যাবস্থা যাঁহাদের মধ্যে অভিন্ন হইয়া আছে।' এতদনুসারে মন্ত্রাংশের

এইখানে একটী সূক্ষ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। যদি 'একাদশৈঃ' পদ সংখ্যাবাচক হইত, তাহা হইলে উহার 'একাদশভিঃ' রূপ দেখিতে পাইতাম। কারণ, সংখ্যাবাচক একাদশন্ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'একাদশভিঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং এখানে এই পদটীকে অকারান্ত 'একাদশ' শব্দ-মূলক বলিয়া গ্রহণ করা গেল। ঐ শব্দের অর্থ—একদশাপন্ন (অভিন্নতাযুত)। এ পক্ষে 'একাদশৈঃ' পদের আ-কার ছান্দস বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অপিচ, ঐ অর্থেই অন্যরূপেও পদটী সিদ্ধ হইতে পারে।

মর্ম্ম হয়,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়! যে দেবতায় বা দেবভাবে সম্পূর্ণরূপ গুণসাম্য (ধাতু-সাম্যও বলা যায়) সাধিত হইয়াছে অথবা যাঁহাদের কৃপায় বা সাহায্যে আমাতে গুণসাম্য সাধিত হইতে পারে, সেই দেবগণের বা দেবভাবের সহিত আপনারা আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিতে আসুন।' আমরা মনে করি, এই অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত অর্থ।

আর একদিক দিয়া আর এক প্রকার অর্থও অধ্যাহার করা যায়। প্রচলিত তেত্রিশ দেবতা বিষয়ক ব্যাখ্যার তুলনায়, সুধিগণ তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিতে পারেন। গুণসাম্যই রক্ষা—ধাতুসাম্যই স্থিতি। 'ত্রিভিঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর সেই সাম্য-বিধানের ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ত্রিকালের ও ত্রিলোকের গুণসাম্যের ও ধাতুসাম্যের ভাবই ঐ পদে আসিতে পারে। 'একাদশ' পদে রুদ্রকে বুঝায়। তাহাতে কঠোরতার ভাব মনে আসে। তাৎপর্য্য-পক্ষে বলা যায়—'গুণসাম্যসাধনপক্ষে যাঁহারা রুদ্রবৎ কঠোর, সেই দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) লইয়া আসুন।' চাই—গুণসাম্যবিধান; চাই—ধাতুসাম্য-সাধন। সে পক্ষে যে দেবভাব যত কঠোর হউক, তৎসমুদায় আসিয়া, আমার শত্রুগণকে—গুণসাম্যবিধান-পক্ষে বাধা-প্রদানকারিগণকে, দমন করুন—ইহাই কামনা। 'একাদশ' পদে রুদ্রভাব—সমষ্টিবদ্ধ, তাহাতে যেন বলা হইতেছে,—'সে পক্ষে, গুণসাম্য-সাধন-সম্বন্ধে, কোনও রুদ্রভাব যেন বিরত না হন,—যেন একাদশ রুদ্রভাব সমষ্টিবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করেন; তাহাতেই সত্বর সফলতা-লাভ হইবার আশা আছে। তাই—সেই প্রার্থনাই করিতেছি।' এ পক্ষে, "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা" অংশের ভাব এই যে,—'অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আমাদের মধ্যে গুণসাম্য-সাধন-পক্ষে আপনারা কঠোর হউন; আমরা ভক্তিভাবে সেই প্রার্থনাই জানাইতেছি। ভক্তিসুধা পানের জন্য কঠোর দেবভাবসমূহকেই লইয়া আসুন,—যেন গুণসাম্যসাধন-পক্ষে কোনও বিঘ্নই উপস্থিত না হয়।'

মন্ত্রাংশের বিবিধ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করিলাম। অধিকারি-ক্রমে যাঁহাতে যে ভাব অবভাসিত হইবে, তিনি সেই ভাবেরই অনুসরণ করিবেন।

মন্ত্রের অবশিষ্টাংশের প্রার্থনা সরল ও সহজ-বোধ্য। গুণসাম্যসাধন হইলে যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, শেষাংশে তাহাই পরিখ্যাপিত হইয়াছে। ধাতুসাম্যে আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, গুণসাম্যে পাপ দূরে যায়,—রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া আসে; তাহারই ফলে, পরিশেষে সাম্যবিধাতৃ দেবদ্বয় নিত্যসহচর হইয়া থাকেন। মন্ত্রের শেষাংশ সেই প্রার্থনামূলক। এ পক্ষে পূর্ণ ঋকটির (দুই পংক্তির) মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়!' আমাদের অন্তর যতই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, আপনারা বজ্রকঠোর শাসনে তাহাকে শাসন করিয়া, আমাতে ত্রিগুণের (ত্রিধাতুর) সাম্যবিধান করুন, তাহাতে আমার আয়ু বৃদ্ধি হউক, শত্রু বিনষ্ট হউক, আমার মধ্যে আপনাদের চিরবিদ্যমানতা বিহিত হউক।'

দুই মতই ব্যক্ত হইল। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু অন্যমত থাকে, তাহা জানাইতে পারেন। যে কোনও সঙ্গত-মত প্রকাশের চেষ্টা পাইব।

পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্য-প্রদক্ষিণ।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ শিরোমণি মহাশয়ের লিখিত।]

(২)

প্রবন্ধলেখক বলেন,—"চক্রস্থ মনুষ্যের ন্যায় (চক্রস্থ মনুষ্যের নিকট চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বস্তু যেরূপ ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ) আমাদের নিকট চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণও ঐরূপ ভ্রমণশীল,—আমাদের নিকট আবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়।"

ইহা অজ্ঞ বালকদিগকে বুঝাইবার কথা। প্রথমতঃ, এইরূপ দৃষ্টান্তের কথা মূল থাকে নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণের অভাবে দৃষ্টান্ত কাহারও সাধক হয় না। তৃতীয়তঃ, এই দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। দেখুন, যাঁহারা পৃথিবীকে অনুক্ষণ আবর্ত্তনশীল বলেন, তাঁহারাও কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় পৃথিবীকে ভ্রমণ করান না। ঐরূপ ভ্রমণ বলিলে, দিন ও রাত্রির উপপত্তি হয় না। তাঁহারা রথচক্রের ন্যায়ই উহার ভ্রমণ বলেন। এই উভয় চক্রস্থিত জীবই আপনার গতির ন্যায় পার্শ্ব ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত বস্তুগুলিকে ভ্রমণশীল দেখেন। এই ভ্রমের কারণ, দ্রুত-ভ্রমণে চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায়; ঐ চঞ্চলতা-বশতঃই ঐরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। ঐ চক্র শিথিলভাবে ভ্রমণ করিলে ঐরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ, যাহা স্থির, তাহাকে স্থিরই দেখায়, যাহা অস্থির অর্থাৎ যাহার যেরূপ গতি, তাহাকে তদ্রূপ গতিশীলই দেখায়। অতএব, স্থিরচিত্তে যাহা দেখা যায়, তাহাই ঠিক বলিতে হয়। ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীর গতি প্রমাণিত হইতে পারে না। পরন্তু উহা দ্বারা পৃথিবী বৃক্ষাদির সহিত ভ্রমণ করিতেছে, ইহা আমি ভুল দেখিতেছি,—ইহাই সাধারণের জ্ঞান হয়। ঐ প্রত্যক্ষ-বিরোধী দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীর গতি প্রমাণিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—প্রমাণ নহে; কোন বিষয় প্রমাণ থাকিলেই দৃষ্টান্ত উহা বুঝাইয়া দিতে সহায়তা করেন মাত্র।

যদি বল, যাহা দেখা যায় তাহার বিপরীত অর্থটিই সর্ব্বত্র ঠিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপনি 'ফুটপাতের' উপর দাঁড়াইয়া আছেন। বহু গাড়িঘোড়াদি চলিয়া যাইতেছে দেখিতেছেন। তখন, আপনি কি মনে করেন—উহারা কোথায়ও যাইতেছে না, আমিই যাইতেছি। যদি বলেন, আমি স্থির ভাবে দেখিতেছি যে, আমি যাইতেছি না, স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া আছি, উহারাই যাইতেছে; তবে ঐ ভাবে পৃথিবীকেও যে স্থির দেখিতেছেন, উহা অস্বীকারের কারণ কি? প্রত্যক্ষের অপলাপ কেহই করেন নাই। আপনিও পৃথিবীর অস্তিত্বে প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন না। উহার স্থিরভাবে স্থিতিতে ঐ প্রত্যক্ষের অপলাপ কেন করিতেছেন, ইহাকেই লোকে স্বেচ্ছাচারিমত বলে না কি? বর্ত্তমান সময়ে উহাতে দুইটি মত দেখা যাইতেছে। একটী প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অপরটি প্রত্যক্ষের অনুকূল চলিতেছে। উভয়েই স্ব স্ব মত স্থাপনের জন্য সুপ্রাচীন লোকদিগের মত প্রমাণরূপে

উপন্যস্ত করিতেছেন। অতি প্রাচীনকালেও যে, কোন বিষয়ে দুই মত ছিল না, এইরূপ বলা যায় না। পরন্তু, দুই মতের একবাক্যতা বা বিভিন্ন-বিষয়কত্ব স্থির না হইলে, ঐ উভয়ের মধ্যে যে একটী মিথ্যা, ইহা বোধ হয়। তখন, ঐরূপ মত সংগ্রহ ও কল্পনার ফল কি? প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হইলে, বহু লোকের কথাই বা কি হইতে পারে? কেবল মাত্র লোকের কথা প্রমাণ নহে। ঐ কথা যদি যুক্তিযুক্ত প্রমাণের অবিরোধী হয়, তাহা হইলেই উহার কথা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। অন্যথা উহাদের কথা প্রামাণিক বলিতে আপত্তি কি? চন্দ্র ও সূর্য্যাদির গতি যাহা অনুভূত হইতেছে, উহা ভ্রম বলিবার কোনও কারণ নাই। দৃষ্টান্তে পার্শ্বস্থিত বস্তুর বা পৃথিবীর ভ্রমণ যাহা লক্ষিত হয়, উহা ভ্রম বা ভুল বলিবার কারণ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আছে। দেখুন—দৃষ্টান্তে চক্রাদিতে অবস্থিত পুরুষ ঐ চক্রাদির গতি বশতঃ পৃথিবী ও বৃক্ষাদিকে ভ্রমণ করিতে দেখেন; কিন্তু ঐ চক্রাদির গতিরুদ্ধ হইলে বা উহা হইতে অবতীর্ণ হইলে পর দেখিতে পারেন, পৃথিবী ও বৃক্ষাদি ঘুরিতেছে না, উহারা স্থির ভাবে এক স্থানেই আছে। এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা গমনশীল চক্রাদিতে অবস্থিত পুরুষের ঐ জ্ঞান (অর্থাৎ পৃথিবী ও বৃক্ষাদি ভ্রমণ করিতেছে এই জ্ঞান) বাধিত হয় বলিয়া উহাকে ভুল বলিতে হয়, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় পৃথিবী ও বৃক্ষাদি ভ্রমণ করিতেছে এই জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। দ্রাষ্টান্তে উহার বিপরীত ভাবে জ্ঞান হয়, দেখুন—ঐরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারাই পৃথিবী স্থির বলিয়া জ্ঞান হয় ও গ্রহাদিকে গমনশীল বলিয়া নিশ্চয় হয়। দৃষ্টান্ত ও দ্রাষ্টান্তের ধর্ম্ম ও ফল বিরুদ্ধ হইলে, কি উহাকে প্রকৃত দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে, বাস্তবিক উহা পৃথিবীর গতিতে দৃষ্টান্তও নহে, উহা অতি দ্রুত গমনকারী যানাদিতে (রেলের গাড়িতে) বৃক্ষাদির গমন-জ্ঞানেরই দৃষ্টান্ত। তথাপি, বর্ত্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত লোক ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধে অর্থস্থাপন করিতে চাহেন।

যাহা হউক, 'সাহিত্য-সংবাদে' "ন্যায়রহস্য" প্রবন্ধে নানা যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বেই আমরা লিখিয়াছি,—"এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবী চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছি বলিয়া আমরাও ঐ সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতেছি। এই জন্যই নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগণ আমাদের নিকট আবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়।"

প্রবন্ধ লেখক কোন ঋকেরই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই কেন? উহা করিলেই অনেকটা চক্ষুঃ ও কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যাইত। ঋকে "চক্রথুঃ" এই ক্রিয়া পদ দেখা যায়। উহার কর্ত্তা কে—ইহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঐ লেখক মহাশয়, কত ভুল করিয়াছেন। যে যজ্ঞে ঐ সূক্তটী বিনিয়োগ করা হইয়াছে, ঐ যজ্ঞকারীর যজমান, সোমদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আপনিই ইন্দ্র অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বা সূর্য্য (যুবাং) আপনারা দুই জনে (যানিমণ্ডলানিচক্রথুঃ) যদ্বা যানি চক্রে অধঃস্থিতানি ক বস্তুনি তানি ঊর্দ্ধাবস্থিতানি চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ, এবমূর্দ্ধস্থিতানি বস্তুনি অধঃস্থিতানি চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ, তানি মণ্ডলানি ইদানীমপি ধুরাচক্রস্থিতা যুক্তাসম্বন্ধঃ"; অর্থাৎ, তৎপরিভ্রমণবশেন যে অধোবস্থিতাস্তে ঊর্দ্ধাবস্থিতা ভবন্তি এবং পুনরূর্দ্ধাবস্থিতাঃ

অধোবস্থিতা ভবন্তি তথা রাশিচক্রমণ্ডলান্যপি রজসঃ রঞ্জনশীলান্ লোকান্ বহন্তি, দিনরাত্রি-সম্পাদনেন রক্ষন্তীতি ভাবঃ। অথবা তানি চন্দ্রসূর্য্যচক্রেষু যানি অবস্থিতানি রশ্ম্যাদীনি বস্তূনি রজসো রজাংসি, ভূতানাং বহনযোগ্যসূক্ষ্মাংশানি বহন্তি এবং চক্রভ্রমণেনাধ ঊর্দ্ধোভবতি তথোর্দ্ধাধোভবতি অতএব যে অর্ব্বাঞ্চঃ তত্র চক্রে অধঃস্থিতাস্তান্ উপরচে উপরিস্থিতানাভ-রেবং যেচ তৎ পরিভ্রমণবশেন ঊর্দ্ধস্থিতাস্তান্ অর্ব্বাঞ্চ আহুঃ অধোবস্থিতানাহুরিত্যর্থঃ। আপনারা যেরূপ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিয়াছেন (এক্ষণও ঐরূপ করিতেছেন) অথবা আপনাদের চক্রের অধোভাগে স্থিত বস্তু সকলকে ঐ চক্রের ভ্রমণেতে করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত করিয়াছেন, এবং ঊর্দ্ধাবস্থিত বস্তুগুলিকে (অর্থাৎ রশ্মি প্রভৃতিকে) ঐ চক্রের গতিতেই অধঃস্থিত করিয়াছেন ও এক্ষণেও করিতেছেন, যেমন সামান্য চক্রেতে অবস্থিত ও উহাতে আবদ্ধ বস্তুগুলি উহার (ঐ চক্রের) ভ্রমণেতে করিয়া উহার অধোদেশস্থিত বস্তুগুলি ঊর্দ্ধে যায় এবং ঐ ঊর্দ্ধস্থিত বস্তুগুলি পুনর্ব্বার অধোদেশে যায়, তদ্রূপে রাশিচক্রের মণ্ডলাকার ভ্রমণ-গুলি এক্ষণ ও রঞ্জনশীল লোকদিগকে বহন অর্থাৎ দিন ও রাত্রি সম্পাদন করিয়া রক্ষা করিতেছেন, অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যের চক্রস্থিত রশ্মি প্রভৃতি বস্তু সকল ক্ষিত্যাদি ভূতের বহনযোগ্য সূক্ষ্ম রজঃকণা বহন করিতেছেন। যেমন চক্রের গতিতে করিয়া উহার অধোভাগ ঊর্দ্ধভাগ হয় ও ঐ ঊর্দ্ধভাগ অধো হয়, তদ্রূপ ঐ চক্রে স্থিত যাহারা অর্ব্বাঞ্চ অর্থাৎ অধঃস্থিত তাহাদিগকেই ঐ চক্রের গতিতে উপরিস্থিত কহে, এবং ঐ চক্রের গতিতে করিয়াই ঐ ঊর্দ্ধস্থিত অধো হয় বলিয়া উহাদিগকে অধোস্থিত কহে। ইহাই ঐ ঋকের অর্থ।

পৃথিবী, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণের কথা দূরে থাকুক, এই ঋকে পৃথিবীর নামও দেখা যায় না। এক্ষণে এই ঋকের সায়ণ কৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, উহাতে কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। "যে সূর্য্যসোময়োশ্চক্রে বর্ত্তমানা রশ্ময়ো গ্রহাদয়শ্চ" যাহারা সূর্য্যসোমের চক্রেতে (ভ্রমনকারী যানেতে) যে রশ্মি সকল আছে এবং উহাতে যে সব গ্রহ আছেন॥ "তৎপরিভ্রমণবশেন অর্ব্বাঞ্চঃ অর্ব্বাঞ্চনাঃ অধোমুখাঃ ভবন্তি" উহারা সূর্য্যসোমচক্রের পরিভ্রমণের বশবর্ত্তী হওয়ায় অধোমুখ হইয়া অবস্থিতি করেন। তাঁউ তানেব, পরাচ আহুঃ পুরাংমুখাঞ্চনানূর্দ্ধানাহুঃ কালবিদঃ" উহাদিগকেই কালবিৎ পণ্ডিতগণ 'পুরাংমুখাঞ্চনান্' অগ্রে মুখ করিয়া গমনকারী বলেন, বস্তুতঃ উহাদিগকেই ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত বলেন। "তথা প্রথমং যে পরাঞ্চঃ পরাগঞ্চনাঃ তাঁউ তানেব অর্ব্বাঞ্চ আহুঃ" তদ্রূপ প্রথম যাহাদিগকে 'পরাঞ্চ পরাগঞ্চনা" ঊর্দ্ধগমন নীচে গমনশীল বলেন। "হে সোম ত্বং ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ ইরাং ভূমিং বৃষ্ট্যাধারক আদিত্যঃ" হে সোম তুমিই ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, তুমি ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা ধারণ কর ও আদিত্য নামে অভিহিত হও। যদ্বা দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে ইন্দ্রোপ্যেকঃ" অথবা দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্রও এক জন আদিত্য। "বিবস্বদিন্দ্রযুতা ইত্যুক্তত্বাদয়মপীন্দ্রঃ স চ যুবাং যা যানি মণ্ডলপরিভ্রমণানি চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ' যেহেতু বিবস্বদিন্দ্রযুতা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবস্বৎ ইন্দ্র তৎযুতা বলা হইয়াছে, তখন এখানেও যে ইন্দ্র শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থ সূর্য্য, এই ইন্দ্র 'স চ' বলিতে সোম "যুবাং" আপনারা দুই জনে 'যা' যানি অর্থাৎ যে সব মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহা

"রজসো রঞ্জকাত্মকস্য লোকস্য কর্ম্মণি ষষ্ঠী লোকং বহন্তি নির্ব্বহন্তি" রঞ্জনাত্মক লোকদিগের এই ষষ্ঠী কর্ম্মেতে হইয়াছে, লোকদিগকে বহন অর্থাৎ দিন ও রাত্রি সম্পাদন করিয়া রক্ষা করিতেছেন "তত্র দৃষ্টান্তঃ" ঐ বিষয় দৃষ্টান্ত, যথা—"ধুরানশকটাদৌধুরিযুক্তাঃ সম্বদ্ধা অশ্বাদয়ো, যথাধুরং বহন্তি তদ্বৎ" যেমন শকটাদিতে যে চক্র যোজনা করা হয় ঐ চক্রেতে সম্বদ্ধ অশ্বাদি যেরূপ ঐ চক্রযুক্ত রথাদিকে ও উহাতে অবস্থিত বস্তুকেও বহন করে, তদ্রূপ রাশি চক্রেতে অবস্থিত রশ্মি ও গ্রহাদিকেও আপনারা দুই জনে ভ্রমণ করাইতেছেন, ভাষ্যকার এই ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ না হওয়ায়, যদ্বাপক্ষ বলিতেছেন, "যদ্বা এতৎপূর্ব্বার্দ্ধ-দৃষ্টান্তিতং" এই ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধে পূর্ব্বভাগে দ্রাষ্টান্তিকার্থ দেখাইয়াছেন। "ধুরাযুক্তাঃ ধুরিস্থিতচক্রমপি ধুরশব্দেনোচ্যতে" তত্র যুক্তাঃ সমর্পিতাঃপুরুষাঃ তৎপরিভ্রমণবশেনার্ব্বাঞ্চঃ পরাঞ্চো ভবন্তি পরাঞ্চোহিপার্বাঞ্চোভবন্তি তদ্বৎ" ধুরা এই পদের অর্থ ধুরিস্থিত চক্র পদার্থ যুক্তা এই পদের অর্থ সমর্পিতসম্বদ্ধ ফলতঃ এখানে ধুরি শব্দে ধুরাস্থিত চক্রকেও বোধ করে অতএব ধুরাঃ অর্থাৎ চক্র বিশিষ্ট (রথাদিপদার্থ) যুক্তাঃ অর্থাৎ যুক্তা অর্থাৎ ঐ চক্রে সমর্পিত (সম্বদ্ধ) পুরুষ সকল ঐ চক্রের পরিভ্রমণ বশতঃ "অর্ব্বাঞ্চঃ" অধোমুখ বা অধঃস্থিত হয়েন ও "পরাঞ্চঃ" উর্দ্ধমুখ বা উর্দ্ধস্থিত হয়েন এবং ঐ চক্রের পরিভ্রমণ বশতঃই ঐ উর্দ্ধমুখ বা উর্দ্ধস্থিত পুরুষ সকল অধোমুখ বা অধঃস্থিত হয়েন তদ্রূপ সোম সূর্য্যের চক্রের গতি বশতঃ ঐ চক্রস্থিত রশ্মি ও গ্রহাদি কখন উর্দ্ধমুখ উর্দ্ধস্থিত হয়েন উহারাই আবার অধোমুখ বা অধঃস্থিত হয়েন এই ঐ ঋকের সায়ণভাষ্যার্থ॥ এক্ষণে পাঠকবৃন্দ একটু বিচার করিয়া দেখুন, উহাতে পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রদক্ষিণের কথা কিছু আছে কি? ঐ কথা দূরে থাকুক উহাতে পৃথিবীর নামও নাই।

বাঁশী।

[শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ মহাশয়ের বিরচিত।]

এখন বাজা'লে হবে কি?
ছি ছি থাম থাম নিলাজিয়া শ্যাম,
শুনিলে ননদী কবে কি?
রাবিনীর মত তাহারে ডরাই
পাছে পাছে সে যে আছে সর্ব্বদাই
'রাধা রাধা' রব, শুনিলে মাধব,
আমার গরব রবে কি?
বাজাইতে হয় বাজাও অবাধে
বাজাবার আছে কত সুর
'কিশোরী কিশোরী' না হলে বাঁশরী
বাজে না কি তব হে কিশোর॥
থাকি আমি সদা গুরু জন মাঝে
বড় দুঃখ হয় ইহা বুঝ না যে
হায়, ভগবান! ধরে' কুল মান
দিতে চাও টান তবে কি?
এখন বাজা'লে হবে কি?

বালীগ্রামের প্রাচীন সমাজ।

[শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মিশ্র বি-এ বিরচিত।]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের শেষ।)

পঞ্চদশ শতাব্দে ব্রাহ্মণদিগের বাস থাকিলেও এই গ্রাম সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই বলিয়া বোধ হয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে সপ্তদশ শতাব্দে লিখিত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে "বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ" —অর্থাৎ বালীগ্রাম ব্রাহ্মণপ্রধান হইয়াছে—এই উল্লেখ প্রথম পাওয়া গিয়াছে।

দলীলাদি দেখিয়া ও অন্যবিধ অনুসন্ধানে যে সকল স্থানীয় ব্রাহ্মণগোষ্ঠী অন্যদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া জানা গিয়াছে তাঁহাদিগের উল্লেখ করা যাইতেছে,:—

১। কাঁটাদিয়া বন্দ্যো চক্রবর্ত্তীবংশ। ইঁহারা এখন বিবিরডাঙ্গা ও চক্রবর্ত্তী-পাড়ায় বাস করিতেছেন। দ্বাদশপুরুষ ঊর্দ্ধে কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বেও বাস ছিল শুনা যায়। ইঁহারা বংশানুগত কায়স্থপৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন।

কাঁটাদিয়া বন্দ্যো মল্লিক ও পাঠকবংশ। শেষোক্তদিগের নামে "পাঠকপাড়া" হইয়াছে। একশাখা, গোঁসাইদিগের পূর্ব্ব হইতে গোঁসাইপাড়ায় বাস করিতেছেন।

৩। কাশ্যপ (?) হালদার-বংশ। এখন কেহই নাই। চৈতলপাড়ায় ইঁহাদিগের বাস ছিল। সাবেক ঘটকপাড়ায় ঘটক (খড়দহবন্দ্যো) গোষ্ঠীও ঐরূপ।

৪। পূতিতুণ্ড বাৎস্য সরখেল-বংশ। সরখেল-পাড়া নাম—ইঁহাদিগের বাস হইতে।

৫। ভদ্রকালীগ্রামের গুড, ঘটক, পাঠক ও চৌৎখণ্ডী—ইঁহারাও খুব পুরাতন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু অনেকের আর বাস নাই বলিয়া বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনতর হইলেও বালীতে প্রচলিত সামাজিক মর্য্যাদায় উঁহাদিগের স্থান নাই। অপেক্ষাকৃত পরতর গোষ্ঠীরাই উহা পাইয়া থাকেন। কাহারা পান, একটি ছড়া হইতে জানা যায়, যথা—

"ঘোষাল ডিংসাই।
চৈতল গোঁসাই॥"

স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে, যথা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে—শ্রোত্রিয় ভরদ্বাজ ডিংসাই চক্রবর্ত্তী মালাচন্দন পান; পণ্ডীতরত্নী কাশ্যপ গোস্বামী ব্রহ্মবরণ পান; সর্ব্বানন্দী ঘোষাল বিরাট পাঠ করেন; খড়দহমেল চৈতল চট্ট, সদস্য সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। কখনও কখনও পণ্ডিতরত্নী বন্দ্যো বিরাট পাঠ করিয়া থাকেন।

সম্ভবতঃ ইঁহারা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়াই এইরূপ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

ছড়ায় চারিগোষ্ঠীর পরিচয় এইরূপঃ—

১। ঘোষাল। ইঁহাদিগের পঞ্চানন্দতলায় ও ঘোষালপাড়ায় বাস রাজীবলোচন

ঘোষাল এখানকার আদিপুরুষ, কলিকাতা-গোবিন্দপুর হইতে আসিয়াছিলেন। অধস্তন দশম পুরুষ চলিতেছে।

২। ডিংসাই। ডিংসাইপাড়ায় বাস। হরি চক্রবর্ত্তীই নাকি ইঁহাদিগের আদিপুরুষ, বটেশ্বর গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। ১১শ পুরুষ চলিতেছে।

৩। চৈতল। চৈতলপাড়ায় ও উত্তরপাড়ার স্থানে স্থানে বাস। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার আদিপুরুষ শান্তিপুর হইতে আসেন। নবম পুরুষ চলিতেছে। রামভদ্র চক্-বালীতে (হাল উত্তরপাড়ার) ২৮০ বিঘা ভূসম্পত্তি পাইয়া "চক্ ভট্টাচার্য্য" নামে খ্যাত হয়েন। সম্রাট আওরেঙ্গজেব প্রদত্ত সনন্দ (তায়দাদ নং ৪৩৬৬৯) ও সাহ আলমদত্ত ছাড়পত্র—দুইটিই বাদশাহী পাঞ্জাযুক্ত, ও উর্দ্দুতে লেখা রামভদ্রবংশীয় রায়সাহেব ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আছে।

গোঁসাই। গোঁসাইপাড়ায় বাস। চণ্ডীদাস চট্ট আদিপুরুষ। নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী ইঁহাকে "গোস্বামী" আখ্যা দেন বলিয়া পারিবারিক প্রবাদ আছে। একাদশ পুরুষ চলিতেছে॥

মতান্তরে বিরাটপাঠ অধিকারী পণ্ডিতরত্নী বন্দ্যোদিগের আদিপুরুষ হরিবন্দ্যো বেলঘরিয়া হইতে বালীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় দুর্গাদাস ও শ্রীরাম পরে আসেন। একাদশ পুরুষ চলিতেছে।

ছড়ার অতিরিক্ত বহু প্রাচীন গোষ্ঠী বালী, উত্তর পাড়া, ভদ্রকালী ও বেলুড় গ্রামে আছে। ইঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য উত্তর পাড়ার শ্রোত্রিয় সাবর্ণচৌধুরী-বংশ। বিদ্যাধর রায় ইঁহাদিগের আদিপুরুষ। অধস্তন দশম পুরুষ চলিতেছে। উত্তর পাড়ার সর্ব্বপ্রাচীন প্রসাদতুল্য অট্টালিকা ইঁহাদিগের পূর্ব্ব সম্ভ্রমের পরিচায়ক। এই বংশীয়েরা বাহির হইতে বাছিয়া বাছিয়া কুলীন সন্তান আনিয়া কন্যা দান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর পাড়ায় বাস করান। এইরূপে উত্তর পাড়ার সম্ভ্রান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উৎপত্তি। চট্টদিগের দৌহিত্র সন্তান উত্তর পাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশ—জগমোহন মুখোপাধ্যায় ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর পাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশও পুরাতন। মহাদেব চক্রবর্ত্তী—আদিপুরুষ গাঁতি হইতে আসেন। অষ্টম পুরুষ চলিতেছে।

বেলুড়ের চট্টবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। দেওয়ান রামশঙ্কর চট্ট ইঁহাদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দপুর হইতে আটপুরুষ আগে আসিয়াছিলেন। এখানকার মুখোপাধ্যায় বংশও সম্ভ্রান্ত। ইঁহাদিগের আট পুরুষ চলিতেছে।

বালীগ্রামের প্রত্যেক ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর পরিচয় দিতে হইলে, একটি বিরাট প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সরকারী বিবরণীমতে এখানে সমগ্র অধিবাসীর ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণ। ১৯১১ সালের এখানকার আদমসুমারিতে লোকসংখ্যা ২২৩৯৪ জানা গিয়াছে। কিন্তু বে-সরকারী অনুসন্ধানে ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৫০০০ ব্রাহ্মণজাতি জানা গিয়াছে। ১৮৪১ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে চার্লস্ জোসেফ্ সাহেব কলিকাতা রিভিউ পত্রে দেখাইয়াছেন যে তৎকালে বালীতে

সহস্রঘর ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী—যেমন তেমন নহেন, অনেকেই পুরাকালের ঋষিদিগের মত—এমন ব্রাহ্মণ, বালীতে বাস করিতেন। সুতরাং ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কালে বালী যে দ্বিতীয় কৃষ্ণনগর বা নবদ্বীপ হইয়াছিল, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

এখানে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল, ও বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। কয়েকটী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম দেওয়া যাইতেছে :—

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, আত্মারাম তর্কালঙ্কার, রাজারাম পঞ্চানন, রুদ্ররাম বাচস্পতি, জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার, হরিশ তর্কালঙ্কার, রামজয় সিদ্ধান্ত, নবকুমার বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি।

নিষ্ঠাবান, ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান বলিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণ বরাবর গোঁড়ামির দেজায় পক্ষপাতী। কথিত আছে,—কলিকাতায় যখন ব্রাহ্মণ মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, তখন বধাস্থানে বালীর সমবেত ব্রাহ্মণগণ সেই ভীষণ পাপজনক ব্রহ্মবধ নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, ব্রহ্মহত্যায় পাপস্থান কলিকাতায় পদার্পণ বা জলপান করিবেন না। তাঁহারা ও পরবর্ত্তী বংশধরেরা অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বালীর গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য-ব্রাহ্মণ।

বালী, রাঢীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণদিগের একটি বিশিষ্ট সমাজ। এখন হইতে দ্বাদশ পুরুষ উর্দ্ধে বাৎস্য গোত্রজ দেবীবর আচার্য্য সম্ভবতঃ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। দেবীবরের পুত্রসন্তান না থাকায় দৌহিত্র বর্দ্ধমান কায়তি নিবাসী অচ্যুত পণ্ডিতকে সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। অচ্যুত স্ব-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি বঙ্গদেশে একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। "অচ্যুত পঞ্চানন" নামেই ইনি প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, মূর্ত্তিমান শনিগ্রহ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। কথাটা শুধু বালীর আচার্য্যদিগের বংশবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এখনও পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের অনেকের মুখে শুনা যায়। খ্রীষ্টান মিঃ সি, এন, ব্যানার্জ্জি পর্য্যন্ত স্ব-রচিত হাবড়া-বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে প্রবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বালীর আচার্য্য জ্যোতিষিদিগের গণনাশক্তি অমানুষী, এবং অচ্যুতবংশীয় জ্যোতিষিগণ এরূপ উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা রচনা করিতেন, আর বালীমতের পঞ্জিকা দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, নবদ্বীপ মতের পঞ্জিকার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন মত গ্রহণ করা বিধেয় স্থির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

উদ্ধৃত মত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এখানকার জ্যোতিষী আচার্য্যগণ সমাজে কিরূপ সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন। বালী-মত-পঞ্জিকা প্রণয়ন-লোপের সহিত সে সম্মানও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অচ্যুত বংশীয় বিখ্যাত জ্যোতিষী রামকৃষ্ণ বালী হইতে উঠিয়া গিয়া হাবড়া-চক্রবেড় গ্রামে নবাব-দত্ত ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। ইনিই চক্রবেড়ের সুবিখ্যাত "জান"-দিগের আদিপুরুষ।

ঐ বংশীয় সনাতন বিদ্যাবাগীশ "রাত্রিদিনোজ্জ্বল" নামক জ্যোতির্গণনাবিষয়ক এক পুস্তক রচনা করেন। ইনি শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজা সার রাধাকান্তদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বালীর শেষ পঞ্জিকাকার রাঢীয় ব্রাহ্মণ শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ইহার ছাত্র ছিলেন।

অচ্যুতের পর তিতু পঞ্চানন নামে আর একজন জ্যোতিষী আচার্য্য বালীতে আসিয়া বাস করেন। ইহার বংশেও রামহরি সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন।

বালীর আচার্য্য জ্যোতিষীদিগের দুইটি জ্যোতিষ-চতুষ্পাঠী ছিল। উপরোক্ত পণ্ডিতগণ ব্যতীত মদন তর্কচূড়ামণি, প্রভুরাম বিদ্যার্ণব, রামেশ্বর বিদ্যাসাগর, রাধাকৃষ্ণ শিরোমণি প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এখানকার গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেলুড়গ্রামেও আচার্য্যদিগের একটি জ্যোতিষ-টোল ছিল।

বালী যাহাদিগের সমাজ তাহাদিগের বিবরণ, এইখানে শেষ করা গেল।

বেদ।

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত।]

(১)

সুদূর অতীত অজ্ঞাতযুগে, অজ্ঞানে ভরা ধরণী ;
চৌদিকে ঘনকুজ্ঝটি, তাহে আবৃত জ্ঞান-সরণি।
সুগভীর ধ্যানে মগ্ন ঋষিরা বিশ্বহিতের লাগিয়া ;
ব্রহ্মে মিলিত বিশ্বের বেদ প্রণবে উঠিলা জাগিয়া।
স্পন্দিত হ'ল বিশ্বের হিয়া, ভেদি' অনন্ত আকাশে ;
ধ্বনিয়া উঠিল প্রণব-মন্ত্র, ভারতের জ্ঞান প্রকাশে।
ভারতের এই শাশ্বত ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া ;
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি' নমি নতশির করিয়া।

(২)

ঋষি সঙ্ঘের মানস-নেত্র বৈদিক জ্যোতি পাইয়া ;
সুপ্ত চিত্ত ব্রহ্ম তত্ত্বে জাগিয়া এ "সাম" গাহিয়া।
ব্যোম পারাবারে তুলি' তরঙ্গ উঠিল সে ধ্বনি গগনে ;
স্তব্ধবিশ্ব চাহে বিস্ময়ে সে দিন সে শুভ লগনে।

বিকীর্ণ হ'ল জ্ঞানের আলোক, উজ্জ্বল হ'ল ধরণী ;
দেখিলা মানব এসেছে তাহার ভবসাগরের তরণী।
ভারতের এই শাশ্বত-ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া,
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি' নমি নতশির করিয়া।

(৩)

জনকোলাহলশূন্য পুণ্য-পূত তপোবন-ভবনে ;
ফুলচন্দন হবির গন্ধ বহিল মিলিয়া পবনে।
স্থাপন করিলা হোমের অগ্নি ঘর্ষণ করি অরণি ;
জাগিয়া উঠিলা শঙ্খশব্দে পুলকোজ্জ্বল ধরণী।
প্রণবমন্ত্রে মঙ্গল-ঘট স্থাপিলা এ শুভ প্রভাতে ;
ভরিয়া উঠিল চিত্ত-ক্ষেত্র জ্ঞান-গায়ত্রী-প্রভাতে।
ভারতের এই শাশ্বত-ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া ;
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি' নমি নতশির করিয়া।

(৪)

প্রকাশিলা বেদ ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্বের মাঝে আসিয়া ;
মহা অমৃতের সন্ধান দিলা মরণের ভয় নাশিয়া।
মঙ্গলময়ী বৈদিকবাণী সত্য-আলোক-হরষা ;
শোক-সন্তাপ-তাপিত-চিত্ত নরের নিত্য-ভরসা।
বরিয়া লইল বিশ্ব এ দান, পুরাতন নাহি হয় গো ;
ধ্বনিয়া উঠিল দিগ্‌দিগন্তে আর্য্যজ্ঞানের জয় গো !
ভারতের এই শাশ্বত-ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া ;
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি' নমি নতশির করিয়া !

(৫)

বেদ-উপাসক সে ঋষিসঙ্ঘ "ব্রাহ্মণ" নামে জাগিয়া ;
বর্জ্জিলা ভোগবিলাসের আশা ব্রহ্মজ্ঞানের লাগিয়া।
রাজপাট ধনসম্পদ সব তুচ্ছ মানসে গণিয়া ;
ত্যজিলা হর্ষে, মোক্ষের গান মানসে উঠিছে ধ্বনিয়া।

নিভৃতে বাঁধিলা পর্ণ-কুটির নির্ঝর-তট-কাননে ;
বন্ধনে তনু আবৃত, তপঃ-প্রভা প্রদীপ্ত আননে।
ভারতের এই শাশ্বত-ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া,
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি' নমি নতশির করিয়া।

(৬)

সেই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম, তাঁহাদের কথা স্মরিয়া,
পুলকে শরীর পূর্ণিত, প্রাণ ভক্তিতে গেল ভরিয়া।
সে ঋষিবংশে সে ঋষি অংশে কে আছে গো আজি জাগিয়া,
বিতরণ কর ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্বমানবে ডাকিয়া।
বিশ্বের গুরু শিষ্যের দ্বারে দাঁড়াও আবার আসিয়া ;
শিখাও আবার বেদ-বেদান্ত অজ্ঞান-তমঃ নাশিয়া।
ভারতের এই শাশ্বত-ধনে জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া,
ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন মানি নমি নতশির করিয়া।

অতীত-শিল্প।

[শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।]

আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন কালেই সভ্যতা-সোপানে আরূঢ় হইয়া শিল্পবিদ্যায় চরম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যখন পৃথিবীর সমগ্র জাতি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আর্য্যজাতি মধ্যাহ্নের খরতর রবির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমাদের কি ছিল—সেই দূর অতীতে এ দেশে শিল্পের কিরূপ উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহার একটু আলোচনা করিব।

এই যে ইষ্টকপ্রস্তরময় গৃহে বাস করি, তাহা নবাবিষ্কৃত নহে—তাহা বিদেশীয়ের দান নহে। বহু পূর্ব্বে—দূর অতীতে—এইরূপ ছাদযুক্ত ও গবাক্ষ-দ্বার-বিশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদের অস্তিত্ব ছিল,—এখনকার সময়ের মত চূণ সুরকি ইট ব্যবহৃত হইত।

বেদে "ইষ্টকস্তম্ভ" "অট্টালিকা" "প্রাসাদ" "ইষ্ট" "কুট্টিম" প্রভৃতি বহু শব্দ আছে; তৎসমুদায় ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঋগ্বেদে "সহস্রদ্বার-বিশিষ্ট গৃহ" (৭।৪৪।৫) "সহস্র স্তম্ভ-রক্ষিত প্রাসাদ" (২।৪।৫) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অন্যান্য স্থানে "প্রস্তরগৃহ" "চক্রপ্রস্তর" প্রভৃতির নির্দ্দেশ আছে। পুরাকালে আর্য্যগণ দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি তলযুক্ত গৃহ এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। অনেক সময় বহুস্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণে তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, বশিষ্ঠ ঋষি একটী সুদৃশ্য বহুস্তম্ভযুক্ত ত্রিতল গৃহ প্রার্থনা করিতেছেন।

যদি সেই সময়ে ত্রিতলাদি গৃহের প্রচলন না থাকিত, মহর্ষি বশিষ্ঠ কখনও ঐরূপ প্রার্থনা করিতেন না।

আর্য্যগণ বস্ত্রপরিচ্ছদাদি বয়নেও সুদক্ষ ছিলেন। অলঙ্কারাদির ব্যবহারে তাঁহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। যানাদি নির্ম্মাণে ও ব্যবহারে তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীত-বিদ্যায়ও তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন। মোটের উপর সকল বিষয়ে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও উপমাবিহীন।

বস্ত্রাদি বয়নের কথা ঋগ্বেদে বহুবার উল্লেখ রহিয়াছে। যজুঃ ও সামবেদেও বস্ত্র প্রচলনের নির্দ্দেশ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) স্বর্ণখচিত কার্পেটের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে রামের "কৈষিক" "অজীন" বাস প্রভৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ত্তমান। কাদম্বরীতে "কৈষেয় রাজের" উল্লেখ বহুবার বহুস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়ে—বস্ত্র চারি প্রকার উপদানে প্রস্তুত হইত,—(১) পশম (২) চর্ম্ম (৩) কার্পাস (৪) মেষ-লোম। শ্বেতবস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।২।১৮) ও অথর্ব্ববেদে (১৫।২।১) "তনুত্রাণ" ও "উষ্ণীষ" ব্যবহার উল্লেখ আছে। জামা ও পিরাণ এইরূপ অর্থে "তনুত্রাণ" ব্যবহৃত। মহিলাগণ সর্ব্বশরীর আবৃত রাখিতেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও তদুপরি "কঞ্চুকী" পরিধান করিতেন। তৎকালে মহিলাগণের মধ্যেও উষ্ণীষ ব্যবহার ছিল। বিবাহে ও যৌতুকে মেষ-লোমের বস্ত্র প্রচলন অত্যধিক ছিল।

আপস্তম্ব-সূত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—"ভিস্তিরা চর্ম্ম দ্বারা পথ জলসিক্ত করিত ও আর্য্যগণ চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিত।" ইহা হইতে স্থির হয় যে, আর্য্যগণ চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন ও চর্ম্মের ব্যবহার জানিতেন। ঋগ্বেদে তিন চারি বার ক্ষৌরকার্য্যের বিষয় উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে নাপিতের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। সামবেদে "চর্ম্মকার" শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। সুতরাং ক্ষৌরকার্য্যোপযোগী দ্রব্যের, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির এবং চর্ম্মের বিবিধ ব্যবহার তখন ছিল।

তৎকালে নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহারের নির্দ্দেশ আছে। যজুর্ব্বেদে "বলয়" "অঙ্গুরীয়" "কণ্ঠমালা" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও "স্বর্ণকুণ্ডল," "মেখলা", "চরণ নিগূঢ়" প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। তৎকালে দেবতাগণের এবং রমণীদিগের "আভরণ," "শিখাপাতা", "শিখাঞ্জলি", "খণ্ড পত্র", "চূড়ামণি", "সক্তরিষা", "মুক্তাঞ্জলি", "গবাক্ষি", "খড়্গপত্র", "বেণীশুদ্ধ", "দারক", "ললাটতিলক", "শিরালঙ্কার" ছিল। কর্ণে "কর্ণিকা" "পত্র কর্ণিকা" "বলয়" "আপে ক্রুক" "মুদ্রা" ও "উৎপল" ধারণ করিতেন। বেদে "সৃক্কা" "বিচিত্র" প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। "ইজ্কা" ও "রুবন" মালা বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে "জবালোলকুণ্ডল গোপা" লিখিত রহিয়াছে। সুশ্রুতসংহিতায় ঔষধ ও অলঙ্কার ধারণের ব্যবস্থা বর্ত্তমান। রামায়ণে "হার", "হেমপত্র", "সঙ্গহ", "কেয়ূর" ও "কুণ্ডল" ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখ পরিব্যক্ত রহিয়াছে। বহু প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তকে ও দেহে অলঙ্কার ব্যবহারের আদর্শ পাওয়া যায়। সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরাও নানাপ্রকার কেশকলাপ বসন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন।

আর্য্যগণ শিশু ও খদির কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত যান ব্যবহার করিতেন। অশ্ব ও গর্দ্দভগণ, তাঁহাদের যান-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ঋগ্বেদে "ত্রিকোণত্রিস্তম্ভবিশিষ্ট ম্লানের" প্রয়োগ পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈদিক গ্রন্থে যান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। যথা—(১) রথ (২) শকট। সাধারণতঃ পিত্তলনির্ম্মিত চক্র ও লৌহস্তম্ভযুক্ত রথ ব্যবহার হইত। স্বর্ণরথ যে ব্যবহার না হইত, তাহা নহি। বর্ত্তমানকালাপেক্ষা তৎকালে রথেরও শকটের গঠন ও পরিচালন-প্রথা উন্নততর ছিল। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগ। সেই যুগে পুষ্পরথ ও দ্রুতগামী শকট-শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ কালে যুদ্ধে ঐরূপ পুষ্পরথ ব্যবহৃত হইত। ৬০০।৭০০ মাইল পথ পাঁচঘণ্টায় যাওয়া যাইত—এরূপ উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। যখন যানাদির ব্যবহার ছিল, তখন আর্য্যগণ পথাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। অতএব তাঁহারা পূর্ত্তকার্য্যে সে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহারা অশ্বপরিচালনের জন্য রশ্মি ব্যবহার করিতেন। অশ্বারোহণ দ্বারা শিকার ও যুদ্ধাদি কার্য্য সংসাধিত হইত।

তাঁহারা জলযানও ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সুদৃশ্য নৌকায় আরোহণ করিয়া জলবিহার করিতেন। যুদ্ধবিগ্রহাদি-কালে "অর্ণবযানের" উল্লেখ আছে। তাঁহারা সমুদ্রের পর-পারে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন।

শত্রুকে আক্রমণ জন্য তাঁহারা নানারূপ ধাতুময় অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বেদে "হস্তঘ্ন" শব্দের প্রচলন রহিয়াছে। "হস্তঘ্ন" ও "চর্ম্ম" প্রভৃতি শস্ত্র আত্মরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত। শত্রুকে আক্রমণার্থ তাঁহারা "বর্ষা" "পরশু" "বাশী" ও "ধনুর্ব্বাণ" ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা অগ্নিময় বাণ ব্যবহার করিতেন। "তরবারির" ও "ত্রিশূলের" ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। তাঁহারা রণাঙ্গণে নানারূপ রণোন্মাদক বাদ্য ব্যবহার করিতেন। বাদ্যগুলি অধিকাংশই চর্ম্মনির্ম্মিত। ঋগ্বেদে "ক্ষোণী" ও "কর্করীর" উল্লেখ রহিয়াছে। যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদে "দুন্দুভি" "ক্ষোণী" ও "ঢক্কার" নির্দ্দেশ পরিদৃষ্টমান্। কেবল যে রণবাদ্য ও রণাস্ত্র ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। তাহারা রণ-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। রণ-পরিচ্ছদের মধ্যে ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে লৌহবর্ম্ম ও লৌহ-শিরস্ত্রাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ সময়ে সময়ে সঙ্গীতাদির আলাপ-চর্চ্চায় আনন্দে কালক্ষেপ করিতেন। ঋগ্বেদে (৩৩।১৫) "শত-তার" "বীণার" উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণাদি গ্রন্থে "শত-তার" "অযুততার" "তাম্বুড" "কিন্নরী" "ক্যংশ" প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ যে গীতবিদ্যায় চরমে উঠিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—সামবেদ। সামবেদের ন্যায় রাগরাগিণীপূর্ণ সঙ্গীত-গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। ঋগ্বেদে (৩।৩২ ২৩) "শালগুঞ্জিকা" ক্রীড়ায় উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শালগুঞ্জিকা" তৎকালে মহাসমাদরে বিশিষ্ট সভায় স্থান পাইয়াছিল। অন্যান্য ক্রীড়াসামগ্রীও তৎকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার শত শত প্রমাণ বেদ ও পুরাণাদি গ্রন্থে আছে। *

---

* এই প্রবন্ধটী "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশনে পঠিত হয়। প্রবন্ধটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থাদির আলোচনায় তাঁহাদেরই মতের অনুসরণে লিখিত।

উপেক্ষিতা।

[শ্রীমতী কিরণবালা দেবী বিরচিত।]

"বৌদি! ও বৌদি! কোথায় গেঃ!"

বলিতে বলিতে একটী কিশোরী বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

মৃণাল তাহার হাতের পাঁইজ সম্মুখস্থ ডালায় রাখিয়া আনত-নয়ন-দুটী বালিকার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল,—"কেন বিনু।"

বিনু কোনও উত্তর না করিয়া সেই অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া রহিল। মৃণাল উঠিয়া সস্নেহে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"রাগ কর্‌লি বিনু।"

বীণা অভিমানে ফুলিয়া বলিল,—"আমার কি অধিকার তোমার উপর রাগ কর্‌বার।" বলিতে বলিতে তাহার ভাসা-ভাসা নেত্রযুগল অভিমানাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। অঞ্চল-প্রান্তে তাহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে স্নেহরুদ্ধস্বরে মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন ডেকেছিলি ভাই।" বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা ধীরে ধীরে বলিল,—"বিভা এসেছে, মতি এসেছে; তুমি হলেই চার জন হয়। তাসা খেল্‌বো তাই। তা তোমার আশা করা,—আর আঁধারে কিল ছোঁড়া—দুই সমান! সময় পেলেই কেবল দিনরাত শুধু—তুলো আর পাঁজ—তুলো আর পাঁজ!" অভিমান ভুলিয়া বীণা উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—"আচ্ছা বৌদি, চরকা কাট্‌বার সাধ তোমার কিসে হল বল দেখি? এমন সৃষ্টিছাড়া সখ্ তো বাপু সার্ত জন্মে দেখিনি।"

মৃদু হাসিয়া মৃণাল বলিল,—"কটা জন্মের কথা তোর মনে আছে ভাই।"

অপ্রতিভ-ভাবে মাথা হেলাইয়া বীণা উত্তর দিল,—"তোমার সঙ্গে কথা বলা বাপু আমাদের কাজ নয়। একটা বেফাঁস কথা বল্‌বার যো নেই! আচ্ছা লোক তুমি বৌদি!"

মৃণাল ততক্ষণে আবার পাঁজের তুলাটা তুলিয়া লইয়াছিল। বীণার আর সহ্য হইতেছিল না। বৌদিদিকে সে বিশেষভাবেই চিনিত। অভিমানের পুনরভিনয় করিয়া যে সেখানে আর কোনও সুফল পাওয়া যাইবে না, তাহাও সে জানিত। আজ পাড়ার মেয়েদের উপর কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়াই সে বৌদিদির শরণাপন্ন হইয়াছে। নহিলে এক খাইবার সময় সময় ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। যাহা হউক, এখন তাহার বৌদিদি না গেলে, নূতন তাস-জোড়াটীর সদ্ব্যবহার হয় না, নিরুপায় হইয়া তাই সকাতরে বীণা বলিল,—"এস বৌদি! দেরী কর্‌লে তারা সব চলে যাবে!"

শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে মৃণাল বলিল,—"দেখ্ বীণা, তোর এই তাস-খেলার বাতিকটা বড্ড সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জানিস্ তো, নল রাজা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এইরূপে পাশা-খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন! বেশী বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়। সেটা সর্ব্বক্ষণের জন্যে মনে রাখা দরকার।"

"তোমার ঐ এক কথা বৌদি! 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' যে লোকে কথায় বলে, এও তাই। তাস-খেলার সঙ্গে নল-রাজা যুধিষ্ঠির-রাজা এনে ফেল্লে! আমিরা তো আর বাজি রেখে খেল্‌ছি না।"

মৃণাল ধীরস্বরে বলিল,—"বাজি না রাখ; কিন্তু ওতে তোমার কত সময়ের অপব্যবহার হয়! যে সময় তুমি তাস খেলে ও বেড়িয়ে কাটাও, সে সময়টাতে তুমি অনেক ভাল কাজ কর্‌তে পার,—লেখাপড়া কত শিখ্‌তে পার! কর্ম্মই মানুষের জীবনকে ধন্য ও সার্থক করে। সময়ের বৃথা অপব্যবহারে জীবনটা বিফল—শূন্যগর্ভ কলসীর মত। শুধু সেটা ফাঁকা।"

অসহিষ্ণু বীণা বলিল,—"চুপ কর্ বৌদি!! আমি ওসব বুঝ্‌তে পারি না, আর বুঝেই বা আমার কি হবে?"

"হবার অনেক আছে, যদি বুঝ্‌তে চেষ্টা কর!"

"আঃ! জ্বালিয়ে তুল্লে দেখ্‌ছি! দাদা আস্‌বার আগে লিখে দেব,—তোমার জন্যে কিছু ঠাণ্ডা তেল আন্‌বে। তোমার দেখ্‌ছি মাথা খারাপ হয়েছে;—কর্ম্ম কর্ম্ম বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! পাগল হবার আর বেশী দেরী নাই! যাক্, যাবে কিনা তাই বল। ওরা সেই থেকে বসে আছে।"

মৃণাল কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল,—"যখন ছাড়্‌বেই না, তখন তাদের এখানেই ডাক। কিন্তু আমি আগে হ'তেই বলে রাখছি, এর পর আর আমায় বিরক্ত কর্‌তে পাব্‌বে না।"

মৃণালের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বীণা সঙ্গিনীদের ডাকিতে ছুটিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল—"সে দেখা যাবে তখন।"

(২)

বেলা প্রায় বারটা। সহরে যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই, সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেই, ঈশ্বর-চিন্তার পরিবর্ত্তে জঠর-চিন্তা,—আফিস ও স্কুল-কলেজের খোরাক-যোগানর জন্য রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হইতে হয়; পল্লীগ্রামে সেরূপ কোনও তাড়া না থাকায়, ধীরেসুস্থে গৃহকর্ম্মের শেষে রন্ধনের আয়োজন করিতে অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের গৃহেই এগারটা বারটা বাজিয়া যায়। মৃণালের সংসারেও তাহাই হইয়া থাকে।

নদী দূরে—ঝি জল আনিতে গিয়াছে। মৃণাল রন্ধনের আয়োজন ব্যস্ত। উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে। মাছ কুটিতে বসিয়া বেড়াল ও কাকের দৌরাত্ম্যে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। শিশুপুত্র ঘুম হইতে জাগিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, নিজের প্রাতঃসন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া, পৈতা পাক দিতে দিতে সেই যে পাড়ায় বাহির হইয়াছেন; এ পর্য্যন্ত ফিরেন নাই। বাড়ীতে এমন কোনও লোক নাই যে, তাহার কর্ম্মে সহায়তা করে বা শিশুটীকে একটু রাখে।

বৃদ্ধা ঝি একা সংসারের সকল কাজ পারিয়া উঠে না। তাহার অর্দ্ধেক কাজ মৃণালকে সারিয়া লইতে হয়। শাশুড়ীর পূজার আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিরামিষ-ঘরের রন্ধনাদি যাবতীয় কার্য্য এবং সংসারের সমুদয় কাজ একা মৃণালকে করিতে হয়। শাশুড়ী নিজেও কোনও সাহায্য করেন না, অথবা মেয়েকেও করিতে দেন না। মৃণাল

তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত নয়! সে নিজে ধনীর কন্যা হইলেও এই দরিদ্র-সংসারে আসিয়া অবধি অকুণ্ঠিতচিত্তে সকল কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। সে যে বড় লোকের মেয়ে, সে পরিচয় তাহার অন্তর বাহিরে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ননদী বীণার পাড়া-বেড়ান এবং অসংযত-স্বভাব শোধরাইয়া তাহাকে কর্ম্মকুশলা সংযতস্বভাবা করিবার জন্যই তাহার এত চেষ্টা। সে জন্য প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে শাশুড়ীর বাক্যবাণগুলি নীরবে সহ্য করিতে হয়!

আজ তাহার মেজাজের ঠিক ছিল না। সে ধৈর্য্য স্থির রাখিতে পারে নাই। আজ কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গিয়া ছেলেটীর কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। ছেলেটীকে কোলে করিয়া সে আজ রন্ধনে ব্যাপৃত। সে নিজে নিজেই বলিতেছিল,—"আর পারি না। ছেলে যে হ'য়ে পড়ে গিয়েছিল, যদি মরেই যেত। অত বড় ধাড়ি মেয়ে, তাকে দিয়ে কোনও উপকার পাবার আশা নেই! সেই সকালে কোথায় বেরিয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত খোঁজ নেই! ছেলেটাকে যে একটু দেখ্‌বে—"

মৃণালের কথা শেষ না হইতেই জলের ঘড়া নামাইতে নামাইতে ঝি বলিতে লাগিল,—"তুমি তাকে কোথা পাবে বাছা! দেখ গিয়ে, সে গাঙে সাঁতার কাটছে।"

মৃণালের এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ঝিয়ের কথায় তাহার দুই চোখ মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল। সে তীব্রস্বরে বলিল,—"কি—কি! কি কর্‌ছে বীণা।"

"কি কর্‌বে। গয়লাদের খাঁদি বিন্দির সঙ্গে সাঁতরে গাঙ পার হচ্ছে! মাগো,—তোমাদের ভদ্দর ঘরের অতবড় মেয়ে এমন বেহায়া! আমাদের ছোট নোকের আর দোষ কি!"

মৃণাল ঝির কথায় বাধা দিয়া ধীর-স্বরে বলিল,—"তুমি তাকে নিয়ে এলেনা কেন?"

"হুঁ। সে—সেই মেয়ে। আমি কত ডাকনু। আরও কত বাবুরা ছেলেন, তাঁরা কত বল্লেন। সে কথা শোনবারই মেয়ে বটে! হাটের কত নোক যাচ্ছে! তার শ্বশুর-বাড়ীর নোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে—বলে কত ভয় দেখানু। তা সে আমারই গাল দিলে! বাবা! ঘাটভরা নোক—কত নিন্দে কর্‌ছে! এ মেয়ে পরের ঘর কর্ত্তি পারবে না বৌদি, এ আমি বলে রাখনু—দেখো।"

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই চোখ জবা-ফুলের মতন্ লাল করিয়া এলোচুলে বীণা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই, রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া মৃণাল তীব্রস্বরে বলিল,—"বীণা! এ তোমার কি বেহায়াপনা বল দেখি! সাঁতার কেটে নদী পার হতে গিয়েছ! ঐ সব বদ্ মেয়েদের সঙ্গে না গিয়ে কি তুমি ঘরে থাক্‌তে পার না! এখন ত কচিটী নও! আজ হাটবার, তা তো জান! নদীর ধার দিয়েই তোমার শ্বশুর-বাড়ীর লোক-জন যায় আসে—তাও জান। যদি বলে দেয়! মা তো কিছু বল্‌বেন না! আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েকে আরও মাথায় তুলে দিচ্ছেন।"

মৃণালের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী-ঠাকুরাণী পৈতার টেকো হাতে পাড়া পরিক্রমণ করিয়া সে বেলার কমিটীর কাজ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। বধূর কথা কয়েকটী শুনিয়াই তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি আদর দেখ্‌লে বৌমা!"

শাশুড়ির অতর্কিত আগমনে মৃণাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও শঙ্কিত হইয়াছিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, গৃহিণী-ঠাকুরাণী সিক্তবস্ত্রে কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে কাপড় ছাড়িবার আদেশ করিলেন, এবং পুনরায় তেমনই রুক্ষস্বরে মৃণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি আদর দেখ্‌লে বৌমা।"

মৃণাল শাশুড়ীর কুঞ্চিত ভ্রূ ও কথার ভাবে আরও শঙ্কিত হইয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল,—"এই দেখুন না মা। আজ হাটবার, বীণা অতদূরে নদীতে সাঁতার কাট্‌তে গিয়েছিল! আপনার একেবারে শাসন নেই, একটু শাসন করা উচিত। এখন ত কচিটী নয়।"

"ওঃ। উচিত অনুচিত এই বুড়োবয়সে তোমার কাছে শিখ্‌তে হবে নাকি গা? পোড়া কপাল আমার।" এই বলিয়া মুহূর্ত্তে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কন্যার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"কোথা গেল সে মুখপুড়ি! দেখি—আজ তারই এক দিন, কি আমারই একদিন! ঐ হয়েছে আমার জঞ্জাল! ও মলেই আমার হাড় জুড়োয়। যমে যে ওকে ছুঁতে ভয় পায়।" কন্যার উপর এইরূপ আশীর্ব্বচন বর্ষণ করিতে করিতে এক-গাছা ঝাঁটা হাতে লইয়া তিনি কন্যার উদ্দেশে কক্ষ মধ্যে ধাবিত হইলেন।

মৃণাল এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া, সে শাশুড়ীর অনুগমন করিয়া ঝাঁটা গাছটা দূরে ফেলিয়া দিল; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ীর পা ধরিয়া বলিল,—"আমার ঘাট হয়েছে মা; ক্ষমা করুন।"

গৃহিণী সবলে পা ছাড়াইয়া লইয়া সরোষে বলিয়া উঠিলেন,—"আর ন্যাকাম করে পা ধর্‌তে হবে না! তুমি বড়-মানুষের মেয়ে; আমরা গরীব! গরীবের পায়ে হাত দিলে যে তোমার অপমান হবে। দিন নেই, রাত নেই, ওর পেছনে লেগেই আছ! বীণা এ কল্লে, বীণা ও কল্লে! কেন বাছা, বীণা যাই করুক না, তাতে তোমার বাপের মাথা মুড়া যায় কিসে? তোমাদের বড় মানুষের যা'তে তাতে জাত যায়; আমাদের কাঙ্গাল-গরীবের তাতে জাত যায় না। আর গেলেই কি, তোমার বড়-লোক বাপ এসে আমাদের জাতে তুলে দেবে? সতের গন্ধ বড় গন্ধ! সে যায় কোথা! লোকে কথায় বলে,—'হাঁজার কর হাঁই ফাঁই, বাঁজির পেটে ছেলে নাই।' আমি দিন-রাত ওঁদের জন্য গতর খাটিয়ে মর্‌বো; আর উনি আমারই মেয়েকে দিনরাত গালমন্দ ছাড়া কথাই কইবেন না! এত সইব কেন গা?"

মৃণাল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে রন্ধনশালাভিমুখে চলিয়া গেল।

(৩)

গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া নিজ কক্ষে বসিয়া, মৃণাল একখানা বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল এবং বারংবার বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছিল। আজ বীণা স্বামীর ঘরে চলিয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতে যে কয়দিন বীণা ছিল, ইহার মধ্যে এক দিনও গৃহিণী বীণাকে মৃণালের কাছে যাইতে দেন নাই। বীণাকে মৃণাল যে নিজের বোনের মতই ভালবাসে-স্নেহ করে। তাই সে শুধু তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহার দোষ

সংশোধন করিতে যায়! বীণার মত মৃণালের একটী বোন ছিল। তাহার বিবাহের অল্পদিন পূর্ব্বেই সে মারা যায়। তাই বিবাহের পর সে বীণাকে পাইয়া প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। শাশুড়ীর একটা মাত্রাহীন অন্ধ আদরে এবং সুশিক্ষার অভাবে বীণার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বিকাশ পাইবার পরিবর্ত্তে একটা দুর্দ্দমনীয় রাগ, জেদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা-ঔদ্ধত্যে সে স্থান ভরাট করিয়া দিয়াছিল। তাই মৃণাল নিপুণ শিল্পীর মত ধীরে ধীরে তাহার দোষগুলি খুঁটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া সেখানে সদ্‌গুণের ও সুশিক্ষার বীজ বপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। শাশুড়ীর শত নির্য্যাতনে এবং বীণার উপেক্ষা ও অবাধ্যতায় সে কদাচ নিরুৎসাহ হয় নাই। কোন্ পথে চলিলে তাহার শ্রম সার্থক হইবে, কি ভাবে লওয়াইলে বীণার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, সৎশিক্ষা সদালোচনায় বীণা আদর্শ রমণী মধ্যে গণ্য হইবে, মৃণালের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এত তিরস্কার এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও যে সে বীণার মঙ্গল-চিন্তায় আবার যে তাহাকে শোধরাইতে যায়, সে তো শুধু বীণাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে বলিয়াই! নহিলে তার এত মাথা ব্যথা কেন? সে তো অনায়াসেই দূরে সরিয়া থাকিতে পারে!

সেই দিন হইতে তাহার শাশুড়ী বীণাকে রান্নাঘরে থাইতে পর্য্যন্ত দেন নাই। অন্য বাড়ী হইতে ভাত-মাছ মেয়েকে আনিয়া দিয়াছেন। মৃণাল কি বলিতে গিয়াছিল; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"অত আদর দেখান হচ্ছে কি ওকে মেরে ফেলবার জন্য!" তবুও মৃণাল মনকে দমন করিতে পারিত না; বীণাকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার তৃষিত হৃদয়খানি উন্মুখ হইয়া থাকিত। সে জানিত, বীণাও তাহাকে ভালবাসে; যে কোন সময় সে "বৌদি" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু এ কয় দিনের মধ্যে একবারও তো সে আসিল না। মৃণাল হঠাৎ একদিন শুনিল—বীণা তাহার শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। কে জানে—কত দিনের মত বীণা চলিয়া গেল! তাহার শাশুড়ী শয্যাগত। কত দিনে সে আবার আসিতে পাইবে, কে বলিবে!

এই যে বীণা চলিয়া গেল, এক বার দেখাটাও করিয়া গেল না! বীণার শত দোষের মধ্যে যে সরলতাটুকু ছিল, সেটুকুও কি সে ছিঁড়িয়া ফেলিল!

(৪)

দিন দুই পরে, আহারাদির পর, মৃণাল ছেলেটীকে ঘুম পাড়াইতেছিল; সহসা শাশুড়ীর উচ্চ চীৎকার শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। একটা নূতন বিপৎ-পাতের আশঙ্কায় সে উঠিয়া জানালায় ধারে গিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় সহসা হরির মা কক্ষে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি-সহকারে বলিতে লাগিল,—"ওগো! বীণা বীণা করে যে মাথা-মুড় ভাঙ্গছিলে, খেতে শুতে বীণার জন্যে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলে! দেখগে যাও,—বীণা আবার পালিয়ে এসেছে। মা গো! এমন ছিষ্টিছাড়া মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি।"

ঝির বাক্যে এবং গৃহিণীর চীৎকারে যথার্থ কারণ উপলব্ধি করিতে মৃণালের বিলম্ব হইল না। সে চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া, ঝি বলিল,—"চুপ ক'রে রৈলে যে! বীণাকে আদর ক'রে ঘরে তোলগে না।"

ঝিকে গমনোদ্যত দেখিয়া মৃণাল ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,—"কেন পালিয়ে এল।"

"সে পরে শুনতে পাবে গো। এখন যাই। গিন্নী জামাই-বাড়ী প'ার ধুলো দিয়ে একটু মিষ্টিমুখ করাবেন কিনা! যাই—তাঁর সঙ্গে যেতে হবে!"

মৃণাল কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা কি ভাবিয়া সে ধীর পাদক্ষেপে শাশুড়ীর নিকট গমন করিল এবং মিনতিপূর্ণস্বরে বলিল,—"মা, এই একাদশীর দিনে এই রদ্দুরের ভেতর নাই বা গেলেন! উপোস ক'রে আছেন!"

গৃহিণী কক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"উনি আবার এলেন সাউকারী কর্ত্তে! যাই না যাই—সে আমার খুসী। তোমার কাছে তো পরামর্শ নিতে যাইনি! ও সব গায়ে পড়ে সব্‌ফরাজি কর্‌বার কারো দরকার নেই। আমার মেয়েকে সে অলপ্পেয়ে, আঁটকুড়ির বেটা যা তা বল্‌বে—মার্‌বে, আর, আমি কিছু না বলে, ওঁর পরামর্শ শুনে, ঘরে চুপ করে বসে থাক্‌বো?" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শাশুড়ী যাইবার পর, মৃণালের বিশ্বাস ছিল, বীণা অবশ্যই একবার তাহার কাছে আসিবে; প্রকৃত ঘটনাটা তাহার মুখে শুনিতে পাইবে। বীণা যখন আসিল না, তখন মৃণাল উদ্বিগ্ন-মনে শাশুড়ীর ঘরের দিকে যাইতেই দেখিতে পাইল,—তাহাদের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে গোয়ালাদের বাড়ীতে বীণা গয়লার মেয়েদের সঙ্গে তাস-খেলায় মাতিয়া গিয়াছে,—'বিন্তি পঞ্চাশ' ডাকিবার উচ্চকলরবে সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। যে বীণার জন্য মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মৃণালের হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছিল, তাহাকে একা রাখিতেও ভরসা হইতেছিল না; মনে হইতেছিল,—কি-জানি মনের কষ্টে যদি কোনও অনর্থ করিয়াই বসে, কিন্তু, এমন একটা কেলেঙ্কারী করিয়া আসিবার পর মুহূর্ত্তেই কিনা, সেই বীণা অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাস-খেলায় মাতিয়াছে। রাগে দুঃখে ঘৃণায় মৃণালের চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

জামাতার গৃহ হইতে ফিরিতে গৃহিণীর সন্ধ্যা অতীত হইল। তাঁহার চীৎকারে মৃণালের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আজ একটা গুরুতর রকমের অনর্থ বাধাইয়াই তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন। ইঙ্গিতে হরির মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই সে হাত উল্টাইয়া মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বলিল,—"একেবারে থালাস!" শঙ্কা-জড়িত স্বরে মৃণাল বলিল,—"কেমন!" ঝি উত্তর দিল,—"এই আর বীণাকে সে ঘর করতে হবেনা গা! গিন্নি গিয়েই, বেয়ান আর জামাইকে হাড়ি-ডোম যা-তা বল্লে; কত গাল দিলে! জামাই বাবু যত বলেন—'চুপ করুন, আর মুখ হাসাবেন না, আপনার মেয়ে আমরা না আন্‌লেই ত হল!' কিন্তু গিন্নি কি তা মানেন! বলে কি না,—'যদি আমার মেয়ে আন্‌তে যাস—'! বৌদি সে আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।" মৃণাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বীণার শাশুড়ী কিছু বল্লেন না?"

"তিনি আর কি বল্‌বেন! বলবার ক্ষ্যামতা কি তানির আছে গো! রোগে ক'খানা বাঁথারী হয়ে গিয়েছেন। দু'চোখ বুঁজ্‌তে এখন যে কদিন দেরী!"

মৃণাল স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অবশেষে কি ভাবিয়া স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইবার জন্য উঠিয়া গেল।

ছয় মাস অতীত হইল। বীণার স্বামী অমরনাথের কাছে মৃণাল অনেক অনুরোধ উপরোধ

করিয়া এক পত্র লিখিল। তাহার শাশুড়ীর রাগ হইলে যে জ্ঞান থাকে না—তাঁহার কথা ধর্ত্তব্য নয়,—এইরূপ সাত পাঁচ লিখিয়া, অবশেষে লিখিল,—"স্বামীই স্ত্রীলোকের শিক্ষক ও গুরু। এ সংসারে স্বামীই এক মাত্র অবলম্বন। সামান্য একটা তুচ্ছ কলহের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীকে কে কোথায় পরিত্যাগ করে। শীঘ্রই যেন তিনি দয়া করিয়া বীণাকে লইয়া যান। স্বামীর আশ্রয়ই স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়! বীণা এখনও বালিকা। তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া, তাহার দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা কর। তাহাকে ক্ষমা করা কি এতই কঠিন! সাপ-বাঘও তো লোকে বশীভূত করে। একটা অজ্ঞান বালিকার চঞ্চল স্বভাবকে স্নেহ ও ক্ষমার আবরণে ঢাকিয়া ফেলাটা কি এতই দুরুহ।"

মৃণালের বিশ্বাস ছিল, অমর তাহাকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে,—তাহার সম্মান রক্ষার জন্যই হোক্ অথবা চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক, সে একেবারে 'না' জবাব দিতে পারিবে না। কিন্তু চিঠির উত্তর পাইয়া মৃণাল চক্ষে অন্ধকার দেখিল। অন্যান্য কথার পর অমর লিখিয়াছে,—"আপনার আদেশ রাখিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি, ক্ষমা করিবেন। লোকের উপহাস-নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে কতরূপে বুঝাইয়াছি। তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতে লিখিয়াছেন। ক্ষমাও তাহাকে যথেষ্ট করা হইয়াছে। সামান্য কারণে অকারণে সে পলাইয়া যায়। শাসন করিতে গেলেই আত্মহত্যার ভয় দেখায়, এবং লোকের কাছে গিয়া বলে,—তাহাকে মার-ধর করা হইয়াছে। আশা করি, এই দারুণ অপ্রীতিকর বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখে আমাকে বেদনা দিবেন না। আপাততঃ তাহাকে আনিবার সামর্থ্য আমার নাই। কখনও হইবে কিনা, জানি না। আমার রুগ্না মাতাকে লইয়া আমি বড় বিপন্ন।" পুঃ নিঃ—"শাশুড়ী ঠাকুরাণীর উপর আমার কোনও রাগ নাই জানিবেন। ইতি।"

(৫)

বৎসর না ঘুরিতেই কন্যার স্নেহ কাটাইয়া গৃহিণী যেদিন অজানিত পথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, যে চিন্তা তিনি কোনও দিন মনে স্থান দেন নাই, কি জানি কেন, সেই দিন সেই চিন্তায় তিনি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন চক্ষুদুটী বধূর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া, তাহার হাতের উপর শোকাকুলা বীণার কম্পিত হস্তখানি রাখিয়া, তিনি বলিলেন—"বৌমা, এত দিন তোমায় চিন্‌তে পারিনি মা! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে থাক্‌বে। বীণাকে আমার আজ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। আমার পাপের জন্য বীণা যেন আমার চিরদিন দুঃখ না পায়।" বীণাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"বীণা। তোমার চারিদিক আমি আঁধার করে দিয়ে গেলাম। তোমার বৌদিদির কথা শুন। আমি আশীর্ব্বাদ করি, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে।"

মাতৃবিয়োগের পর সত্য সত্যই অসহায় শিশুর মত একান্ত নির্ভরে বীণা তার বৌদিদির কাছে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। মৃণাল সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সেই উদ্ধত অসংযত বীণা এত শীঘ্র কেমন করিয়া এত রূপান্তরিত হইয়া গেল। একদিন ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ভাবে বীণা বলিল,—"বৌদি, তোমরা আর বাড়ী যাবে না!"

মৃণাল বলিল,—"কেনরে, তোর কি বাড়ী যেতে ইচ্ছে হয়!"

বীণা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল,—"বাড়ীতে আর কেই বা আছে, আর কার কাছেই বা যেতে ইচ্ছে হবে।" জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে বলিল,—"শাশুড়ীও বেঁচে নেই! একলাটি কি করে আছেন, কেমন আছেন, তাই—।" বীণা মুখ নত করিল।

মৃণাল অন্তরে অন্তরে বড় প্রীতি অনুভব করিল। পাষাণে যে দাগ বসিয়াছে, সে আভাষ সে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আজ বীণার নিজের মুখে তাহা স্পষ্ট শুনিয়া সেটা বিশ্বাসে পরিণত হইল। মৃণাল দেখিল, বীণার আনত নয়ন-দুটিতে জল টল্‌টল্ করিতেছে। মৃণালের স্নেহাকুল হৃদয়খানি অনুতপ্ত বীণাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া দুটি আশার কথায় তাহার বেদনাতুর হৃদয়খানিকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও সে আত্ম দমন করিয়া নিজের মনেই বলিল,—"এখনও সময় হয় নাই। খাদ পুড়িয়ে খাঁটি সোণা করিতে হইবে।" একটুখানি হাসিয়া প্রকাশ্যে শুধু বলিল,—"ভারি দরদ দেখছি যে। আচ্ছা, কালই চিঠি লিখে জানব।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর পাঁজটা বীণার ডালায় দিতে দিতে মৃণাল বলিল,—"এত শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন বীণা। মুখ যে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে! কোনও অসুখ বোধ হয় কি?"

বীণা সুতাটা জড়াইতে জড়াইতে কহিল,—"কৈ, না!"

"না-ছাড়া হাঁ যে বল্‌বি না, সে আমি জানি। যাইহোক, দিনরাত অত পরিশ্রম করাটা এ রোগা শরীরে পোষাবে না। তা তোমার সঙ্গে আমি আমি ত কিছুতেই পেরে উঠি না! আজ তোমার দাদা আমায় কত বক্‌লেন! তোমার এই রোগা শরীর! রোজ রান্না কর্‌বে! আগুনের আঁচ সইবে কেন? কবে তুমি বিছানায় পড়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি আর রাঁধ্‌তে যেওনা। আমি আগে হতেই বলে রাখ্‌ছি। কথা না শুন্‌লে, তোমার ভাল হবে না।"

এই বলিয়া, মৃণাল বীণার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল। বীণা জানিত, তাহার বৌদিদির কথা ও কাজ এক। তাই সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"অত বড় সাজা আমায় দিওনা গো বৌদি! তোমার পায়ে পড়ি, ওকাজও যদি আমার না থাকে, কি নিয়ে কি করে আমার দিন কাট্‌বে। তোমরা কিছু ভেব-না, আমার কোনও অসুখই নাই!" বলিতে বলিতে বীণার চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মৃণাল কি বলিতে যাইতেছিল; এমন সময়, জুতার শব্দে চমকিত হইয়া চাহিতেই, মৃণালের মাসতুত-ভাই নবীন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। স্মিতহাস্যে মৃণাল বলিল,—"এমন অসময়ে হঠাৎ দিদির কথা মনে পড়্‌ল যে! বাড়ীতে সব ভাল ত। তুমি ভাল আছ ত। বস।"

নবীন জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"হাঁ, সব ভাল। তুমি এখানে আছ, কি করে জান্‌বো! কাল শ্যামবাজারের ট্রামে হঠাৎ মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা। আমি তাঁর কাছে বলেছিলাম তো আজ আসব।"

"কাল আমায় বলেছিলেন বটে! তবে, সত্যিই যে তুমি আস্‌বে, সে আমার বিশ্বাস হয়নি।"

নবীন মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমায় এত অবিশ্বাসী ঠাওরালে কেনে?"

মৃণাল বলিল,—"ভাগলপুরের কথা ভুলে গেছ নাকি ?"

"ওঃ। সে ত অনেক দিনের পুরাণো কথা? আমি একটা নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া, তা জানত দিদি।"

"বিয়ে কর্‌বিনে, সে কার দোষ।"

"দেয় কে! এমন একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে কোন মেয়ের বাপের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে, ভরসা করে মেয়ে দেবে! যাক্! উঃ!—যে রোদ, বড় তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল দাও ত দিদি!"

মৃণাল বীণার দিকে চাহিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। মৃণাল তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলিল,—"যাও ত বীণা, ঝিকে দিয়ে এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দিয়ে তুমি গোটা-কতক পান সাজগে।"

নবীন বলিল,—"শুধু জলটা দাও দিদি! সন্দেশ এখন থাক্। এই সবে খেয়ে আস্‌ছি।"

"কেন এত বেলায় যে। ছুটী আছে বুঝি!"

"না, কলেজের তো কোন তাড়া নেই। বেলায় আমাদের কলেজ!"

"তা হোক্। সন্দেশ দুটোতে আর তোর পেট ফেটে যাবে না! খেয়ে ফেল!"

নবীন সন্দেশ দুটি গালে পূরিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল নিঃশেষ করিয়া গ্লাস্‌টা রাখিতে রাখিতে বলিল,—"বাঃ! বেশ সুন্দর সন্দেশ তো দিদি। ঠিক নাটোরের রাঘবসইয়ের মতন! এ সন্দেশ এখানে কি করে পেলে? ফর্‌মাস দিয়ে আনিয়েছ বুঝি!"

মৃদু হাসিয়া মৃণাল বলিল,—"কোথাও থেকে আনান-টানান হয়নি! বীণা ঘরেই এ সব করে! ও যে একজন পাকা হালুইকর।"

প্রশংসমান চক্ষু-দুটি তুলিয়া আগ্রহভরে নবীন জিজ্ঞাসা করিল,—"ও মেয়েটী তোমার কে হয় দিদি!"

"ননদ।"

"তোমার ননদ আছে নাকি। তাত জানি না।"

মৃণাল দ্বারপ্রান্তে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল,—"সৎ।"

"ভাগলপুরে যখন ছিলে, তখন কি তোমার ননদ সঙ্গে ছিল!"

"হাঁ, ছিল বৈকি।"

"তা ওঁর বিয়ে হয়েছে কোথায়?"

মৃণাল অত্যন্ত সঙ্কুচিত-ভাবে বলিল,—"দেশেই হয়েছে, বাঁড়ুয্যেদের ঘরে। তা তারা ওর খোঁজ-খবর ত নেয় না!"

"কি রকম?"

"রকম মানে—দোষ দুপক্ষেরই ছিল। তবে আমার শাশুড়ীর দোষটাই ছিল বেশী। বীণার স্বামী ছাড়া কেবল এক অন্ধ শাশুড়ী ছিলেন। বীণার তখন সবে তের চৌদ্দ বৎসর বয়স বৈ ত নয়! ছেলে মেয়েদের ছোট বেলা থেকে শাসন-শিক্ষা না দিয়ে বেশী আদর দিলে যা হয়ে থাকে, ওরও তাই হ'য়েছিল। স্বামী শাশুড়ী কিছু বললেই মেয়ে পালিয়ে

আস্‌তো। আমার শাশুড়ীও মেয়ের পক্ষ হ'য়ে তাদের গালাগালি দিতেন! এমনি হ'তে হ'তে শেষ তাঁদের দু'পক্ষের দোষে এখন মেয়েটার মরণ! এখন ছেলেবেলার দোষগুলো ত সবই শুধ্‌রে গেছে! বয়েস হয়েছে, নিজের ভাল-মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছে; বুঝে, বেঁচে ম'রে আছে।"

"তোমরাও কি পাঠাবার চেষ্টা করনি?"

"হাঁ, উনি বীণাকে রেখে আস্‌তে চেয়েছিলেন। সে অনেক দিন আগে। তাতে সে লিখ্‌লে যে,—'যদি ভাত-কাপড় দিতে কষ্ট বোধ করেন, তাহ'লে আপনার বোনকে রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠিয়ে দিবেন। শুনেছি সেখানে অনেক অনাথা প্রতিপালন হয়!' সেই চিঠি পেয়ে, উনি ত একেবারে রেগে আগুন। আমায় শুদ্ধ কত বক্‌লেন। আমিই ওকে পাঠাতে ব'লেছিলাম কিনা! কি বলবো ভাই, বেচারার মুখের দিকে চাইতে আমার বুক্ ফেটে যায়।"

নবীন কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিল,—"বড় দুঃখের কথা ত? ঐ জন্যেই অনেকে ঘরের কাছে বিয়ে দিতে রাজী হয় না। সে ছেলে বুঝি আবার বিয়ে করেছে!"

"না। তা ঠিক জানিও না। এই ত প্রায় ছয় বছর হ'তে চ'ল্‌লো, তার কোনও খবর জানি না। দেশে চিঠি লিখেছিলেন,—আমার জ্ঞাতি খুড়শ্বশুরের কাছে! তিনি লিখেছিলেন,—'তার মা মারা যাবার পর সে গয়ায় গিয়েছিল।' আর কোনও খোঁজ কেউ জানে না। সন্ন্যাসীই হলো, কি কোথায় বিবাগী হয়ে গেল, কেউ বল্‌তে পারে না।" ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিবার পর, মৃণাল বলিতে লাগিল,—"লোকে শিক্ষিত শিক্ষিত বলে যে গর্ব্ব করে, আমার কিন্তু মনে হয়, বিদ্বান গোঁয়াড়ের চেয়ে মূর্খ ভাল। এই দেখ না, অমরেনকে বিদ্বান্ দেখেই না উনি তার অবস্থার বা কোনও কিছুর দিকে লক্ষ্য করেন-নি! শুধু শিক্ষিত ছেলে ব'লেই না বোনকে তার হাতে দিয়েছিলেন! একটা তুচ্ছ কথার ঘোঁটের জন্যে, সেই কথা কথা মনে রেখে কিনা সে চিরজন্মের মত স্ত্রীকে ঠেলে রেখেছে।"

নবীন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"অমরেন। কোন্ অমরেন।"

বিস্মিত মৃণাল বলিল,—"তুমি চেন নাকি? নেত্রকোণার ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যের ছেলে।"

"ওঃ! হাঁ, আমাদের সেই অমরেন বাঁড়ুয্যে নয় তো? আচ্ছা, আজই জেনে তোমায় জানাব।"

মৃণাল ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"লক্ষ্মী ভাইটী আমার। যদি তাকে চিনিস্, তাহ'লে—"

নবীন বাধা দিয়া বলিল,—"আঃ! দিদি তুমি পাগল! যদি সেই ঠিক হয়, তাহ'লে যত শীঘ্র সম্ভব জানাব—নিশ্চয় বল্‌ছি।"

মৃণাল আত্মদমন করিতে পারিতেছিল না, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—বলে যে, "তুমি এখনই গিয়ে, জেনে এসে ব'লে যাও—সে অমর কিনা!" কিন্তু মনের ইচ্ছা সব সময় কার্য্যে পরিণত করা চলে না;—অদম্য হইলেও দমন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইতে হয়!

মৃণালের চিন্তায় বাধা দিয়া নবীন বলিয়া উঠিল,—"ওটা কি দিদি?" নবীন ঘরে প্রবেশ

করিবা মাত্র মৃণাল তাড়াতাড়ি চরকা ও তুলা প্রভৃতি খাটের তলায় সরাইয়া রাখিয়াছিল। মৃণালের ইচ্ছা নয়—ওগুলো কাহারও চোখে পড়ে। কিন্তু নবীনের দৃষ্টি হইতে তাহার প্রিয় অথচ গোপনীয় জিনিসটী রক্ষা পাইল না দেখিয়া, সে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নবীন গিয়া সেটা টানিয়া বাহির করিয়া বলিল,—"দিদির এ ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হ'ল!"

লজ্জিতা মৃণাল উত্তর করিল,—"ও ত অনেক দিনের খেয়াল।"

নবীন বলিল,—"এ জিনিসটা আজকালকার কালে নূতন বটে!" তার পর সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—"তা দিদি, তুমি অত লজ্জিত হচ্ছ কেন? তোমার এই যথার্থ উপকারী এবং (না, ঠিক হ'চ্ছেনা কি বলে বুঝাব—ধর, এই না, হাঁ) তোমার এই আদর্শস্থানীয় এই কাজ, যদি আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা—গৃহস্থ-গৃহের মহিলারা—সংসারের পাঁচটা কাজের সমান ক'রে কর্‌তেন, তাহলে আজ এই গরিব দেশের কত উন্নতি হতে পার্‌ত। জান ত, এই যুদ্ধের জন্য কাপড়ের বাজার দিন দিন চড়ে যাচ্ছে, বিলাত থেকে তো আর সুতো আস্‌ছে না!" একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থেরই আয় অতি সামান্য। তাতে, ব্যয়-সঙ্কুলান করে পরার কাপড় কেনা কত কঠিন? পেটে না খেয়ে চতুর্গুণ দাম দিয়ে কাপড় তো কিনতেই হবে। যাঁর সংসারে পোষ্য বেশী অথচ আয় কম, তাঁর অবস্থা একবার ভেবে দেখ। তার পর মেয়ের বিয়ে!" আবার একটু ভাবিয়া লইয়া সে বলিতে লাগিল,—"আচ্ছা দিদি, এই সুতো দিয়ে কি কি করেছ!"

মৃণাল এই কার্য্যে এতটা উৎসাহ কোনও দিন কাহারও নিকট পায় নাই। তাহার স্বামী ভাল-মন্দর বিচার বড় করিতে জানিতেন না। তাঁহার ঠিক সময়টিতে চারিটি ভাত, সে যাহা দিয়াই হোক না কেন, পাইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন। কোনও বিষয়েরই ভিতরের খোঁজ-খবর লইতে কোনও চেষ্টা কোনও দিন তিনি করেন নাই। তাই আজ সর্ব্বপ্রথম তাহার এই প্রিয় কার্য্যটীতে উৎসাহ পাইয়া, মৃণাল তাহার কক্ষ-মধ্যস্থ চেয়ার টেবিল হইতে জানালার পর্দ্দা পর্য্যন্ত সমস্ত একে একে ভ্রাতাকে দেখাইতে লাগিল। চরকায় সুতা কাটিয়া টেকোয় পাক দিয়া ক্রমে কেমন সুন্দর সুন্দর জিনিস তাহারা বুনিয়াছে। নবীন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহার বুদ্ধির ও গুণের শত প্রশংসায় তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত মৃণাল অব্যাহতি পাইবার আশায় বলিল,—"থাক—থাক! অত প্রশংসা করিস্‌নে—গলে যাব শেষটা। আর, এ গুলোর জন্যে প্রশংসাটা সত্যিকারের পাওনা হচ্ছে—বীণার! সেই এগুলো করেছে,—আমার অত ধৈর্য্য নেই। শুধু—"

"চুপ কর্‌লে কেন দিদি? শুধু কি?"

মৃণাল মৃদু হাসিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"বল্‌ছিলাম কি যে, শুধু এই নয়! এর চেয়েও দরকারি জিনিস আমাদের নিজের কাটা সুতোয় আমরা পাই!"

"কি রকম!"

"এই আমরা সুতো কেটে দেশে জোলাদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তারা গামছা বিছানার চাদর বুনে বুনে পাঠিয়ে দেয়। একটু মোটা হয় এই যা—"

এই বলিয়া, মৃণাল বিছানার চাদর বাহির করিয়া ধরিতেই, নবীন তাহার হাত হইতে চাদরখানা টানিয়া লইয়া, দেখিতে দেখিতে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ! চমৎকার জিনিস! তোমাদের হাতের সুতো দিয়ে কাপড় বুনিয়ে এবারে আমায় দিতে হবে কিন্তু। দেখো—সে কাপড় পেয়ে আমার কি আনন্দ—কি তৃপ্তি হয়।"

মৃণাল ভ্রাতার আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সে কিবে? সে যে বড় মোটা হবে?"

"সে—হোক দিদি মোটা! সেই মোটা কাপড়ে আমায় যে আনন্দ যে গর্ব্ব দেবে, এ ঠিক জেন, নদে-শান্তিপুরের কাপড় তার শতাংশের একাংশও দিতে পারবে না। এ আমি নিশ্চয় বল্‌ছি। আমার দিদির মতন যদি প্রতি ঘরে ঘরে এম্‌নি লক্ষ্মী থাক্‌তেন, তাহলে কি আমরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হই! কবে আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা নাটক-নভেল-বিলাসিতা ত্যাগ করে আমার দিদির আদর্শ নিয়ে এই দুঃখ-দৈন্য-ভরা দেশকে, আবার তাঁদের পুণ্য আলোকে উজ্জ্বল করে তুল্‌বেন। দিদি! সত্য বল্‌ছি—আমাদের জাতির কেন্দ্রস্বরূপা স্ত্রীজাতি যদি বিলাসের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেন, তবে আমরাও বিষহীন ঢোঁরা সাপের মতন বাহ্য সাজসজ্জার চটকে ভুলে, নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যে অর্থ সংগ্রহ কর্ত্তে হয়, সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে বিলাসিতার জিনিস আহরণে ব্যস্ত না হব কেন।"

"মা, পিসিমা বল্লেন—জলখাবার হয়ে গেছে।"

নবীনের বক্তৃতার ঝাঁঝে মৃণাল কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যার কথায় যেন তাহার চৈতন্য করিয়া আসিল।

মৃণালের কণ্ঠস্বরে নবীনের হুঁস হইল। সে সহসা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,—"চারটে বাজ্‌তে পনের মিনিট। দিদি! তাহলে আজ আসি। আবার গোয়েন্দাগিরি কর্ত্তে হবে।"

"বীণার খাবার তৈরী হয়ে গিয়েছে—একটু বস।"

"আঃ! কেন মিছিমিছি তাকে এই গরমের ভিতর কষ্ট দিচ্ছ।"

"তোমার জন্যে তার কোন কষ্টই হয়নি। সে ত রোজই করে? দুবেলা রান্না থেকে সংসারের কাজ, ছেলে-পুলে দেখা,—সব সে একাই করে। কুটোগাছা দুখানা কর্‌তেও সে আমায় দেয় না।"

নবীন বলিল,—"আহা! এমন লক্ষ্মীকে যে কষ্ট দেয়, সে পাষণ্ড নয় ত কি?"

বৃদ্ধা ঝি হরির মা জলের গ্লাস ও আসনটা রাখিতে রাখিতে কহিল,—"ওগো পরশ পাথরের সঙ্গে থেকে লোহা সোণা হয়েছে। বীণু কি অম্নি ছিল? বৌদি যে আমাদের পরশ পাথর!"

জলযোগান্তে নবীন মৃণালকে প্রণাম করিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। মৃণাল বারংবার তাহার অভীষ্ট বিষয় স্মরণ করাইতে করাইতে সিঁড়ি বাহিয়া সদর ফটক পর্য্যন্ত ভ্রাতার অনুগমন করিল।

(৬)

সকাল হইতেই নবীনের আসার আশায় বার বার রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া, মৃণাল গৃহ-কার্য্যে মন দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় নবীন আসিয়া ডাকিল,—"দিদি!"

"কে—নবীন! বেশ লোক। সেই সকাল থেকে তোমার আসার আশায় চেয়ে আছি? এতক্ষণে বুঝি তোমার ঘুম ভাঙ্গলো।"

বাধা দিয়া নবীন বলিল,—"ঘুম অনেকক্ষণই ভেঙ্গেছে। হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে আস্‌তে যেটুকু দেরী। তা এখনও সাতটা বাজেনি যে! কোথায় শ্যামবাজার, আর কোথায় তোমাদের ভবানীপুর! দূর তো বড় সোজা নয়?"

নবীনের বেশী কথা বলা চিরদিনের অভ্যাস। মৃণালের সহিতেছিল না। সে বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আসল যা কাজের কথা, তাই আরম্ভ কর তো শুনি! এ কয় দিন যে কি ক'রে আমার কেটেছে, সে আর কি বল্‌বো।"

"কাজের কথা এই যে, জালে মাছ পড়বার আর বেশী দেরী নেই!

উৎফুল্ল হইয়া মৃণাল বলিল,—"কি রকম!"

"রকম এই ধরে নাও" বলিয়া নবীন মৃণালের কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি কি বলিল।

মৃণাল ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল,—"অনেক দূরে ত এগিয়েছে! এখন শেষ রক্ষা হলে ত?"

"সে ঠিক হয়ে যাবে, যে কাজে শর্ম্মা হাত দিয়েছেন, সে কোনও ফাঁকেই ফস্কাতে পার্ব্বে না, এ ঠিক জেনো। তোমাদের জন্যে একবারে পাকা জোচ্চুর হতে হয়েছে কিনা?" একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল,—"ছোঁকরা বাইরে যেমনই হোক্ না, ভিতরটায় বেশ সরল। আমার কথায় কোনও রকম সন্দেহ না ক'রে, বরাবর বিশ্বাস করে আস্‌ছে! এ যদি আগে জান্‌তাম! যাক্, ও বোধ হয় এখনও জানে না যে, তোমরা এখেনে আছ! দেখ, এ সব যেন প্রকাশ পায় না দিদি। শেষটা গরীবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি না হয়! যাক্ দুটো পান দাও। তাড়াতাড়িতে চা খেয়ে পান খেতেও সময় হয়-নি।"

আনতবদনে পানের ডিবাটী মৃণালের হাতে দিয়া বীণা ধীরপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলে, নবীন বলিল,—"মেয়েটাকে দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়, দিদি। কি বলবো, নৈলে—"

মৃণাল জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"তুমি ভাই ওর জন্যে যা কর্‌ছ, সে আর মুখে বলে কি ক'রবো। এখন ওর অদেষ্ট!" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃণাল বলিল,—"হাঁরে নবীন, বীণার কথা অমর কিছুই কি তোকে বলে না? এই যে সে আবার বিয়ে কর্ত্তে রাজি হচ্ছে, এতেই তো বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বীণার উপর ভালবাসা দূরের কথা—তার।"

বাধা দিয়া নবীন বলিল,—"তোমরা যা-ই বল দিদি, লোক সে নেহাৎ মন্দ নয়? তবে রাগটা ওর বরাবরই বেশী। মেসে তো আমরা অনেক দিন থেকেই এক সঙ্গে আছি। ওর রাগের জ্বালায় সকলেই ওকে একটু-আধটু ভয় করে চল্‌তে বাধ্য হয়। এমন কি, বামন চাকরকে শুদ্ধ তটস্থ থাক্‌তে হয়। তুমি জিজ্ঞেস কর্‌ছ, বীণার কথা বলে কি

না! এ কি বুঝছো না দিদি, সে যেমনই হোক, লেখা পড়া শিখেছে! আর নিজের বিবাহিতা স্ত্রী তো বটে!"

মৃণাল বলিল,—"তার যদি এতই জ্ঞান আছে, তবে স্ত্রীকে গ্রহণ না করে আবার বিয়ে কর্‌তে যায় কেন?"

নবীন ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল,—"তুমি কি মনে কর, এক কথাতেই সে রাজী হয়েছে? প্রথম যখন তাকে বিয়ের কথা বলি, তখন সে বল্‌ল—'কেন, আমি কি অবিবাহিত—না, আমার স্ত্রী মরেছে!' আমি বল্‌লাম, তাকে নিয়ে যখন ঘর কর্ত্তে পেলে না, তখন আর স্ত্রী থাকা হল কিসে!' সে বল্লে,—'আবার বিয়ে কর্‌লেও যদি তাই হয়, তখন!' এই রকম অনেক কথা কাটা-কাটির পর যখন সে কিছুতেই মাথা পাত্‌তে চায় না, তখন আমি বেগতিক দেখে পৈতে দিয়ে হাত জড়িয়ে বল্‌লাম,—'ভাই আমার যা অবস্থা, এখনকার বাজার ত জান! এই বোনটাকে নিয়ে যে কি অকূলেই পড়েছি! তাতে কুলীনের ঘরের মেয়ে। শুধু পরোপকার—ভাই পরোপকার।' এই বলে গোটা কতক দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা চোখের জলও কোনমতে ফেলেছিলাম। নৈলে কি আর তার মন গল তো!"

নবীনের কথার ভঙ্গিতে মৃণাল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আচ্ছা রগুড়ে ভাই তুই!" এমন সময় অবনী কক্ষ-দ্বারে আসিয়া বলিল,—"দশটা বাজে যে! নবীন স্নান কর্‌বে না? যেমন ভাই, তেম্‌নি বোন! গল্প আর ফুরোয় না!"

(৭)

সপ্তাহ অতীত হইল। মুখ কালী করিয়া নবীন আসিয়া বলিল—"দিদি, চাটুয্যে মশাই বাড়ী আছেন!"

তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কাজড়িত স্বরে মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কি হয়েছে! তিনি ত আফিশ থেকে ফেরেন নি!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নবীন ভীতভাবে উত্তর দিল,—"বড় বিপদ! ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে অমর ভয়ানক আহত হয়েছে। এখন পর্য্যন্তও জ্ঞান হয় নাই। তাকে মেডিক্যাল কলেজে রেখেই আমি আস্‌ছি—চাটুয্যে মশাইর কাছে। কি সে কি হয়, বলা যায় না। তা আমি চল্লাম। মেডিকেল কলেজ হয়ে তাঁর আফিশেই যাব এখন।" এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

স্তম্ভিত মৃণাল হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল। কি বলিবে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। হায় বেচারী বীণা! তোমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া দিবার জন্য এত উদ্‌যোগ আয়োজন কি পরিশেষে আকাশকুসুমেই পরিণত হইবে! মৃণাল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। তাহার পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল। সে দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। সহসা বীণা আসিয়া ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে, বৌদি?"

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। কক্ষমধ্যে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প তাহার মৃদু রশ্মিছটা প্রাণপণে বিকীর্ণ করিয়াও কক্ষমধ্যস্থ অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে সমর্থ না হওয়ায় যেন কুহেলিকার রাজ্য ছড়াইয়া পড়িয়া কক্ষের নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নিকটেই

ক্যাম্প-খাটে অমর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছে। আলোকের মৃদুতা-হেতু তাহার মুখবিম্বব সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত না হইলেও বেশ বুঝা যাইতেছিল যে, সে কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই নবীন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অতি স্নেহের সহিত তাহার রোগশীর্ণ বক্ষে এবং ললাটে মৃদু হস্তামর্ষণ করিতে করিতে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল,—"কি হে, অসুস্থ বোধ কচ্ছ নাকি।"

অমর মৃদুস্বরে বলিল,—"অসুস্থ যে ঠিক, তাও নয়; তবে শরীরটা বড় ক্লান্ত বোধ কর্চ্ছি। সে হয় তো কিছু নয়! দেড় মাস পরে আজ প্রথম কলেজে গিয়েছিলাম বলে বোধ হয় একটু exertion হয়ে থাকবে।"

তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে ঈষৎ স্নেহানুযোগের সহিত নবীন বলিল,—"আমি ত প্রথমেই বারণ করেছিলাম! তা ত শুনলে না ভাই!"

"আর কত কামাই করি—বল। যদি এবারেও percentage না রাখ্‌তে পারি, তাহলে ত examine দিতে পারব না! এ বছরটাও মাটি হবে।"

"তা বলে আর উপায় কি? যে ভোগটা ভুগে উঠলে। বাঁচবার আশা কি আর ছিল! এখন ভগবানের দয়ায় ধীরে ধীরে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরে পেলেই সব সার্থক।"

অমর একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল,—"অবশ্য তোমার সেবা-যত্নের জন্য আমায় আজন্ম ঋণী থাকতে হবে। সে ঋণ শোধ দিবার মত ক্ষমতা আমার কখনও হবে না। কিন্তু আমার জীবনে মরণে কি কাহারও কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে, তুমি মনে কর। সংসারে যে আমি একেবারে একা। মলে যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে, এমনও ত কেউ নেই। রোগে পলে যে একটু সেবা-যত্ন কর্‌বে, এমন কাহাকেও এই সারা দুনিয়াটা খুঁজলেও তো মিল্‌বে না! তাই মনে হয়, একবার যখন মরতেই হবে,—কি জানি কত ভুগে কষ্ট পেয়ে—তার চেয়ে একেবারে এই ধাক্কায় সেটা চুকে গেলে আমার পক্ষে ভাল হ'ত না কি?" বলিতে বলিতে অমরের চোখে জল টল টল করিতে লাগিল।

নবীন সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল,—"ছিঃ, কি ছেলেমানুষের মত যা-তা বল্‌ছ—অমর! তুমি কি জান না, তোমার ভাল-মন্দয় আর কারও কিছু হোক না হোক, তাতে আমরই যে মস্ত ক্ষতি! শুধু সেই জন্যেই না যা কিছু তোমায় করেছি! নিস্বার্থভাবে আমি কিছুই করিনি ভাই। তোমার জীবনে যে আমার মস্ত স্বার্থ রয়েছে।" একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে সে বলিতে লাগিল—"দিন ত ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। আজ সাতই বৈশাখ; আমি মনে করছি, আস্‌ছে চোদ্দই বৈশাখে কোনও রকমে সাতটা পাক দিয়ে দিতে পারলে নিজেও হাঁফ ছাড়তে পারি; আর তোমার বিষয়েও কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। পায়ে শিকল পর্‌লে বাছাধন আপনিই পথে আস্‌বে তখন।"

অমরের পানে চাহিয়া তাহার ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া নবীন একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সহসা অমর উঠিয়া নবীনের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"এ থেকে কি তুমি আমায় মাপ কর্ত্তে পার না—ভাই। আর যে দণ্ড দেবে, নীরবে মাথা পেতে

নেব! আর আমি তোমায় ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌ছি, যেমন করে হোক ভাল বরে তোমার বোনের বিয়ে আমি নিশ্চয়ই দিয়ে দেব! আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমায় মুক্ত কর।"

যেন কতই শঙ্কিত হইয়াছে এমনই মুখ করিয়া, ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে নবীন বলিতে লাগিল,—"এ আবার তোমার কি খেয়াল—অমর। তোমার অনেক রকম খেয়ালের কথাই ত জানি! এটাও সেই রকম কিছু নাকি। সবই কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে যদি নাই ছিল, তবে কেন স্বীকার কর্‌লে?"

অমর কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়া নবীন একটু শান্তস্বরে বলিতে লাগিল,—"তোমাকেই জিজ্ঞেস কর্‌ছি, তুমিই উত্তর দাও। আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে, সমস্ত প্রস্তুত। এখন জেনে শুনে সে মেয়েকে আমি কি করে অন্য বরে বিয়ে দিই? তোমায় বলেছি, আমার বোন বয়স্থা। আমাদের কুলিনের ঘরে সৎপাত্র এবং টাকা অভাবেই যে মেয়ে বয়স্থা হয়, তাও ত জান? আর শুধু কয়েকটা মন্ত্রের বিবাহই বিবাহ নয় হে অমর। তার চেয়েও যেটা বড়, আমি জানি তা তার হয়ে গিয়েছে,—চারু মনে মনে তোমায় পতিত্বে বরণ করেছে। এখন তোমার এই খেয়ালের বশে জেনে শুনেও যদি আমি তার অন্য রকম ব্যবস্থা কর্‌তে যাই, সে লজ্জায় বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও, নিজের পথ যে সে নিজে চিন্তা করবে না, তাই বা কে জানে!—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের যে দু'বার বিয়ে হয় না তাও ত জান!"

বহুক্ষণ দুইজনে নীরব হইয়া রহিল। অবশেষে নবীন ধীরস্বরে বলিল,—"তোমার বিবাহে অনিচ্ছা হঠাৎ কিসে হল শুন্‌তে পাই না কি।"

একটা নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া অমর বলিতে লাগিল,—"তোমার মত বন্ধুর কাছে যদি না বলি, তবে আমার ব্যথার কথা আর বলবার স্থান কোথায়! প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যে যে কারণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তার প্রায় সব কথাই তুমি জান। এতদিন তার কথা কখনও কোনও সময়ের জন্যই আমার মনে আসত না। তার জন্য কোনও অভাবও আমি কখনও বোধ করি নাই। কিন্তু সেই অসুখের সময় অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে যখন বিদ্যুতের মত একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার হত, সেই সময় আমার মনে হ'ত কে যেন অতি স্নেহ-যত্নের সহিত তার নরম হাত দুইখানি আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিতেছে। সেই হাতের গুণে আমার সমস্ত শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় কেমন একটা স্নিগ্ধ হিল্লোল বহিয়া যাইত! যে আমায় এত শান্তি দান কর্‌তো, একবার তার মুখখানি দেখ্‌বার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জেগে উঠত। আমি অতি কষ্টে চোখ তুলে তার পানে চাইতাম বটে, কিন্তু তার মুখের অধিকাংশই ঘোমটায় আবৃত থাকায় আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত না। বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিবার শক্তিও আমার ছিল না। তখনই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতাম। রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে একবার তাহাকে দেখিবার জন্য চারিধারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমার ক্লান্ত চক্ষুদুটি যখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত, তখন প্রাণে কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতাম।" একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"কি জান নবীন, তার যতটুকু আমি দেখেছি, তাতেই—তাতেই যেন আমার অনেক দিনের পুরাণ একটা

স্মৃতি মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সে আমার পূর্ব্ব স্ত্রীর। নবীন, আমি তোমায় স্পষ্ট অন্তরের কথা বল্‌ছি—তাকে পাবার জন্য আমার অন্তরে শত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছে। যার জন্য কোনও দিন কোনও অভাব বোধ করি-নি এখন—এখন একবার তাকে দেখ্‌বার জন্য ও পাবার জন্য প্রাণটা যে আমার কি ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, সে শুধু যিনি মানুষের অন্তর দেখ্‌তে পান, তিনিই জানেন।"

নবীন ইহাই চায়। তাহার বিবাহে অনিচ্ছার যে কি কারণ, তাহাও সে পূর্ব্ব আভাষেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মনের ভাব চাপিয়া সে বলিল,—"মাথায় বড্ড আঘাত পেয়েছিলে কিনা, তাই? ও সব দুর্ব্বল মস্তিষ্কের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।" তার পর সে বিস্ময়-বিমুগ্ধের মত ভাণ করিয়া বলিল,—"স্ত্রীলোকের কথা বল্‌ছ? এক nurse ছাড়া আর কে যাবে বল? আমি ত প্রায় সর্ব্বক্ষণ তোমার কাছেই থাক্‌তাম।" তার পর সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া সহসা উঠিয়া বলিল,—"ওঃ দশটা চল্লিশ মিনিট। বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে ত। তোমার খাবারের যোগাড় দেখি।" এই বলিয়া নবীন সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৯)

রাত্রি ন'টা দশ মিনিটে বিবাহের লগ্ন। কোনরকমে ফিরিবার উপায় নাই বলিয়াই শুধু তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তাই নবীনের এত উৎসাহেও অমর কোন-রূপ বেশ-বিন্যাস করে নাই।

নবীন স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা। আবার বরকর্ত্তাও বটে। সে নানারূপ উৎসাহ-উপদেশ দিয়া বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন যাহা না করিলে নয় সেই জন্য ভবানীপুরে গিয়াছে। অমরকে বলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর সে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস্‌ গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইল। জুতার মস্‌ মস্‌ শব্দ করিতে করিতে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে নবীন আসিয়া অমরকে বলিল,—"কিহে প্রস্তুত?" শুষ্ককণ্ঠে অমর বলিল—"হাঁ"। "আঃ তুমি জ্বালালে দেখ্‌ছি। একটা নূতন কাপড়ও ত অন্ততপক্ষে পরা উচিত। একটু চন্দন—এই নাও। ভাগ্যিস একখানা নূতন কাপড় আমার ছিল। ও যাঃ, এ যে আবার কাল পাড়। যাক্‌, চট্‌ পট্‌ তুমি মাথাটা আঁচড়ে নাও। আমি সাম্‌নের দোকান থেকে একখানা কাপড় কিনে আনি।"

ঢোক গিলিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে অমর বলিল,—"কি কর্‌ছ ভাই! এতেই হবে এখন।"

নবীন দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—"কি রকম, আমার সব কাজেতেই যে কেবল বাধা দিচ্ছ। তোমাদের একটা মঙ্গলামঙ্গল ত আমায় দেখ্‌তে হবে। আর তোমার যেন একবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চারুর ত এই প্রথম!" বলিতে বলিতে নবীন নীচে নামিয়া গেল। ক্ষণপরে আসিয়া বলিল,—"এই নাও, আমি আস্‌তে আস্‌তেই যেমন তেমন করে কুঁচিয়ে এনেছি। চট্‌ পট্‌ পরে নাও। আট্‌টা বাজে।"

"বাবু আউর কিত্‌না দের হ্যায়"—গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল।

নবীন উচ্চ চীৎকারে কহিল,—"আরে কাহেকো চিল্লাতে"। ঘণ্টা ভাড়া গাড়ী; বেটাচ্ছেলের সচ্ছে ন! বাস্‌ বেশ হয়েছে। একটু চন্দন পরিয়ে দিই' বলিয়া অমরের ললাটে

চন্দন লেপন করিয়া তাহাকে লইয়া নবীন ভবানীপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সে অনুচ্চ কণ্ঠে একটু 'উলুও' দিয়াছিল। মেসের অন্যান্য ছেলের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ বান্ধবতা ছিল না এবং বিবাহটা অতি গোপনে হইতেছিল বলিয়া কাহাকেও সে কথা জানানও হয় নাই।

যাইতে যাইতে অমর বলিল,—"ট্রামে গেলেই বেশ হত। ছ্যাকরা গাড়ীর চেয়ে ট্রামই ভাল।"

"আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে। একখানা ফাষ্ট ক্লাস ফিটিং আন্‌লেই ঠিক হত। শরীরটা তোমার ভাল নয়! কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।"

"না-না, সে জন্যে নয়! বল্‌ছি—ট্রামে গেলে পয়সাটা কম লাগত।"

"পয়সা ত তুমি দেবে না! সে চিন্তা তোমার করবারও দরকারও নেই। বিয়ের বর; তাকে ট্রামে করে নিয়ে যাব।—কি আক্কেলের কথা!

"আরে ব্যাটা এ কোথায় আন্‌লি। এ যে এল্‌গিন রোড! ডাহিনে—ডাহিনে, রামমোহন দত্ত রোডে যেতে হবে যে!"

(১০)

রামমোহন দত্ত রোড নং ১৪৬ বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইলে ভৃত্য একটা লণ্ঠন ধরিল। নবীন অমরকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বরাবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় অমর একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, নবীন বলিল—"অত সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? এ ঠিক নিজের বাড়ীর মতন মনে কর। তুমি যে বিয়ের বর, সে কথা ভুলে যাও। আমিই ত একা। তোমার লজ্জার কোনও প্রয়োজনই নেই।"

জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। এক পাশে রান্না ঘরে শুধু জন দুই লোক আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। হাজার হইলেও বিয়ে বাড়ী ত বটে! দুই চারি জন লোক, পুরোহিত, কি বাহিরের উঠানে একটা আলো—কিছুই যে নাই! নহবতও বোধ হয় বাজে! বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া, মৃদুস্বরে অমর জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কোথায় নিয়ে এলে হে! কোনও উদ্‌যোগই ত দেখ্‌ছি না!"

"সব ঠিক আছে—সব ঠিক আছে, কিচ্ছু ভেবনা তুমি।"

তার পর সিঁড়ির নিকটস্থ একটা ঘরে ঢুকিয়া নবীন বলিল,—"তুমি এই চেয়ারখানায় বসে এইখানা ততক্ষণ পড। সময় হলে আমি এসে নিয়ে যাব?" অমরকে আর কথা বলিবার অবকাশ মাত্রও না দিয়া নবীন দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অমর হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে যে কি প্রহেলিকায় নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ দেওয়াল-সংলগ্ন একখানা ফটোর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ায় সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বৈদ্যুতিক আলোকে ছবিখানা জ্বল জ্বল করিয়া তাহার নয়ন-সম্মুখে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া ছবিখানায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। ইলেক্‌ট্রিক পাখাখানা পুরাদমেই বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া

উঠিতেছিল। ক্ষণপরে সে পদদ্বয়ে কাহার কুসুম-কোমল মৃদু হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। ফিরিয়া চাহিতেই সহসা তাড়িৎ স্পর্শের মত কেমন একটা ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না—সে জাগ্রত কি স্বপ্নাভিভূত। কি করিবে স্থির করিবার পূর্ব্বেই অতি কাতরকণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"সকল অপরাধ ক্ষমা করে, আমায় তোমার পায়ে রাখ"

বিহ্বলের মত সহসা অমর তাহার অশ্রুবিপ্লুত মুখখানি তুলিয়া ধরিতেই কক্ষমধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইল,—সে মুখ তাহার অতি পরিচিত।

কক্ষের বাহিরে রমণী-কণ্ঠের উলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ঘড়ির কাঁটা তখন ঠিক নয়টা দশ মিনিটের ঘরে।

* * * * * *

মৃণাল উচ্চকণ্ঠে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ওগো এস, তোমার বোন বোনাইকে আশীর্ব্বাদ করে যাও।" অবনী কক্ষত্যাগ করিয়া গেলে বীণা অনুচ্চকণ্ঠে স্বামীকে বলিল,—"যাঁর জন্যে আজ নূতন জীবন পেলাম, এস সেই বৌদিদিকে প্রণাম করি।" মৃণালের পদধূলি লইতে লইতে সহাস্যে অমর বলিল,—"বৌদি, ভাই বোনে মিলে বেশ শিক্ষাটাই দিলে।"

স্মিতহাস্যে মৃণাল বলিল,—"যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল না হলে কি তাকে শিক্ষা দিতে পারা যায়।"

মৃদুস্বরে বীণা বলিল,—"শিক্ষা নয় গো দীক্ষা।" এমন সময়ে বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল নবীন কক্ষে প্রবেশ করিতেই অমর কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়া নবীন বলিয়া উঠিল,—"ওহে কথায় চিঁড়ে ভিজে না। গরীব ব্রাহ্মণকে এখন পেটপুরে সন্দেশ খাওয়াও।"

অচিন বঁধু।

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম্-এ বিরচিত।]

কি যেন কেমন মায়া কাজলে ঢাকচ' দেহখানা!
গেহ কুঞ্জ বাগ্-বাগিচায়,
খুঁজ্‌ছি তোমা আলো-অমায়;
পায়ের শব্দ গানের গলা যায় গো কাণে শোনা,
কাছে আছো তবু তোমা যায় না সখা চেনা।

রঙ্‌টি শুনি উজল তব—তপ্ত নিকষ সোণা!
ভিজাও কভু ঝড় বাদলে,
নাচাও পুনঃ বেণুর তালে,
ফুটাও প্রাণের লতা-কুঞ্জে সুখের হাস্‌না-হেনা;
কেমন তুমি অচিন বঁধূ যায় না ত গো চেনা!

আজকে তুমি ব্যথার কাঁটা ফুটাও গায়ে পায়ে;
যাতন্ জ্বালায় অথির হিয়া,
কাঁদে যখন ছট্-ফটিয়া,
মুচ্‌কি হেসে আপনি এসে করটি বুলাও গায়ে!
আজ ফেলে যাও আঁধার কূপে,
আলো ধরতে কাল আস চুপে,
ধবল শিখায় করো উজল মলিন আঁধার কোণা;
'কেমন তুমি সখা আমার' যায়নাত গো চেনা!

আজকে চিত্ত-বাতায়নে বিলাও চাঁদের হাসি;
কালকে অমার তমোরাশি,
হৃদয়খনি ফেলে গ্রাসি,
আজকে তুমি কর সম্রাট, কালকে পরাও ফাঁস!
অনিল আলোও ধর্‌তে পারি,
লীলা তোমার জটিল ভারি,
নীলিম নভের ক্ষুদ্রতারা যায় গো কলে গোনা;
জটিল তুমি এতই কঠিন যায় না তোমা চেনা!

ভগবৎ-কৃপা।

[শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি-এল, মহাশয় বিরচিত।]

সংসারে কষ্টে পড়িলেই স্বভাবতঃ নিজের দোষের কথা মনে আইসে না; ইহাকে, উহাকে, তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয়। যদি কাহাকেও না হয়, নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিতে হয়। তাহাতেও সময়ে সময়ে মন মানে না। তখন অগত্যা ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হয়। কখন আমরা ভাবিনা যে, আমরা যে কিছু কষ্ট পাই, তাহা আমাদের নিজ দোষেই হয়, নিজকৃত কার্য্যাকার্য্যের জন্যই আমরা কষ্ট পাই। আর যিনি সেই কর্ম্মফলের নিয়ন্তা, তিনি আমার মঙ্গল জন্যই আমাকে এত কষ্ট দেন। কষ্ট দিয়া মঙ্গল সাধন করেন, কথাটা যেন কেমন অসংলগ্ন বলিয়া সহসা মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। সকলেই রজকের বস্ত্রধৌত করার প্রণালী দেখিয়াছেন। রজক মলিন বস্ত্রখানি বেশ গুছাইয়া এক দিক ধরিয়া, কঠিন প্রস্তর বা কাষ্ঠ ফলকে, যতদূর সাধ্য বলের সহিত, আছড়াইতে থাকে। যতক্ষণ কাপড় হইতে সমস্ত ময়লা দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ আছড়াইতে থাকে, যতক্ষণ কাপড় বেশ নির্ম্মল না হয়, ততক্ষণ তাহা ছাড়ে না,—ক্রমাগত আছড়াইতে থাকে। আমাদের ভিতর ক্রমাগত যে প্রভূত ময়লা জমিতেছে, তাহা দূর করিয়া নির্ম্মল করিবার জন্য, ভগবান আমাদিগকে সংসাররূপ কঠিন প্রস্তর বা কাষ্ঠ ফলকে ক্রমাগত আছড়াইতেছেন। যতক্ষণ আমাদের চিত্ত নির্ম্মল না হয়, ততক্ষণই আছড়াইবেন। আছড়াইতেছেন বটে, কিন্তু একদিক নিজ হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এত যে মলিন অবস্থা, তবুও তিনি হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন,—ঘৃণায় ফেলিয়া দেন না, উপেক্ষাও করেন না। আমাদের সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার জন্য তাঁহার কত চেষ্টা কত কৃপা! রজক গলদঘর্ম্ম হইয়া, চৈত্র বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন রৌদ্র সহ্য করিয়া, বর্ষার বারি ধারায় মাথায় পাতিয়া, কন্‌কনে শীতের সময় জলে দাঁড়াইয়া, কাপড় আছড়াইতেছে। বিরাম নাই, আলস্য নাই, ঔদার্য্য নাই, আমাদের প্রতি কি কৃপা। চেষ্টা—কিসে মলা-মাটী দূর হয়। কাপড় পরিষ্কার হয়, সমল চিত্ত নির্ম্মল হয়। তাহার উপর আমরা আবার এমনি কৃতজ্ঞ, আত্মদর্শী সাধু যে, তিনি কাপড়ে বড় জোরে আছাড় দিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে দোষ দি। বাল্যকালের এক পল্লীগ্রামের একটী দরিদ্র বৃদ্ধার কথা মনে পড়িতেছে। বৃদ্ধা বহু কষ্টে তুলা সংগ্রহ করিয়া, চরকা কাটিয়া প্রায় ছয় মাসে সূতা তৈয়ার করিয়া, তন্তুবায়ের নিকট অনেক যাতায়াত করিয়া, প্রায় তিন মাসে একখানি কাপড় বুনাইয়া লয়। কাপড়খানি হাতে লইয়া তাহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। সে যত্নের সহিত তাহা ব্যবহার করে। কিছু দিন ব্যবহার করার পর কাপড়খানি মলিন হইলে, পল্লীর রজকের নিকট কাচিতে দিল। কাচিতে দিয়া অবধি প্রতিদিন সে রজকের বাড়ী যাতায়াত করে। ভাঁটিতে কাপড় উঠিয়াছে, বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। পরে যখন

ঘাটে কাপড় কাচিতে লইয়া গেল; বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যতক্ষণ অন্য কাপড় কাচা হইতেছে, বৃদ্ধা একটু দূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। পরে যখন তাহার কাপড় রজক কাচিবার জন্য হস্তে লইল, বৃদ্ধা অমনি আস্তে আস্তে রজকের সমীপবর্ত্তী হইল; রজক কাপড়খানি বেশ গুছাইয়া লইয়া এক প্রান্ত ধরিয়া পাটের উপর আছাড় মারিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধা প্রথমে একটু চিন্তিত হইল, পাছে আছাড়ের জোরে কাপড় ফাটিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিল না, রজককে বলিল,—"বাবা, এত জোরে আছাড় মারিও না, কাপড়খানি ছিঁড়িয়া যাইবে; আস্তে আস্তে কাচ।" প্রথমে রজক বৃদ্ধার কথায় উপেক্ষা করিল। পরে যখন বৃদ্ধা বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল, রজক বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তাহা হইলে কাপড় পরিষ্কার হইবে না; আমি কাপড় কাচিতে পারিব না, ফেলিয়া দিব।" বৃদ্ধা অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বহু যত্নের কাপড়ের উপর এত উৎপাত এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার চক্ষে দেখিতে না পারিয়া বৃদ্ধা বাটী চলিয়া গেল। বাটী যাইয়া সে আহারাদি করিল বটে; কিন্তু কাপড়ের জন্য তাহার সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। প্রত্যুষ না হইতেই, বৃদ্ধা ক্ষুণ্ণমনে আস্তে আস্তে রজকের বাটী চলিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়াই রজক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"তোমার কাপড় আছে কিনা দেখিতে আসিয়াছ?" তাহাতে বৃদ্ধা কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রজক বস্তা খুলিয়া বৃদ্ধার পরিষ্কৃত কাপড়খানি তাহার হস্তে দিল। বৃদ্ধার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন রজকের উপর তাহার যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহার স্থলে কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হইল। সে কাপড়খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যখন দেখিল, কাপড়খানি ছিন্ন হয় নাই এবং বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে; তখন রজককে সে কত যে আশীর্ব্বাদ করিল, তাহার আর সীমা নাই।

আমরা কি সেই বৃদ্ধার অধম নই? করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের ময়লা দূর করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেছেন, কতই আছাড় মারিতেছেন! আমরা তাঁহার কৃপার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহাকে দোষ দিতেছি। আছাড় খাইয়া সহ্য করিতে পারিলে, পরিষ্কৃত হইব,—আমাদের ময়লা তখন দূর হইবে। করুণাময় পরমেশ্বর যাহাদিগকে আছাড় মারেন, তাহাদের এক প্রান্ত তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন; ইহা কি কম ভাগ্যের কথা!

রজকের কাপড় পরিষ্কার করিতে কেবল আছাড় মারিলে হয় না, তাহাতে আরও কিছু পদার্থ চাই। কিছু ক্ষার ও জল প্রয়োজন। রজক ক্ষার-মাটীতে কাপড় না মাখিয়া কেবল আছড়াইলে ময়লা দূর হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে জলে ধুইয়া লইতে হয়। আমাদেরও এই সকল আছাড়ের সঙ্গে একটু জ্ঞান ও ভক্তির প্রয়োজন। এই জ্ঞান ও ভক্তি রূপ-ক্ষার ও জলের সাহায্য ব্যতীত কখনও সহস্র আছাড় সত্ত্বেও আমরা পরিষ্কৃত হইব না;—কেবল আছাড় খাইয়া ফাটিয়া যাইব মাত্র; কেবল কষ্ট ভোগ করা হইবে ও পরিশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইব। তবে আমরা যদি ধনী হই, ক্ষার ও জল বা তাহার মূল্য রজককে দিতে পারি, তাহা হইলে সহজেই আমরা পরিষ্কৃত হইতে পারি। নচেৎ, বৃদ্ধার ন্যায় রজকের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। তিনি দয়া করিয়া নিজ হইতে যদি ক্ষার ও জলের ব্যবস্থা করেন, তবেই আমাদের মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হইবে; নচেৎ, যে ময়লা, তাহাই রহিয়া

যাইবে। আমি বড় দরিদ্র; আমার ক্ষার ও জলের মূল্য দিবার সামর্থ্য নাই; কাজেই রজকের দয়ার উপর, ভগবানের কৃপার উপর, নির্ভর করিয়া না থাকিলে চলিবে কেন? নির্ভর করিলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া নিজ হইতে আমাদের মালিন্য দূর করিয়া নির্ম্মল বস্ত্রের গাঁদায় সাধুসঙ্গে রাখিয়া দিবেন; এবং পরে যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন। জ্ঞান—ক্ষার; ভক্তি—জল। ক্ষার বড় মূল্যবান জিনিস। জল সহজ-প্রাপ্য। গরীবের পক্ষে জল-কাচাই ভাল; ক্ষার জুটিলে ভালই, নচেৎ জল-কাচাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক জলে কাচিলে, ময়লা বড় জমিতে পারে না, তাহাতে আর রজকের হাতে যাইতে হয় না। সাধু-সন্ন্যাসীদের কৌপিন এইরূপ চিরদিনই জলকাচা হইয়া পরিষ্কার থাকে। বাবুদের কোট-কামিজ হপ্তা অন্তর রজক-গৃহে যায়। তাঁহাদের অর্থ আছে, ক্ষারের মূল্য দিতে তাঁহারা সমর্থ। গরীবের পক্ষে প্রত্যহ জলকাচা করিয়া পরিষ্কার রাখাই ভাল। তবে আমার গল্পের বৃদ্ধার উপর রজক দয়া করিয়া যেমন নিজব্যয়ে ক্ষার যোগাইয়াছিল, আমাদেরও তাহাই। নিজ কৃপায় ভগবান জ্ঞান দান করেন ভালই; নচেৎ, আমরা জলকাচা হইয়াই পরিষ্কার থাকিব। আর তাহাতে একটা কথা আছে। ক্ষার-মিশ্রিত করিলে আছাড় খাইতে হয়। জ্ঞানের পথ বড় কষ্টকর—বহু আয়াস-সাধ্য। ফলটা খুব ভাল;—কাপড় বড় ভাল পরিষ্কার হয়। আরও এক কথা, খালি ক্ষার দিয়া কাপড় পরিষ্কার হয় না, জল প্রয়োজন। ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান ভিন্ন কি উপায় আছে? তবেই জলের অধিক উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আর, জল অনায়াস-লভ্য, ক্ষার মূল্যবান। ভক্তির জন্য অধিক প্রয়াস করিতে হয় না; কিন্তু জ্ঞান বহু আয়াস-সাধ্য। কাজেই আমরা এখন নিয়ত জল-কাচা হইয়া পরিষ্কার থাকিতে পারিলে অনেকটা ভাল; নচেৎ, আছাড় খাইতেই হইবে। তবে এটা ঠিক, আছাড় খাইলে শীঘ্র পরিষ্কার হওয়া যায়। ইহা ভগবানের কৃপা—ইহাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, বিরক্ত হওয়া উচিত নয়।

মুঙ্গেরের নিকট সীতাকুণ্ড তীর্থে গিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে এ বিষয়টী অনেকটা পরিষ্কারভাবে বুঝিবার সাহায্য হইয়াছে। সেখানে চারিটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; তাহা হইতে উষ্ণ ক্ষারজল অজস্র বাহির হইতেছে। যে নর্দ্দমা দিয়া জল বাহির হইতেছে, তাহার অনতিদূরে কয়েকজন স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ তাহাদের বস্ত্র ধৌত করিতেছে। তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তাহারা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে রজক-গৃহে দেয় না; সেই স্বাভাবিক ক্ষার-মিশ্রিত উষ্ণ জলে কাপড় কাচিয়াই পরিষ্কার করে। তাহারা স্বভাব-জনিত ক্ষার ও জল বিনা-ব্যয়ে ও বিনা-কষ্টে প্রচুর পাইতেছে এবং তাহাতে তাহাদের কাপড় উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইতেছে। আমার মনে হইল, আমাদের যত তীর্থস্থান আছে, মানসিক মল ধৌত করিতে সেই সকল পুণ্য-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ভক্তি শিক্ষার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। সেখানকার সাধু-মহাত্মাদের সংসর্গে, উপদেশে ও আশীর্ব্বাদে, আমাদের ময়লা আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। এই জন্যই তীর্থস্থানগুলির এত মাহাত্ম্য! ইহাই পুণ্যক্ষেত্রের পবিত্রতা। আমাদের নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মফলে বড় কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল মহাত্মার আশীর্ব্বাদ ও ভগবৎকৃপা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই।

বুদ্ধ-চরিত।

[গোস্বামী শ্রীযুক্ত রুদ্রানন্দ গিরি বিরচিত।]

(১)

মগধ আসনে, শুদ্ধোদন-নামে
ছিল এক নরপতি,
কি দিব তুলনা, তাঁহার মহিমা
ধর্ম্মে রহে সদা মতি॥

(২)

প্রাচীন বয়স, হয়েছে রাজার
পুত্রমুখ নাহি দেখে।
পুত্রের কারণ, ভাবে অনুক্ষণ
সদা দুখ তাঁর থাকে॥

(৩)

ভাবে সদা রাজা, কে পালিবে প্রজা
আমার অভাব হ'লে।
মগধ আসন, ধন রত্ন জন
কার হাতে দিব ফেলে॥

(৪)

মায়া-প্রজাবতি, দুই গুণবতী
রাজার রাণী ছিল তারা।
রাজার মতন, তাহাদের মন
মরমে হয়েছে মরা॥

(৫)

বড়ই অশান্তি, রাজার যে চিতে
কেমনে এ দুঃখ যাবে।
সন্তান উদ্দেশে, যাবে কোন্ দেশে
কি করিলে সুত পাবে॥

(৬)

বহু যাগ যজ্ঞ করিতেছে রাজা
সন্তান কামনা তরে।
হল না সন্তান, তাহাতে তাঁহার
বিধির করম ফেরে॥

(৭)

একদিন তরে, নক্ষত্র উৎসবে
স্বপন দেখিল রাণী।
অতি অসম্ভব, স্বপনের কথা
এমন কভু না শুনি॥

(৮)

এক শ্বেত করী, শুণ্ডাগ্রেতে ধরি
শ্বেতপদ্ম লয়ে আসে।
রাণীর উদরে, অতি ত্বরা করে
রাখিয়ে পলায় ত্রাসে॥

(৯)

(এক) দেবের কুমার, আসিয়ে রাণীর
কোলে বসি কয় হেঁসে।
তুমি মোর মাতা, আসিয়াছি হেথা,
আকাশেতে ভেসে ভেসে॥

(১০)

সূর্য্যসম তেজ, তাহার শরীরে
পেতেছিল বড় দীপ্তি।
যত দেখ তারে, তত লোভ বাড়ে,
দেখিলে না হয় তৃপ্তি॥

(১১)

কি দিব তুলনা, সে দেব মহিমা,
শরীরে সুগন্ধ তার।
আঁখির নিমিষে, কোথা গেল মিশে
দেখিতে না পেল আর॥

(১২)

এমত স্বপন, রাণী মহামায়া
দেখিয়ে কন্ রাজারে।
আশ্চর্য্য স্বপন দেখিয়াছি রাজা
গত রজনীর ভোরে॥

(১৩)

গত যামিনীর, স্বপন বারতা
শুনিয়া রাণীর মুখে।
স্বপন বিচার, করিবার তরে
দৈবজ্ঞেরে রাজা ডাকে॥

(১৪)

রাজার আদেশে, আসিয়া দৈবজ্ঞ
বিচার করিয়া দেখে।
এক মহাজ্ঞানী, রাণীর গরভে
জন্মেছেন এই লেখে॥

(১৫)

দৈবজ্ঞ বচন, শুনি শুদ্ধোদন
সুখী হল বড় মনে।
ধন রত্ন দান, করিতে লাগিল
রাজা রাণী দুই জনে॥

নবদ্বীপে—'বেদ-বিদ্যালয়।'

বঙ্গের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপকে কেন্দ্র-স্থানে পরিণত করিয়া, বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যার প্রচারে একটা প্রচেষ্টা চলিয়াছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই প্রচেষ্টার মূলীভূত। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং শিক্ষিত জনসাধারণ এ পক্ষে সহায় হইবেন—স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গত ২৫এ জুলাই (১৯২০ খৃঃ) শুক্রবার অপরাহ্নে নবদ্বীপে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত সতীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ মহাশয়ের স্বাক্ষরে ঐ সভা আহুত হইয়াছিল।

নবদ্বীপে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগিগণের মধ্যে সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন;—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সান্যাল, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস মৈত্র, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কবিরাজ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিমোহন স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপথনাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী কাব্যতীর্থ, প্রভৃতি। বেদসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল ঐ সভায় উপস্থিত হন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিমোহন স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কি ভাবে ঐ বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে—শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় তাহার আভাষ প্রদান করেন।

তখন সভাস্থ সকলেই একবাক্যে ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। শেষে স্থির হয়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেডমাষ্টার মহাশয় এই প্রস্তাবিত বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করিবেন। লিপিবদ্ধ হইলে, তাহা সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে দেখান হইবে এবং তাঁহাদের মন্তব্যাদির আলোচনার পর আগামী এক অধিবেশনে ঐ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদিসহ পরিগৃহীত হইবে।

পরিশেষে তৃতীয় সভায় (কৃষ্ণনগরের মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে সভা আহুত হইবে) উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি-সংবলিত ঐ পাণ্ডুলিপি পুস্তিকাকারে ছাপা হইয়া বিতরিত হইবে; এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত পাকা স্থির হইয়া যাইবে।

হাওড়ায় যে "বেদসভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সভা নবদ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে বেদ-বিদ্যার প্রচার জন্য চেষ্টিত আছেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নবম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।] [আষাঢ়, ১৩২৭ সাল।

সাহিত্য-সংবাদ।

ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ।

ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ। আপনারা এখন কোথায় (কোন দূরস্থানে) অবস্থিতি করিতেছেন? করুণা-বিতরণ-রূপ আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যকে আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) রাখিয়াছেন? দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে আপনারা আগমন করুন; ইহলোক (আমাদের নিকট) হইতে আর চলিয়া যাইবেন না। আপনাদিগের জ্ঞানকিরণ (বিবেক-বাণীরূপে) কেন আমাদিগকে আর উদ্বোধিত করে না?

করুণা-বর্ষণে।

ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা ব্যগ্র হইতেছে; করুণাময়ের করুণার ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন, তিনি যে সাধু-মাহাত্মাদিগের অমৃতবাণীর মধ্যে নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাজমান্ রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্য তোমার কর্ণকুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন,—এ সকল কি তাঁহার করুণাবর্ষণ নহে?

তুমিও যতই উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, যতই বিপথগামী হইবার চেষ্টা পাইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সৎপথে পরিচালন।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানাপ্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারের চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন; করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 'পুত্র বিপথগামী হইয়াছে। বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে।' যৎক্ষণাৎ সেই কারণের বিষয়টী মনে উদয় হইল, অমনি স্নেহময় জনক-জননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইলেন। কারণের জন্য কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। অনুগ্রহ-প্রকাশের কত কারণই না তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অল্প-আয়ু অল্পবুদ্ধি হইতেছে; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী-প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তানের গন্তব্য পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে, সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তান কুকর্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইঙ্গিত মানিতেছে না, সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জ্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে ধারার মধ্যে সকলই আছে। লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে পরিচালনা করিবেন।

অবাধ্যের দণ্ড।

তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সৎপাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্য চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বখাদসলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, 'তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?'—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতপ্ত হয়। এক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ কর। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া; ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, 'তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল'—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে! তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবার, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী-ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাইতেছ না কি?

সংশয়-প্রশ্ন।

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—'ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর কারণ অনুসন্ধান করেন; তখন কেন-না তিনি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সৎপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আর ফেলা কেন?' এ প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে দুই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও সুকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, দুই একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি বিধান। প্রজার যত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা-রূপ বিচার-বিতর্ক মীমাংসার দ্বারা রাজা ও রাজ প্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্ত্তন আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান প্রবর্ত্তনারই লক্ষ্য—রাজ্যে শান্তি-স্থাপন, প্রজার হিতসাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে, অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু, দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধানকর্ত্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—'ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো একরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন।' তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যেই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধাপ্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়মাল্য প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে।' এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়। কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মুক্তির অধিকারী হইবে, যে তাহা না পারিবে, পরন্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্য্যাতন-ভাগী হইতেই হইবে।

একবার উদ্বুদ্ধ হও।

আমরা এতই অপকর্ম্মশীল, আমরা এতই পাপাচারী হইয়াছি যে, দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদিগের নিকট হইতে কোন্ লোকে কোন্ দূরদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। এ ভাব একবার উপলব্ধ হইবে না কি? বিষম আত্মগ্লানিতে ব্যথিত হইয়া, দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক একবার বলিতে পারিব না কি,—"নূনং ক্ব"।—তোমরা কত দূরে কোথায় চলিয়া গেলে? কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? আমরা কুকর্ম্মী কদাচারী পাপপরায়ণ সত্য, কিন্তু তোমরা যে করুণার

সাগর—দয়ার স্বতঃবর্ষী নির্ঝর! করুণাই যে তোমাদের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এখন, এ অভাগাদের সম্বন্ধে, তোমাদের করুণা-বিতরণ-রূপ সে ঐশ্বর্য্যকে কোথায় লুকাইয়া রাখিলে? "বঃ অর্থং কৃৎ!" শুনিতে পাই, দেবগণ তোমরা দ্যুলোকে আছ, স্বর্গে অবস্থান করিতেছ। তাই ডাকিতেছি,—"দিবঃ গন্তা।" এস, একবার এস, স্বর্গ হইতে একবার নামিয়া এস! আর প্রার্থনা—ইহলোক আর পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সম্বন্ধ আর ত্যাগ করিও না। "পৃথিব্যাঃ ন।" করুণা বিতরণ কর, আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করিয়া রাখ। বিবেকরূপে আসিয়া তোমরা নয় সর্ব্বদা মানুষকে উদ্বুদ্ধ কর? কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কেন এমন হইলে? তোমাদের জ্ঞানকিরণ-সমূহ, বিবেকবাণী-রূপে আসিয়া, আর কেন আমাদিগকে উদ্বোধিত জাগরিত করে না? "ক্ব বঃ গাবঃ ন রণ্যন্তি।" পাপ-মোহে মগ্ন থাকিয়া, দিন দিন আমরা সংজ্ঞাহারা হইতেছি। হে দেবগণ। আমাদের এ সংজ্ঞা-শূন্য দেহে, এস, একবার সংজ্ঞা-সঞ্চার করিয়া দেও। জানি না—এ ভাব কবে মনে আসিবে? জানি না—এমন প্রার্থনা কবে করিতে পারিব?

—০—

'বেদ' ও তাহার ব্যাখ্যা।

[পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।]

দশম প্রবন্ধ।

বেদের ব্যাখ্যা যে কত প্রকারে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাখ্যাকারি-গণের যাঁহার মধ্যে যখন যে ভাব প্রকট ছিল, ব্যাখ্যায় সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই প্রায় ব্যাখ্যাতেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। প্রায় প্রতি মন্ত্রের আলোচনাতেই অসামঞ্জস্য ও বিরুদ্ধ-মত প্রতিপন্ন হয়। এখানে আজ আর একটী বেদ-মন্ত্রের ও তাহার ব্যাখ্যার আলোচনা করিতেছি। দেখিতে পাইবেন,—কত জনে কত প্রকারে কিরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন! মন্ত্রটী এইঃ—

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষ্বত্নত।

বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে॥

ঋক্‌টির সায়ণ-ভাষ্য, প্রচলিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রভৃতি কিরূপ দৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহার পরিচয় দিতেছি। যথা,—

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যে পূর্ব্বপ্রকৃতা গিরঃ সূনবো বাচ উৎপাদকা মরুতঃ। বায়বো হি তাবোষ্ঠাদিষু সংচরন্তো বাচমুৎপাদয়ন্তি। অজ্মেষু স্বকীয়েষু গমনেষু সৎসু কাষ্ঠা অপঃ। আপোঽপি

কাষ্ঠা উচ্যন্তে ক্রান্তাস্থিতা ভবন্তি। নি০ ২।১৫। ইতি যাস্কঃ। উদু উৎকর্ষেণৈবাদ্ভুত। অতনিষত। বিস্তারিতবন্তঃ। উদকং বিস্তার্য্য তৎপানার্থং বাশ্রা হম্বারবোপেতা গা অভিজ্ঞু। জান্বাভিমুখ্যং যথা ভবতি তথা যাতবে গন্তুং প্রেরিতবন্ত ইতি শেষঃ॥ *

প্রচলিত অনুবাদাদি।

দুইটী ইংরাজী এবং দুইটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এস্থলে প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর, আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা, যথা,—

(১) "বাক্যোৎপাদক মরুদ্দেবসকল স্বীয় গমনানন্তর জলকে বিলক্ষণরূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ জল পান করিতে হম্বারববিশিষ্ট গোসকলকে সত্বর গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন।"

(২) "তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমনকালে জল বিস্তার করেন, এবং (গাভীদিগকে) হম্বারবপূর্ব্বক জানু পর্য্যন্ত (সেই জলে) প্রেরণ করেন।"

(3) "They are the generators of speech · they spread out the waters in their courses · they urge the lowing (cattle) to enter (the water), up to their knees, (to drink)"

(4) "And these sons, the singers, stretched out the fences in their racings ! the cows had to walk knee-deep."*

আমাদের অর্থ।

আমরা এই মন্ত্রে কি ভাব ও কি অর্থ গ্রহণ করি,—আমাদের 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায়', বঙ্গানুবাদে এবং বিশদার্থ-আলোচনায় "আমাদের বক্তব্য" মধ্যে তাহা অবগত হউন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তো' (প্রসিদ্ধা মরুতঃ) 'উদু' (শ্রেষ্ঠস্য) 'গিরঃ' (বাচঃ, শব্দস্য) 'সূনবঃ' (উৎপাদকাঃ); 'অঞ্জেষু' (তেষাং গতিরূপেষু) 'কাষ্ঠাঃ' (দিশঃ) 'অত্নত' (অতনিষত, বিস্তৃতবন্তঃ), 'বাশ্রাঃ' (দিবসাঃ, কালেতি যাবৎ) 'অভিজ্ঞু' (তেষাং আভিমুখ্যে অনুসরণে) 'যাতবে' (গন্তুং প্রেরিতবন্তঃ)। দিক্‌কালশব্দাঃ তেষাং মরুদ্দেবানাং (দেবভাবানাং) শাসনপরিচালিতাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ মরুদ্দেবগণ শ্রেষ্ঠ বাক্যের উৎপাদক, তাঁহাদের গতিরূপে (গতিপথে) দিক্‌সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে, কাল তাঁহাদিগের অভিমুখেই প্রধাবিত হইয়াছে।

---

* ম্যাক্সমূলার এই ভাষ্যটির অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ; যথা,—"There, the producers of speech, have spread water in their courses; they cause the cows to walk up to their knees in order to drink the water".

আমাদের বক্তব্য।

এই ঋকটীর অর্থ পরিগ্রহ একটু আয়াসসাধ্য। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদ—বিভিন্ন বিপরীত ভাব-দ্যোতক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। বৈদেশিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি এই মন্ত্রের ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া আছে। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই দেখা যায়। কাহারও কাহারও ব্যাখ্যায় সে প্রভাব বড়ই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই সায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু কাহারও ব্যাখ্যায় বা কোনও কথা বাদ পড়িয়াছে, কাহারও ব্যাখ্যায় বা অতিরিক্ত এক-আদটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তবে শেষোক্ত (ইংরাজী) ব্যাখ্যাটি দেখিয়াই, এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যে দেশকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। অনুবাদক ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাঠ দিয়া ঘেরা বেড়া দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহারই প্রতিচ্ছবি আসিয়া পড়িয়াছে।* এইরূপ মনে হয়,—গরুই যাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল, বেদ তাঁহাদের সমাজে প্রচলিত ছিল বা তাঁহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল—এই ভাব যাঁহাদের মনে আসিবে, তাঁহারা মন্ত্রের মধ্যে স্বতঃই গাভীর উপমা-সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবেন। এ ক্ষেত্রে, এ কথা আমরাও অবশ্য অস্বীকার করি না যে, যে ভ্রান্তির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত আছে, আমাদের ব্যাখ্যাও সে ভ্রান্তির কবল হইতে হয় তো সম্পূর্ণরূপ পরিত্রাণ পায় নাই! যাহা হউক, যে সূত্রে মন্ত্রের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহারই একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রটীকে (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন) আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের ("তো উদু গিরঃ সুনবঃ" বাক্যের) অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই ঐকমত্য লক্ষিত হইবে। 'মরুদ্দেবগণই শব্দের উৎপাদক'—এ উক্তির সার্থকতা সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। এক পক্ষে মনে করিতে পারি, বায়ুই শব্দের জনয়িতা। অন্য পক্ষে (ভাবপক্ষে) সত্ত্বভাবেই শব্দব্রহ্মের উদ্ভূতি,—দেবভাব হইতেই মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে, কোনই মতান্তরের কারণ নাই। অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"অজ্মেষু কাষ্ঠা অত্নত।" এখানে 'কাষ্ঠাঃ' পদে 'কাঠের বেড়া' অর্থ গ্রহণ করিলাম না;—'অপঃ' (জল) অর্থও গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম না। 'কাষ্ঠাঃ' পদে, 'দিক্-

---

* তিনি লিখিয়াছেন,—মরুদ্গণ তাঁহাদের ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রের (race-course) বেড়া বাড়াইয়াছিলেন—এবংবিধ বাক্যের ভাব এই যে, আকাশে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বিস্তৃত হইয়া মেঘদিগকে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিচালিত করিয়াছিল। এই সূত্রে তিনি বলেন,—"KASTHA may mean the wooden enclosures (carceres) or the wooden poles that served as turning and winning-posts (metae)"

সকল' অর্থই আমরা এখানে নির্দ্দেশ করি। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'তাঁহাদের গতিরূপে (গতিপথে) দিক্‌সকল বিস্তৃত।' ভাব এই যে,—তাঁহারাও অনন্ত অসীম, দিক্‌সকলও অনন্ত অসীম। ইহাতে দেবভাবসমূহের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধ হয়। সে প্রভাব—দিক্‌সকলের ন্যায় অসীম, অথবা, অনন্ত অসীম যে দিক্‌সমূহ, তাহারাও সে প্রভাবের আয়ত্তাধীন হইয়া আছে। ঐ অংশে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করা যায়। শেষাংশ—"বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে।" কেন হাম্বারবকারী গাভীর সম্বন্ধ এখানে টানিয়া আনি? 'বাশ্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা।' এই হইতে হাম্বারব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গাভীকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অথচ, 'বাশ্রা' শব্দের একটী অর্থ—'দিবস, দিন,' সে অর্থ ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত। আমরা এখানে সেই দিবস অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'বাশ্রাঃ' পদ এখানে বহুবচনান্ত। তাহাতে দিবস-সমূহের সমষ্টিভূত কালকে লক্ষ্য করে। ভাব পরিগ্রহ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! কালও আপনাদের অভিমুখে ধাবমান্। অর্থাৎ, কালও আপনাদের আয়ত্তাধীন।'

এখন একবার পূর্ব্বাপর পদ-কয়েকটীর ভাবসমাবেশ অনুধাবন করুন। দিক্, কাল, শব্দ—এই তিন লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি-বিভাগ। কিন্তু এ তিনই ধ্যান-ধারণার অতীত —অনন্ত অসীম। অথচ, প্রকারান্তরে এখানে বলা হইয়াছে, এই তিনকেও মানুষ আয়ত্তীকৃত করিতে পারে। কি প্রকারে?—দেবভাবের প্রভাবে। মানুষ যখন দেবগণের অনুগ্রহ লাভ করে, মানুষ যখন দেবভাবসমূহের অধিকারী হয়, তখন দিক্-কাল-শব্দকে তাহারা আপনাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে। এখানে যোগের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত আছে—মনে করিতে পারি। যোগ আর কি?—সে তো ভগবানে আত্মলীন হওয়া। সে আত্মলীন হওয়া—কি প্রকারে সম্ভবপর? দেবভাবের অধিকারী হওয়া—দেবত্ব লাভ করা। বায়বীয়-সূক্তের আলোচনায়, বায়ু-দেবতার সহিত যোগের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা একটু আভাষ দিয়াছি। এখানেও সেই ভাব ব্যক্ত দেখিতেছি। মরুদ্দেবগণ-রূপ দেবভাব-সমূহকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, ভগবানের সহিত যুক্ত (যোগ-পরায়ণ) হইতে পারিলে, দিক্ কাল বা শব্দ সকলই তোমার আয়ত্তীকৃত হইয়া আসিবে। তখন, তোমার শ্রেয়-সাধনের পথে কেহই কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবে না। দিক্-কাল-শব্দ আয়ত্ত হইলে, দিক্-কাল-শব্দ-রূপী অনন্ত ভগবানও তোমার আয়ত্ত হইবেন। এতদুভয় এক অলক্ষ্য পারম্পারিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। এই মন্ত্র, সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ-রূপ ভগবদ্বিভূতিনিবহ! দিক-কাল-শব্দ আপনাদের আয়ত্তাধীন। আপনাদিগের অনুসরণকারী আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন, আপনাদের অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লউন, তাহাতে, আপনাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, আপনাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া, আমরাও যেন দিক্-কাল-শব্দের প্রভাব ধারণা করিতে সমর্থ হই।' এখন বুঝিয়া দেখুন—কোন্ অর্থ সঙ্গত?

—*—

কবিকুঞ্জ।

অভিন্ন।

[শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ]।

তোমার সাথে ঘট্‌ছে আমার
কর্ম্মদোষে ছাড়াছাড়ি,
ধর্ম্মপথে চল্‌লে প্রভু,
আজো তোমায় পে'তে পারি!
আমার এ আমিত্বটুকু
দেহেন্দ্রিয় মনে গড়া,
চিদাভাসে অনায়াসে
যায় তোমারে চিন্‌তে পারা!
তোমারি চৈতন্যে আমি
জগৎ-মাঝে চলিফিরি,
তোমারি আবৃশীতে আমি
আমারে প্রত্যক্ষ করি!
সুখদুঃখ সবই বুঝি
এ সংসারে তোমায় দিয়ে
অনুভূতি রূপে তুমি
আমাতে আছ জাগিয়ে।
তোমাতে আমাতে কি আর
অসৌহৃদ্য হ'তে পারে?
পর বানা'য়ে রাখ্‌ছে শুধু
মন বুদ্ধি আর অহঙ্কারে!

অবেলায় জাগরণ।

[শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম-এ।]

নীরবে কর্ত্তব্যপথে চলি বহুদূর
এলায়ে পড়েছে রবি ঘন বীথি গায়।
তিতীর্ষু তীরেতে বসি তুলি তার সুর
ধ্বনিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকে খেয়া নায়॥
ভরিয়া মৃণ্ময় কুম্ভ পল্লীবধূগণ
ফিরিয়াছে ফেলি শূন্য তটিনীর তট
ক্ষুধায় কাতর পান্থ খোঁজে নিবেশন
ফিরিছে কৃষাণ-গৃহে মাথে নিয়ে ঘট॥
গৃহে গৃহে পূজা সারি ফিরিছে পূজারী
বসন-অঞ্চলে বাঁধি তিমিত তণ্ডুল।
কিশোরী দয়িতাকুল গৃহ কাজ সারি
দয়িতের পূতগৃহে বিনাইছে চুল॥
গোধূলির পাংশুছবি হেরি দূরাকাশে
কর্ম্মে রত নরনারী ব্যাকুল হিয়ায়।
মদিরা-শিথিল-দেহ কাঁপে মোর ত্রাসে
আমি যে জাগিনু আজ বড় অবেলায়॥

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর।

[শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর রাজ।]

নাথ হে! তোমারি কারণে,—
হৃদি-করণ্ডকে, ভকতি-কুসুম
সাজায়েছি সযতনে,
দিতে ও রাতুল-চরণে।
আর কিছু মোর নাই,
যা ছিল আমার, হে চির-বাঞ্ছিত!
যতনে এনেছি তাই।
প্রেম-বারি-ধারা ঢালো,
তবে প্রেমে হোক্ হৃদি নিমগন
তুমিই হৃদয়-আলো,
জ্ঞানের আলোক জ্বালো।
আশা-ডোরে হিয়া বাঁধি,
রব কত কাল? হৃদয় মাঝারে
এস হে হৃদয়-নিধি!
বাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর,
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি, প্রেমময়!
ছিঁড় না হে! প্রেম-ডোর;
ছেঁড় মোহ মায়া-ডোর!
রহিব তোমাতে মজি,
তোমারি ধেয়ানে দিব ও চরণে,
ভকতি-কুসুম-রাজি।

গয়ার ইতিহাস।

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল-লিখিত।]

দেও (দেবদ্রুম)।

গয়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান আওরঙ্গাবাদ সব্‌ডিভিজানের মধ্যস্থিত দেওর সামন্ত-রাজবংশের ইতিহাস কাহিনী পূর্ব্বে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশিত হয়। পাঠকগণের সম্মুখে পুনশ্চ সেই ভগ্ন ইতিহাসের ইষ্টকখণ্ডগুলি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। সহৃদয় পাঠকগণ তাহার অঙ্গগঠন পুনঃসংস্কৃত করিয়া লউন।

উমগার প্রাচীন দেওরাজ্যের রাজধানী নিবিড় বনে লুক্কায়িত হইয়া শ্বাপদগণের প্রিয় আবাসভূমি হইয়াছে। বন্ধু ৺পরমেশ্বর লাল এখন মায়ের কোমল চরণতলে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। সে আমার বাল্যবন্ধু। মৃত্যুকালে সে আমাকে তাহার জীবন-পোষিত "গয়া জেলার প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির" নোট-বহি দিয়া না যাইলে, আমি আমার 'গয়ার ইতিহাস' পুস্তক সঙ্কলন করিতে পরিতাম কি না—তাহা সন্দেহ। ৺পরমেশ্বর লাল নিঃস্ব ও গরীব লোক হইলেও সত্যবাদী পরিশ্রমী ও সৎলোক ছিল। তাহার সহিত কত দিন গয়ার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে ও বিপদ-সঙ্কুল বনে গিয়া বৌদ্ধ লুপ্তকীর্ত্তি উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বলা যায় না। আমরা উভয়ে গয়া-জেলার লোক হইলেও কত অনুদ্‌ঘাটিত স্থানে গিয়া লুপ্ত প্রস্তর-খণ্ডের বা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

উমগার বিখ্যাত লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায়। তস্মৈ নমোস্তু হরয়ে কমলাস্যে কটাক্ষপীযূষ-সিক্তবপুষে পরুশ্চেতরাক্ষম্। যশ্চোত্থিতাং জলনিধেরবলোক্য লক্ষ্মীং লক্ষ্মী চকার ন সুরা ন সুরাবিমুগ্ধঃ॥ ১॥ (১)

উমঙ্গানগরী গরীয়সি গিরৌ গীর্ব্বাণ-বৃন্দারকৈঃ প্রাসাদেষু নিবেশিতৈরতিতরাং ধর্ম্ম্যান্দধদ্ভির্ধুরম্॥ তত্তৎ সোমকুলোদ্ভবার্জ্জিততমৈঃ পুণ্যৈরগণ্যৈর্গুণৈঃ প্রত্যষ্ঠাৎ প্রতি-বাসরং প্রতিদিশং পূর্ত্তাদ্ভুতৈর্ভূরিভিঃ॥ ২॥ (২)

তস্যামস্যামরাজন্নরবতি রজনীনাথবংশে বতংসে রাজন্যানামরীণোময়বিনয় গুণৈ দুর্দ্দমো

---

(১) এই প্রস্তরলিপি অতি সুন্দরভাবযুক্ত ভাষায় লিখিত এবং লেখকের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রকটিত করিতেছে। ইহার ছন্দ বসন্ততিলকঃ—"ভেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌগঃ"॥

(২) এই শ্লোক শার্দ্দূলবিক্রিড়িত ছন্দে মিলিত। "সূর্য্যাশ্বৈর্যসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রিড়িতং"।

ভূমিপালঃ। চঞ্চদ্দোর্দ্দণ্ডলীনা বলয়িত নিমচ্চণ্ড কোদণ্ডকাণ্ডৈরানঞ্চায়ং রিপূণাং রণশিরসি শিবাং খণ্ডিতৈর্যশিরোভিঃ॥ ৩॥ (৩)

কুমারপালঃ ক্ষিতিপস্ততোভূৎ কুমারতুল্য প্রথিতৈক। শক্তিঃ। অবাপ্যায়ং চারু গুণৈবরীণামুবাস লোলাপি চিরং নৃপশ্রীঃ॥ ৪॥ (৪)

জাতস্ততো জগতি লক্ষ্মণপালনামাকামং কুমার কমনীয়তনুর্মহৌজাঃ।
ক্ষোণীং চকার চিরমুদ্রিতচিত্রচিত্রাং যশ্চার্থসার্থরহিতাং মহিতাং নৃবীর্য্যৈ॥ ৫॥ (৫)

কলঙ্কেন বিনা চন্দ্র চন্দ্রপালস্ততোঽভবৎ। যস্যোদয়েরিবানিতা-চক্রবাকী মসীজতি॥৬॥ (৬)

তস্মাদভূন্নয়পাল ইতি প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধাঙ্গনা স্বয়মুপেত্য পতিঞ্চকার।
যস্যাস্তিকীর্ত্তিপরিনির্জ্জিতকামদেবং দেবাস্নিহায় বিরহার্ত্তিভয়প্রনুন্না॥ ৭॥ (৭)

তাদায় নিঃসন্তবভুবি সগুপালঃ যস্তত্ত্বমাপুররর্যোভুবিতেজসোঽস্য।
যশ্চাজিসিমণিবিভাধস্যুবাসকাদীস্তত্তৎপ্রভাবনিচয়ৈঃ সদৃশীচকার॥ ৮॥

অভয়দেব ইতি প্রথিতৌজসাং প্রথম এব বভূবতদাত্মজঃ॥
সমভিশাসতি যত্র নৃপে ভয়ং রিপুকুলে বসতিস্ম সতোঽভয়ং॥ ৯॥

অভবদমলকীর্ত্তিঃ ল্লদেবোঽস্য সূনুঃ ক্ষিতিপতিরতিশক্তির্ব্রীডিতানেকবীরঃ।
জগতি বিজয়যাত্রাভ্যর্জিতা যস্য গুণময়িমণিগীর্ণাকর্ণকীর্ত্তি প্রকীর্ণা॥ ১০॥

জাতস্ততো নৃপবরঃ কিলকেশিরাজোযজ্ঞে বিজিত্য বিনয়ী সকলান্ ক্ষিতীশান্।
যঞ্চামকক্রমমুদারতরং বিধায় ধাতান্তদাতুরচণাবিমুখী বভূব॥ ১১॥

তস্মাদজায়ত নৃপোনরসিংহদেবঃ সেবাবনম্র ধরণীপতি মৌলিরত্নৈঃ ভাস্বদ্ভিরর্চিত পদস্য-গুণাতিয়েকৈবযস্য ভুবিরাজতিকীর্ত্তিবল্লীঃ॥ ১২॥

ভানুদেব স্ততোজাত করাক্রান্তমহীতলঃ। ভানুমানিব বিধ্বস্ততমস্তোমঃ শুচিক্রিয়ঃ॥ ১৩॥

তস্মাদ্বভূব ভবদত্তমনামনীষী সোমেশ্বরঃ ক্ষিতিপতিঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং যদ্বীরবৈরিবনিতা বিভবাদধীরা দোস্তেজসঃ প্রতিদিশং সকলা বভূবুঃ॥ ১৪॥

জিত্বা জন্যেশবর্গব্রজমকৃতধরাং বিপ্রসাজ্জামদগ্ন্যস্তামের্তাযস্যকীর্ত্তিং হ্রসয়িতুমখিলাং মনিনীষু প্রতিষ্ঠাম্। ত্রৈলোক্যাধারমেকং প্রথিতপৃথুযশাঃ পার্থিবান্প্রীণয়িত্বা ব্রহ্মাণ্ডং ভূখিরিণ্ডং ব্যদিতবসুমতীনাথ সোমেশ্বরায়ঃ॥ ১৫॥

তস্যাত্মজো জগতি জঙ্গম পারিজাতঃ শ্রীভৈরবেন্দ্র নৃপতিবিজিতারিবর্গাঃ।
যস্য প্রতাপঃ তপনাংশুভিরাশুশোষমায়ান্তি বুদ্ধিসরিতঃ প্রসভং রিপূণাম্॥ ১৬॥

সোমান্বয়ে মহতিভূরিগুণাবদাতাঃ ক্ষোনীভুজঃ কতিকতীহনবাবভূবুঃ।
আচারচারু চরিতৈস্ত কুলং শুধাংশো শ্রীভৈরবেন্দ্র নৃপতির্বিমলী করোতি॥ ১৭॥

---

(৩) স্রগ্ধরাঃ—"মভৌর্যানাম্ ত্রয়েণ ত্রিমুনি ত্রয়েন যতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেঽয়ং॥"
(৪) উপেন্দ্রবজ্রা।
(৫) বসন্ততিলকং।
(৬) অনুষ্টুভ।
(৭) বসন্ততিলক।

ঔদার্য্যেন সুরদ্রুমঃ স্থিরতয়া হেমাচলো ব্যরিধির্গাম্ভীর্য্যেণ চঞ্চনৃতেন বচসা বাচস্পতি মন্মথঃ॥ সৌন্দর্য্যেণ মতোবুধৈঃ শুচিতয়া:জ্যেষ্ঠোবশিষ্টাদপি প্রায়োযশঃ শুভকীর্ত্তিনোবিজয়তে শ্রীভৈরবেন্দ্রনৃপঃ॥ ১৮॥

বহুবিতরণশীলঃ স্মৃতলেম্বেকবীরঃ কলিদুরিতনিহন্তা নীতিশাস্ত্রাবিগন্তা। মদন মধুরমূর্ত্তি-র্লোক-বিখ্যাত কীর্ত্তিঃ স্বকুলজলধিচন্দ্রো রাজতে ভৈরবেন্দ্রঃ॥ ১৯॥

জগন্নাথঃ সুভদ্রাচ বলরামঃ সুরত্রয়ং ভৈরবেন্দ্র মহীপালঃ প্রতিষ্ঠাপিতবানিতি॥ ২০॥

জাতের্কনাম্বুধীন্দুগণিতেসম্বৎসরেবৈক্রমে বৈশাখে গুরুবাসরে সিততরে পক্ষে তৃতীয়ে তিথৌ রোহিণ্যাম্পুরুষোত্তমং হলভৃতং ভদ্রাং সুভদ্রাস্তথা প্রত্যায়যদেকদৈকবিধিনা শ্রীভৈরবেন্দ্রোনৃপাঃ॥ ২১॥

গীর্বাণবৃন্দমবগেহতড়াগযূপকুপৈধরাসুললিতাসমকারিযেন।

বংশাবলী বিবচনং কৃতমেতদাস্তামামাংস ভৈরবনৃপোপি সতাসহস্রং॥ ২২॥

কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ।

কারয়িত্বা হরের্ধাম ধূতপাপোদিবং ব্রজেৎ॥ ২৩॥

তীর্থেচায়তনেপূণ্যে সিদ্ধক্ষেত্রে তথাশ্রমে।

কর্ত্তুরায়তনং বিষ্ণোর্যথোক্তাৎ ত্রিগুণং ফলং॥ ২৪॥

ফলং শতগুণং শৈলে যথোক্তাব্যপরিকীর্ত্তিতম্। সহস্রগুণিতং শৃঙ্গে কর্ত্তুর্দ্দেবালয়স্য চ॥২৫॥

ইষ্টকানি চিতং তিষ্ঠেদ্যাবদায়তনং হরেঃ। কর্ত্তা চ সকুলস্তাবদ্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ২৬॥

সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ কুলানামযুতং নরঃ। বিষ্ণুলোকনয়ত্যা শুকারয়িত্বা হরের্গৃহং॥ ২৭॥

ভৈরবেন্দ্রপ্রসাদাপ্তমহিন্নাগমবেদিনা। জনার্দ্দনেন কৃতিনা প্রতিষ্ঠাকারিতা হরেঃ॥ ২৮॥

অত্রাঙ্কতোপি বিক্রমাব্দা ১৪৯৬ বৈশাখে সুদী তৃতীয়া গুরৌ॥

উমগার উপরোক্ত প্রাচীন লিপিটি ১৮৪৭ সালের এসিয়াটিক পত্রিকার ৩০ ভাগের ১২২০-১২২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পর বৎসর জুন সংখ্যার পত্রিকায় কাপ্তেন কীটো ইহার সম্বন্ধে এক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নোট লিখিয়া যান। আমি স্বয়ং এই মন্দির ও লিপির ছাপ ৮৯ বার লইয়া আসিয়াছি এবং সেই সকল হইতে মিলাইয়া এবং দেবদত্ত শর্ম্মা ও কানাইয়া লাল মিশ্র ও অপর বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতের সহিত পাঠ মিলাইয়া এই পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি কোনও ভুল হইয়া থাকে, সুধিগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। গয়া জেলার মধ্যে দেওয় রাজবংশের মত প্রাচীনতম ও প্রখ্যাত রাজবংশ বা সামন্তবংশ আর নাই। রাজপুতানার "রাণা হাডাবাও কাছোয়াহা" বংশের সহিত কেবলমাত্র এই রাজবংশের শোণিতের সম্পর্ক আছে বলিয়া বিহারপ্রান্তীয় প্রদেশ-মধ্যে দেও রাজবংশের এত মান ও মর্য্যাদা। বর্ত্তমান দেও রাজকুমার জগন্নাথপ্রসাদ সিংহ দুর্দ্দমা নৃপতি হইতে অধঃস্তন ২৮ পুরুষ হইতেছেন। "দেওরাজবংশবর্ণন," "জীবনমুক্ততরঙ্গিণী," "কংসনির্ব্বাণ দর্পণ" প্রভৃতি পুস্তক হইতে দেবদ্রুমের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। দুর্দ্দমা নৃপতি হইতে ভৈরবেন্দ্র রাজ পর্য্যন্ত ১৩জন নরপতি দেও-উমগার সিংহাসনে রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই সোমবংশীয়

নরপতি ছিলেন। মহারাজ ভৈরবেন্দ্রের ভাস্বতী নাম্নী একমাত্র নগ্নিকা কন্যা, শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনাধিরূঢ়া হইলে, উদয়পুররাজ রাণারাও প্রতাপসিংহের আত্মীয় বা নিকটস্থ জ্ঞাতী রাণা রণভানুসিংহের সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র সহস্র-মল্লসিংহ দেও সিংহাসনে মহারাজ ভৈরবেন্দ্রের পর রাজত্ব করেন। মহারাজ সহস্রমল্লসিংহই দেবক্রমের প্রথম সূর্য্যবংশীয় নৃপতি হইতেছেন। মহারাজকুমার জগন্নাথপ্রসাদ সিংহ বর্ত্তমান দেও-রাজ সিংহাসনের গদীনশীন এবং তাঁহা হইতে অধস্তন ১৫ পুরুষ হইতেছেন। তাঁহার "জীবনমুক্তিতরঙ্গিনী" গ্রন্থ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞান ভক্তি ও মুক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সহিত দেও রাজবংবশের ইতিহাস জড়িত আছে। দেওরাজগণের মধ্যে মহারাজ ঘনশ্যাম সিংহ, যুবরাজ ফতেহ্ নারায়ণ সিংহ, এবং মহারাজ জয়প্রকাশ সিংহ K. C. S I. বাহাদুর খুব প্রখ্যাত লোক ছিলেন। মহারাজ জয়প্রকাশ সিংহ বাহাদুরের বীরত্ব, রণদক্ষতা, ক্ষিপ্রহস্ততা এবং সাহসিকতা দেখিয়া ১৮৭৭ সালের দিল্লীর দরবারে বড়লাট লিটন বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। উমগার লিপি হইতে এই রাজবংবশের একরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়। মহারাজ ভীষ্মনারায়ণ হইতে দেওবাজ্যের অবনতি ঘটে। মহারাজ জয়প্রকাশ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দেনা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। বিলাসী রাজা ভীষ্মনারায়ণ সেই পিতৃকৃত ঋণের পরিশোধের কোনও উপায় চিন্তা না করিয়া নিজে অসৎসংসর্গে পড়িয়া উন্মার্গগামী হইয়া পড়িলেন। রাজ বা "রেয়াসৎ" রক্ষার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া রাণীর আবেদনে বঙ্গাধিপ দেওরাজ্য Encumbered Estates এর অধীনে লইয়া কতকাংশ বিক্রয় করিয়া পতনোন্মুখ প্রাচীন দেওরাজ্যকে রক্ষা করিলেন। এই বিক্রীত অংশ এখন রায় ৺ পশুপতিনাথ বসুর ষ্টেটভুক্ত। বর্ত্তমান দেওরাজ যদি এই সকল ষ্টেট উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয়। যাহা হউক, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, দেওরাজের পূর্ব্বগৌরব ও অস্তিত্ব বজায় থাকে ও যশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেওর সূর্য্যমন্দির গাত্রে লিখিত আছে,—"শূন্য ব্যোম রসেন্দু করভূহীনে দ্বিতীয়ে যুগে। মাঘে বাণ তিথৌ সিতে গুরুদিনে দেবে দেবেমালিয়ম্॥ .....বিশোকে ভুবি॥" উহার অর্থ উদ্ঘাটনে বেশ বুঝা যায় যে, এই মন্দির পুরুরবা-নরপতির রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পুরুরবা-সম্বন্ধীয় ও উর্ব্বশী সংক্রান্ত উপাখ্যান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উর্ব্বশী কাহারও কাহারও মতে কান্দাহার-দেশীয় স্ত্রী। পরবর্ত্তী পুরাণে দেবনকী-রূপে পরিচিত হইয়াছে। যদি এই মন্দির বর্ত্তমান চতুর্যুগের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বয়ঃক্রম ৯৪৯০০০ বৎসর হইবে। যদি ইহা প্রথম চতুর্যুগে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা ১১৭৫৮৯০০০ বৎসরের প্রাচীন হয়। কিন্তু রৌদ্র, বর্ষা, গ্রীষ্ম উত্তাপাদি প্রাকৃতিক কারণগুলি উপেক্ষা করিয়া এই মন্দির এতাবৎ কাল কিরূপে অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা বিশেষ বিস্ময়ের কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। ইহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পাদি স্বতঃই দর্শকের মনে দুঃখ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই মন্দিরের অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, যাহা পৃথ্বীর উপরে

দণ্ডায়মান, তাহাও অত্যুচ্চ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দেওর সূর্য্যমন্দিরের চূড়ার শীর্ষদেশস্থিত স্বর্ণের বৃহৎ কলস—পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। প্রবাদ এই যে, এই মন্দির ৫২ তলা উচ্চ নির্ম্মিত হয়; পরে ক্রমে পৃথিবীর মধ্যে পাপ বেশী হওয়ায় ইহার অর্দ্ধেক মৃত্তিকাগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেবের ছট্ (ষষ্ঠী) ব্রত উৎপত্তি এই স্থান হইতে হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি উল্লেখ করিয়া থাকে। এই কথা আমরা ময়ূরভট্টের পুস্তকাবলি পাঠেও জানিতে পারি। সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিয়া ও সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি দর্শন ও পূজা করিয়া বহু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গয়া-নগর হইতে ১৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেওদেবুক্রম নামক প্রাচীন নগর বর্ত্তমান। দেও সূর্য্যমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক স্থানে কিছু ভগ্নচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবাদ-বচনে ইহাকে কোনও হিন্দুদ্বেষী মুসলমানরাজ কর্ত্তৃক কামানের (তোপের) গোলার চিহ্ন বলিয়া আরোপ করিয়া থাকে। এই হিন্দু-দেবালয় এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত। কোনও মুসলমান বাদসাহ, এই পুণ্যময় হিন্দুর-দেবভূমি ভগ্ন ও কলুষিত করিতে অগ্রসর হন। তিনি তোপ নিক্ষেপ করিলে, প্রত্যেক তোপাঘাতে এক একটী তলা ভূগর্ভে বসিয়া যায়। শেষে বাদসাহ স্বয়ং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। তখন স্ফটিক-নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তি কূপে লাফাইয়া পড়েন। এইরূপ প্রবাদ—বহু হিন্দুদেবতার সম্বন্ধে শুনা যায়। ৺কাশীধামের জ্ঞানবাপীর কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। মূলমন্দিরের চতুষ্কোণে ৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল; তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের দুইটী মন্দিরের আদৌ কোনও চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। জনপ্রবাদ বলে যে, ইহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকের দুইটী মন্দিরের সামান্য মাত্র চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এখন ইহাদের সান্নিধ্যে লোকের বসবাস ঘরবাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরদিকের মন্দিরটীর পার্শ্বেই শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। প্রবাদ এই যে, বিগত তিন যুগে মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বাস্য ছিল, কলিযুগে তাহা পশ্চিমমুখী হইয়াছে। কথিত আছে, কবিবর ময়ূরভট্ট পাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া রোগবিনির্মুক্ত হন। শুকশর্ম্মার বিষয়েও সেইরূপ উপাখ্যান আছে। ময়ূরভট্টের সময় হইতেই মন্দিরদ্বার পশ্চিমমুখী হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। আমার মনে হয়, কবিবর ময়ূর ভট্টই শুকশর্ম্মার অন্যতম নাম। ময়ূরভট্ট কোনও অপরিচিতা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন, এবং রূপেমোহিত হইয়া তাহার রূপ বর্ণন আরম্ভ করেন। তখনই তাঁহার সর্ব্বশরীর কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই স্ত্রী তাঁহার অপরিচিতা কন্যা ছিলেন। বহু স্তবস্তুতি ও সূর্য্যদেবের পূজান্তে তাঁহার ব্যাধি প্রশমিত হয়। "প্রেত-বিজয়" নামক গ্রন্থে তাঁহার সানুনাসিক বহু-শ্লোক রচনা ও পিপ্পল-বৃক্ষস্থিত প্রেতকে পরাজয়ের উপকথা প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, রাজা পুরুরবা, যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কোনও ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হন এবং তদবস্থায় অত্রদেশে মৃগয়া করিতে আসিয়া শৌচক্রিয়ার চেষ্টা হওয়ায় ভৃত্যের নিকট জল চাহেন। ভৃত্য এক ডোবার বা গর্ত্তের জল ভৃঙ্গারে পুরিয়া লইয়া গিয়া রাজাকে দেয়। শৌচান্তে রাজা তাহা ব্যবহার করিলে, যে যে অঙ্গে কুষ্ঠ ছিল, সেই জলস্পর্শে সেই সেই অঙ্গ কুষ্ঠমুক্ত হয়। রাজা,

বিস্মিত হইয়া, সেবকের নিকট জল আনার স্থান অবগত হইয়া, সেই গর্ত্তে গিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া স্নান করিলেন। তাহাতে তিনি রোগ ও সকল ব্যাধিমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ কাঞ্চন-শ্রী দেহ লাভ করিলেন। এই জলাশয় অদ্যাবধি সূর্য্যকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ আছে। মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা যে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাহাতে সকল দেবতা, তাৎকালীন রাজাগণ ও প্রজাগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। বহু রাজা ও পৃথিবীপতিগণ এই স্থানে এক একটী পুষ্করিণী বা জলাশয় খনন করেন। তাহাদের মধ্যে বহু জলাশয় অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। বহু জলাশয় পলি পড়িয়া সমতল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের প্রথম হইতে একাদশী পর্য্যন্ত এই থানে মেলা বসিয়া থাকে। দূরদেশান্তর হইতে লোকসকল ও যাত্রিগণ আসিয়া সূর্য্যদেবের পূজা ও অর্ঘ্যদান করিয়া বালক ও বালিকাদের "মুণ্ডন-সংস্কার" সম্পাদন করিয়া থাকে। পণ্ডিত কানাইয়া প্রসাদ মিশ্র দেবক্রমের মাহাত্ম্য উদ্ধার করিয়া ধরায় অসীম যশ রাখিয়া গিয়াছেন। দেওর সূর্য্যমন্দির বড়ই জাগ্রৎ সাক্ষাৎফলপ্রদ—বিহারের এক তীর্থস্থান।

সমাধি।

[শ্রীমতী উমালতা ঘোষ বিরচিত।]

থেমে যায় শঙ্খ ঘণ্টা, আরতির রোল;
সুগন্ধ প্রদীপখানি, সমীরণ ভরে,
কেঁপে কেঁপে নিভে যায়; উতলা বিভোল,
ভক্তের হৃদয়খানি, সমাধির তরে॥
শুকায় অগুরুসিক্ত ফুল্ল ফুলরাশি;
সমীরণ লুঠে লয় ধূপের সৌরভ;
জ্বালে আলো কিরূপ সে, কি মধুর হাসি,
পূজারীর হৃদিতলে কি প্রেম-গৌরব॥
'বহে যায়' মন্দাকিনী; হৃদয় দেউলে
শত আরতির বাদ্য বেজে উঠে তার।
সুগন্ধ মাতিয়া রয়, পারিজাত-ফুলে
প্রদীপের নবালোকে, মোহের আঁধার
ঘুচে যায়; প্রেমধূপ সুরভিতে ভরা।
অন্তর বিশ্বের প্রেমে হয় মাতোয়ারা॥

নরেন্দ্র-স্মৃতি। *

[শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বিরচিত।]

কবি বলিয়াছেন,—

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন চিরস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে, আমরাও হব বরণীয়।

সকল দেশে, সকল জাতিই, পূর্ব্ববর্ত্তী দেশনায়কদিগের ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বদেশহিতৈষিতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, একাগ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুকরণ ও অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আলোক-স্তম্ভ-সকল পথহীন মহাসমুদ্রে যেমন পোতবাহকদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়া থাকে, দেশহিতব্রত মহাজন ও ধার্ম্মিকদিগের জীবন ও কার্য্য তেমনই ভাবয়দ্বংশীয়দিগকে কর্ত্তব্যের পথ—সিদ্ধির পথ—দেখাইয়া দেয়। মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বহু ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তির হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদিগের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া, কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে কত লোককে প্রণোদিত করিয়াছে। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই হেতু, আদর্শচরিত্র মহাত্মাদিগের ও কর্ম্মবীর-গণের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে, সভ্যদেশে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। এই সকল সভায় পরলোকগত মহাত্মগণের প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ হয়, তেমনই তাঁহাদিগের সদ্‌গুণরাশির আলোচনায় হৃদয়ে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়।

সকল সদনুষ্ঠানে—নরেন্দ্রনাথ।

যে সকল মহাত্মাদিগের চরিত্র-বল কর্ম্মোদ্যম ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার ফলে এদেশের বিবিধ উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছে, স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর তাঁহাদিগের অন্যতম। আজ ৯ বৎসর হইল, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের জীবন যেরূপ বহু-কর্ম্মান্বিত ছিল, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল, তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে সেরূপ জীবন অতি অল্পজনেরই পরিলক্ষিত হইত। দেশে এমন কোনও সদনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল না, যাহার সহিত নরেন্দ্রনাথ সেনের যোগ ছিল না। পরন্তু যে অনুষ্ঠানের সহিত নরেন্দ্রনাথ সেনের যোগ ছিল না, তাহা একটা বিশেষ চেষ্টা বলিয়াই পরিগণিত হইত না।

নরেন্দ্রনাথ সেনের এই কর্ম্মানুরাগ ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে তাঁহার বংশগত প্রভাব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তিনি কলিকাতার কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ বৈদ্য-সেনবংশ-সম্ভূত। ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগ হইতেই দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যেই এই সেনবংশের প্রভাব

---

* স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের নবম-বার্ষিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।

সম্যক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কি সামাজিক কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, আর কি শিক্ষা-দীক্ষা—এ দেশের সকল উন্নতিকর কার্য্যের সহিতই এই সেনবংশের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ বিদ্যমান্। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে যে এই সেনবংশের কীর্ত্তি চির-উজ্জ্বল থাকিবে, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। নরেন্দ্রনাথ সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগের একজন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি কিরূপে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে আসন লাভ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস বিবৃত করা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীতে মাসিক আট টাকা বেতনের চাকরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় অধ্যবসায় কর্ম্ম ও চরিত্র-বলে দেড়-হাজার টাকা বেতনের বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য-ভার পাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত শক্তির পরিচয় মাত্র। এ দিকে আবার, দেশোন্নতিকর কার্য্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, তাহা Maunders Biographical Treasury নামক গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সে যুগে রামকমল সেন কিরূপ দেশনায়ক ছিলেন! উক্ত গ্রন্থের লেখক তাঁহাকে "Man of superior attainments, indefatigable industry and great influence" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—"His endeavours to disseminate useful knowledge were both zealous and well directed, and throughout his whole career he proved himself to be an active promoter of every institution in Calcutta that had for its object the advancement of European Science or the intellectual progress of his countrymen." কেবল শিক্ষার উন্নতি-কল্পে নহে; দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এক্ষণে এ দেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ হইতেছে। দেওয়ান রামকমল সেন কিঞ্চিন্ন্যূন শতবর্ষ পূর্ব্বে Agricultural and Horticultural Societyতে Manufacture of Paper in India সম্বন্ধে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র কর মহাশয় তাঁহার পাটের চাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে তাহা অনেক স্থানে উদ্ধৃত করিয়া রামকমল সেনের দূরদৃষ্টি ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা যে রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে বাস করিতেছি, রামকমল সেনের সময়েই তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান British Indian Assoociation এর বহু পূর্ব্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উদ্‌যোগে Landholder's Society নামে একটী সভা আভিজাত্য সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। রামকমল সেন এই সভারও একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, যে কোনও অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইত, রামকমল সেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার পোষকতা করিতে ত্রুটি করিতেন না। পিতামহের এই গুণ নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ সেনের পিতা হরিমোহন সেনও একজন শক্তিমান্ স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনিও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে পিতার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য বিশেষ শ্রমসাধ্য হইলেও তিনি দেশহিতকর কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না। তৎকালে কলিকাতার শিক্ষা ও অন্যান্য হিতকর কার্য্য সংক্রান্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, হরিমোহন সেনকে ছাড়িয়া তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই, সকলে হরিমোহন সেনের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ও দেশানুরাগের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Lex Loci Act নামে একখানি আইন বিধিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ হয়। ইহা সে সময়ে ২১ আইন নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। এই আইনে হিন্দুধর্ম্মের উপর যার-পর-নাই অযথা ও জঘন্য আক্রমণ করা হইয়াছিল। ইহাতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সকল প্রদেশেরই হিন্দুগণ ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিমোহন সেন এই আইনের প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইলেন। সে সময়ে 'ল্যাণ্ডহোল্ডর্স সোসাইটি' ব্যতীত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি' নামে আর একটি জনহিতকর সভা কলিকাতায় ছিল। হরিমোহন সেন এই দুই সভারই বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি এই উভয় সভার সহকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করিলেন। সে সভায় বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভায় প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে 'কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর'-দিগের নিকট আবেদন পাঠাইবার সঙ্কল্প স্থির হয়, এবং সে জন্য একটি কমিটি সংগঠিত হয়। হরিমোহন সেন সেই কমিটীর সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছিলেন। হরিমোহনের শক্তি-সামর্থ্যে ও তাঁহার যোগ্যতায় সাধারণের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর-দিগের নিকট যে আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, সেক্রেটারী হরিমোহনই যে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুনিয়াছি, এই আবেদন-পত্র এরূপ আবেগপূর্ণ তীব্রভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাহাতে তাৎকালিক বৃটীশ গবরমেণ্টের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল যে, এদেশে আর কোন উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে সেরূপ ভাষা প্রয়োগের কথা শুনা যায় নাই। হরিমোহন সেন তিন বৎসর কাল উক্ত কমিটীর সেক্রেটারী-রূপে উক্ত আইনখানি রহিত করিবার জন্য অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিয়া দেশবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হরিমোহন সেন এরূপ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর সহিত একটি সামান্য কথান্তর জন্য তিনি অতবড় আয়ের ও মর্য্যাদার পদ পরিত্যাগ করেন। সেক্রেটারী মিঃ হগের বিরুদ্ধে "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" পত্রে কোনও নিন্দা প্রকাশিত হয়। হরিমোহনের সংবাদপত্রে লেখা অভ্যাস ছিল বলিয়া, তিনি তাঁহাকে সে জন্য সন্দেহ করেন। হরিমোহনের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিলেও মিঃ হগের সন্দেহ দূর হয় না। এরূপ উপরওয়ালার সহিত ভদ্রলোকের কাজ করা সম্ভব নহে বলিয়া, তিনি সেই দেড় হাজার টাকা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া দিতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান উন্নতির মূল যে হরিমোহন সেন,

এ কথা কাহারও অবিদিত নহে। কেবল তাহাই নহে; জয়পুরাধিপতি মহারাজ রামসিংহ বৃটীশ গবরমেণ্ট কর্ত্তৃক যে বহু সম্মানে সম্মানিত হন, হরিমোহনই তাহার হেতু। হরিমোহনের পরামর্শেই মহারাজ রামসিংহ অপর মিত্ররাজগণের কথা উপেক্ষা করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে গবরমেণ্ট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। মহারাজও সেজন্য হরিমোহন সেনকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। হরিমোহনের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী, দেশীয় স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রিপদ লাভ করেন নাই।

নরেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র।

পিতার এই দূরদর্শিতা ও স্বাধীন প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ সেনের চরিত্রকে কিরূপ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে, সেন-বংশের আর এক মহাপুরুষের প্রভাব তাঁহার চরিত্র-গঠনের কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, আমি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। তিনি আর কেহই নহেন,—নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত-পুত্র বিশ্ববিশ্রুত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও সমাজ-সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। নব্য-বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে যাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যাঁহার চরিত্রের আদর্শে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নৈতিক জীবন নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছিল, স্থিতিশীল হিন্দুসমাজে যিনি এক মহা পরিবর্ত্তনের যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, এ হেন মনীষির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? আমরা অনেক সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার জীবনে যে কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ও দৃষ্টান্তে। কেশবচন্দ্র সেন একটি যুগসন্ধি-সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তাহার প্রদীপ্তচ্ছটায় বাঙ্গালী যুবকদিগের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের গতিশীলতা সন্দর্শনে প্রাচ্য স্থিতিশীলতার প্রতি তাহাদিগের বীতরাগ জন্মিয়াছিল, এবং সেই জন্য যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহার প্রতি তাহারা ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছিল। ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহারা তাহাদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের আচার-ব্যবহার অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে তাহারা কিরূপ ভ্রষ্টাচারী ও সমাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা মনীষী রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। অভোজ্য ভোজন ও অপেয় পান যখন তাহারা উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং সংস্কারক মাত্রেরই এই সকল কার্য্য অবশ্য-অনুষ্ঠেয় বলিয়া তাহাদিগের দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কেশবচন্দ্র তখন সেই সকল ব্যবহারের বিরুদ্ধে আত্মনিয়োগ করিলেন। বৈষ্ণব-পরিবারে জন্মহেতু তিনি স্বভাবতঃই আচার-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাকে ধীরশান্তস্বভাব ও চিন্তাশীল করিয়াছিল। ভ্রষ্টাচার যে সুশিক্ষার পরিচায়ক নহে, কেশবচন্দ্র তাঁহার স্বকীয় চিন্তার দ্বারা তাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন। আচারনিষ্ঠা যে আধ্যাত্মিক জীবনের সোপান, তাহা

হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সকালে মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়াছিলেন। পলাণ্ডু প্রভৃতি হিন্দুর অভোজ্য খাদ্য—যাহা প্রথম যুগের সংস্কারকেরা আগ্রহের সহিত আহার করিতেন; কেশবচন্দ্র জীবনে কখনও তাহা স্পর্শ করেন নাই। নরেন্দ্রনাথও জ্যেষ্ঠের এই দৃষ্টান্ত-ক্রমে নিরামিষভোজী ও নিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন। পঠদ্দশা হইতেই কেশবচন্দ্র শিক্ষা-বিস্তারের অনুরাগী ছিলেন; এমন কি, তাঁহার অবকাশ-কালে তিনি দরিদ্র ও অর্থব্যয়ে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কলুটোলা-পল্লীতে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারাকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি কেশবচন্দ্রের সেই নৈশবিদ্যালয়ে প্রথম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি তাঁহার আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ হেন সহৃদয় উন্নতচরিত্র আত্মীয়ের সংসর্গ যে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে কল্যাণজনক হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সংবাদপত্র-সংশ্রব।

কেশবচন্দ্রের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছিল, সুতরাং নরেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ আদৌ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দেবী সরস্বতীর নিকট হইতে একেবারে বিদায় লন নাই। তাঁহার পিতা, গৃহেই তাঁহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে সময় কাপ্তেন পামার (Captain Palmer) নামে একজন সংবাদ-পত্র-লেখক ও সুশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ইংরেজ কলিকাতায় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের শিক্ষার ভার তাঁহার উপরই অর্পিত হইয়াছিল। এই শিক্ষকের সাহায্যে ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তে নরেন্দ্রনাথ অল্পদিবসের মধ্যে এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ না হইতেই কিশোরীচাঁদ মিত্রের "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" (Indian Field) নামক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বোধ হয় অতি অল্প ছাত্রই এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। এই সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ-লেখা হইতে নরেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই সংবাদপত্র-সম্পাদকের কার্য্যে অনুরাগ জন্মে। সে সময়ে সংবাদপত্র-সম্পাদকের কার্য্য কোনও বাঙ্গালী জীবিকার জন্য অবলম্বন করিতেন না—উহা কেবল স্বদেশ-সেবাব্রতের সহায় বলিয়া অবলম্বিত হইত। নরেন্দ্রনাথের পিতা জয়পুরের মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎকালে তাঁহারও সে পদ লাভের আশা থাকিলেও তাঁহার দেশ-সেবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি স্বাধীন ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং তাই কার্টের 'সলিসিটর' (Solicitor) হইবার জন্য খাতনামা 'সলিসিটর' উইলিয়াম য়্যানলির আফিসে শিক্ষানবীশ (articled) হন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, সংবাদপত্র-সম্পাদনে নরেন্দ্রনাথ সেনের

যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এই ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে সেরূপ ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি ইহাতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধুতা, ন্যায়পরতা, অকপটতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি তাঁহার সমব্যবসায়ীদিগের ও ধর্ম্মাধিকরণের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যে শ্রদ্ধা-সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায় যে, সে সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অনেক প্রবীণ বাঙ্গালী উকীল বিদ্যমান থাকিলেও তিনিই তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে 'নোটারি পাব্‌লিক্' (Notary Public) হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ 'ইণ্ডিয়ান ফিল্‌ড' (Indian Field) পত্রে তাঁহার লেখা সমাদৃত হওয়ায় এবং অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাকে সেই পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘ-ভুক্ত করায়, সম্পাদকের ব্রত গ্রহণে তাঁহার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সেই Indian Field পত্রে লিখিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইত না। সেসময়কার বাঙ্গালীদিগের সকল সংবাদপত্রই অল্পাধিক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিল। কোনও পত্র জমীদারদিগের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইত, কোনখানি বা কেবলমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। নরেন্দ্রনাথের উদার হৃদয় সেরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। এদিকে শীঘ্রই তাঁহার আশানুরূপ একখানি পত্র প্রকাশের আয়োজন হইয়াছিল।

'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রের সৃষ্টি ও নরেন্দ্রনাথের সংশ্রব।

এই সময়, বঙ্গমাতার সুসন্তান-স্বনামধন্য দেশহিতৈষী মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও উন্নতিশীল জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে, একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যে, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায়, "ইণ্ডিয়ান মিরর" (Indian Mirror) নাম দিয়া (ইংরাজী ১৮৩০ সালে) একখানি ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করিলেন। ক্ষুদ্র ফুলস্ক্যাপ আকারের কতিপয় পৃষ্ঠাযুত সেই পাক্ষিক-পত্রিকাখানি যে একদিন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত প্রথম ও প্রধান সংবাদ-পত্রের সম্মান লাভ করিবে, ইহা সে দিনে কাহারও স্বপ্নেও মনে হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ যখন এই নূতন পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘ ভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর মাত্র। এখনকার উচ্চশিক্ষার উন্নতির দিনেও, এরূপ অল্পবয়স্ক যুবকের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন ২৪ বৎসর। প্রতাপচন্দ্রের বয়সও তদনুরূপ এবং মনোমোহনের বয়স ২০ কি ২১ বৎসর হইবে। এইরূপ অল্পবয়স্ক যুবকদিগের দ্বারা পত্রখানি পরিচালিত হইলেও, কি ভারতবাসী, কি য়ুরোপীয়, সকল সম্প্রদায়েরই নিকট উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যে সময় দেশীয় সংবাদপত্র-পরিচালকদিগের পিতৃস্থানীয় হরিশ্চন্দ্র, সুযোগ্য সহকারী কৃষ্ণদাসের সহিত হিন্দুপেট্রিয়টের কর্ণধার-রূপে বিরাজ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্রের তেজস্বী লেখনী যখন "বেঙ্গলীকে" গৌরবান্বিত করিয়াছিল, এবং লালবিহারীর সরস রচনায় "ফ্রাইডে রিভিউ" যখন য়ুরোপীয় ও দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের

চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল; সেই সময়ে, এইরূপ যুবকদিগের পরিচালিত ক্ষুদ্রকায় পাক্ষিক পত্র "ইণ্ডিয়ান মিরার" যে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ইহা পরিচালকদিগের সামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কিন্তু "মিরারের" এই যশঃসৌরভ বিস্তারিত হইতে না হইতে, ইহার প্রবর্ত্তক মনোমোহন ঘোষ শিক্ষা-লাভের জন্য বিলাত-যাত্রা করিলেন। তখন ইহার পরিচালন-ভার কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ এই তিন জনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে নরেন্দ্রনাথই উহার প্রধান পরিচালক হইলেন। কেন-না, কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে দূরদেশে যাইতেন বলিয়া, তাঁহারা সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে "মিরারের" কার্য্যে মনোযোগ-দানে সমর্থ হইতেন না। অল্পকালের মধ্যে এই পাক্ষিক পত্রিকার গৌরব-প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, উহাকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিতে হইল। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি বা সমাজ-সংস্কার সর্ব্ববিষয়ে "মিরার" নির্ভীকভাবে তাৎকালিক উন্নতিশীল শিক্ষিতমণ্ডলীর অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

দেশহিতৈষণা ও "মিরারের" প্রতিপত্তি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা (Mass education) বিস্তারের আয়োজন হইতেছে, 'ইণ্ডিয়ান মিরারই' অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে এই জনশিক্ষা-প্রবর্ত্তনার জন্য তারস্বরে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি সকল সময়েই ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে শিক্ষিত-সমাজে যে সুরাপানের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইত, তাহা নিবারণের জন্য মিরারের ন্যায় আর কোনও সংবাদ-পত্র প্রাণ-মন উৎসর্গ করেন নাই। বালিকাদিগের শিক্ষা, অন্তঃপুরচারিণী নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি সমাজহিতকর কার্য্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার"ই যে সে সময়ে সকলের অগ্রণী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগত ও আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক এই পত্র পরিচালিত হইলেও সকলে ইহার অভিমত শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যের সহায়তাও করিতেন। "মিরারের" প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা কেবল এই বঙ্গদেশে নিবদ্ধ ছিল না। বিহার, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ ও মাদ্রাজ, সর্ব্বত্রই ইহার সমান সমাদর হইয়াছিল। সে সময়ে কোনও বাঙ্গালী সম্পাদক প্রাত্যহিক-পত্র প্রকাশের কল্পনাকেও কখন মনে স্থান দেন নাই। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রাত্যহিক ইংরাজী সংবাদ-পত্র সম্পাদিত হইতে পারে, ইহা অনেকের ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু মিরারের পরিচালকগণ যাহা প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন—Heart within and God overhead—একমাত্র এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশে শিক্ষা-বিস্তার ও নীতির উন্নতির অভিপ্রায়ে যে সকল অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন, "মিরার"কে প্রাত্যহিক-পত্রে পরিণত করা তন্মধ্যে একটী। তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট এইরূপ প্রস্তাব

করিবা মাত্র নরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাহা সমর্থন করেন। আরও বিশেষ কারণে সে সময়ে বাঙ্গালীদিগের একখানি প্রাত্যহিক ইংরাজী-পত্র প্রকাশও আবশ্যক হইয়াছিল। সেই সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে হেয়ার-স্কুলের কি হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের সহিত পুলিসের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে পুলিস-আদালতে মামলা পর্য্যন্ত রুজু হয়। এই উপলক্ষে ইংরেজী দৈনিক-পত্র-সকলে ছাত্রদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া নানা প্রবন্ধ ও প্রেরিত পত্রসকল প্রকাশিত হইতে থাকে, কিন্তু ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ প্রেরিত হইলে, তাহা প্রকাশিত হইত না। বাঙ্গালীদিগের একখানি দৈনিক পত্র থাকিলে ঐ সকল প্রতিবাদ প্রকাশে কোনও অসুবিধা থাকিত না; কিন্তু কেহই সে কথা চিন্তা করেন নাই। মিরারের পরিচালকেরা যেমন ইহার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, অমনি কালবিলম্ব না করিয়া, লাভ-লোকসান না খতাইয়া, কত মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে—তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে সাপ্তাহিক মিরারকে প্রাত্যহিকে পরিণত করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ অবাক হইলেন। অনেক বন্ধু এই অসমসাহসিতার নিন্দা করিলেন। কিন্তু পরিচালকগণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রাত্যহিক মিরার নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে লাগিল। লিপিপটুতা ও প্রবন্ধ-গৌরবে উহা ইংরেজদিগের পরিচালিত সংবাদ-পত্র অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন হইল না। এদেশে ও ইংলণ্ডে—এমন কি আমেরিকাতেও—উহার রচনাভঙ্গীর ও উদার অভিমতের প্রশংসা প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'মিরার' প্রাত্যহিকে পরিণত হইবার অল্পদিন পর হইতেই উহার শীর্ষদেশে নরেন্দ্রনাথের নাম সম্পাদক বলিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং তদবধি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 'মিরারের' ললাটে সেই নাম শোভা পাইয়া আসিয়াছে। 'মিরার' যখন এইরূপে প্রকাশিত হইল, তখন নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এজন্য দৈনিক-পত্রের প্রধান সম্পাদকের যেরূপ সময় প্রদান করা প্রয়োজন, তাহা তিনি দিতে পারিতেন না। এই হেতু তিনি কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ সুপণ্ডিত ও আদর্শচরিত কৃষ্ণবিহারী সেনকে তাঁহার সহযোগিরূপে গ্রহণ করেন। এইরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের বিপুল পরিশ্রমে 'মিরার' আরও উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উহা অন্যান্য ইংরেজী দৈনিকের ন্যায় বিস্তৃত কলেবরে প্রকাশিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবন এবং দেশব্যাপী সুনাম ও প্রতিপত্তি এবং তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি—এই মিরারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া আমরা ইহার ইতিহাস এতটা বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়া আপনাদিগের কতকটা ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইলাম।

রাজনীতিক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ।

সেকালে যাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সেজন্য এখনকার মত রাজনৈতিক দলাদলি ছিল না, সুতরাং ধীরপন্থী উগ্রপন্থী (Moderate, Extremist) ইত্যাদি বিশেষণে কাহাকেও বিশেষিত করা হইত না। কিন্তু এক্ষণে 'মডারেট'

শব্দ যে অর্থবোধক, তাহাতে বলা যাইতে পারে "মিরর" পত্র চিরদিন এই 'মডারেট' নীতিতেই পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; বর্ত্তমান সময়ের প্রবীণ রাজনীতিকেরা সরকারের সহিত তাঁহাদিগের ব্যবহার-সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"Co operation when necessary" এবং "Opposition when we must." অর্থাৎ,—গবরমেণ্টের সহিত সহযোগিতার প্রয়োজন হইলে সহযোগিতা করিব এবং প্রতিবাদের সময় উপস্থিত হইলে তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। "মিরর" আজন্মকাল এই মূলমন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ইদানী নরেন্দ্রনাথ সেনই এই মন্ত্র প্রচারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইল্‌বার্ট বিলের আন্দোলন-কালে "মিরার" বা নরেন্দ্রনাথ সেন কিরূপ তেজস্বিতার সহিত আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, আবার, সহবাস-সম্মতি-আইনের প্রবর্ত্তন-কালে, স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, দেশের সম্প্রদায়-বিশেষের অপ্রীতিভাজন হইয়াও, নরেন্দ্রনাথ তাহার পোষকতা করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের শাসন-প্রণালীর "মিরার" যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, লর্ড কার্জ্জন তাহাতে এতদূর অধীর হইয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান-অনুষ্ঠান-উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি 'মিরারের' উক্তির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সে সময় সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও লর্ড কার্জ্জন দিল্লীর দরবার সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাকে রোমীয় সম্রাটদিগের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-কালেও নরেন্দ্রনাথ লর্ড কার্জ্জনের নীতির প্রতিবাদে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু যে সময়ে 'বোমা-নীতি' প্রবর্ত্তিত হইল এবং আইরীশদিগের অনুকরণে বিপ্লব-বাদ প্রচারের সূত্রপাত হইল, নরেন্দ্রনাথের বিবেক তাঁহাকে যোগ-দান (Co-operation) নীতির অনুসরণ করিতে বলিল; সুতরাং তিনি তখন সেই নীতির অনুসরণই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার বিবেকের আলোকে তিনি যে মার্গ অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, কিছুতেই তিনি তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। তিনি "হাততালি" পাইবার আকাঙ্ক্ষায় কখনও বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইতেন না। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আপনাদিগের মধ্যে অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকারের মনোনীত কমিশনর-রূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োগের কিছুদিন পরে নগরের স্বাস্থ্যোন্নতি উপলক্ষে গবরমেণ্ট কমিশনরদিগের সম্বন্ধে অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহাতে নির্ব্বাচিত কমিশনরদিগের সকলে অপমানিত মনে করিয়া পদত্যাগ করেন। নরেন্দ্রনাথ, মনোনীত কমিশনার হইয়াও, নির্ব্বাচিতদিগের কার্য্য অনুসরণ করেন। অল্পদিন পরে, যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা করদাতাদিগের কিরূপ বিশ্বাসভাজন,—ইহা প্রতিপাদনার্থ নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন। নরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে মুচীপাড়া-থানার অন্তর্গত ওয়ার্ডে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন। অন্যান্য কমিশনারদিগের ন্যায় তিনিও সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমান মিউনিসি-

পাল আইন প্রবর্ত্তনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তিনি বরাবর নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মিউনিসিপাল আইন যখন বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন নরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক-সভায় মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি-রূপে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার তাকালিক সহযোগী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টে যে মতান্তর (Minute of Dissent) প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে ওরূপ গবেষণা-পূর্ণ সতেজ ভাষায় লিখিত সুদীর্ঘ মত (Minute of Dissent) আর কখনও ব্যবস্থা-পরিষদের কোনও সদস্য লিখিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। স্বাধীন মত প্রকাশে নরেন্দ্রনাথ চিরদিন নির্ভীকতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। লাট ভবনে লর্ড ডফ্‌রিণের কোনও বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে তিনি যে আত্মমর্য্যাদা সাহসিকতা ও সংবাদপত্র-সম্পাদকের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার চাক্ষুষ সাক্ষী অদ্যাপি অনেকেই বর্ত্তমান আছেন। আমাদিগের সভাপতি মহাশয় সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কি না, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি-সভায় সেই ঘটনার কথা এত বার উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহা বিবৃত করিয়া আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ করা আমি সমীচীন মনে করিলাম না।

নরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মূল।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক উন্নতির সহিত নরেন্দ্রনাথের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার পরিচয় না দিলে নরেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিসভার উপযোগিতা অনুভূত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রকার-রাজনৈতিক উন্নতির হেতু যে কংগ্রেস, আপনারা কি জানেন যে, নরেন্দ্রনাথ সেন সেই কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তী কালে আমাদিগের দেশের যে সকল নেতৃবর্গ কংগ্রেসের সংশ্রবে খ্যাতিমান্ ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, কংগ্রেসের সূতিকাগারে এবং তাহার জাতকর্ম্ম-উপলক্ষে তাঁহাদিগের কেহই উপস্থিত ছিলেন না, এবং কংগ্রেস যে দেশে এরূপ মহীয়ান্ হইবে, সেদিন কেহই তাহা মনেও করেন নাই। আপনারা বোধ হয় জানেন, নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার 'থিয়জফিকেল সোসাইটীর' সভাপতি ছিলেন। যাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী নাস্তিকতা পরিহার করিয়া আস্তিক হয় এবং হিন্দুর বেদ বেদান্ত-দর্শনাদির আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে পারে, এজন্য তিনি প্রথমাবধি কর্ণেল অল্‌কট ও মাদাম বেলাভাটস্কির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কয়েকবার মাদ্রাজে এই থিয়সফিকেল সোসাইটীর বার্ষিক সভা উপলক্ষে ভারতের নানাস্থান হইতে নানাদেশীয় ও নানা সম্প্রদায়স্থ লোক সমবেত হন। বিভিন্ন দেশবাসী লোকদিগের এই সম্মেলন দর্শন করিয়া, মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও ও নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কয়েক জনের মনে এইরূপ একটা রাজনৈতিক সম্মেলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে; সুতরাং এজন্য দেওয়ান বাহাদুরের গৃহে এক পরামর্শ সভা হয়। সে সভায় বাঙ্গালীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল ও ভূতপূর্ব্ব 'নববিভাকর'-পত্রের প্রধান সম্পাদক পরলোকগত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এই তিন জন মাত্র উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে এ বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিয়া, মিঃ হিউমের নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করেন। মিঃ হিউম সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং

শাস্ত্রের পঠন-পাঠন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে আছে, সেই প্রদেশের প্রণালী অবগত হইয়া সেই সেই শাস্ত্রের পঠন-পাঠনী বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এই বিভাগ "সংস্কৃত-বিভাগ" নামেও অভিহিত হইতে পারিবে। কেন-না, এই বিভাগে, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও প্রকৃতি অনুসারে, সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতির শিক্ষাদান করা হইবে; এবং পাঁচ শ্রেণীর ছাত্রের এই প্রকারে শিক্ষা-বিধান লক্ষ্য থাকিবে :—

(ক) আচার্য্য-গুরু,—ব্রহ্মচারী। (খ) পুরোহিত। (গ) পুরাণ-পাঠক। (ঘ) ধর্ম্মবক্তা।

(ঙ) অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত; শাস্ত্র-গ্রন্থ-সম্পাদক ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ।

এই বিভাগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আহারীয় ও বাসস্থান প্রভৃতি দেওয়া হইবে।

(২) সাধারণ-বিভাগ।

সাধারণ বিভাগে বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় বিদ্যার আলোচনা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইবে।

এই বিভাগে প্রত্যেক ছাত্রকে মোটামুটি সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে। অন্ততঃ পক্ষে ক্রিয়া-কর্ম্মে বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারা যায় এবং তাহার মোটামুটি অর্থ বোঝা যায়—এইটুকু সংস্কৃত ভাষা ও আর্য্যসদাচার শিক্ষা দেওয়া—এই বিভাগের লক্ষ্য থাকিবে। এই বিভাগের আর লক্ষ্য থাকিবে যে, প্রত্যেক ছাত্র আট দশ বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করার পর সংসারাশ্রমে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বনশীল হইয়া নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করিতে পারে। এই বিভাগে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যে, ১৬।১৭ বৎসরের ছাত্র ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রাদিও আধুনিক পদ্ধতি-অনুসারে এই বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বিভাগে যে সমুদয় ছাত্র পড়িবে, প্রথম প্রথম তাহাদের অভিভাবকগণের নিকট অভিভাবকের অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু টাকা লওয়া হইবে; কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম্ম এমনভাবে চালাইতে হইবে, যেন অচির-ভবিষ্যতে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে পড়িতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, একটী বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করিতে হইবে; এবং ছাত্রগণকে (১) কৃষি (২) গোপালন ও (৩) আবশ্যক শিল্প শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক হইবে। তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রকে তাহাদের রুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী এক বা তদধিক বিভাগে নির্দ্দিষ্ট সময় পরিশ্রম করিতে হইবে।

বিশেষ বিষয়।

সমগ্র বিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ বেদ-বিভাগে—প্রাচীন কালের "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" বা গুরুগৃহের আদর্শ ও প্রণালী যতদূর সম্ভব অনুসৃত হইবে।

মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহায্যে বর্ত্তমান জগতের উন্নতিমুখী চিন্তা-ধারার সহিত প্রত্যেককে পরিচিত করিতে হইবে। এ পক্ষে ব্যবহারিক ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার আবশ্যক হইবে।

স্বাবলম্বনশীল হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইলে ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে, যে সকল দৈহিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, তাহাও প্রত্যেককে শিক্ষা করিতে হইবে।

"বেদ"-বিষয়ে অভিমত।

বেদজ্ঞ পণ্ডিত (গবর্ণমেণ্ট পেন্সনার) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়, আমাদের "অথর্ব্ববেদের" গ্রাহক। আমাদের প্রকাশিত বেদ পাঠ করিয়া, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয় সম্পাদিত "অথর্ব্ববেদ-সংহিতা" কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই সংহিতাখানি মাত্র আমার সভাষ্য নাই; তজ্জন্য আনাইয়াছিলাম। এই সংহিতাখানি প্রকাশ করাতে লাহিড়ী মহোদয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য কেহই প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিয়া, বেদকে যাঁহারা "চাষার গান" বলেন,—তাঁহাদের ভ্রম-ধারণা বা বুঝিবার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। বেদ সকলের নিকট আত্মদেহ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন না; কেবল যে ভাগ্যবানের প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, তাঁহাকেই আত্মদেহ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। এই দুর্ম্মূল্য গ্রন্থ—এত অল্প মূল্যেও কয় জন গ্রাহক পাইবেন? এখনকার লোক সাধারণতঃ বহির্ম্মুখ; তাঁহারা ভস্ত্রার ন্যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃথা জীবন নষ্ট করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের ধারণাই হয় না;—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥"

শ্রীভাগবতে ২।৩।১৭—১৮।

লাহিড়ী মহোদয় যদি কতকগুলা নভেল নাটক প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এতদিন অনেক গ্রাহক পাইতেন; কিন্তু তিনি জীবনের কার্য্য করিতেছেন।

তিনি জানেন যে, মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

শ্রীভাগবতে ১১।৯।২৯

সুতরাং তাহা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মেই ক্ষেপণ করা উচিত। আমাদের দেশে বেদপাঠ অত্যন্ত বিরল। আমার পূজ্যপাদ দ্রাবিড়-নিবাসী বেদাধ্যাপক মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেশে উপনয়ন পরেই বালকগণ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করে; তজ্জন্য তিনি আমায় আদেশ করিয়াছিলেন যে—"প্রতিদিন কয়েক সূক্ত বেদপাঠ করিও।" তাঁহারই আদেশ এখনও পালন করিতেছি। লাহিড়ী মহোদয় যখন ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া লোকের উপকারের জন্য বেদ-সংহিতা অতি সরলভাবে প্রকাশ করিতেছেন, যে বেদ যিনি পাঠ না করিবেন, তিনি আত্মবঞ্চক ভিন্ন কি বাচ্য হইতে পারেন—জানি না।

লাহিড়ী মহাশয়ের ভক্তি ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এরূপ পাণ্ডিত্য কোথাও দেখি নাই। ইহা প্রাণের কথা। চিত্রিত নহে।"

পুনশ্চ,—"হিন্দু-পত্রিকায় আমিও 'সামবেদ' প্রকাশ করিতেছিলাম। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যা দেখিয়া বিরত হইলাম।"

কালনার "পল্লীবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রে "সাহিত্য-সংবাদের" সমালোচনা-উপলক্ষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"সাহিত্য-সংবাদ"—ধর্ম্ম-সাহিত্যে উৎকৃষ্ট মাসিক। যত ধর্ম্মপ্রাণ কৃতবিদ্য লেখক-লেখিকার সন্দর্ভে ইহার অঙ্গ সজ্জিত থাকে। লাহিড়ী মহাশয়ের বেদ-ব্যাখ্যা এক অপূর্ব্ব জিনিষ। হিন্দুর এমন মনের মত প্রাণের মত জলের মত এবং কালের মত বেদ ব্যাখ্যা আর কেহ করিতে পারেন নাই। বেদের যাঁহারা দোহাই দিয়া দেশে অনাচার চালাইতে যান, "সাহিত্য-সংবাদ" পড়িলে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে। হিন্দুর মহত্ত্ব কিসে, সহযোগী সেইটাই আধুনিক শিক্ষিতদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে চান। ইহাতে সমাজের পুরাতন খবরও দেওয়া হয়। নিজস্বের গতি লক্ষ্য রাখার পক্ষে এমন যত্ন অন্যত্র খুবই বিরল।"

পহেলা আষাঢ়।

[শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত বিরচিত।]

বিরহী যক্ষের ব্যথা মূর্ত্তিমান্ হয়ে
গুমরি উঠিছে আজি আমার হৃদয়ে
উদাসী ব্যাকুল করি! প্রেয়সী আমার
পূর্ণ করি একদিন যৌবন-ভৃঙ্গার
মধুর অমৃত রসে তৃষ্ণার্ত্ত পরাণ
ভরে দিত ক্ষণে ক্ষণে অফুরন্ত গান
জাগিত মরমতলে! অভিশাপে কার
সে আনন্দ-স্বর্গ হতে হায়রে আমার
ঘটেছে পতন ঘোর—প্রিয়া মোর নাই
এ বক্ষের পাশে আর! ভাবিয়া না পাই
কোন্ দূর অলকার মুক্ত-বাতাবনে
সে আজি রয়েছে বসে—পড়ে না কি মনে
এ দুর্ভাগ্য মর্ত্ত্যজীবে! কোথা জলধর
বহিবে আর্ত্তের বার্ত্তা প্রেয়সী গোচর!

বঙ্গ-বিধবা।

[শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।]

বিশ্বের মাঝে সেবার ধর্ম্ম ত্যাগের কর্ম্ম মর্ম্মে গাঁথা।
রিপুর গর্ব্ব খর্ব্ব তোমাতে দর্প কামনা চরণানতা॥
কায়া গেছে চলে ছায়া তুমি শুধু দয়া লয়ে হেথা আছগো প'ড়ে।
ছায়ার ধর্ম্মে ছায়ার কর্ম্মে শান্তি বিতর ক্লান্ত পরে॥
ভোগের তৃপ্তি ত্যাগ কর তুমি ত্যাগের যাগে আহুতি দিয়া।
বিশ্বমাঝারে নিঃস্ব হয়েছ বিশ্বসেবায় বিলায়ে হিয়া॥
রাখ নাই কিছু আপনার জন্য দৈন্যে ভরেছ বহির্বেশ।
সন্তোষ-ফুলে অন্তরে ভরি কান্ত-চরণে সঁপগো শেষ॥
সুখ ত্যাগ করি নিতে চাও তুমি বিশ্বজনের দুঃখ যত।
দুখ-মাঝে সুখ ব্যর্থ জীবনে সার্থক তব মহাব্রত॥
সম্মুখে তব ভোগসম্ভার সংযমে নাই লোভের লেশ।
সন্ন্যাস বলে গৃহবাস ত্যজি ছেড়ে চলে যাও লোভের দেশ॥
সে ব্রত মন্ত্র তুচ্ছ করেছ কতনা উচ্চে তোমার ব্রত।
লোভ দুর্গের স্বর্ণপ্রাকার চূর্ণ হইয়া চরণে নত॥
বিবাহ-বাসরে মঙ্গলাসরে প্রবেশে নাহিক তবাধিকার।
বিলাসীর মালা পেয় নহ, তুমি—পূজার কুসুম গঙ্গাধার॥
কর্ম্মের মাঝে কিবা অবসরে অন্তরে সদা চাহিয়া সতী।
অন্তরাসীন কান্তচরণে ভক্তিবিভোলা করগো নতি॥
ব্রহ্মচর্য্য-পালন-নিরতা তণ্ডুলকণা খাদ্যসার।
স্বামিচরণ ধেয়ান-নিরতা নীরব সাধিকা নমস্কার॥
হিন্দুগৃহের জাগ্রত দেবী—সেবা ও প্রীতি আসনাসীনা।
(তুমি) ধরিত্রীমত ক্ষমা পবিত্রা দুর্ব্বারও চেয়ে দর্পহীনা॥

—•—

অবিলম্বে বোম্বাই-নগরে কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। তাহাতেও সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত কলিকাতা হইতে নরেন্দ্রনাথ সেন, এলাহাবাদের জি এন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ৩।৪ জন মাত্র বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। তৎপর বৎসরে কলিকাতায় মহাসমারোহে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই প্রথম কংগ্রেশ হইতে সুরাটের প্রথম দলাদলির কংগ্রেস পর্য্যন্ত প্রায় সকল কংগ্রেসের অধিবেশনেই নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কংগ্রেসের এই আজন্ম-পৃষ্ঠপোষকের জন্য একটু অশ্রুপাত করাও কেহ কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। বোধ হয় সভাপতি বিষণ নারায়ণ ধর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে নামোল্লেখ না করিলে, সে ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের নাম অনুচ্চারিতই থাকিত।

অন্যান্য সদনুষ্ঠানে।

আমি প্রবন্ধারম্ভে নরেন্দ্রনাথকে একজন বহুকর্ম্মান্বিত দেশহিতৈষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সকল কর্ম্মের পরিচয় দেওয়া সম্ভবও নহে এবং আপনাদের ধৈর্য্যেও কুলাইবে না। সুতরাং আমি তাঁহার দুইটি প্রধান কার্য্যের উল্লেখ করিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি এ দেশে নীতি ধর্ম্মের উন্নতির জন্য হিন্দুসভা, গীতাসভা, ব্রহ্ম-সংসদ প্রভৃতি সভা স্থাপনে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবের যে সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-রূপে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। অথবা, এদেশে বালিকাদিগের হিন্দুপদ্ধতিতে শিক্ষা-দানের জন্য মাতাজী তপস্বিনীর সহযোগে মহাকালী পাঠশালা ও আর্য্য-বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপনে তিনি যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিব না। কেবলমাত্র এদেশে ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতি-কল্পে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি কিরূপ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কথা না বলিলে, নরেন্দ্রনাথ সেনের বিয়োগে দেশের কি মহান্ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এই জন্য এই দুইটি বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যাঁহারা "মিরাব" পত্র নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এ দেশীয় যুবকদিগকে কার্য্যকরী শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কতদূর ব্যগ্র ছিলেন। কংগ্রেসের সহিত এখন যে শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত সমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতেও নরেন্দ্রনাথ সেন নিঃসম্পর্ক ছিলেন না। যাহা হউক, তিনি বহু দিন যাবৎ এ বিষয়ে চিন্তা করেন, এবং শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব চিনা-মাটীর কাজ শিখিবার জন্য যখন জাপানে গমন করেন, তখন রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তিনি মিলিত হইয়া তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে সাফল্য লাভ হইল দেখিয়া, তিনি যোগেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত সম্মিলিত হইয়া, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য সভা (Society for the advancement of scientific learning)

স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই সভার জন্য কিরূপ প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গের সকলেই অবগত আছেন। এই সভার দ্বারা এদেশে অন্ন-সমস্যার যে কতকটা সমাধান হইয়াছে, আমাদিগের যুবকগণ যে চিরন্তন জীবিকা অর্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে, আর তাহা যে দেশের একটা পরমলাভ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সভার সহিত নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম চিরদিন সংযুক্ত থাকিবে।

নরেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক হইলেও এবং সেজন্য বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনে তাঁহার সুযোগ না হইলেও, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের কিরূপ অনুরাগী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তাহা কবিবর মধুসূদনের স্মৃতিস্তম্ভ পরিচয় দিতেছে। মাইকেলের মৃত্যুকালে তাঁহার সমাধির উপর একখানি ইষ্টক পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার বহু ধনী বন্ধু থাকিতেও, তাঁহাকে "সাজিয়ে মাচা কলসী কাচা" দণ্ডী-বেশেই বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। খৃষ্টান সমাধি-ক্ষেত্রের নিয়মানুসারে "কাঁচা কবরে" প্রোথিত দেহের অস্থি-কঙ্কাল কয়েক বৎসর পরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কোন্ অজানিত স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়; অথবা তাহা চূর্ণিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য নিয়োজিত হয় কি না—তাহা জানি না। যাহাই হউক, মধুসূদনের অস্থির এই দশা হইবে শুনিয়া, লিটি কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, সকল সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে এ জন্য এক কমিটির সভাপতির স্থান গ্রহণ করিয়া স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। অর্থের অভাবে কোন সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মাইকেল নিজের সমাধি-স্তম্ভের উপরে অঙ্কিত করিবার জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃতি-গর্ভে নিমজ্জিত না হইয়া আজ উজ্জ্বল অক্ষরে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভে যে শোভা পাইতেছে, তাহা নরেন্দ্রনাথের উদ্যম ও চেষ্টায়। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত মধুস্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এহেন ব্যক্তিকে যদি বাঙ্গালী প্রাতঃস্মরণীয় মনে না করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক চিরকাল প্রলেপিত থাকিবে।

উপসংহার।

নরেন্দ্রনাথ যেমন কর্ম্মী ছিলেন, তেমনি পরহিতব্রত ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি স্বতঃ এবং পরতঃ পরের উপকার-সাধনে ও আর্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ-মোচনে যত্ন করিতেন। এমন কি, সে বিষয়ে তিনি শত্রু মিত্র ভেদাভেদ জানিতেন না। যাহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইত, তাঁহাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া আনন্দ-লাভ করিত, তাহাদিগের বিপদকালে উপকার করিতেও তিনি অস্বীকৃত হইতেন না। তাঁহার এই সকল গুণের জন্য তাঁহার ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। রাজপুরুষদিগের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান,

ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়স্থ লোকের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, বিড্‌নস্কোয়ারে পুলিসের অত্যাচারে লোকে উৎপীড়িত হইলে বেসরকারী কমিসন নিয়োগ দ্বারা তাহার যে অনুসন্ধান আবশ্যক হয়, সর্ব্বসম্মতিতে নরেন্দ্রনাথ সেন সেই কমিসনের সভাপতি মনোনীত হন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। সকলেরই বিশ্বাস ছিল—তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফলে কোনও পক্ষেই সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। আমাদিগের সমাজে এইরূপ বহুকর্ম্মী সদাশয় নিরপেক্ষ দেশ-নায়কের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। নরেন্দ্রনাথের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি আমাদিগের উদীয়মান দেশ-সেবকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, দেশ-সেবায় ও জনসেবায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহারও নিরাশ হইবার কারণ থাকিবে না। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ লোকের আবির্ভাব হয়। দেশকালের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত কার্য্যের, প্রণালীর ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সে বিষয়ে পূর্ব্বেকার জননায়কদিগের সহিত বর্ত্তমানের মতভেদ উপস্থিত হইতেও পারে। কিন্তু যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একাগ্রতা অকপটতা ও সর্ব্বোপরি বিবেকানুবর্ত্তিতা সকল সদনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভের নিদান, সে বিষয়ে পূর্ব্বগত মহাজন-দিগের পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁহাদিগের আনুগত্য-স্বীকার সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। নরেন্দ্রনাথ সেনের এই স্মৃতিসভায় তাঁহার এই সকল গুণের আলোচনা করিয়া আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণে সেই গুণরাশি যদি আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের এই সভার অনুষ্ঠান সার্থক হইবে। উপসংহারে একটি কথা বলিয়া অবসর লইব। অদ্যকার এই স্মৃতিসভা থিওজফিকেল সোসাইটীর গৃহে হওয়া বড়ই উপযোগী হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সেন এই থিয়সফিকেল সভার প্রথমাবধি ইহার উন্নতি-কল্পে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল ইহার সভাপতি ছিলেন; এবং সভার "শ্বেত-সরোজ" উৎসবে বর্ষে বর্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিতেন, তাহাতে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মপ্রাণতা সাধুভক্তি প্রভৃতি বহু গুণের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ঐ সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে নব্য থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় যেমন উপকৃত হইতে পারেন, সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণও তেমনই শিক্ষালাভ করিতে পারেন। আমি থিয়সফিষ্ট সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট এবং নরেন্দ্রনাথ সেনের পুত্রদিগের নিকট এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াই অবসর গ্রহণ করিলাম।

প্রণতি।

[শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ভট্টাচার্য্য বিরচিত।]

তব চরণ-রাগ-রঞ্জিত বন্দি হরষ অন্তর।
কান্ত কোমল তুমি সে যে জ্ঞানপুলক সুন্দর।
দিব্য মধুর দর্শন, ভক্ত মানসাকর্ষণ,
পাপি-হৃদয়-মর্ষণ, পুণ্যপ্রতিভা-মন্দির।
উজ্জ্বল করি এ হিয়া, বিশ্বজগত মোহিয়া,
ধীরে চলুক বহিয়া, জ্ঞানপ্রবাহ মন্থর।

বঙ্গে বেদ-বিদ্যার প্রচার।

"বেদসভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন, বঙ্গের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে "বেদ-বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। সেই বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প ও কার্য্যব্যবস্থা প্রভৃতি কিরূপ হইবে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণমূলক একটী (খসড়া) পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। নিম্নে সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যার প্রচারে যাঁহারা অনুরাগ-সম্পন্ন, এ বিষয়ে তাঁহারা মতামত জ্ঞাপন করিবেন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। "সাহিত্য-সংবাদ" বঙ্গে বেদ-বিদ্যার প্রচার বিষয়ে নিয়োজিত হইল। এতৎসংগ্রান্ত সংবাদাদি 'সাহিত্য-সংবাদে' যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশে এখনও অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আছেন। বিলুপ্তপ্রায় বৈদিক-জ্ঞান বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক,—এ ইচ্ছাও এখনও অনেকের মনে জাগরূক আছে। তাঁহারা সকলেই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করুন—কর্ম্ম-সাফল্য জয়শ্রীমণ্ডিত হউক। ইহাই প্রার্থনা।

* * *

নবদ্বীপ বেদ-বিদ্যালয়।

সঙ্কল্প।

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের বিশিষ্টতার সহিত যাহাতে সকলেই পরিচিত হইতে পারেন, সেইজন্যই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্প।

ব্যবস্থা।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ যিনি যে বিষয়েই শিক্ষালাভ করুন, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-সমূহের বিশিষ্টতার সহিত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যাহাতে পরিচয় হয়, সে জন্য ব্যবস্থা থাকিবে। কেবল তাহাই নহে;—বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে সমুন্নত মানব-জীবনের যে আদর্শ রহিয়াছে, সেই আদর্শ বর্ত্তমানযুগে যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। কতকগুলি উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বিদ্যালয়ের বিভাগ।

এই বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ হইবে। একটির নাম (১) বেদ-বিভাগ; অপরটির নাম—(২) সাধারণ বিভাগ।

(১) বেদ-বিভাগ।

বেদ-বিভাগে চতুর্ব্বেদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকিবে; এবং বেদকে ভিত্তি করিয়া বেদানুগত শাস্ত্রের যাবতীয় বিভাগের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকিবে। বঙ্গদেশে যে সমুদায়